কথা কল্পনা কাহিনী

(অষ্টম স্তবক)

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

অষ্টম স্তবকের প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৯

সম্পাদনা

মণীশ চক্রবর্তী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র
সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে পি. কে. পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

নিমাই ও জয়াকে

স্নেহাস্পদেষু—

সুচীপত্র

চিত্ত ও চিত্র

অলৌকিক

প্রসন্ন মধুর

এই গল্প-গ্রন্থমালার প্রথম স্তবকে তেত্রিশটি, দ্বিতীয় স্তবকে আটত্রিশটি, তৃতীয় স্তবকে সাঁইত্রিশটি, চতুর্থ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি, পঞ্চম স্তবকে চৌত্রিশটি, ষষ্ঠ স্তবকে পঁয়ত্রিশটি এবং সপ্তম স্তবকে উনত্রিশটি বিভিন্ন রসের গল্প সংকলিত হয়েছে। প্রথম স্তবক ২২্, দ্বিতীয় স্তবক ২০্, তৃতীয় স্তবক ২২্, চতুর্থ স্তবক ২৪্, পঞ্চম স্তবক ২৪্ ও ষষ্ঠ স্তবক ২৫্, সপ্তম স্তবক ৩০্।

যোগাযোগ

ওই যে হাওড়া থেকে যে পুরী এক্সপ্রেস রওনা হয়, তার একটি আনরিজার্ভড্ থার্ড ক্লাস কামরাতে গাড়ি ছাড়ার আগে, একেবারে শেষ মুহূর্তে, একটি লোক এসে উঠেছিল। গাড়িতে পেষাপেষি ভিড়—তার ওপর কয়েকটি কলেজের ছেলে যাচ্ছিল দল বেঁধে, তারা যথারীতি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে—সুতরাং উঠতে পারার কথা নয়। যারা জোর-জবরদস্তি তর্ক-বিতর্ক করেছিল তারা কেউ উঠতে পারেও নি। কিন্তু এ লোকটি সে সব কিছু না ক'রে নীরবে বিনা প্রতিবাদে গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে হাতল ধরে ঝুলে যেতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে যাবার পর ছেলেগুলিই তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল।

নিতান্তই সাধারণ লোক, হতদরিদ্র-গোছের আকৃতি সঙ্গে টিকিট ছিল কিনা সন্দেহ। খুব সম্ভব ছিল না, কারণ যারা পয়সা খরচ ক'রে টিকিট কাটে তারা এমন ক'রে সহযাত্রীদের জুলুম আর তম্বি সহ্য ক'রে না। গাড়িতে উঠে বসবার জায়গা আশা করে—না পেলে বচসা করে ঝগড়া করে, হাতা-হাতিতেও কুণ্ঠিত হয় না। একেবারে কোথাও কোন স্থান না থাকলে অন্তত বিলাপ করে, অসন্তোষ প্রকাশ করে। এ লোকটি কিন্তু সে সব কিছুই করে নি, গাড়িতে উঠে অন্যদিকে তাকায়ও নি বোধ হয়, একেবারে দোরের কাছে, জানলার ধারে ধারে আধুনিক কামরায় যে একটি ক'রে বসবার সীট্ থাকে—তারই পিছনে সামান্য খাঁজমতো জায়গাতে একটি ভাঁজকরা বিবর্ণ তুলোর কম্বল পেতে বসে পড়েছিল। তার সঙ্গে মালও ছিল সামান্য, ঐ ছেঁড়া কম্বলটা বাদ দিলে একটা গামছায় জড়ানো একখানা ধুতি এবং পানের বটুয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। লোকটির গায়ে জামাও ছিল না।

লোকটি বসেই কোণে ঠেস দিয়ে চোখ বুজেছিল। হয়ত অসুস্থ ছিল তখনই—কিম্বা ক্লান্ত। ঠাসা এক কামরা লোক, তারা অনেকেই বসবার জায়গা পায় নি—ফলে বকাবকি চেঁচামেচির অন্ত ছিল না। কলেজের ছেলে-গুলো অবিরাম হৈ-হল্লা ক'রে যাচ্ছে কিন্তু এত চিৎকারেও লোকটি চোখ খোলে নি। যেমন উঠেই অবসন্ন ভাবে বসে পড়েছিল, তেমনিই বসে রইল, চোখও

খুলল না, কথাও বলল না।

সে কাউকে লক্ষ্য না করলেও তাকে অনেকে লক্ষ্য করছিল। ছেলেরা তো বিশেষ ক'রে। কেউ কেউ বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা নিয়ে কটূ মন্তব্য করছিল, কেউ কেউ বা এই ধরনের ভালমানুষ চেহারার দীনহীন লোকই যে গাড়িতে চুরি-ডাকাতি করে সে সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিচ্ছিল বাকী যাত্রীদের।

লক্ষ্য করছিল বলেই বোধ হয়, ওর প্রথম নড়েচড়ে ওঠা থেকে সব ঘটনাই চোখে পড়েছিল অনেকের। তখন বোধ হয় রাত চারটে হবে, হঠাৎ যেন চমকে ঘুম ভেঙে যাবার মতো ক'রে নড়ে উঠল লোকটি, যেন হঠাৎ দম আটকে আসার মতো হাঁ ক'রে নিঃশ্বাস নিল বার-কয়েক—তারপরই আবার সব স্থির হয়ে গেল। মাথাটা তেমনিই পিছনে হেলে সেই গাড়ি আর সীটের খাঁজে আটকাল। তফাতের মধ্যে এবার আর চোখ দুটো পুরো বুজল না, মুখটাও একটু ফাঁক হয়ে রইল। শেষ নিঃশ্বাসটা নেবার জন্য মুখটা ফাঁক হয়েছিল, সেটা আর বন্ধ হ'ল না।

ছেলেরা তখনও বুঝতে পারে নি। বাথরুমের পাশে বাঙ্কের ওপর যে মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিলেন তিনিই প্রথম বলে উঠলেন, 'মাই গড্! লোকটা মরে গেল নাকি?...হার্ট ফেল করল?'

তখন অনেকেই সচকিত হলেন। ওদিকের লোকেরা ভিড় ক'রে এলেন দেখতে। ছেলেরাও ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। সত্যি সত্যিই একেবারে বিনা প্রস্তুতিতে, বিনা নোটিশে একটা লোক এমন ক'রে দুবার খাবি খেয়েই মরে যাবে—এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করা শক্ত।

বিশ্বাস হ'লও না প্রথমটা। 'এই—!' 'আরে শুনতা হ্যায়?' 'কী হয়েছে হে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?' ইত্যাদি প্রশ্নে ও উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বরে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা চলল খানিকটা। একজন তাঁর জলের বোতল থেকে খানিকটা জল নিয়ে ছিটিয়ে দিলেন মুখে। আর একজনকে বললেন বাতাস করতে। হয়ত আরও জল ঢালতেন কিন্তু অনেকেই প্রতিবাদ ক'রে ওঠাতে নিবৃত্ত হলেন। বহু মাল ও বহু মানুষ আশপাশেই মেঝেয় পড়ে—একটু বেশী জল হ'লেই গড়িয়ে আসবে, যদি মড়াই হয় তো মড়ার জল, সেটা আদৌ অভিপ্রেত নয় কারও।

গাড়ির কোণে কার একটা ছাতা ছিল, ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন ছাতাটা টেনে নিয়ে বার-দুই খোঁচা দিয়েও দেখল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে পরীক্ষা চালাবার সুযোগ মিলল না, যাঁর ছাতা তিনি হৈ-হৈ ক'রে উঠলেন। ছেলেটি তাড়াতাড়ি ছাতা রেখে দিতেও জের মিটল না, ছাতার মালিক যথেষ্ট ঝাঁঝ প্রকাশ করতে লাগলেন বহুক্ষণ পর্যন্ত, ছেলেটিও দু-একটা গরম গরম জবাব দিল শেষের দিকে। ফলে হয়ত বেশ একটা বড় রকমের তামাশা জমে উঠত —যদি না গাড়ির অপর দু-চারজন মধ্যস্থ হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতেন।

এদিকের গণ্ডগোলটা মিটতে ছেলেদের মনোযোগটা আবার ঐ লোকটার ওপরই এসে পড়ল। তাদের তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। সত্যিই এ-ভাবে অকস্মাৎ—বিনা কারণে বা বিনা আয়োজনে একটা লোক নিঃশব্দে মরে যেতে পারে, এটা বিশ্বাস করার বয়স নয় তাদের। তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে তর্ক বাধিয়ে তুলল।

একজন বলল, 'আরে এই হ'ল রিয়াল থ্রম্বসিস। বুঝতে পাচ্ছিস না?'

আর একজন বলল, 'দূর, এসব লোকদের কখনও থ্রম্বসিস হয়। যারা ঘরে বসে কাজ করে, শুধু মাথা ঘামায় আর ভাল ভাল রিচ ফুড খায়—সেই সব সিডেণ্টারী হ্যাবিটের লোকরাই থ্রম্বসিসে মরে। এ যদি মরেও থাকে— হুইচ আই ডাউট ভেরি মাচ—হার্ট ফেল ক'রে মরেছে হঠাৎ।'

'ওরে বাবা ও-ই হ'ল। যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি। আগে থ্রম্বসিস নামটা জানত না, বলত হার্ট ফেল। এখন সবই থ্রম্বসিস।'

'কিন্তু যা-ই বলো, ও বাবা মরে নি—আমি বাজি রেখে বলতে পারি। হয় ভোচ্‌কানি গেছে—হয়ত অনেকদিন খাওয়া-টাওয়া হয় নি—নয়তো মহাঘুঘু। ঐ রকম পোজ করছে, আমরা মরে গেছে মনে ক'রে নিশ্চিন্তি হ'লেই কিছু একটা ঝেড়ে নিয়ে পালাবে।'

'হাঁ—এই এত বেলায়, চারিদিক ফরসা হয়ে গেছে—এখন চুরি করবে! তুইও যেমন! ও গেছে, গন্।'

'একটু দেখলেই তো হয়—দাঁড়া আমি একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করছি!' একটি ছেলে উঠে কাছে এসে দাঁড়াল, 'ক্ষিদেয় যদি অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকে, খাবারের গন্ধে উঠে বসবে ঠিক। একটু খাবার দিয়ে ছাখ বরং—'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিল মাইরি। লুচি, লুচি ইজ দ্য থিং—লুচির গন্ধে মরা মানুষ জেগে ওঠে। লুচি আছে কার কাছে? বার করো।'

সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাগ থেকে খাবারের কৌটো বার করল একজন। অল্প বয়সের কৌতূহল ও নিষ্ঠুরতায় সবাই ঝুঁকে পড়ল আবার, অনেকেই হাসতে লাগল একটা বড় রকমের তামাশার আভাসে, সকলেরই চোখে মুখে কৌতুক জড়ানো উত্তেজনা; তারই মধ্যে একজন একখানা লুচি ছুঁড়ে দিল তার মুখের দিক তাগ ক'রে। লুচিখানা তার মুখে লেগে কোলের ওপর এসে পড়ল—এবং পড়েই রইল। কিন্তু ততক্ষণে আর এক মুঠো বোঁদে এসে পড়েছে। কে একজন আস্ত চীনেবাদামও গোটা দুই ছুঁড়ল ওপাশ থেকে।

এবার ওদেরই মধ্য থেকে একটি ছেলে ধিক্কার দিয়ে উঠল, 'এই—কী হচ্ছে কি, অসভ্যতা করছিস কেন? একটা ডেড্ ম্যানকে নিয়ে এসব বিশ্রী রসিকতা আমার ভাল লাগে না।'

'সত্যিই বাবারা,' ভরসা পেয়ে ওধার থেকে একজন প্রবীণ ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মৃত্যুর একটা স্যাংটিটি আছে, মৃত ব্যক্তিকে অমন খোঁচাখুঁচি করা ঠিক নয়।'

অপ্রস্তুত হয়ে সরে এল সবাই। অবশ্য কতটাই বা সরা সম্ভব! তবু, কিছুক্ষণের মতো ওদের সেই অবিশ্রান্ত হৈচৈতেও ছেদ পড়ল। মিনিট দুই-তিন স্তব্ধ থেকে যেন মৃতের আত্মাকে সম্মান দেখাল ওরা।

তার একটু পরেই অবশ্য আবার শুরু হয়ে গেল তাদের আলোচনা। প্রথম দিকে সেটা ঐ মৃত ব্যক্তিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল কিছুক্ষণ। কী হয়েছিল লোকটার, কেন মারা গেল, কী করে বা কী করত, কোথায় বাড়ি—এই সম্পর্কে নানা বিচিত্র অনুমান, তর্ক ও বাজি রাখারাখি। প্রসঙ্গটা ফুরিয়ে যেতে আবার যথারীতি আলোচনাটা রাজনীতি, কলেজ ও চলচ্চিত্রে এসে পড়ল।

সে লোকটি তেমনই পড়ে রইল। সেই কোণে ঠেস দিয়ে—লুচি, বোঁদে ও চীনেবাদাম কোলে নিয়ে।

ইতিমধ্যে বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাড়ি খুরদা রোডে এসে পড়ল।

কে একজন বললেন, 'গার্ডকে তো তাহ'লে ইনফর্ম করা দরকার, এমন কাণ্ডটা হ'ল—'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন, 'অমন কাজও করবেন না, অমন কাজও করবেন না। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? খবর পেলেই পুলিস আসবে—কী হয়েছিল কী বৃত্তান্ত, কে চেনে ওকে—হাজারো রকমের জেরা আর জবানবন্দী শুরু হয়ে যাবে। দু' ঘণ্টা তিন ঘণ্টা হয়ত ডিটেন্‌ড্‌ হয়ে যাবে গাড়ি তার ফলে। তারপর হয়ত বলে বসবে আপনারা নেমে যান, গাড়ি কাটব। এই ভিড়ে আবার কোথায় গিয়ে উঠব মশাই মোট-ঘাট নিয়ে? আপনি তো এক কথা বলে খালাস।...তার চাইতে চলুন—যেমন এতক্ষণ এলেন তেমনি চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিন, কতটুকুই বা বাকী? পুরীতে পৌঁছে সবাই নেমে যাব যখন—যাদের চোখে পড়বার ঠিক পড়বে। তখন থানা-পুলিস যা হয় হোক, আমাদের তো হয়রান করতে পারবে না।'

বুদ্ধিমানের মতো কথা তাতে সন্দেহ নেই।

যিনি গার্ডকে খবর দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি অপ্রতিভ ভাবে চুপ ক'রে গেলেন।

কিন্তু ট্রেন সেদিন অনেক দেরিতেই পৌঁছল। ছাঁকা একটি ঘণ্টা লেট্‌ হয়ে গেল পুরী পৌঁছতে। নটায় পৌঁছবার কথা—ঠিক দশটায় পৌঁছল।

ওদিকে ঠিকমতো এসে সাক্ষীগোপালে দেরি ক'রে ফেলল এক ঘণ্টা।

সাক্ষীগোপাল স্টেশনে ঢোকবার মুখেই ঘটল ঘটনাটা।

যারা বাইরের দিকে ছিল—এ কামরার ছেলেরা দু'দিকের দরজা খুলে নিজের নিজের বেডিং পেতে সামনেই বসে ছিল – তারা সবাই দেখেছে।

ওদিকের পাকা রাস্তাটা দিয়ে তীরবেগে আসছিল ছেলেটা, কুড়ি বাইশ কি পঁচিশ হবে তার বয়স—মালকোঁচামারা ধুতি পরনে, গায়ে ধোপদস্ত ছিটের শার্ট, সুশ্রী ভদ্র চেহারা। যে সাইকেলটা ক'রে আসছিল সেটাও ঝকঝকে নতুন। একেবারে লাইনের ধারে পড়ে রাস্তাটা যেখানে ঘুরে গেছে, সেইখানে নেমেই সাইকেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে দুটো বগির মাঝখানে গলা দিয়ে শুয়ে পড়ল। কেউ চেঁচিয়ে ওঠার কি কোন বাধা দেবার সময় তো পেলই না, ঘটনাটা কি ঘটছে তা বোঝবার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে ছেলেটির গলা থেকে মুণ্ডটা কেটে বেরিয়ে গেল।

তারপর যথারীতি হৈ-চৈ, চেন-টানা, ভিড়। রিপোর্ট, চেঁচামেচি। এবং অনাবশ্যক দেরি।

তারপর একসময়ে গাড়ি আবার ছাড়ল। পুরীতে পৌঁছলও। যাত্রীরা নেমে গেলেন পাণ্ডাদের কচকচি ও রিকশাওয়ালাদের কোলাহলের মধ্য দিয়ে। এক গাড়ি অশিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তির এক-রাত্রি-বাসের চিহ্ন বহন ক'রে পড়ে রইল শুধু রাশীকৃত জঞ্জাল—খাবারের টুকরো, শালপাতা, দগ্ধাবশিষ্ট বিড়ি, দেশলাইয়ের কাঠি, চীনেবাদাম ও কলার খোসা—এবং আরও বহু বিচিত্র আবর্জনা।

আর পড়ে রইল, ঐ মৃত দেহটা, সেই একক আসনের খাঁজে মাথা হেলিয়ে অর্ধনিমীলিত স্থির শূন্য দৃষ্টি মেলে, মানুষের নিষ্ঠুর-কৌতুকের চিহ্নস্বরূপ লুচি বোঁদে ও চীনাবাদাম কোলে ক'রে।

পড়ে রইল সাক্ষীগোপালের প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার মুখে দ্বিখণ্ডিত মৃত-দেহটাও। কোথা থেকে যেন রেল পুলিশের দারোগা আসবেন, সরেজমিন তদন্ত হবে, তবে ডোম এসে লাশটা সরাবে। আপাতত পড়ে রইল ঐ ভাবেই—ধড়টা থেকে মাথাটা হাত চারেক দূরে, তারও স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টি অনন্ত শূন্যে মেলে দিয়ে।

এ দুটো ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। সে গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, ঐ দুই স্টেশনের স্টেশন-স্টাফ এবং আরও অনেকে। কিন্তু জানেন দুটো ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে। এর মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা জানেন না। হয়ত কোনদিন কথাটা ভেবেও দেখেন নি। হয়ত ঐ হার্ট ফেল ক'রে মরা লোকটির কোন পরিচয়ও পাওয়া যায় নি কোন দিক থেকে।

তাঁরা জানেন না তার কারণ, তাঁদের জ্ঞান পরিমিত, দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। শুধু তথ্যের ওপরই নির্ভর করতে হয় তাঁদের। লেখকের দৃষ্টি মুক্ত এবং সত্য। তিনি বহুদূর দেখতে পান। তাঁর কল্পনা অনেক সময় এমন সত্যে পৌঁছয় যেখানে পৃথিবীর কোন তথ্য কোনদিন নাগাল পাবে না।

আমি দেখতে পাচ্ছি দুটি মৃত্যুর মধ্যে এক রহস্য-নিবিড় যোগাযোগ।

আমি পরিচয় পেয়েছি ঐ লোকটির। ওর নাম শত্রুঘ্ন দাস। এই সাক্ষী-

গোপালের কাছেই ওর বাড়ি।

ছেলেটিকেও চিনি। ওর নাম বিশ্বনাথ। ছেলেবেলায় নাম ছিল মাগন দাস। শত্রুঘ্নর ছেলে ও। একমাত্র ছেলে।

আরও ভাল ক'রে এর রহস্যটা জানতে হ'লে আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে বহু বছর আগের একটা সময়ে।

এই বিশ্বনাথের ছেলেবেলায়।

শত্রুঘ্ন লেখাপড়া জানত না। যেমন আর পাঁচজন ওদের দেশ থেকে কলকাতায় শুধুমাত্র দুটো হাতের ওপর ভরসা ক'রে আসে—সেই ভাবে সেও এসেছিল একদিন। এখান-ওখান নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত চ্যাটার্জী-বাবু 'পিলাম্বরে'র কাছে এসে ঠেকেছিল। ভাল মিস্ত্রী, কাজ ভাল শিখেছিল বলে ঐখানেই হেড্ মিস্ত্রীর কাজ পেয়ে গিয়েছিল। পয়সা ভালই কামাত, বাবুর বিশ্বাসভাজন—আর এখান-ওখান করার কোন প্রশ্ন ওঠে নি।

যথাসময়ে অর্থাৎ যথাসময়ের অনেক আগেই শত্রুঘ্নর বিয়ে হয়েছিল। তখনও সে কাজ খুঁজতে বেরোয় নি কলকাতাতে। বাপের সামান্য জমি ভরসা, পোষ্য অনেক। খুবই দুর্দশায় দিন কাটত ওদের। কিন্তু তাতে ওরা অভ্যস্তও ছিল, খুব দুর্দশা বলে কোন দিন কেউ ভাবতে শেখে নি সে অবস্থাটাকে।

প্রথম ভাবল শত্রুঘ্নই। কলকাতায় এসে নাগরিক জীবন দেখে প্রথম তার মনে হ'ল যে এ-ই তো জীবন। এরাই তো বেঁচে আছে। তাদের জীবনের মূল্য কি ? প্রয়োজনই বা কি ?

সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করল সে যে যদি কোনদিন তার ছেলে হয় তো তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করবে—এমন ক'রে ওদের মতো গরু-ভেড়া-ছাগলের জীবন যাপন করতে দেবে না।

ছেলে হ'লও ওর প্রথমেই। আগে মনে হয়েছিল কিছুই হবে না, ওর বৌ একটু রুগ্ন গোছের ছিল, সময় পেরিয়ে বেশী বয়সেই হ'ল। তারপর ওর বৌ আর বাঁচেনিও বেশীদিন, বছর খানেক সুতিকায় ভুগে মারা গিয়েছিল। তখন শত্রুঘ্নের বয়স সামান্যই—পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী নয়—সকলেই আশা করেছিল যে ও আবার বিয়ে করবে। না করবার কোন আপাত-কারণও ছিল

না, কলকাতায় 'কাম্‌অ' করে, টাকা কামায়—সে তো একটা ছেড়ে তিনটে বিয়ে করতে পারে। আত্মীয়স্বজনরা চেপেও ধরে ছিল খুব। কিন্তু শত্রুঘ্ন আর রাজী হয় নি।

তার কারণ, সুখের চেয়ে উচ্চাশাটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে তখন, সে বুঝেছে যে এখন বিয়ে করলে আরও বহু ছেলে মেয়ে হবে তার, আর তাদের সবকটাকে ভাল ভাবে মানুষ করা তার দ্বারা সম্ভব হবে না, যত পয়সাই সে কামাক না কেন। একটি মাত্র ছেলে প্রসব ক'রেই যে ওর স্ত্রী মারা গেল, এটাকেও সে বিধাতার স্পষ্ট নির্দেশ বলে ধরে নিল। এই ছেলেই মানুষ হোক ওর—আর সে কিছু চায় না।

শত্রুঘ্ন করলও অসাধ্য সাধন। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ছেলেকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে লাগল। অনেক খরচা, অথচ আয়ের পথ সীমিত; সে সময়টা যুদ্ধের বাজারে কাজ-কারবার কম, মালই পাওয়া যায় না, যা মেরামতী কাজ। মিলিটারীতে নাম লেখালে অনেক টাকা পাওয়া যেত হয়ত কিন্তু শত্রুঘ্নর ভরসা হ'ল না। তাতে স্বাধীনতা থাকবে না। হয়ত কোন দূর দেশে ঠেলবে, মগের মুলুকেই ঠেলবে হয়ত, সেখানে বোমা কি গুলি-গোলায় মরে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এখানে তার ছেলেটা বারো মাস বোর্ডিং-এ থাকে—তাকে কে দেখে? শত্রুঘ্ন মরে গেলেই বা তার কি হবে। অনেক ভেবে সে বেশী মাইনের লোভ সম্বরণ করল।

কিন্তু পুরনো কাজেও টিকে থাকতে পারল না। পুরনো মনিব পুরনো কর্মচারীর মাইনে হিসেব করেন আগের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে, সেই হিসেব-মাফিক বাড়ান একটু একটু ক'রে। এধারে যুদ্ধের বাজারে নতুন নতুন কারখানা হচ্ছে তখন, তাতে মোটা মাইনের ব্যবস্থা। তারই একটাতে ঢুকে পড়ল সে।

কিন্তু তাতেও কুলোয় না। নিজের খরচ যেমন-তেমনই হোক—একটা ঘরে তারা দশ-বারোজন থাকে, শুধু ভাত-ডাল ফুটিয়ে খায়—কিন্তু তার দায় ধাক্কা অনেক। দেশে তখনও বুড়ো মা-বাবা আছে, ভাইটা লড়াইয়ে চলে গেছে—কিছুই পাঠায় না প্রায়, তার সংসারও দেখতে হয় ওকে। এদিকে ছেলে হোস্টেলে থেকে পড়ে—তার একগাদা খরচ। মাগন দাস নাম দিয়ে-

ছিল ওর ঠাকুর্দা, বহু ঠাকুরের দোরে মেগে ছেলে হয়েছিল বলে—ইস্কুলে ভর্তি করার সময় শত্রুঘ্ন পালটে বিশ্বনাথ ক'রে দিল। মাগন অর্থাৎ ভিক্ষা শব্দটা দারিদ্র্যের প্রতীক, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে ছেলের কোনদিন। ভদ্রলোকের ছেলের মতোই যেন সে মানুষ হয়—এই চেষ্টাই করেছে শত্রুঘ্ন বরাবর। বই-খাতা অনেকেই চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করে, অনেক অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেও, ওরও হয়ত তা হ'ত কিন্তু সে দিক দিয়েই যায় নি শত্রুঘ্ন কোনদিন।

এর মধ্যে বহু দুঃখ করতে হয়েছে তাকে। কারখানার চাকরি ছাড়াও অনেক খুচরো কাজ করত সে। যে অঞ্চলে ওদের বাসা—সেখানে তখনও সব বাড়িতে জলের ব্যবস্থা হয় নি—ভারীর চাহিদা আছে। শত্রুঘ্ন ভোরে উঠে দু-তিন বাড়ি জল যোগাত। রাত্রে ফিরেও যোগাতে হ'ত। যেদিন ওভার-টাইম থাকত—সেদিন অন্য ভারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে যোগানটা ঠিক রাখত। এ ছাড়া একজনের বাড়িতে মালীর কাজ করত, রবিবার বা ছুটি-ছাটায়। প্লাম্বারের যন্ত্রপাতি কিছু কিছু ছিল ওর কাছে—আশপাশের বাড়িতে কারও কোন দরকার পড়লে টুকটাক কাজ ক'রে দিয়ে আসত। তাতেও দু-চার টাকা পাওয়া যেত। এক কথায় বারো মাস এবং প্রতি মাসে ত্রিশ দিন ভূতের মতো খেটেছে সে। ভোর হওয়ার বহু আগে থেকে আরম্ভ করত—গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত সে খাটুনি। সূর্য কখন ওঠে বা কখন অস্ত যায়—তা কোনদিন চেয়ে দেখে নি শত্রুঘ্ন।

তার ফলে, যে ছেলের জন্যে এত, সেই ছেলের সঙ্গেই দেখা হ'ত দৈবাৎ-কালে-ভদ্রে। ছুটি পাওনা হ'ত কিন্তু ছুটি মানেই তো লোকসান। কখনও-সখনও দু-তিন দিনের ছুটি নিয়ে দেশে আসত ছেলেকে দেখতে—ছেলের ছুটির সময়, তাও যেতে-আসতেই দুটো রাত চলে যেত, একদিনের বেশী ছেলের কাছে থাকা হ'ত না। ওর ইস্কুলে কখনও যেত না শত্রুঘ্ন, পাছে তার বেশভূষা কি কথাবার্তায় তার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে—ছেলে লজ্জা পায়।

ইস্কুলের পড়া শেষ হ'তে বিশ্বনাথ বললে, 'এবার আমি একটা কাজটাজ খুঁজি—তুমি দিনকতক বিশ্রাম নাও। যা হোক একটা চাকরি কি আর

জুটিয়ে নিতে পারব না ?'

কথাটা শুনে শত্রুঘ্ন শিউরে উঠল।

বা রে! এই জন্যে কি সে এত কষ্ট করল? ছেলেকে কলেজে না পড়িয়ে তিনটে পাস না করিয়ে সে ছেড়ে দেবে? কী হয়েছে তার শরীরে যে এখন থেকে ছেলেকে দিয়ে রোজগার করিয়ে বসে বসে খাবে সে?

'যা যা, তোকে অত মাথা ঘামাতে হবে না। কী করবি না করবি সে আমি বুঝব।'

এক ধমকে চুপ করিয়ে দিল সে ছেলেকে।

না, বালেশ্বর কলেজে নয়, পুরীর ছোট কলেজেও নয়—ওদের গ্রামের পোস্টমাস্টারবাবুকে খরচ দিয়ে পাঠিয়ে সে কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজেই ভর্তি করিয়ে দিলে। ছেলে তবু একবার আপত্তি করতে গিয়েছিল, পুরীতে হ'লে ফ্রী হ'তে পারত, বালেশ্বরেও চেনা লোক আছে, অন্তত হাফ্-ফ্রী হ'ত—আর কিছু না হোক হোস্টেলের খরচ অনেক কম ওসব জায়গায়, এ শত্রুঘ্ন কী করল! মিছিমিছি এ নবাবীতে দরকার কি?

এর মধ্যে একদিন, ঠাকুরদার মৃত্যুসংবাদ দিতে সে কলকাতায় এসেছিল, তার বাবা কী অবস্থায় থেকে তার খরচা যোগায় তা নিজের চোখেই দেখে গেছে।

কিন্তু শত্রুঘ্ন এবারও কোন কথা শুনল না। তার এখন দায়-ধাক্কা অনেক কম। মা বাবা গেছে—ভাই ফিরে এসেছে, তার সংসার সে বুঝবে—এখন তার দায় বলতে ঐ ছেলে। পাঁচটা নয় দশটা নয়—একটাই ছেলে। তার জন্যে খরচ করবে না তো কার জন্যে করবে? যদি পাঁচ-সাতটা ছেলে মেয়ে থাকত ওর, কি বিশুর মা বেঁচে থাকত—তা হ'লে কি আর পারত? তার ভাবনা না বিশ্বনাথ ভাবে—মন দিয়ে লেখাপড়া করুক সে, তা হ'লেই শত্রুঘ্নর এ কষ্ট সার্থক।

তাছাড়া এখন আরও অনেক বেড়েছে আগের চেয়ে, স্বদেশী সরকারের আমলে বেশ ভালই রোজগার করছে সে. শরীরও অপটু হয়ে পড়ে নি কিছু-মাত্র। এখনই বা কাজ ছাড়বে কেন? আর তার বয়সই বা এমন কি একটা হয়েছে? এখনও তো পঞ্চাশ হয় নি। আরও ঢের কম। ঠিক হিসেব

নেই—কিন্তু তার যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স তখনই বিশু এসেছে তার ঘরে —আর বিশুরই বা কী এমন বয়স। হিসেব করে নিক না বিশু, এত তো লেখাপড়া শিখেছে। তার কি বসে খাবার বয়স এটা?

এরপর আর কথা চলে নি। শত্রুঘ্নর বহু কষ্টার্জিত অর্থে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলের মতোই কটকের সরকারী কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়েছে বিশু।

কিন্তু শত্রুঘ্নর উচ্চাশা এইখানেই থেমে থাকে নি। ছেলেকে যেমন মানুষ করছে, তার উপযুক্ত ঘরবাড়িও যে ক'রে দিতে হবে সে কথাটাও সে ভোলে নি। ওদের গ্রামে পাকাবাড়ি কারও নেই, বাড়ি করার সাজসরঞ্জাম বহুদূর থেকে আনতে হয়—সুতরাং খরচ অনেক বেশী, তবু তিল তিল ক'রে পয়সা জমিয়ে ওর হিস্যায় একখানা পাকা ঘরও তুলে ফেলল সে ইতিমধ্যে। ছাদটা হ'ল না এ যাত্রায়—আপাতত য়্যাসবেস্টাসের চাল দিয়েই রাখতে হ'ল কিন্তু অন্যসব মাল-মসলায় কোন কার্পণ্য করে নি। দরজা-জানলাও সদর বাজার থেকে ভাল দেখে আনিয়েছে। এরকম কখনও এ গ্রামের লোক দেখে নি— গ্রামে রটে গেল—লড়াইয়ের বাজারে বিস্তর টাকা কামিয়েছে শত্রুঘ্ন দাস, টাকার কুমির হয়ে গেছে।

·

আরও একটা আশা তার ইদানীং একটু একটু ক'রে মনের মধ্যে বেশ ভালমতো একটা আকার ধারণ করেছে।

একটি মনের মতো বৌ আনবে সে ছেলের জন্যে।

আবার লক্ষ্মীছাড়ার সংসারে শ্রী ফিরবে, সুখের সংসার হয়ে উঠবে। মা-হারা ছেলেটা চিরকাল হোস্টেলে হোস্টেলে কাটাল—এবার যখন কাজকর্ম করবে তখন যেন অন্তত একটু গৃহসুখ পায়।

সে-বৌও মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছে সে।

ওদের পাশের গ্রামের দামো—ওর সঙ্গে এক কারখানাতেই কাজ করে, এক বাসাতেই থাকে দীর্ঘকাল। দামোই বলে-কয়ে ওকে এ কারখানাতে ঢুকিয়েছিল, তার জন্য একটা কৃতজ্ঞতাও আছে। এতাবৎ, এই দীর্ঘকাল, উপকার ছাড়া অপকার করে নি কখনও।

দামো ওদের স্বজাতিও বটে।

এই দামোরই একটি বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে। বয়স—তাদের তুলনায় একটু বেশীই হয়ে গেছে, খুব কম ক'রেও—শত্রুঘ্নর যা আন্দাজ—চোদ্দ-পনেরো হবে। দেখতে যে খুব একটা ভালো তা নয়—অবশ্য কুৎসিতও নয়। তা তাদের ঘরে তাদের গ্রামে সুন্দরী মেয়ে আর কটা আছে। কই নজরে তো পড়ে না। তবু এ মেয়েটির একটা আল্‌গা শ্রী আছে বেশ। লক্ষ্মী নাম—আচারে-আচরণে চলায়-বলায়ও চমৎকার একটা লক্ষ্মী-লক্ষ্মী ভাব। সবচেয়ে যেটা শত্রুঘ্নকে আকৃষ্ট করেছে—স্বভাবটি ভারী মিষ্টি। একবার দামোর খুব অসুখ করে—খবর পেয়ে বাড়ি থেকে স্ত্রী আর মেয়ে এসেছিল সেবা করবার জন্যে, সেই সময়ই লক্ষ্মীকে প্রথম দেখে সে। শুধু শত্রুঘ্ন কেন—বাসার সকলেই লক্ষ্মীর ব্যবহারেও মিষ্টি কথায় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাপের সেবাও করেছিল তেমনি, ঐটুকু মেয়ে দিনরাত খুটখাট কাজ ক'রে যেত—মাকে সাহায্য করত।

তারপর—ঐ মেয়েটিকে আরও ভাল ক'রে দেখতেই—একবার দামোর বাড়িতে গিয়েছিল শত্রুঘ্ন, দামোর সঙ্গে। আরও ভাল লেগেছে তার। এই মেয়েই তো সে চাইছিল, যাকে দেখেই মা-জননী বলে ডাকতে ইচ্ছে করে।

সেই বারেই মন স্থির ক'রে ফেলে সে। কলকাতায় ফিরে, দামো পাছে অপর কোন জায়গায় কথা দিয়ে ফেলে (খোঁজ-খবর তো করছেই বহুদিন ধরে) এই ভয়ে, দামোকেও অভিলাষটা জানিয়েছে সে। তবে একটা কথা জানিয়ে দিয়েছে সঙ্গে-সঙ্গেই, যতদিন না ছেলে তিনটে পাস দিয়ে কোন ভাল চাকরি নিচ্ছে, ততদিন সে বিয়ে দেবে না ছেলের—ছেলেও রাজী হবে না। ভাল ক'রে নিজের পায়ে ভর দেবার আগেই একটা বোঝা ঘাড়ে করতে চায় না আজকালকার কোন ছেলেই। শত্রুঘ্নরও সেটা পছন্দ নয়।

বলা বাহুল্য দামো হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেয়েছিল একেবারে। তাদের ঘরে তিনটে পাস করা চাকুরে বাবু পাত্র এখনও দুর্লভ। এমন অদৃষ্ট কি তার লক্ষ্মীর হবে?

তার মনের এই গোপন কথাটি অবশ্য ছেলেকে জানায় নি শত্রুঘ্ন। জানাবার কোন প্রয়োজনও বোধ করে নি। তার ছেলে বাধ্য—ভাল ছেলে। বাপকে সে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। বাবা তার সুখের জন্যে যে ব্যবস্থা

করছে সে ব্যবস্থা সে মাথা পেতে সসম্মানেই নেবে নিশ্চয়। আর তাতে সুখীও সে হবে। নিশ্চয়ই হবে। শক্রুঘ্ন ভুল করে নি। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে বহু দুঃখ করেছে সে। সব চেয়ে, বলতে গেলে ভরা যৌবনেই সন্ন্যাসী হয়েছে। ওর যে বয়সে বিশুর মা মরেছে সে বয়সে এখন প্রথম বিয়েই হয় না। ছেলের কথা ভেবেই তো সে আর বিয়ে করে নি। নিজে একদিনও ভাল একখানা কাপড় পরে নি, একদিনও—এই কলকাতার বাজারে কত ভাল খাবার—জীবন ধারণের মতো ভাত-ডাল ছাড়া কোন খাবার কিনে খায় নি। সবই ছেলের মুখ চেয়ে। ছেলের সুখের ব্যাপারে হিসেবে ভুল হলে চলবে না।

বিশ্বনাথ বি. এ. পাস করল ভাল ভাবেই। তারপর পরীক্ষা দিয়ে প্রভিন্সিয়াল য়্যাডমিনস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ঢুকে পড়ল। কোন ধরপাকড় করতে হ'ল না, সে রকম মুরুব্বী ছিল না কেউ। নিজের জোরেই বেরিয়ে গেল। তার কৃতিত্বের আরও একটি স্বীকৃতি পেল সে। এ চাকরির প্রথমে সাব-ডেপুটি হবার কথা, কিন্তু সরকার থেকে ট্রেনিং দিয়ে একেবারে ব্লক-ডেভেলপ-মেণ্ট-এ বড় একটা পদে তাকে বসিয়ে দেওয়া হ'ল।

এ ছেলে শহর-বাজারেও সুপাত্র। পাড়াগাঁয়ে তো কথাই নেই, এ রকম পাত্র সেখানে সুদূর কল্পনারও অতীত। সুতরাং চারিদিক থেকে বহু পাত্রীর বাবা ঠিকানা যোগাড় ক'রে খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হ'তে লাগলেন শক্রুঘ্নর সেই সামান্য বাসায়। শেষে ওদের পাশের গ্রামের জমিদার—রাজা উপাধি তাঁর—লোক পাঠালেন ওর কাছে।

এ শক্রুঘ্নর কল্পনাতীত সৌভাগ্য। কিন্তু শক্রুঘ্নর সৌভাগ্যের ধারণা একটু অন্য রকম। বৃদ্ধ বয়সে দুটি কোমল স্নেহপরায়ণ হাতের সেবা, একটি কল্যাণী মেয়ের সস্নেহ সম্ভাষণ, সংসারের শ্রী—এই তার কাম্য। তার ছেলেকে রাজার জামাই ক'রে চিরদিনের মতো আয়ত্তের বাইরে পাঠাবার জন্যে সে এমনভাবে মানুষ করে নি।

সে রাজার লোককে 'না' বলে দিল। কিন্তু সেই সঙ্গেই বুঝল যে আর দেরি করাও উচিত নয়। লোভ বলবান। চারিদিক থেকে বড় বেশী টাকার

প্রলোভন আসছে। তার মতো দরিদ্র লোক কতদিন এ লোভ সামলাতে পারবে তার ঠিক কি? সামান্য ক'টা টাকার জন্যে হয়ত ছেলের সুখসৌভাগ্য বিক্রি ক'রে বসে থাকবে শেষ পর্যন্ত।

রাজার লোককে বিদায় ক'রেই শত্রুঘ্ন দুদিনের ছুটির দরখাস্ত করল। ছেলের নতুন চাকরি, সে আসতে পারবে না। তবে জায়গাটা ভাল—সাক্ষী-গোপালের কাছেই—ঐখানে কোথাও থেকে হেঁটে গিয়ে দেখা ক'রে আসা যায়। একেবারে ছেলের কাছে গিয়ে ওঠা ঠিক হবে না, ছেলে হয়ত লজ্জা পাবে।···

বিশু ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলেও লজ্জা পেল না। অতি সহজেই অধস্তন কর্মচারীদের সামনে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো নিল, অফিসে নিয়ে গিয়ে বসাল, তারপর দুপুরে খাওয়ার ছুটি হ'তে বাসায় নিয়ে গিয়ে শত্রুঘ্নরও স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিল। আলাদা কোয়ার্টার এখনও পায় নি, বিয়ে না হ'লে পাবে না। তবে—অন্য অফিসারদের সঙ্গে থাকলেও—আলাদা ঘর পেয়েছে একখানা। কথাবার্তার কোন অসুবিধা নেই।

খেতে খেতেই কথাটা পাড়ল শত্রুঘ্ন। ছেলে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে—প্রথমটায় তো ওকে অমনভাবে আসতে দেখে উদ্বিগ্নই বোধ করেছিল। আর অন্ধকারে রাখা ঠিক নয়। বিশুর বিয়ের বয়স হয়েছে, অবস্থাও হয়েছে—গোড়ায় সেই কথাই বলল। বহু সম্বন্ধ আসছে চারিদিক থেকে, শত্রুঘ্ন আর সামলাতে পারছে না। রাজামশাই সুদ্ধ লোক পাঠিয়েছেন তার কাছে—কথাটা জানিয়ে আনন্দিত গর্বে ছেলের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর নিজের মনের গোপন ইচ্ছাটির কথাও জানাল। দামোকে কথা-দেওয়া হয়ে গেছে—তাও। দামো বেশী কিছু দিতে পারবে না—কিন্তু তার দরকারও নেই। বিশু যদি বেঁচে থাকে তো ঢের টাকা রোজগার করবে। আসলে মানুষের যেটা দরকার—সুখ-শান্তি, সেটা দিতে পারবে দামোর মেয়ে। বিশু সুখী হবে তাকে বিয়ে ক'রে।

নিজের বলার ঝোঁকে আপন মনে বলে যাচ্ছিল শত্রুঘ্ন, বলতে বলতে নিজেরই মানসচোখে ভেসে উঠেছিল ভবিষ্যতের একটি স্বপ্নচিত্র—সেখানে শান্তি ও শ্রীর একটি ক্ষুদ্র নীড়ে সুখী একটি পরিবার, আর তার মধ্যে সেও—

তৃপ্ত, চরিতার্থ। এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ক্ষণকালের জন্য চোখ ধেঁধে দিয়েছিল বলেই শত্রুঘ্ন লক্ষ্য করল না যে বিশুর মুখ ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে, চোখে ফুটে উঠেছে অসহায় বিহ্বলতা।

ছুটো বাজার ঘণ্টা পড়তে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়ল বিশু। এখনই আবার অফিস শুরু হবে, পাঁচটা পর্যন্ত চলবে অফিস। বাবা এখন বিশ্রাম করুন, সে ফিরে আসছে ছুটি হ'লেই।

শত্রুঘ্ন বললে, 'কিন্তু আমি তো এখনই ফিরে যাব ভাবছিলুম রে, এতটা পথ যাওয়া—সময় তো লাগবে।'

'না না, আজ কোথায় যাবেন—কাল গেলেই চলবে। তাছাড়া হাঁটতেই বা হবে কেন, জীপ আছে, পৌঁছে দেবে এখন—'

ব্যস্ত হয়েই চলে গেল বিশ্বনাথ। কিন্তু শত্রুঘ্নর হঠাৎ কেমন মনে হ'ল যে কোথায় কী একটা গোলমাল বেধেছে। ছেলের আচরণ ঠিক সহজ বা স্বাভাবিক নয়। ছেলের যে সহজ সম্মতি আশা করেছিল বা সম্মতিসূচক নীরবতা—তা যেন, ওর এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে নেই।

ছেলেরই বিছানায় শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু ঘুম এলো না। বিশু মুখে কিছু বলে নি এটা ঠিক, তবু শত্রুঘ্ন স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই গোলমাল কেন, কিসের গোলমাল—না বোঝা পর্যন্ত স্বস্তি পাবেও না। তাই বিকেলে ছেলে এসে চা নিয়ে বসতেই একেবারে সরাসরি আক্রমণ করল সে, 'তাহ'লে কবে নাগাদ ছুটি নিতে পারবি বল, সেই বুঝে দিন ঠিক করব। ওদেরও তো একটু সময় দিতে হবে।'

গত তিন ঘণ্টাতেই বিশ্বনাথের মুখে বহু পরিবর্তন হয়েছে। মসৃণ ললাটে জেগেছে কুঞ্চন, অমন যৌবনদীপ্ত মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। সেটাও চোখ এড়ায় নি শত্রুঘ্নর। খেটেখুটে এল ঠিকই—কিন্তু এই বয়সে, চেয়ার-টেবিলে বসে কাজে, মুখে এমন কালি পড়ে না। এত দ্রুত আক্রমণের বোধ হয় সেও একটা কারণ।

বিশুর কপালে আবারও বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সে অসহায়ভাবে একবার বাবার মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'এখন থাক না বাবা, এই তো সবে চাকরীতে ঢুকেছি। এত তাড়া কি?'

'তোর তাড়া নেই, আমার তাড়া আছে। আমি ঢের দিন কষ্ট করেছি—আর না। বৌয়ের সেবা চাই।' শত্রুঘ্নর গলায় অস্বাভাবিক জোর।

তবুও বিশ্বনাথ ওর মুখের দিকে চাইতে পারে না। তেমনি ওদিকে চেয়েই জবাব দেয়, 'কিন্তু তুমি তো এখনই চাকরী ছেড়ে বৌয়ের সেবা খেতে আসছ না। যখন সে সময় হবে তখনই না হয় তাড়া করো।'

শত্রুঘ্ন আর কথার মারপ্যাঁচে গেল না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বল্ দেখি বিশু—ঠিক ঠিক বল্। আমাকে লুকোবার চেষ্টা করিস নি কিছু। আমি বুঝেছি কী একটা গোলমাল আছে তোর কথার মধ্যে।'

তবু খানিকটা সময় নিল বিশু। ঘেমে নেয়ে উঠল সে। গলাটা ধরে আসতে লাগল কথা কইতে গিয়ে, বহুক্ষণ পর্যন্ত স্বরই ফুটল না যেন। শত্রুঘ্ন অবশ্য তাড়া দিল না, স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলের সামলে ওঠবার। স্থির হয়ে গেছে যেন তার বুকের মধ্যেটাও—সমস্তটা যেন হিম আড়ষ্ট হয়ে গেছে কী এক অজ্ঞাত অশুভ আশঙ্কায়।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেলল বিশু।

তার কলেজের সহপাঠিনী মালতী। সে-ই তার স্বপ্নকল্পনা। সে-ই তার আত্মার আনন্দ, প্রাণের আরাম। তাকে ঘিরেই যত কিছু সুখস্বপ্ন তার। যদি সুখী হয় তো তাকে পেলেই হবে। সেও রাজী আছে। সেও চাকরী পেয়েছে। এই চাকরীই। চেষ্টা করছে এই ব্লকে আসবার। এলে বিয়ে করা সহজ হবে। সে সম্ভাবনা হ'লে বিশু বাবাকে বলবে বলে স্থির ক'রে রেখেছিল। বাবা যে এত শিগ্‌গির তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তা ভাবে নি। তা'হলে বলত। বাবা যেভাবে তাকে মানুষ করেছে, তাতে কোন শিক্ষিত ভদ্র মেয়ে ছাড়া যে তার বিয়ে করা সম্ভব নয়—শত্রুঘ্নর এটুকু জানা উচিত। তা ছাড়া ছেলের সুখের প্রশ্নই যদি বড় হয়—বিশুর এই নির্বাচনে ওর অমত করাও উচিত নয়।

স্থির হয়ে শুনল শত্রুঘ্ন, পাথরের মতোই স্থির হয়ে বসে শুনল। বাধা দিল না, চেঁচামেচি করল না—মাঝে কোন প্রশ্নও করল না। কথাগুলো বলতে বিশুর অনেক সময় লাগল কিন্তু ধৈর্য ধরেই শুনল সে। সব বলা শেষ

হ'তে শুধু বলল, 'তুমি তাকে কথা কথা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ—একরকম দেওয়াই। মানে—আমিই তার কাছে কথা পেড়েছি।'

'অ। তাহলে আর এর নড়চড় হওয়া সম্ভব নয়?'

'কিন্তু তার কোন দরকার হবে না বাবা, তুমি ছাখো, তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। খুব ভাল মেয়ে।'

হাসল শত্রুঘ্ন। বলল, 'বিয়ে করবি তুই, আমি দেখে কী করব বল। আমার পছন্দরই বা কী দাম। তোর ভাল হ'লেই ভাল।…তা তাহ'লে আর দেরি করার দরকার কী? বিয়েটা সেরেই ফ্যাল—'

এই সরল হাসি ও সহজ কথা সত্ত্বেও বিশ্বনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'না বাবা, তবু তুমি একটু ছাখো। বলছি, তোমার ভাল লাগবে।'

'বেশ তো। ভালই তো। তাহ'লে তুইই-বা অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন। তাই যদি জানিস তো দেখাতে চাইছিস কেন মিছিমিছি।'

'তবু তুমি ছাখোই না একবার'—জেদ করার মতোই বলে বিশ্বনাথ।

শত্রুঘ্ন আবারও হেসে বলে, 'আমরা মুখ্যু লোক, লোহা পিটে খাই। আমাদের পছন্দ এক রকমের। আমার ওপর অত ভরসা করিস নি। তাছাড়া —যদিই ধর আমার অপছন্দ হয়—তুই কি বিয়ে বন্ধ করতে পারবি? অন্য মেয়ে বিয়ে করবি আমার পছন্দমতো!'

'তোমার যদি অমত হয় তো—নিশ্চয় ও বিয়ে বন্ধ করব, এ তুমি কি বলছ! তবে অন্য মেয়ে হয়ত আর বিয়ে করতে পারব না। কিন্তু তোমার অমতে তোমার পুত্রবধূ এনে তোমার ঘরে বসাব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

'আর তা জেনেও আমি তোর মনের মতো বৌ অপছন্দ করব ভাবছিস। ওসব বাজে কথা থাক, তুই শুধু একটু তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে ফ্যাল!'

'কিন্তু—কিন্তু সে আমার সজাতি নয় বাবা, ওরা ব্রাহ্মণ। বিয়ে এমনি হয়তো করা যাবে না, রেজেস্ট্রী করতে হবে।'

'তা বেশ তো। কিন্তু লোকজন খাওয়াতে তো বাধা নেই? যেদিন থেকে রোজগার করছি সেইদিন থেকেই শখ, গ্রামের ষোল আনা সবাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াব। বাবা-মা'র শ্রাদ্ধের সময় হয়ে ওঠে নি, কারণ তখন পয়সা ছিল না হাতে প্রায় কিছুই, যা করেছি দেনা ক'রে করেছি। তোর

বিয়েতেও যদি না খাওয়াতে পারি—'

'হ্যাঁ, তা পারবে বাবা, নিশ্চয় পারবে। তবে আর কটা মাস অপেক্ষা করলে আমিও কিছু দিতে পারব।'

'না, তার দরকার হবে না, তুই বরং তাড়াতাড়ি যাতে হয়—সেই চেষ্টা কর্।'

মাস ছুই পরেই বিয়ে হয়ে গেল ওদের। এর জন্যে অনেক কাণ্ড করতে হ'ল বিশ্বনাথকে, অনেক তদ্বির। প্রথম তদ্বির মালতীর বদলির, দ্বিতীয় তদ্বির কোয়ার্টারের। ওর সৌভাগ্যক্রমে ছুটোই হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। সুতরাং পাত্র-পাত্রী কোন পক্ষেই আপত্তির কোন কারণ রইল না।

শত্রুঘ্নও খুশী শেষ পর্যন্ত। গ্রামসুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতে পেরেছে সে ভালভাবেই। বৌটিও ভাল হয়েছে। দেখতে যেমন-তেমন কিন্তু স্বভাব বড় মিষ্টি। যথার্থ শিক্ষার পালিশ আছে ব্যবহারে। উদ্ধত বা উন্নাসিক নয়। শ্বশুর কেমন, কী করে—সবই সে জানে, তবু শ্বশুরের প্রাপ্য সম্মানে এতটুকু ত্রুটি ঘটতে দেয় নি। এই কদিনই সেবা যত্ন যথেষ্ট করেছে। শিক্ষিত ও ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে বলে যত না হোক—সরকারী চাকরী-করা মেয়ে ওর বৌ হয়েছে বলেই গ্রামের লোকেরা যথেষ্ট ঈর্ষিত শত্রুঘ্ন সম্বন্ধে। আরও ঈর্ষা—সেই চাকরে বৌও তার অশিক্ষিত অল্পবিত্ত শ্বশুরকে শ্বশুরের মতোই ভক্তিশ্রদ্ধা করছে বলে।

বিবাহের উৎসব-অনুষ্ঠান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ছুটির মেয়াদও ফুরিয়ে এল। এবার কর্মস্থলে ফিরতে হবে। মালতী বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।'

'নিশ্চয়ই যাব। তোমাদের ঘর সংসার গুছিয়ে না দিলে চলবে কেন?'

তবু সংশয় থেকে যায় মালতীর মনে। বলে, 'আর কলকাতাতে ফিরবেন না তো?'

'ও হরি, তা না ফিরলে চলে! আমারও তো ছুটির মেয়াদ ফুরিয়ে এল।'

'কিন্তু আর দরকার কী বাবা আপনার সেই খাটুনির মধ্যে গিয়ে?'

'দূর পাগলী, এখনও পঞ্চাশ বছর বয়স হয় নি আমার, এরই মধ্যে বসে বসে খাব! আর কিছুদিন চাকরী করি তারপর বসবার কথা ভাবা যাবে।'

'কিন্তু—' কী যেন বলতে গিয়েও থেমে যায় মালতী।

'কিন্তু কি মা? বলো না, ভয় কি?'

'বলছি যে—আপনার ছেলে এখন বড় অফিসার হয়েছে, আমিও—এখন আপনার আর ও চাকরী করা ভাল দেখায় না। লোকে এ নিয়ে হয়ত মুখের সামনেই ঠাট্টা-তামাশা করবে—জানেন তো, আমাদের এদেশের লোকের স্বভাব, খোঁচা দিতে পারলে আমরা ছেড়ে দিই না। আগে করতেন সে আলাদা কথা ছিল—এখন আরও একটা কথা উঠবে, লোকে বলবে ব্যাটা-বৌ খেতে দেয় না।'

শত্রুঘ্ন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, এটা আমার ভাবা উচিত ছিল মা। কিন্তু বিশু তো বলে নি কখনও—তাই মনে পড়ে নি। তা তার যদি অসুবিধা হয় ও চাকরি ছেড়ে দেব বৈকি। কিন্তু এক কথায় এখানে বসে ছাড়ি কি ক'রে, এতদিনের চাকরি, পাওনাও আছে অনেক, তাছাড়া তাদের বলেকয়ে আসাও তো উচিত, নইলে বেইমানী করা হয় তাদের সঙ্গে—'

কেমন অসহায় ও অনুনয়ের ভাবে চায় সে পুত্রবধূর মুখের দিকে।

লজ্জিত হয়ে পড়ে মালতী। তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, এখনই এখান থেকে ছাড়তে বলছি না আপনাকে। একথা বলেছি জানলেও আপনার ছেলে রাগ করবেন।...আপনি যান—। তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আমরা থাকব কার ভরসায়—আপনি কলকাতায় বসে থাকলে?'

শত্রুঘ্ন হাসল একটু। এরা লেখাপড়া জানা মেয়ে—কিন্তু বলে-ফেলা কথা এখনও সুকৌশলে ঢাকতে পারে না। গুছিয়ে কোন কথা পাড়তেও পারে না। বিশুর মা হ'লে এর চেয়ে অনেক গুছিয়ে বলতে পারত।

শত্রুঘ্ন ওদের সঙ্গে ওদের কোয়ার্টার পর্যন্ত এল।

দুটো তিনটে দিন থাকলও। কিছু কিছু গোছগাছ ক'রে দিল। তবে সে শুধু সংসারের হাঁড়ি-হেঁসেলের দিকটাই, শৌখীন সাজসজ্জার কিছুই বোঝে না সে, সেদিকে গেলও না।...নতুন কোয়ার্টার, বহু সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা—লোভ হয় বৈকি। মনে হয় অনেক খেটেছে—দিনকতক আরাম করতে দোষ কি? কিন্তু সে লোভ সে সামলে নেয়। এর মধ্যে সে বড়ই বেমানান।

ছেলে বৌয়ের সামাজিক জীবনে তো বটেই, ঘরোয়া জীবনেও—সে থাকলে অসুবিধারই সৃষ্টি হবে। চাকরবাকররাও জেনে গেছে যে সে এদের গুরুজন হ'লেও সে মূর্খ, সে এদের চেয়ে অনেক ছোট।

বিদায়ের দিনও জীপে তুলে দিয়ে পুত্রবধূ প্রশ্ন করল, 'তাড়াতাড়ি চলে আসছেন তো ?'

'দেখি—।' বলে হাসল শুধু শত্রুঘ্ন।

মালতী বলল, 'এখানে যদি খুব অসুবিধা মনে করেন, দেশেও তো এসে থাকতে পারেন। নতুন বাড়িঘর করেছেন, পরের ভরসায় ফেলে রেখেই বা লাভ কি ? দেশে থাকলে জীপ পাঠিয়ে আনিয়ে নিতে পারি মধ্যে মধ্যে, আমরাও যেতে পারি। কিছুদিন এখানে রইলেন—কিছুদিন ওখানে রইলেন—কিন্তু চাকরি আর না।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল শত্রুঘ্ন। হঠাৎ যেন প্রবল উৎসাহভরে মাথা নাড়ল, 'সে তো বটেই। আচ্ছা, আমি আসি তাহ'লে। সাবধানে থেকো তোমরা।'

জীপ ছেড়ে দিল। মালতী আরও কি একটা বলতে গেল সেটা আর শোনা হ'ল না।

যত তাড়াতাড়িই সে চলে আসুক, মাসখানেকের আগে যে আসতে পারবে না তা এরা জানত। তাই চিঠিপত্র না পেলেও কোন উদ্বেগ বোধ করে নি, খবর নেবারও প্রয়োজন বোঝে নি। কখন যে মাসখানেক কেটে গেছে তাও বুঝতে পারে নি।

মাসখানেক পরেই খবর পাওয়া গেল অবশ্য। কিন্তু সেটা শত্রুঘ্ন মারফৎ নয়। দামোর মারফৎ। দামো এসে খবর দিলে।

এক বস্ত্রে চলে এসেছে স্টেশনে নেমে—এক মিনিটও কোথাও দাঁড়ায় নি, মুখে জল দেয় নি। এতটা পথ প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছে। এভাবে এসেছে তার কারণ, তার মনে হয়েছে এ ব্যাপারে—পরোক্ষ হ'লেও—তার একটা বড় রকমের দায়িত্ব আছে।

খবর সংক্ষেপে একটিই—শত্রুঘ্নর বোধহয় মাথার কিছু গোলমাল ঘটেছে।

দামোর মেয়েটির জন্যে সে-ই উদ্যোগী হয়ে একটি ভাল সম্বন্ধ ঠিক করে-ছিল, গত সপ্তাহে অনেক খরচপত্র ক'রে বিয়ে দিয়েছে -নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তখন দামো বোঝে নি যে কোথা থেকে অত টাকা পেল শত্রুঘ্ন। কালই জেনেছে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল সে কদিন আগেই। অফিসের প্রাপ্য টাকা চুকিয়ে নিয়ে সেই টাকাই খরচ করেছে। সামান্য কিছু বাকী ছিল, ক'দিনের মাইনে না কি ওভারটাইম—সেইটে নিয়েছে কাল, তা থেকে পুরীর একখানা থার্ড ক্লাস টিকিট কেটে যা ছিল সব পাঠিয়ে দিয়েছে দামোর মেয়েকে —মনিঅর্ডার ক'রে। কাপড় জামা স্যুটকেশ ওখানে যা ছিল—সামান্যই অবশ্য, একখানি কাপড় আর একটি গামছা রেখে সব বিলিয়ে দিয়েছে গরিব দুঃখী ভিখিরী ডেকে।

অফিসের খবরটা জানতে পেরেছে দামো দিন-দুই আগে। তারপরই এই ঘটনা। সে চেপে ধরেছে শত্রুঘ্নকে। কী মতলব তার, কী করতে চায় সে। এতদিন ভেবেছে যে দেশে যাবে কিংবা ছেলের কাছে—কিন্তু জামাটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিল—তার মানে কি ? সে কি আত্মহত্যা করতে চায় ?

'না রে,—আত্মহত্যা করব কেন ? ছিঃ! এবার দিনকতক বিশ্রাম করব!' হেসে জবাব দেয় শত্রুঘ্ন।

'তার জন্যে কি এমন ক'রে কেউ সব বিলিয়ে দেয়। এ তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ।' দামো দু হাত চেপে ধরে ওর, 'ঠিক ক'রে বলো দিকি কী মতলব তোমার!'

'না রে, সত্যিই ছুটি নিলুম এবার। কাজ থেকেও, সংসার থেকেও। একদম স্বাধীন জীবন এখন থেকে। আর কোন পরোয়া রইল না কারও। ভগবানকে তো ডাকি নি এতদিন, ডাকার সময় পাই নি।—এবার তাঁকে ডাকব। পুরীতে যাব, বাসা রাখব না কোথাও, যেখানে-সেখানে পড়ে থাকব। যদি কোন মঠে কাজ পাই, বাসন মাজার কি ঝাড়ু দেবার তো—তাই নেব। নইলে আনন্দবাজারে প্রসাদ মেগে খাব। প্রভুকে দর্শন করব, তাঁর নাম করব—তোফা আনন্দে দিন কেটে যাবে। খুব আনন্দে থাকব রে, বিশ্বাস কর্, খুব আনন্দ।'

আর কিছু বলে নি দামো। ছুটে চলে এসেছে এখানে। আজকেরই

টিকিট কাটা আছে। আজকের এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা হবে শত্রুঘ্ন। এখন তো আর সেখানে আটকানোর সময় নেই। বিশু যদি পারে তো কাল ভোরে এই সাক্ষীগোপালেই তাকে নামিয়ে নিক, নইলে—যদি খুঁজে না পায় তো—যেন পুরী পর্যন্ত চলে যায় ঐ ট্রেনে. সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসে।

চুপ ক'রে বসে শুনছিল বিশ্বনাথ। স্বপ্নাবিষ্টের মতো। মুখে কোন ভাবই ফোটে নি এর মধ্যে একবারও। দামোর কথা শেষ হ'তে শুধু বলল, 'তাই যাব। ভোরেই স্টেশনে চলে যাব।'

তারপর মালতীকে বলেছিল দামোর খাওয়াদাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে, আর ওরই একখানা ধুতি বার ক'রে দিতে।

তারপর থেকে আর একটি কথাও বলে নি কারও সঙ্গে। অফিসেও যায় নি সেদিন। স্লিপ পাঠিয়ে ছুটি নিয়েছিল।

শান্ত স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল সে। প্রশান্ত, ভাবলেশহীন মুখে। সে মুখ দেখে কিছুই বোঝবার উপায় ছিল না; মনে যদি কোন ঝড় উঠে থাকে তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নি সেখানে।

এতখানি স্তব্ধতা ওর স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাই মালতী প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খাওয়ার সময়ে যথানিয়মে এসে খেতে বসাতে ততটা ভয় আর থাকে নি। সেও চুপ ক'রে ছিল, এ প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে সাহস হয় নি তার। হয়ত মনের মধ্যে গোপন একটা বিবেকের দংশনও অনুভব করছিল—কে জানে!

চুপ ক'রেই রইল বিশু—বাকী সমস্ত দিন। রাত্রেও বহুক্ষণ পর্যন্ত। একভাবে একটা চেয়ারে বসে রইল সে। শেষে মালতী উদ্বিগ্ন হয়ে এসে অনুযোগ করতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু ঘুম আসে নি বহুকাল। সেটা মালতীরও না জানবার কথা নয়। কারণ সেও জেগে ছিল। তার ঘুম হচ্ছে না নানা রকম এলোমেলো চিন্তার জন্যে। অবশ্য তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। তবে বিশুর ঘুম আসা দরকার। নীরবে নিঃশব্দে কী প্রচণ্ড ঝড় বহন করছে সে বুকের মধ্যে, তা—পূর্ব-ইতিহাস সবটা জানা না থাকলেও—কিছু কিছু বুঝতে পারে বৈকি মালতী।

শেষে একসময় ভরসা ক'রে প্রশ্নটা ক'রেই ফেলল, 'ঘুমের ওষুধ খাবে

কিছু ? দেব ?'

খুব সহজভাবে উত্তর দিল বিশু, 'না, কাল ভোরে উঠতে হবে।'

ভোরে যে যাবে—জীপ বলে রেখেছ ? মহান্তীবাবুকে না বললে কি গাড়ি আনবেন ?'

'দরকার হবে না। সাইকেলে যাব।'

সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সহজ উত্তর। স্বাভাবিকও।

'এতটা পথ সাইকেলে যাবে—কষ্ট হবে খুব।'

মৃদু অনুযোগ একটু করল মালতী, বেশী বলতে পারল না। আজ যেন সে বিশুর নাগাল পাচ্ছে না কিছুতেই, বড় দূর—বড় পর মনে হচ্ছে নিজেকে।

আর একটি মাত্র প্রশ্ন করেছিল সে খানিক পরে, অনেকক্ষণের অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে, 'ওঁকে এখানেই আনবে তো ?'

বিশুও একটি মাত্রই কথা কয়েছিল তার উত্তরে, 'না।'

আর কোন কথা হয় নি।

আর কোন কথা হ'লও না কোনদিন। কারণ বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে এপাশ ওপাশ করতে করতে শেষ রাত্রের দিকে মালতী ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিশু যে কখন উঠে রওনা হয়ে গেছে, তা সে টের পায় নি।

দাম্পত্য

ওদের সরু গলিটা যেখানে এসে চওড়া বড় রাস্তায় মিশেছে, সেই মোড়ে হঠাৎ সেদিন স্বামি-স্ত্রীতে সাক্ষাৎ।

স্বামী বললে, 'এই যে সুচিত্রা।'

ক্ষীণ ক্লান্ত-কণ্ঠে স্ত্রী উত্তর দিল, 'ও, এই যে।'

ক্লান্তির কোন কারণ নেই। ঐ রকমই অভ্যস্ত। সুচিত্রা হাঁটে অবসন্ন ভাবে, কথা কয় যেন ক্লান্তির শেষ নেই। চোখের দৃষ্টিটা সুদ্ধ যেন প্রাণহীন, বিবর্ণ।

'কোথায় চললে ?' বিপুল উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করে স্বামী। বিজয়ের

স্বভাব ওর স্ত্রীর ঠিক বিপরীত। সে চলে ছুটে, কথা কয় জোরে জোরে এবং দ্রুত। জীবনের ওপর ওর অগাধ আস্থা। সে ছেলেবেলায় খেলাধুলোয় প্রথম হ'ত—আজও সন্ধ্যার পর কাজে যেতে যেতে, আলো জ্বেলে ছেলেরা ব্যাডমিন্টন খেলছে দেখলে কারুর হাত থেকে ব্যাট্‌টা কেড়ে নিয়ে একটা 'গেম' খেলে নেয়। এখনও নিয়মিত ব্যায়াম করে—হাজার কাজ থাকলেও ওটা বন্ধ হয় না। ওর চলায় বলায় ভঙ্গিতে প্রাণশক্তি যেন উছলে ওঠে, আর তাইতে প্রকাশ পায় ওর অসাধারণ কর্মশক্তি। বিজয় ওঠে ছটায় এবং শুতে যায় রাত এগারোটায়। তখনও বিছানায় শুয়ে পড়াশুনো চলে। সকালের কাগজটা যেটুকু বাকি থাকে পড়তে, সেটুকু শেষ করে—তারপর মেডিক্যাল জার্নালগুলো। ঘুমোতে ঘুমোতে প্রায় প্রতিদিনই রাত একটা বেজে যায়। তবু, এত অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়েও সে ক্লান্তি অনুভব করে না কিছুমাত্র।

এই দুটি বিপরীত স্বভাবের মানুষের মধ্যে প্রেম জমে ওঠবারই কথা। আর তা তো উঠেও ছিল।

সুচিত্রা বললে, 'যাচ্ছিলুম তোমার ওখানেই।'

'আরে! সে যে আমার সৌভাগ্য! ইস্—যদি ঘরে ব'সে থাকতুম!' কৌতুক ক'রে বলে বিজয়।

কিন্তু সে কৌতুকের তাপ সুচিত্রার ক্লান্তির বরফ গলাতে পারে না। মুখে ওর একটা হাসির রেখাও ফোটে না। বিজয়ের মনেই পড়ে না কবে ও সুচিত্রাকে হাসতে দেখেছে। হাসলেও মড়ার মতো হাসি ফোটে, প্রাণহীন, নিষ্প্রভ।

সুচিত্রা চুপ ক'রেই রইল। বিজয় বললে, 'কিন্তু দেবী, হতভাগ্যের প্রতি এত করুণা কেন আগে তাই বলো। না কি তোমার সঙ্গে বাড়িতেই ফিরে যাবো।'

'না না, এখানেই সেরে নিই। কতকগুলো খুচরো ব্যাপার আছে। দীপু-মঞ্জুর বিস্কুট ফুরিয়েছে, এবেলাই মনে ক'রে পাঠিয়ে দিও। আমার সেই টনিকটা। সাবান এক বাক্স। ওদের জামার ছিট কিছু কিনতে হবে, আমারও খুচরো খরচ আছে—অমনি ঐসঙ্গে একশ'টা টাকা দিও।

'টাকাটা এখনই নিয়ে যাও। বাকি জিনিসগুলো আমি চারটের মধ্যেই

পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'তাই দিও। ওরা ইস্কুল থেকে ফেরবার আগেই বিস্কুটটা দরকার।'

'নিশ্চয় দেব। আচ্ছা, কিন্তু একটা কথা—এবার যে দশ পাউণ্ডের টিন ছিল চিত্রা, এখনও তো এক সপ্তাহ—'

'ওটা কেনাই তোমার ফুলিশ হয়েছিল। এই বর্ষায় টিন খোলবার পর কি আর থাকে ? মিইয়ে গেলে তোমার ছেলেমেয়েরা খায় না, তা আমি কি করব। সে চাকর-বাকররা খাচ্ছে! তাও তারা খেতে চাইছে না, বলে এ যে একেবারে কাদার তাল হয়ে গেছে দিদিমণি—'

'অ,' একটু যেন দমে-যাওয়া কণ্ঠস্বরে বলে বিজয়।

'হ্যাঁ— আর একটা কথা, সামনেই তো শীত। ওদের দুটো উলের ফ্রক আর পুলওভার চাই—কিনবে না বুনে নেব ?'

'বুনতে পারবে ? তোমার তো আবার চোখে স্ট্রেন্ হয়।'

'না, সময় তো আছে। একটু একটু ক'রেই না হয় বুনব—তাহ'লে উল কিনতে হবে।'

'ওটা তুমিই পছন্দ ক'রে কিনে নিও বরং।...এই নাও, একশো কুড়ি টাকা ছিল আপাতত দিলুম।'

'আচ্ছা।' তেমনি উৎসাহহীন ভাবে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে ব্যাগে রাখলে সুচিত্রা। তারপর একটু ইতস্তত করতে লাগল। অর্থাৎ 'তবে আসি' এ কথাটা ও স্বামীর কাছ থেকে শুনতে পারলেই খুশি হয়।...এ কথাটা বলতে আজও যেন কেমন বাধে ওর।

কিন্তু বিজয়ের অত ব্যস্ততার মধ্যেও, এই মুহূর্তে ওর কাছে যেন সমস্ত সময় স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে কোথায়। সে স্ত্রীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। সে চাহনিতে আজও পুরুষের অনন্ত কামনা। চোখের চাহনিতে যুগযুগান্তরের বহ্নি। উৎসুক, ব্যগ্র হয়ে আছে, স্ত্রীর কাছ থেকে—এমন কি প্রেমও নয়—এতটুকু সহানুভূতি, একটুখানি আগ্রহ, একটু স্নেহের ভঙ্গীমাত্র আশা ক'রে। কী প্রচণ্ড দীনতা ওর সেই দাঁড়িয়ে স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে থাকার মধ্যে!

কয়েক মুহূর্ত, তাই যেন কত যুগ স্বামীর কাছে।

বিজয়ই শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করলে, 'তুমি তো বাড়ির কতদূর কী হ'ল—

জানতে চাইলে না।'

'সে তো তুমি দেখছই।' তেমনি নিরুৎসাহ কণ্ঠে উত্তর দেয় সুচিত্রা।

'এধারে গাঁথুনি সব কমপ্লিট্। দোতলার ছাদটা আজ-কাল ঢালাই হবে। এখন আর তেতলায় হাত দেব না মনে করছি। এধারে সব সেরে নিই। দেওয়ালে বালির কাজ, সিঁড়ি, মেঝে—দোর জানলা হাজারো কাজ বাকি। এ সব খুচরো কাজে বড্ড সময় নেয়। আমি যে মোটে সময় পাচ্ছি না দাঁড়াতে, কনট্র্যাকটর ব্যবসাদার, তার পঞ্চাশটা বাড়ি হচ্ছে, কাজ চললেই হ'ল, তার আর তাড়া কি? তবু আমি আশা করছি মাস-দুয়েকের মধ্যেই বসবাস-যোগ্য ক'রে নেব সবটা। তুমি সিঁড়িতে মার্বেল্ পছন্দ করো, সিঁড়ি আর তোমার ঘরের মেঝে সাদা পাথর দিয়ে দেবো ঠিক করেছি। তুমি কি বলো?'

তবুও সে নিষ্প্রভ চোখে বিদ্যুৎ খেলে না।

'যা ভাল বোঝ তুমি।'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'এই যে সামনেই—একটা টায়ফয়েড কেস আছে। তুমি একাই যাবে, না পৌঁছে দিয়ে আসব?' কোথায় যেন একটু ঔৎসুক্য ওর গলায়। এমন সময় আসে বৈকি জীবনে, যখন কেউ কাজের ক্ষতি করলেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ হয়।

'না না, এটুকু আমি চলেই যাচ্ছি। তোমায় আর সময় নষ্ট করতে হবে না।'

সুচিত্রা বাড়ির পথ ধরে।

বিজয় তবু দাঁড়িয়ে থাকে কিছুকাল। দীর্ঘনিঃশ্বাস? না, সে সময় ওর নেই। কোথায় যেন 'কল' আছে, কী যেন রোগ—ইতিমধ্যেই সব ভুলে গেল। অতীশবাবুদের বাড়ি ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি, তারকবাবুদের বাড়ি টায়ফয়েড? না না, মনে পড়েছে—অতীশবাবুদের বাড়িই টায়ফয়েড।...কি হ'ল আজ ওর? সব গুলিয়ে যাচ্ছে কেন এমন ক'রে?

অভ্যস্ত দ্রুতপদে অতীশবাবুদের বাড়ির পথ ধরে সে।

অথচ এই সুচিত্রাকে পাবার জন্য কী না করেছে বিজয়। সাধনা? সাধনা

কেন, তপস্যাই বলা যেতে পারে।

কি দেখেছিল ওর ঐ ক্লান্ত চোখে? কী মোহের অঞ্জন লাগিয়েছিল ওর ঐ অবসন্ন ব'সে থাকার ভঙ্গী? নাকি, সেদিন কিছু বহ্নি ছিল ওর চোখে মুখে?

কে জানে। আজ আর মনেও পড়ে না।

ওরা সহপাঠী ছিল। একসঙ্গে আই-এসসি, বি-এসসি পাস ক'রে বিজয় গেল ডাক্তারী পড়তে, সুচিত্রা এম-এসসি পাস ক'রে রিসার্চ করতে লাগল। দুজনেই ভাল ছাত্র। ইণ্টারমিডিয়েটে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল বিজয়, বি-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স। তারপর ডাক্তারিতে একবারও ফেল না ক'রে গৌরবের সঙ্গে পাস করল। আর সুচিত্রাও বি-এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স নিয়ে এম-এসসিতে প্রথম হ'ল।

এদের সহপাঠনা অবশ্য স্বল্পকালের কিন্তু বিজয়ের উৎসাহে পরিচয়টা সখ্যে পরিণত হ'তে বাধে নি। সুচিত্রার বাবা বিজয়কে স্নেহের চোখে দেখতেন। ওর উৎসাহী মন প্রৌঢ় বয়সেও তাঁকে যৌবনচঞ্চল ক'রে তুলত। সে যে ছাত্র হিসাবে ভাল তা তিনি সুচিত্রার মুখে শুনেছিলেন, সুতরাং তাকে সাদর অভ্যর্থনা করতে বাধে নি। সুচিত্রার মা তো বিজয়কে খুবই ভালবাসতেন, বলতেন, 'আমার ছেলেটা বেঁচে থাকলে অমনিই হ'ত। কেমন দুটি ভাই-বোনে পড়াশুনা করত, খুনসুটি করত—হেসে খেলে বেড়াত। আমার কপাল —নইলে অমন ছেলে খেয়ে বসে থাকি! তবু বিজুটা আসে, আমি যেন অনেকটা শান্তি পাই।'

বিজয়ের দেশ মফস্বলে, হোস্টেলে থাকা ছাড়া তার উপায় ছিল না, সেজন্যে সুচিত্রার মা প্রায়ই ওকে নিমন্ত্রণ করতেন। বিজয় যত খেত তার চেয়ে ঢের বেশি উচ্ছ্বাস করত—পিঠে-পায়স হ'লে তো আর কথাই ছিল না। বলত, 'মা, মাছ-মাংস তবু দেবাৎ ঠাকুরদের হাতে উতরে যায় কিন্তু এসব তো আমাদের কাছে দুরাশা।'

চেয়েচিন্তে উপদ্রব ক'রে খেত বিজয়, মার প্রাণও স্নেহ-বিগলিত হয়ে উঠত। তিনি প্রায়ই সুচিত্রাকে বলতেন, 'ওরে, কলেজ থেকে একটা টেলিফোন ক'রে দিস তো বিজুকে, আজ যেন আসে একবার। নিশ্চয়ই মনে ক'রে

করিস, ভুলিস নি যেন।'

সুচিত্রা বিরক্ত হয়ে উঠত, 'এই আবার এক হাঙ্গামা···এসব ভাল লাগে না আমার—তোমাদের এই খাওয়া খাওয়া নিয়ে যেন এক আদিখ্যেতা!'

বিজয়কে বলত মার সামনেই, 'তুমিও এমন কাঙালপনা করো খাবার নিয়ে, যেন মনে হয় কখনও কিছু খেতে পাও নি। আমার লজ্জা করে তোমার ভাবভঙ্গী দেখে—'

বিজয় কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ত না। হেসে বলত, 'তুমি আধুনিকা, আহারটা অত্যন্ত স্থূল বস্তু তোমাদের কাছে, কাজেই লজ্জার ব্যাপার। আমরা অত সূক্ষ্ম রসের রসিক নই, আমরা জানি যেটা না হ'লে এ সংসারে তুচ্ছ কীট-পতঙ্গেরও চলে না, যত বড় মনীষীই হোন—কবি বলো, দার্শনিক বলো—সকলের সবকিছু পাণ্ডিত্য প্রতিভা অচল যেটার অভাবে, সেটা এমন কিছু অকিঞ্চিৎকর বস্তু নয়। পৃথিবীতে যদি কিছু আদিখ্যেতা করতেই হয়, খাদ্য নিয়ে করাই সঙ্গত নয় কি!'

'না। সে তুমিও জানো বিজু। শুধু ওটা তোমার পোজ্। মাকে খুশী করার একটা চাল ওটা।'

'কিন্তু সেটাও তো এই জন্যে। নইলে মার কাছে কি স্বার্থ বলো?'

'জানি নে। বাজে বকতে পারি নে তোমার সঙ্গে—'

ক্লান্ত সুচিত্রা চুপ করে। মা ধমক দেন, 'ওসব তোর কি কথাবার্তা রে! তোরই যেন বেশী আদিখ্যেতা—না-খাওয়াটা একটা চাল তোমার।'

বিজয়ের দুর্ভাগ্য যে সুচিত্রার মা বেঁচে নেই! থাকলে বোধ হয় এমনটা হ'ত না।

ডাক্তারী পাস ক'রে যখন কোথায় বসবে এই প্রশ্ন দেখা দিল, তখন বিজয়ের বাবা বলেছিলেন সরকারী চাকরি নিতে, মা আর কাকারা উপদেশ দিয়েছিলেন দেশে গিয়ে বসতে।

কিন্তু কোন কথাই না শুনে বালিগঞ্জের এই পাড়ায় যে বিজয় এসে বসল, তার মূলেও ও বাড়ির প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল বৈকি! সুচিত্রার বাবা সরকারী বড় অফিসার ছিলেন, রিটায়ার ক'রে নতুন বাড়িতে এসে বসেছেন,

সুতরাং সত্ত তাঁর নড়বার কোন আশঙ্কাই ছিল না। অগত্যা বিজয় বেছে বেছে এই পাড়াতে ঘর নিয়ে ডিস্পেন্সারী সাজালে।

সুচিত্রা বলেছিল, 'সিলি! কী আছে এ পাড়াতে? এত জায়গা থাকতে এখানে এলে বিজু। তুমি একটি ফার্স্টক্লাস ক্যাবলা।'

বিজয় বলেছিল, 'কেন, এপাড়া ওপাড়ায় তফাত কি? যার শক্তি আছে সে সব জায়গাতেই পসার জমাতে পারবে। জানো তো সেই সঞ্জীব চাটুয্যের কথা—অশ্বত্থগাছ বড় রসিক! সে প্রস্তর হইতে রস আহরণ করে।'

'আঃ। বড় বিরক্ত বোধ হয় তোমার ঐ বড় বড় কথাতে।'

বিজয়কে প্রস্তাবটা করতে হয়েছিল ভয়ে ভয়েই। বলা বাহুল্য, সুচিত্রা প্রথমে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, 'ওসব কথা থাক্ বিজু। ওসব সিলি ননসেন্স আর এ বয়সে শুনতে ভাল লাগে না।'

বিজয় বলেছিল, 'ভালবাসাটা না হয় সিলি ননসেন্স—যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু বিয়ে করাটা ত তা নয়। তুমি বৈজ্ঞানিক, জৈব ধর্মকে অস্বীকার করতে পারো না। আর বিয়েই যদি করতে হয় তো পাত্র হিসেবে আমি কি খারাপ?'

সুচিত্রা উত্তর দিয়েছিল, 'এমন ভালই বা কি। তোমার চেয়ে ভাল পাত্র কি আমি পেতে পারি না? তিন বছর যোগ্যতার সঙ্গে রিসার্চ ক'রে সরকারী চাকরিতে ঢুকেছি। চেহারাও বোধ হয় মন্দ নয়। সুতরাং—?' সুচিত্রা হাসির মতো ক'রে মুখটা বেঁকিয়েছিল একটু।

'সেই সব ভাল পাত্র তো আপাতত হাতের কাছে নেই। আমিই আছি। আমার সম্বন্ধে তোমার আপত্তি কি?'

'তুমি? তোমাকে ও লাইটে ভেবেই দেখি নি কোনদিন। ক্যাবলা ব'লে, কৃপার পাত্র ব'লেই মনে করেছি। তাছাড়া বয়সেও বোধ হয় ছোট হবে তুমি, কে জানে!'

'ও সব তোমার বাজে ওজর সুচিত্রা। আমার কথাটা তোমায় ভেবে দেখতেই হবে।'

প্রতিদিনই এক কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে সুচিত্রা রাজী হয়েছিলো। ওর মা তখন আর বেঁচে নেই, সুচিত্রার বাবা খুশীই হলেন। নিজের মেয়ের

চেয়ে তাঁর বিজয়ের ওপর আস্থা বেশি। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। সুচিত্রার ভবিষ্যৎ কিছুদিন ধরেই তাঁকে চিন্তিত ক'রে তুলেছিল।

কিন্তু বিজয়ের লড়াই ঐখানেই থামে নি। ওর বাবা অনেক কষ্ট ক'রে ওকে ডাক্তারী পড়িয়েছিলেন, এমন কি কাকারাও কর্ম স্বার্থ ত্যাগ করেন নি। ওঁদের মনে ব্যথা দিয়ে কোন কাজ করতে সে পারবে না। গোঁড়া হিন্দু পরিবার ওঁদের—এরকম বিবাহে ওঁরা অভ্যস্ত নন।

বিজয়ের দিকে যুক্তি ছিল যে সে পাল্‌টি-ঘরেই বিয়ে করছে। কিন্তু সেটাই সব নয়। প্রথমত বয়স সম্বন্ধেই বাবার ঘোরতর আপত্তি। তিনি বললেন, 'জীবন তোমার সবে শুরু, কিন্তু ওদের এ বয়সে উৎসাহ কমে আসে। আটাশ বছরের পুরুষ আর আটাশ বছরের মেয়েতে ঢের তফাত। আরও একটা কথা কল্পনা করো, দশ বছর পরে তোমার যৌবন ঠিকই থাকবে, উদ্যম উৎসাহ কিছুরই অভাব থাকবে না, কিন্তু আটত্রিশ বছরের বাঙালীর মেয়ের দেহে মনে কি থাকে বাবা? আজ যেটাকে আকাঙ্ক্ষার ধন ব'লে ভাবছ, কাল সেটাই বিভীষিকা হয়ে উঠবে, অথচ তখন আর ফেরবার পথ থাকবে না। সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ে-চাপা সেই বৃদ্ধের মতো তোমার সমস্ত শক্তিকে পঙ্গু ক'রে তুলবে। জান তো, সাঁড়াশির মতো পা দুটো দিয়ে গলা চেপে ধরত—নিজের ইচ্ছামতো জীবনের পথে চলতে গেলেই দম বন্ধ হয়ে আসত তার?'

ইস্কুল মাস্টার বাপকে করুণার চোখে দেখত না বিজয়, বরং শ্রদ্ধাই করত। কিন্তু সেদিন ওর চোখে ছিল রঙীন চশমা। কোন কথাই ভাল লাগে নি। সে জেদ ক'রে, মান অভিমান ক'রে, মা বাবার কাছ থেকে মত আদায় করেছিল। অত্যন্ত অনিচ্ছাতে মত দিলেও তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে তাঁরা রাজীই ছিলেন। অর্থাৎ বিবাহ দেওয়ানো, কথাবার্তা কওয়া, সব কিছু। অন্তরের হতাশা বাইরে না বেরোয়, এটা ছিল তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য।

কিন্তু সুচিত্রার তাতেও আপত্তি। বলেছিল, 'আমি কিন্তু ও দেশে-ফেশে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারব না। ফুলশয্যা, তার পরের দিন, ব্যস্। আট দিন থাকা পোষাবে না।'

'কিন্তু অষ্টমঙ্গলা না সেরে এলে মা মনে বড় দুঃখ পাবেন।'

'যা হয় একটা বানিয়ে ব'লো, না হয় ব'লো, বাবার খুব অসুখ—বা অমনি কিছু।'

শেষ অবধি আটদিন ছিল অবশ্য। দেশের ওঁরা এত যত্ন করেছিলেন যে মুখের ওপর আঘাত দিয়ে চ'লে আসতে সুচিত্রারও বেধেছিল, কিন্তু আর কখনও সে দেশে যায় নি।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। দুটি সন্তান হয়েছে ওর, দীপক আর মঞ্জু। বিজয়ের পশার বেড়েছে দ্রুত গতিতে—ও ভাল ডাক্তার ব'লে হয়ত নয়—অত্যন্ত পরিশ্রমী, কর্মঠ, মিষ্টভাষী লোক ব'লে। পাড়াঘরে টাকা-পয়সা বাকীই থাকে দু'চারটে। বিজয় তার প্রতিবেশী ডাক্তারের মতো ঘাড়ে চেপে আদায় করে না—সেজন্য দু'পয়সা দাম বেশি দিতেও আপত্তি নেই। এতে ক'রে বিজয় দেখেছে যোগবিয়োগের কাঁটায় লাভের ওজনই ঝুঁকে থাকে।

কিন্তু এ তো গেল জীবনের বহিরঙ্গ। ভেতরে ভেতরে এই উৎসাহী লোকটি সত্যিই আজ ক্লান্ত।

ডিস্‌পেনসারীর ওপর ওর একটা বাসা ছিল, একখানা ঘর এবং চাকর। সেখানে সুচিত্রাকে তোলবার কথা বিজয় মুখে আনতেও পারলে না। অতএব সে বাপের বাড়িতেই রইল। তাই ব'লে বিজয়ের সেখানে থাকবার হুকুম ছিল না। সুচিত্রা মুখ বেঁকিয়ে বলত, 'এ কী ঘরজামাই? ছি!'

সপ্তাহে একদিন মাত্র থাকা চলত। বাকী ছ'দিনের ব্যবস্থা বিচিত্র। যেদিন রাত্রি দশটার মধ্যে ফিরতে পারত সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ত—কাজের চাপে যেদিন ফেরা অসম্ভব হ'ত সেদিন দেখাও হ'ত না। শ্বশুর জোর করে রাত্রে এখানে খাওয়ার ব্যবস্থাটা করেছিলেন। সুচিত্রার কড়া হুকুমে ঠাকুর-চাকরকেও বসিয়ে রাখা চলত না। দশটার মধ্যে এলে ঠাকুর খাবার দিয়ে যেত, সুচিত্রা সামনে এসে বসত, কোন কোন দিন শ্বশুরও থাকতেন। তা নইলে দেখত নিচের টেবিলে খাবার ঢাকা আছে, কোন কোন দিন বেড়াল কিছু নষ্টও ক'রে যেত। পিঁপড়ে ধরা তো তুচ্ছ ঘটনা।

বিজয় বলত, 'বাসা একটা দেখি চিত্রা। এমন ক'রে কি চলে?'

সুচিত্রা বলত, 'বাবার কি করব। বৃদ্ধ বয়সে একা—'

বিজয় বলত, 'তাহ'লে বড় বাসা নিই। বাবাও চলুন।'

'জামাই-বাড়ি? ছি!'

শ্বশুর নিজে বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'এ তোর কী বিশ্রী জেদ সু। এত বড় বাড়ি আমার পড়ে রয়েছে—জামাই কেন কষ্ট করবে? ওরই তো সব।'

'কেন বাবা? তুমি কোন চ্যারিটিতেও তো দিতে পার। ওসব কথা শুনিও না ওকে, তাহ'লে উপার্জনের আর্জ কমে যাবে।'

বাবা উত্তর দিতেন, 'তুই ওর বৌ হ'তে পারিস কিন্তু তোর চেয়ে ওকে ঢের বেশি চিনেছি আমি। তোর সঙ্গে বিয়ে হয়েও যদি আর্জ না কমে থাকে তো সে আর কমবে না।'

শ্বশুর একদিন দুপুরবেলা জামাইয়ের বাসায় গিয়েছিলেন। দেখলেন, আড়াইটের সময় জামাই ফিরে, স্নানের জল না পেয়ে নিজে টিউব-ওয়েল থেকে জল পাম্প ক'রে এনে স্নান করলে, তারপর ঢাকনা খুলে ভাত খেতে বসল। ঠাণ্ডা শক্ত ভাত, একটা কি ঘঁ্যাট আর দু'টুকরো মাছ। খাবার জলটাও নিজেকে গড়িয়ে নিতে হ'ল। আনাড়ী চাকর তায় ফাঁকিবাজ, প্রত্যহই নাকি এমনি বেরিয়ে যায় দুপুরে।

শ্বশুর প্রশ্ন করলেন, 'সকালে কি খেয়ে বেরোও?'

'এর আগের চাকর লুচি কি ডিম ভাজাটাজা ক'রে দিত। এ এত পারে না। গোটাচারেক রসগোল্লা, দুটো কলা আর চা—'

শ্বশুরের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'তুমি বাসা দেখ বাবা। মেয়ে আর আমি পুষতে পারব না। সেই কথাই বলতে এসে-ছিলুম।'

মেয়ে শুনে বললে, 'ওটা বাবার একটা জেস্‌চার। স্বার্থত্যাগ। হাউ-এভার—তুমি বাসা ছাখো। কিন্তু আমাকে না দেখিয়ে নিও না—'

একে যুদ্ধের ফলে বাসা দুষ্প্রাপ্য, তায় যদি বা ডাক্তারীর দৌলতে কোনটা খুঁজে বার করে বিজয়, সুচিত্রার একটাও পছন্দ হয় না। ইতিমধ্যে সন্তান-সম্ভাবনা হওয়াতে সে কথা চাপা পড়ে গেল।...

প্রথম পুত্রসন্তান হওয়ার পরেও যখন বিজয় বৌকে নিয়ে গেল না দেশে, তখন বুড়োবুড়ী আর থাকতে পারলেন না। দেশ থেকে এসে হাজির

হলেন। তাঁরা এ গৃহস্থালীর কোন কথাই জানতেন না—অবাক্ হয়ে গেলেন।

মা নাতিকে দেখতে গিয়ে পুত্রবধূর দুই হাত ধ'রে বললেন, 'এমন ক'রে ওকে দগ্ধে মেরো না মা, প্রসন্ন হও। ওরও তো সমাজ আছে—লোকের কাছে কি বলে ভাবো দিকি! তিন বছর বিয়ে হয়েছে, বৌ আজও স্বামীর ঘর করে না!'

ক্লান্ত সুচিত্রা স্বামীকে ডেকে বললে, 'এই সব নানা রকম কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না ব'লেই আমি তোমাদের দেশে যাই না। বিয়ে করার এত ঝঞ্ঝাট জানলে আমি কখনই রাজী হতুম না। যাই হোক, এসব আর ভাল লাগে না। বাসা নাও যেখানে পাও—'

মার আগ্রহে দেশেও যেতে হ'ল। সেখানে অন্নপ্রাশন করবেন ছেলের। 'এটি আমায় ভিক্ষা দাও মা। দেশে যে আর মুখ দেখাতে পারছি না।' ঠিক দুটি দিন থেকে সুচিত্রা ফিরে এল।

'এনাফ্ অব্ দিস্ ননসেন্স্। জানো, এবার ভাবছি আবার চাকরি করব।'

'কেন চিত্রা?' ব্যস্ত হয়ে বিজয় প্রশ্ন করে।

'অফিসের অজুহাত একটা বড় অজুহাত তো। কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

বিয়ের পরই—স্বামীর ঘর না করুক, চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল সুচিত্রা!

দুটি বড় ঘরওলা ফ্ল্যাট্ পেয়ে বিজয় একেবারে টাকা আগাম দিয়ে এল। ফার্নিচার শ্বশুর দিলেন কিছু কিছু। বললেন, 'এ তোমার জন্যই কেনা বাবা বিজু। এ আনন্দের দিনটির জন্য অনেকদিন ধ'রেই প্রস্তুত হচ্ছি।'

অস্ফুটস্বরে সুচিত্রা বললে, 'সকলেরই যেন বাড়াবাড়ি। ভাল লাগে না এ সব আমার।'

তা ছাড়াও বিজয় কত যে বাজার করল তার ইয়ত্তা নেই। কাজ কামাই ক'রে সাজাল সব। ও বাড়ি থেকে সুচিত্রার মাল এসে পৌঁছল একগাদা। বিছানা, ছেলের কট্ ইত্যাদি—সে সবই বিজয় গুছিয়ে রাখল।

সন্ধ্যার পর খেয়েদেয়ে সুচিত্রা এল।

এক ঘরেই দুটি খাট রাখা হয়েছে। মধ্যে খোকার কট্।

'এ কী? এক ঘরে কেন? তোমাকে হাজার বার বলেছি না! এসব ননসেন্স আমার কাছে চলবে না। তুমি ডাক্তার হয়ে—। বিয়ে হয়েছে ব'লেই এক ঘরে শুতে হবে, এ আইডিয়া একেবারে প্রিহিস্টোরিক।..প্লিজ, অন্য ব্যবস্থা করো।'

বিজয়ের মুখ শুকিয়ে গেছে ততক্ষণে, 'কিন্তু সু, লক্ষ্মীটি, দুটি তো ঘর, তার মধ্যে ওটা একেবারে মালে বোঝাই হয়ে গেছে। তবু তো আমার আগের ঘরটা ছাড়ি নি, সেটাতেও কতক চালান করেছি। তা ছাড়া চাকর শোবে—'

'চাকর চলনে শোবে'খন। মাল ওঘরে আরও পাঠাও, এ ঘরে এনে রাখো। নইলে ফেরত পাঠিয়ে দাও বাবার ওখানে। এসব আন্‌হাই-জিনিক্—'

'আজকের মতো শোও চিত্রা! সারা দিন এইসব ক'রে ক্লান্ত। এত রাত্রে আবার সব ওলট-পালট করতে গেলে মরে যাবো। কালই আমি ব্যবস্থা ক'রে দেবো।' অনুনয় করে বিজয়।

বেশি বাদানুবাদে ক্লান্তি আসে সুচিত্রার—তাই রাজী হয়। কিন্তু পরের দিন সকালে ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা করতে হ'ল। চাকর মুখ টিপে হাসল, অন্য ফ্ল্যাটের মেয়েরা ফিস্‌ফিস্ করল—কারণ এতটা বিজ্ঞানে দখল নেই তাদের।

অবশ্য বাসা ক'রেও খুব সুবিধা হ'ল না বিজয়ের। সকালে জলখাবারের ব্যবস্থা তো দুরাশা। দুপুরের জলও গড়িয়ে নিতে হয়, এখানেও বেড়ালে মাছ খেয়ে যায়। উপরন্তু সংসারের হাজার ঝঞ্ঝাট এসে ঘাড়ে চাপে। ছেলের ঝঞ্ঝাট, স্ত্রীর পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। তাও অর্ধেক দিন সে ওবাড়ি থেকে ফেরে না। ছেলের জন্যে ঝি রাখতে হয়েছে। অত ঝামেলা সুচিত্রার সহ্য হয় না।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিল। সুচিত্রা এই সুযোগে কিছু-কালের মতো বাপের বাড়ি চলে গেল। বিজয়ের কিন্তু খুব ফাঁকা লাগল না। বরং কয়েকদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। স্বাধীনতার মূল্য আছে

বৈকি। শেকল সোনার হ'লেও সহ্য হয় না, ওর পায়ে যা চেপে বসেছিল তা তো লোহার বেড়।

কিন্তু প্রথম সন্তান ওর—তার জন্তে মন কেমন করে। বিজয় সময়ের হিসেব করতে শুরু করে অবশেষে—এখনও তিন মাস ছেলে হ'তে—তারপর ধরো আরও তিন মাস—মোট ছ'মাস এখনো দেরি—

তবু ছ'মাস সত্যিই এমন কিছু বেশি সময় নয়। তিন মাস যখন বয়স হ'ল মঞ্জুর—অনেক ইতস্তত ক'রে বিজয় কথাটা পাড়ল, 'এবার তো একটা দিন-টিন দেখতে হয় তা'হলে।'

ব'সে ব'সে উল বুনছিল সুচিত্রা। ক্লান্তভাবে ঘাড় ঘোরাল, 'কিসের?'

'ওখানে যাওয়ার—মানে বাসায়?'

'ও! ছাখো, তোমার ঐটুকু বাসায় গুচ্ছের মালের মধ্যে আমার বড় অসুবিধা হয়। এখন আবার ছুটো বাচ্ছা হ'ল—। তাছাড়া গোলমাল, চেঁচামেচি, ফ্ল্যাটবাড়ির নানা আন্‌প্লেজাণ্টনেস্, ও আর আমার বরদাস্ত হয় না। তুমি বরং যেমন আছো তেমনি আর কিছুদিন থাকো—একটা বড় বাড়িটাড়ি পেলে তখন দেখা যাবে।'

স্তম্ভিত আড়ষ্ট হয়ে ব'সে থাকে বিজয়। কতক্ষণ পরে বলে,—স্খলিত ভগ্ন শোনায় ওর কণ্ঠস্বর, 'তুমি ওখানে যাবে না মোটে?'

এমনই দীনতা ও হতাশা ফোটে ওর গলায় যে সুচিত্রা প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়, 'তুমি একটা জমি কিনেছ, না? সেও তো শুনেছি এই পাড়ায়—বাড়ি করবে কবে?'

এত তুঃখেও বিজয়ের হাসি পেল, স্বামীকে করবার মতো প্রশ্নই বটে। এই বোধ হয় প্রথম—সে একটু তিক্ত-কণ্ঠেই বলল, 'শুনেছি!!···তোমাকে বহুবার দেখাতে চেয়েছি, দেখো নি। প্ল্যান দেখিয়েছি, রাস্তার নামও জানো—ওভাবে প্রশ্ন করা কি তোমার সাজে? আমার আর্থিক অবস্থা কি, তাও তো জানতে চাও নি। তাহ'লে আর ও প্রশ্নটা করতে না। ছ'বছরের প্র্যাক্‌টিসে সতেরো হাজার টাকা দিয়ে জমি কিনেছি তাই ঢের!'

সুচিত্রা চুপ ক'রে চোখ বুজে ব'সে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, 'আমাকে তো তুমি দীর্ঘকাল দেখেই বিয়ে করেছ বিজু—আমার কাছ থেকে কি

আশা করতে পারো তা জানবার সুযোগ তোমার হয়েছে। এ সব ঝামেলা আমার ভাল লাগে না, পারিও না আমি গৃহস্থালীর অত ডিটেল্‌স্‌-এ যেতে।'

বিজয় চুপ ক'রে গেল। কিন্তু হার মানল না, ওর ভেতরে যে উৎসাহের অফুরন্ত উৎস আছে তা সমস্ত আঘাতের ক্ষতই পুরিয়ে দেয় নিমেষে। পরের দিনই এসে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে, 'সব ঠিক ক'রে ফেলেছি সু। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে ফেলেছি একটা, বিশ হাজার টাকা পাচ্ছি। বাকী টাকা এদিক ওদিক থেকে তুলে ফেলব ঠিক। দোতলা বাড়ি। একটা ঘর থাকবে আঠারো বাই পনের—সেইটে হবে তোমার ঘর। তুমি স্পেস্‌ ভালবাসো—ঢের স্পেস্‌ পাবে। আর একদিকে থাকবে আমার ঘর, আর একদিকে নার্সারী, মানে ছেলেমেয়েদের ঘর। মধ্যে দরজা থাকবে কমিউনিকেটিং ডোর। এ ছাড়া আর একটা ঘর, আমার স্টাডি। নিচে ঐ ঘরটায় আমার চেম্বার—ডিস্‌-পেনসারী। বাকী একটাতে গুদোম, একটায় ল্যাবরেটরী—কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল কাজও করব মনে করছি—আর একটা থাকবে স্পেয়ার বেড্‌রুম। মানে বাড়তি ঘর—যদি কেউ আসে-টাসে। ধরো মা-ই এলেন—।'

ওর উৎসাহের প্রবল স্রোত কিসে যেন আটকে গেল। সুচিত্রার ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল বিজয়। সুচিত্রা চোখ বুজে ব'সে ছিল হেলানো কেদারাটায়, এবার চোখ খুলে বলল, 'ছাখো, তোমাকে একটা খবর দেওয়া হয় নি। আমি একটা চাকরি নিয়েছি, কাল থেকে জয়েন করব।'

অনেকক্ষণ সময় লাগল কথা কইতে বিজয়ের, 'চাকরি নিয়েছ? কি চাকরি? কোথায়? অধ্যাপনা?'

'না। অত বকুনি আমার পোষায় না। কতকগুলো বোকা মেয়ের কাছে চেঁচানো। না, কেমিস্টের চাকরি। এতে আমার রিসার্চ করার সুবিধাও থাকবে। সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের কাজ—আটশ' টাকার মতো পাবো এখন সবসুদ্ধ।...দুপুরটা তো বসেই থাকি—তাছাড়া ঘর সংসার ঠিক আমার পোষায় না। বরং এদিক দিয়ে তোমায় যদি সাহায্য করতে পারি সেটাও কম কথা নয়।...ছেলেমেয়েদের ভাল ক'রে মানুষ করতে হবে তো, হিউজ একস্‌পেনস্‌।'

'বাবাকে বলেছ?' শুধু প্রশ্ন করে বিজয়।

'বলেছি। বাবা ওল্ড্-ফ্যাশান্ড্ লোক। কেবল ঐ এক কথা, বিজুকে একটু ছাখ্, ঘরকন্নায় মন দে,—বলেন আমার কাছে গিয়েই থাকবেন, এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে।'

'বেশ তো, থাউজ্যাণ্ড ওয়েলকাম! দোতলার স্টাডিটা বলো তো—শোবার ঘর ক'রে নিই।'

'পাগল হয়েছ? এ বাড়ি থেকে গেলে বাবা আর বাঁচবেন না। আর তা ছাড়া জামাই-বাড়ি গিয়ে থাকবেন কি?'

বিজয়ের মুখে বহুবারই কথাটা এল যে, এ আপত্তিটাও ওল্ড-ফ্যাশান্ড্। অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কার এসব। কিন্তু কিছু বলল না। সুচিত্রার এসব দিকে আত্মসম্মান-বোধ অসাধারণ, তার একটি পয়সার দরকার হ'লেও সে বিজয়ের কাছে চেয়ে পাঠায়। বাবার কাছে কোন কারণেই কিছু নেয় না। মাসে প্রায় পাঁচশো' টাকা লাগে এ বাড়িতেই—

ক্রমশ বিজয়ও ক্লান্ত হয়ে আসছে। সে আর কথা কইল না, উঠে পড়ল।

সে হ'ল আজ ছু'মাসের কথা। এ ক'টা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করেছে বিজয়। আজকাল কোন কাজই ছাড়ে না, টাকার দরকার। পাড়ায় প্র্যাক্টিস—বরং গাড়ি একটা হ'লে মর্যাদা বাড়ে, কিন্তু গাড়ি কেনবার সাহস নেই। সব পয়সা যাচ্ছে বাড়িতে। ভূতের মতো ঘোরে দিনরাত। তারই ফাঁকে ফাঁকে নতুন বাড়িটার কাজ দেখে, কনট্রাক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করে, ছোটখাটো নির্দেশ দেয়।

এর ভেতর সুচিত্রার কাছে যাওয়াও হয় নি। সে এসেছিল দিন-ছুই, কয়েক মিনিটের জন্যে। অফিস যাবার আগে বা পরে। নইলে লোক পাঠায় জিনিসের ফর্দ দিয়ে আর টাকার প্রয়োজন জানিয়ে। এছাড়া কেউ কারুর খবর রাখে না।

কিন্তু আজকের এই সাক্ষাৎটা বিজয়কে যেন আমূল নাড়া দিয়ে গেল।

কোথায় কী গোলমাল হ'ল, মস্তিষ্কের কোন্ স্নায়ুতে কি আঘাত করল—সারাদিন উন্মনা হয়ে বেড়াল বিজয়। অনেক রোগীকে ভুল ঔষধ দিল,

অনেকের কাছে যেতেই মনে রইল না। টাকাকড়ির হিসাব গুলিয়ে যেতে লাগল বার বার।

অবশেষে মনের কাছেই স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে সুচিত্রার আজকের এই নিস্পৃহতায় ওর একটা সন্দেহ জেগেছে। সে সংশয়ের কথাটা মনে আনতেও সাহসে কুলোচ্ছে না ওর।

তবে কি সুচিত্রা নতুন বাড়িতেও আসবে না? কিন্তু কেন? কেন?

কোন উত্তর পায় না। সন্ধ্যার পর 'শরীর খারাপ' সংক্ষেপে এই কথা মাত্র জানিয়ে চেম্বার থেকে উঠে পড়ে। অনেকদিন পর নিজে থেকে একটা বাজে খরচ করে—একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে যায় মাঠে, সেখানে অন্ধকারে বহু রাত্রি পর্যন্ত জোরে জোরে হাঁটে পাগলের মতো। তারপর ফিরে পাঁজিটা খুলে বসে। পরের দিন কনট্রাক্টরকে গিয়ে বলে, 'কত বেশি টাকা দিলে আপনি দোতলাটা কুড়িদিনের মধ্যে বসবাসযোগ্য ক'রে দিতে পারবেন?'

'সে কি? কুড়িদিন? অসম্ভব।'

'অসম্ভব ব'লে শব্দ বিংশ শতাব্দীতে নেই সত্যেনবাবু। সারারাত কাজ করান, আমি তিনগুণ রোজ দেব।'

'দেবেন?'

'দেব কিন্তু কুড়িদিন। মনে থাকে যেন। এক বেলা দেরি হ'লে সব টাকা রিফাণ্ড করতে হবে।'

'বেশ! কিন্তু সুপারভিস্যান্ চার্জ লাগবে হাজার টাকা এক্স্ট্রা।'

'তাই হবে।'

সেদিন রাত্রে সুচিত্রার কাছে গেল বিজয়।

'সব ঠিক করে ফেললুম সু।'

'ঠিক?' একদিকের ভ্রূ ঈষৎ তুলে প্রশ্ন করে সুচিত্রা।

'হ্যাঁ। বিশে শ্রাবণ গৃহপ্রবেশের শেষ দিন। তারপর এক মাস আর দিন নেই। তিনগুণ টাকা দিয়ে ঠিকেদারকে রাজী করিয়েছি। তারই মধ্যে দোতলাটা ফিনিশ ক'রে দেব। মাকেও চিঠি লিখে দিয়েছি—তিনি চলে আসবেন।'

'বিশে শ্রাবণ? ইংরেজী যেন কত হ'ল? চৌঠো আগস্ট?...ও। ভালই

হ'ল মাকে চিঠি দিয়েছ। উনি এসে গেলেই ঠিক হবে। ওদিন আমি কিন্তু যেতে পারব না।'

'তুমি—যেতে—পারবে না? তার মানে?' কথা বেধে যায় বিজয়ের, যদিও গত ছত্রিশ ঘণ্টা এই আশঙ্কাই করছিল সে।

'মানে আমাকে দিল্লী যেতে হবে ঐ সময়টায়। ডিপার্টমেণ্টে গোলমাল হচ্ছে—ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য বস্‌-এর সঙ্গে আমাকে যেতে হবে। তাতে কি—মা আসবেন, আমার বাবা আছেন, ঠিক ক'রে নিতে পারবে না?'

'না। সে কিছু আটকাবে না।' কেমন একটা শুষ্ক কণ্ঠে কথাগুলো ব'লে উঠে দাঁড়ায় বিজয়, 'মা আসছেন, তোমার বাবা আছেন—ঠিকই তো! কী-ই বা গৃহপ্রবেশ! তোমার কাজের ক্ষতি করার দরকার নেই।'

'তুমি চললে নাকি? খেয়ে যাবে না? বাবা যেন ঠাকুরকে তোমার খাবার কথা বলছিলেন!' নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুচিত্রা।

'তোমার বাবা এখনও বড্ড ওল্‌ড্‌-ফ্যাশান্‌ড্‌ রয়ে গেলেন সু। এখনও সেই জামাই এলে খাওয়াবার কুসংস্কার গেল না।…সরি টু ডিস্‌অ্যাপয়েণ্ট দ্য ওল্‌ড্‌ বয়—কিন্তু আমার বিশেষ কাজ আছে। এখনই একবার সত্যেনের কাছে যেতে হবে।' হঠাৎ হেসে ওঠে বিজয়।

'কে সত্যেন?'

'ও এমন কেউ না। কনট্রাক্‌টর।'

সত্যেনের কাছে পৌঁছে বিজয় আবার হেসে ওঠে আপন মনে।

'কী হ'ল, হাসছেন যে?'

'না, কিছু না। দেখুন তাড়া করবার আর দরকার নেই। ভেবে দেখলুম মিছিমিছি অতগুলো টাকা বেশি খরচ করতে যাই কেন! যেমন চলছে তেমনি চলুক।'

'তাই ভাল। আমিও বাঁচলুম।' সত্যেনবাবু ঝুঁকিটা নিয়ে অবধি অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

'হ্যাঁ, আর শুনুন। সেদিন যে নিচের তলা ভাড়া দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভাড়াটে আছে?'

'আছে বৈকি! দেবেন?'

'সবটা নেবে ?'

'তা নিতে পারে হয়ত। কিন্তু আপনি দেবেন কেন ?'

'বেশি ভাড়া পাবো। আমার ও ফ্ল্যাটে আর ডিস্‌পেনসারীতে লাগছে মোটে একশো'র মতো। এতে তো দুশো আড়াইশো পাবো ?'

'বে-ওজর। হাজার কয়েক টাকা য়্যাডভ্যান্সও দেওয়াতে পারি।'

'খুব ভাল। পাকা কথা দিলুম। ভাড়াটে দেখুন আপনি।'

বিজয় সেখান থেকে হেঁটেই বাসায় ফিরল, অনেক দিন পরে শিস দিতে দিতে।

যোদ্ধা

এত ছেলে থাকতে সতীশবাবু যখন বাপিকেই বেছে নিলেন তখন একটা উপহাসের ঝড় বয়ে গেল তাঁর ওপর দিয়ে। সতীশবাবু কিন্তু সে উপহাস গ্রাহ্য করেন নি—করবার কথাও নয়, কারণ তিনি তখন সবে বি-এ পাস ক'রে ইস্কুল মাস্টারীতে ঢুকেছেন, এম-এ পড়ছেন প্রাইভেটে—বিদ্রূপ বা উপহাস অগ্রাহ্য করবার মতো মনের জোর তাঁর যথেষ্ট আছে। যে মানুষ দুর্বল, যার আত্মবিশ্বাসের অভাব, সে-ই বিদ্রূপে বিচলিত হয়।

এসে পর্যন্ত পুরাতন মাস্টার মশাইদের সঙ্গে তাঁর তর্ক চলেছে এই ব্যাপার নিয়েই। সতীশবাবু বললেন, 'ভাল ছেলে বা খারাপ ছেলে ব'লে কিছু নেই। মনীষা বা প্রতিভা দু-একজনের থাকে, তারা ঈশ্বরের চিহ্নিত করা, মহামানব। এছাড়া প্রায় সব ছেলেই অল্পবিস্তর সমান। কারুর বুদ্ধি প্রকট, কারুর বা আচ্ছাদিত। সে বুদ্ধির ওপরের ছাই সরিয়ে আগুনটাকে ফুঁ দিয়ে জাগিয়ে তুলতে পারলেই তা দহনশক্তি নিয়ে জেগে উঠবে। তখন তাতে ঠিকমতো ইন্ধন জুগিয়ে যান—দেখবেন আগুনের অভাব হবে না।

বলা বাহুল্য, এ নিয়ে বিস্তর তর্ক উঠেছিল। এর জবাবে অনেক কিছুই বলবার ছিল এবং তা তাঁরা ব'লেও ছিলেন। দৃষ্টান্ত উদাহরণের অভাব ছিল না কোন পক্ষেরই। সতীশ নিজের যুক্তির স্বপক্ষে যেমন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের বাণী উদ্ধার করেছিলেন—অন্য শিক্ষকরাও ছাড়েন নি। বিশেষতঃ হেডমাস্টার

—এই ছোকরাটির তর্ক করার ভঙ্গী, ঔদ্ধত্য এবং যুক্তি-প্রয়োগকে ধৃষ্টতা ব'লেই মনে করেছিলেন। নেহাত বর্তমান সেক্রেটারীর এককালীন ছাত্র ব'লে সতীশবাবুকে তিনি তাড়াতে পারেন নি—বিশেষতঃ বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্স-এ প্রথম হয়েছে যে, তাকে তিনিও মনে মনে সমীহ করতে বাধ্য, কারণ ও বস্তুটি তিনি পান নি।

সতীশবাবু বলেছিলেন, 'আসলে এই ছাঁচে-ঢালা শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী এই সব ছেলের পাঠে অমনোযোগ বা বিতৃষ্ণার জন্যে। ঐ যে সেকেণ্ড ক্লাসের অরবিন্দ—প্রত্যহ ক্লাস পালিয়ে রাস্তায় গুলি খেলে—দুষ্টুমিতে ওর মাথা কেমন সাফ দেখেছেন তো? নিত্য নতুন নতুন বদমাইশীর উদ্ভাবন হয় ওর মাথায়। ওকে আপনি বোকা বলবেন?'

তারপর একটু থেমে সোজা য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার ষোড়শীবাবুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ঐ যে উনি—কালই আমি আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলুম ওঁকে। ক্লাসে ঢুকে প্রথমেই চাইলেন হোমটাস্ক। যারা এনেছে তাদের খাতায় চোখ বুলিয়ে একটা ক'রে সই ক'রে দিলেন। যারা ভুল করেছে তাদের খাতায় ঢ্যারা দিলেন—যারা ভুল করে নি তাদের কাছে খোঁজও নিলেন না যে, অঙ্ক তারাই করেছে, না অপর কাউকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। আর যারা আনে নি তাদের দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর উঠে গিয়ে বোর্ডে নতুন অঙ্ক বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন। বাকী যতক্ষণ রইলেন ক্লাসে—এক মিনিটও বিশ্রাম করেন নি। আপনি এ কথাও বলতে পারবেন না যে, উনি একটি মিনিট ফাঁকি দিয়েছেন। অথচ ফল কি হ'ল? কোন্ ছেলে বুঝল আর কোন ছেলে বুঝল না—তার উনি কোন খবরই রাখলেন না। যারা টাস্ক আনে নি তাদের উনি শাস্তি দিয়েই খালাস—কেন আনে নি, বুঝতে পেরেছে কি না—সেকথা জিজ্ঞাসা করাও উনি কর্তব্য ব'লে মনে করলেন না।'

ষোড়শীবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল, উনি বললেন, 'আমি বোঝাবার সময় প্রত্যেক স্টেপে জিজ্ঞাসা ক'রে নিই ওরা বুঝেছে কিনা।'

সতীশবাবু বললেন, 'আপনারাও তো ছাত্র ছিলেন একসময়। আপনাদের শিক্ষকরাও অমনি জিজ্ঞাসা করতেন—না বুঝলেও আপনারা উঠে সে কথা বলতেন কি?'

মুখ গোঁজ ক'রে ষোড়শীবাবু বললেন, 'তার চেয়ে বেশী আর কি করতে পারি বলুন—পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো ক্লাস। এর ভেতরে কি আর প্রত্যেক ইন্‌ডিভিজুয়াল ছাত্রের খবর রাখা সম্ভব!'

'কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব তো আপনারা নিয়েছেন। ওরই মধ্যে কি ক'রে সে দায়িত্বের মর্যাদা রাখতে পারেন সেটা ভাবা দরকার।'

ভূগোলের মাস্টার অমিয় গোঁসাই বললেন, 'বেশ তো ভায়া, একজাম্পল্‌স্ আর বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট্‌স্—তুমি ক'রে দেখিয়ে দাও না—কী ক'রে সে মর্যাদা থাকে।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব বৈকি!' সতীশবাবু প্রশান্ত কণ্ঠেই বলেন, 'কিন্তু একার দ্বারা আর কতটা করা সম্ভব!'

'একটিকেই দেখুন না! আপনার থিওরী যদি সত্যি হয় তাহ'লে খুব খারাপ রেজাল্ট যে করেছে তাকেও পাস করানো যাবে—তেমনি কোন ছাত্রকে বেছে নিয়ে তাকে মানুষ ক'রে দেখিয়ে দিন যে, মনোযোগ দিলে সব ছেলেই মানুষ হ'তে পারে। তাহ'লে আমাদেরও শিক্ষা হবে।' কণ্ঠে মধু ঢেলে দেন ষোড়শীবাবু।

'বেশ তো তেমনি একটা ছেলে বেছে দিন না! দেখি রেজাল্‌টের খাতাটা।' নিজেই হাত বাড়িয়ে দেন সতীশবাবু। যেন চ্যালেঞ্জ করেন ষোড়শীবাবুকে, অথবা তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন।

খুঁজতে খুঁজতে ক্লাস সিক্স-এর বাপির নাম পাওয়া গেল। অতুল্য রায়-চৌধুরী—ইংরেজী শূন্য, অঙ্ক শূন্য, বাংলা সাত, ইতিহাস দশ, ভূগোল ত্রিশ।

'এই তো! চমৎকার ছেলে। একেই আমি বেছে নিলাম। ছেলেটিকে ডেকে পাঠান তো ষোড়শীবাবু, দেখি।'

বেয়ারা নিয়ে এল ছেলেটিকে। রোগা ছিপছিপে, বেচারী বেচারী ছেলে। দেখতে সুশ্রীই বলা চলে—কিন্তু মুখের মধ্যে কোথাও বুদ্ধির কোন ছাপ নেই।

'তোমার নাম অতুল্য? ডাক নাম কি?'

'ডাকনাম বাপি স্যার।' সবাই হেসে উঠলেন। এ ডাকনাম বলে কেউ! বাপির মুখও লাল হয়ে উঠল। কিন্তু সতীশবাবু বললেন, 'বেশ, বেশ। ভারি মিষ্টি নাম। কে ডাকেন এ নামে—বাবা?'

'বাবা নেই স্যার—মারা গেছেন।'

সতীশবাবু একটু অপ্রতিভ হলেন, 'কে আছে আর তাহ'লে ?'

'মা আছে, আমরা দুজন পিসেমশাইয়ের কাছে থাকি।'

'অ। তাহ'লে তোমার পিসেমশাই-ই গার্জেন। আচ্ছা, আজ ছুটির পর আমাকে তুমি নিয়ে যেও তো তোমাদের বাড়ি, চিনে আসব।'

আশঙ্কায় বাপির মুখ শুকিয়ে উঠল, একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'আর কখনও এমন হবে না স্যার, খুব মন দিয়ে পড়ব এবার থেকে। এবারের মতো মাপ করুন, স্যার।'

'না না—ভয় নেই, ভয় নেই। ওসব কোন কথা নয়। আচ্ছা, না গেলেও চলবে। তুমি তোমার মা আর পিসেমশাইকে বলে এসো—কাল থেকে তুমি সন্ধ্যের সময় আমার কাছে পড়তে আসবে—পড়া শেষ হ'লে আমি এগিয়ে দেব। তাতে যদি অসুবিধা হয় তো ইস্কুলের ছুটির পর এখানেই এক ঘণ্টা পড়তে পারো। তবে তখন তো তোমার খিদে পাবে—'

বাপির মুখ যেন আরও শুকিয়ে গেল, 'খিদে আমার পায় না—কিন্তু স্যার, আমরা যে—মানে মা যে—টাকা দিতে পারবে না স্যার।'

কথা ক'টা বলার অপমানে ওর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

সতীশবাবু হেসে বললেন, 'না না—ভয় নেই। টাকা আমাকে দিতে হবে না। আমি এমনিই পড়াবো। বলো তো আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েও পড়িয়ে আসতে পারি।'

এমনি ভাবে, একেবারে যেন দৈবক্রমে বাপি এসে পড়ল সতীশবাবুর দায়িত্বে।

সতীশবাবু আরও একটা টিউশ্যনী করতেন টাকার জন্যে। সেজন্যে সন্ধ্যাটায় একটু অসুবিধাই ছিল—ইস্কুলের পরই বাপি ওঁর সঙ্গে যেত ওঁর বাসায়। ইস্কুলের খুব কাছেই একখানা ঘর ভাড়া ক'রে থাকতেন একটি মেসে। দেশে ওঁর আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ আছে কিন্তু তাদের নিয়ে এসে বাসা করার সঙ্গতি বা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না। নেহাত পড়ার ক্ষতি হবে ব'লে আলাদা ঘর নিয়ে থাকতেন, খাওয়াটা মেসেই হ'ত।

ইস্কুল থেকে ফিরে নিজে খেতেন কোনদিন দুধ-মুড়ি, কোনদিন বা দই-চিড়ে, বাপিকেও খাইয়ে নিতেন। ছেলেমানুষ হ'লেও বাপির সঙ্কোচ করার মতো জ্ঞান হয়েছিল—প্রথম প্রথম তার লজ্জা করত কিন্তু সে লজ্জা সতীশবাবু ভেঙে দিলেন। ওকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অতক্ষণ পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে পড়া মাথায় ঢুকবে না। আর ওকে লেখাপড়া করাতে না পারলে সতীশবাবুর অপমানের শেষ থাকবে না। এ হ'ল ওঁর জেদের ব্যাপার।

একদিন বাপির পিসেমশাই এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলেন। একটু লজ্জাও প্রকাশ করলেন, 'অনাথ ছেলে—আপনি যা করলেন তার তুলনা নেই। ও যদি কোনদিন মানুষ হয় তো আপনার গোলাম হয়ে থাকবে। আমার কিছু করা হয়ত উচিত, কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন আমিও বড় ছাঁপোষা—'

ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় করলেন সতীশবাবু।

একটা সুবিধা হয়েছিল ওর—বাপি লেখাপড়ায় যাই হোক, এমনি খুব শান্ত, মিষ্ট স্বভাবের ছেলে। উনি যখন পড়াতেন সে মন দিয়েই শুনত।

সেই বছরই সব বিষয়ে পাস ক'রে বাপি প্রমোশন পেলে। তার পরের বছর সেকেণ্ড হ'ল—তার পরের বছর ফার্স্ট!

ষোড়শীবাবুকে জব্দ করার কাজ হয়ত এইতেই শেষ হয়ে গেল কিন্তু বাপিকে আর সতীশবাবু ঘাড় থেকে নামাতে পারলেন না। আসলে ইচ্ছাও ছিল না—বাপি ওঁকে নেশার মতো আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। আরও ভাল ফল চাই, বাপি বিশ্ববিদ্যালয়েও সকলের সেরা হবে এই হ'ল ওঁর সাধনা। ইতিমধ্যে উনি নিজে এম-এ পাস করেছেন। বি-টি পড়া চলেছে। সতীশ-বাবুর নামডাক বেরিয়েছে খুব—সেই সঙ্গে ইস্কুলেরও। পুরনো হেডমাস্টার চলে গিয়ে ষোড়শীবাবু হেডমাস্টার হয়েছেন—কমিটি আরও সাতজনকে ডিঙিয়ে সতীশবাবুকেই য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার করেছেন। ফলে অনেকটা স্বাধীনতা পেয়েছেন সতীশবাবু, উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড ক'রে বসছেন প্রত্যহ। যে সংস্কৃতে এম-এ তাকে দিচ্ছেন ইংরেজী পড়াতে, ইংরেজীর লোককে দিচ্ছেন সংস্কৃতের ভার। সতীশবাবুর মত হচ্ছে,' কে কোন্‌টা পড়েছে সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়, কে কোন্‌টা পড়াতে পারে ভাল সেইটেই বড় কথা।' গ্রুপ ভাগ ক'রে নিয়েছেন ক্লাসের মধ্যে। ভালো, মন্দ, মাঝারি। প্রত্যেক

গ্রুপের দিকে স্বতন্ত্র মনোযোগ দেবেন শিক্ষকরা—সে ব্যবস্থা হয়েছে। ওপরের দুটো ক্লাসে কম্পাল্সরি কোচিং—সব শিক্ষককেই ছুটির পর থাকতে হয় এক ঘণ্টা—সেজন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সামান্য কিছু বেশি টাকাও আদায় করেছেন সতীশবাবু।

কিন্তু এতে ওঁর আয় বেড়েছে সামান্যই। দেশে কিছু পাঠাতে হয়, এখানে খরচ আছে। তার ওপর সময় কম, বেশি টিউশ্যনীও করতে পারেন না। একটা পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন কিন্তু তাতে আয় হয় নাম মাত্র—অন্য মাস্টারমশাইরা, যাঁদের বই আছে, তাঁরা যেমন নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে সব কাজ ছেড়ে বই নিয়ে পড়েন—সতীশবাবু তা পারেন না। প্রকাশক স্পষ্টই বলে, 'আমাদের চেষ্টাতে কি আর কিছু হয়? অথররা চেষ্টা করলে তবে বই চলে!'

অথচ বাপি যখন ম্যাট্রিক পাস করলে তখন তার সব খরচাই এসে পড়ল ওঁর ওপর। ইতিমধ্যে সে যখন ক্লাস নাইনে পড়ছে তখনই মা মারা যান ওর —তিনি ওর পিসেমশাইয়ের বাসায় ঝি-রাঁধুনীর যুগ্ম কাজ করতেন ব'লে ওদের গলগ্রহ মনে হয় নি! এখন হলো, তাই ম্যাট্রিক পাস করতেই ওর পিসেমশাই চাইলেন তাঁর অফিসে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে। বাপি ছলছল চোখে এসে সেই সংবাদ দিল।

সতীশবাবু নিজে গেলেন দেখা করতে। ওর পিসেমশাইকে বললেন, 'অসুখ-বিসুখ গেল তাই, তা নইলে বাপি আরও ভাল করত, এই অবস্থায় পড়াটা ছাড়িয়ে নেবেন? যাই হোক, দশ টাকার স্কলারশিপও পেয়েছে—'

'দশ টাকাতে আর কি হয় বলুন। খাওয়া-পরার কথাটা ছেড়েই দিলুম —কলেজের মাইনে, বই, খাতা, জলখাবার—সবটা ধরুন। আমি ছাঁপোষা মানুষ—আমারও তো ছেলেপুলে আছে!'

সতীশবাবু কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'ওর কলেজের মাইনে, বই, খাতা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ আমার। হয়ত কলেজের মাইনে লাগবে না— না লাগলে ওর কাপড়-জামাও আমি দেব।'

এবার ওর পিসেমশাই অপ্রতিভ হলেন। বললেন, 'দেখুন আপনার তো কোন দায়ই নেই, আপনি যদি এতটা করেন তো আমি আর বাকিটা পারব

না। যেমন ক'রে হোক পারতেই হবে।'

কলেজে ছুটোছুটি ক'রে ফি মাপ করিয়ে নিলেন সতীশবাবু। কিন্তু তবুও খরচ কম নয়। তাছাড়া শখও আছে। নিজে বিয়ে করেন নি—ছেলে-পুলে হয় নি, সন্তানের সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটেছে বাপিকে পেয়ে। ছেলে কলেজে পড়লে বাপের যেমন শখ হয়—সতীশবাবুরও সেই সব শখ দেখা দিল। তিনি একটা ভাল কলম কিনে দিলেন, একটা হাতঘড়ি। তাছাড়া ও, মধ্যে মধ্যে এটা-ওটা তো আছেই—কোনদিন হয়ত গিয়ে একটা ভাল কাপড়ের স্যুটের অর্ডার দিয়ে বসলেন, কোনদিন বা চামড়া-বাঁধানো খাতা। বাপি অনুযোগ করে, অপ্রতিভ হয়, কিন্তু সতীশবাবু শোনেন না।

আই-এসসি পাস ক'রে যখন বি-এসসি পড়তে গেল বাপি, তখন খরচ আরও বাড়ল। পিসেমশাই স্পষ্টই বলে দিলেন, সামান্য কিছু টাকা না পেলে তাঁর পক্ষেও খরচ চালানো সম্ভব হবে না। অথচ বাপি ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পেল না।

বাপি বলল, 'টিউশ্যনী করব।'

সতীশবাবু বললেন, 'না। টিউশ্যনী আমিই করব।'

বাপি বলল, 'তাহ'লে পড়াই ছেড়ে দেব।'

সতীশবাবু অনেক ক'রে বুঝিয়ে বললেন। বললেন, 'বাপি, তোর পড়ার ক্ষতি হবে, বিশ্বাস কর্। এ তুই ঋণ বলেই নে, পরে শোধ করিস। কিন্তু এখন না। এই কথাটা আমার শোন্।'

বাপি শুনল। তবে ফল হ'ল হিতে বিপরীত। অর্থকরী টিউশ্যনীটা বন্ধ করলেন সতীশবাবু ; তাতে শখের টিউশ্যনীটার সুযোগ বাড়ল। সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠার পরই বন্ধু সুশীলের বোন অচিরাকে পড়াবার এই শখটা জেগে-ছিল, হয়ত সেই জন্যই স্কলারশিপটা হয় নি। তবে সতীশবাবু অতটা বোঝেন নি।

কিন্তু থার্ড ইয়ারের মাঝামাঝি পৌঁছে ব্যাপার চরমে পৌঁছল। সতীশবাবুর চোখেও পড়ল। তখন কি আর ফেরাবার পথ আছে ? এইবার প্রথম যেন হতাশার সামনাসামনি দাঁড়ালেন তিনি ; যদিও হাল ছাড়লেন না।

সে যা সংগ্রাম করলেন সতীশবাবু! বোধ হয় কোন মানুষে কখনও করে

না। শুনেছি হিংস্র জন্তুরা শাবককে বাঁচাবার জন্যে এমনি একাগ্র সংগ্রাম করে। বাপি প্রথমটা একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল—বললে, 'লেখাপড়া শিখে ফল কি? আমি কারখানায় চাকরি করব। টাকা আমার চাই-ই। এমন ক'রে চলে না।'

বাপি তার প্রণয়নাট্যের কথা স্বাভাবিক ভাবেই গোপন করেছিল কিন্তু সতীশবাবু তাঁর প্রাপ্য সম্মানটার বদলে ছাত্র-শিষ্য-পুত্রের মঙ্গলটাকেই বড় ক'রে দেখলেন। তিনি নিজেই কথা পাড়লেন। বাপি প্রথম প্রথম এড়িয়ে গিয়েছিল কথাটা কিন্তু পরে যখন দেখল গোপন করা বৃথা—তখন উদ্ধতভাবেই স্বীকার করলে। কী হয়েছে তাতে? হ্যাঁ—ভাল সে বেসেছে। তুচ্ছ লেখাপড়া, তুচ্ছ উন্নতি। জীবন আরও বড়!

সতীশবাবু ছায়ার মতো লেগে রইলেন। মুখে বুঝিয়ে বলেন, আর অনুসরণ করেন সর্বদা। শুনতে শুনতে বাপি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাগ করে—সতীশবাবুর সম্পর্ক ত্যাগ করতে চায় কিন্তু যে কিছুতে ছাড়ে না, তাকে ছাড়াবে কি ক'রে? সতীশবাবু অচিরাদের সঙ্গে পরিচয় ক'রে নিলেন অন্য সূত্র ধ'রে। সব টিউশ্যনীতে দু'মাস ছুটি নিলেন—দিনরাত অচিরাদের বাড়িই প'ড়ে থাকেন। বাপি একেবারেই নিভৃত অবসর পায় না। প্রথম প্রথম সে ক্ষেপে উঠেছিল, কিন্তু পরে হার মানতে বাধ্য হ'ল। দিনরাত কানে যা শোনা যায়—তা ক্রমে বিশ্বাসও হয়ে পড়ে।

বাপি অবশেষে সামলে নিলে নিজেকে।

বি-এসসি'তে অনার্স নিয়ে প্রথম হ'ল বাপি। সায়েন্স কলেজে এম-এসসি পড়তে গেল। খরচ কমাতে সে মেস ছেড়ে আরও অন্ধকার গলিতে সস্তার এক মেসে উঠে গেলেন সতীশবাবু। টিউশ্যনীর সংখ্যা বাড়ল। এমন কি, যে শিক্ষা-সংস্কারের জন্য তাঁর জীবন পণ, তাও পেছনে পড়ে গেল তাঁর জীবনের ক্ষেত্রে। বাপির উন্নতি ছাড়া অন্য কোন কথা নেই এখন।

কিন্তু প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধল বাপি এম-এসসি পাস করার পর। সতীশবাবু চেয়েছিলেন, সে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিক। বাপি সে কথা কানেই তুলল না, একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল। বললে, 'আপনাকে দেখেই আমার শিক্ষা

হয়েছে মাস্টার মশাই। আর না।'

'কিন্তু আমার স্বপ্ন?'

'আশীর্বাদ করুন, আপনার স্বপ্ন সার্থক করব অন্যভাবে। যথেষ্ট পয়সা উপার্জন ক'রে আপনাকে নিজস্ব ইস্কুল ক'রে দেব একটা। সেখানে যা খুশি তাই করবেন—যেমন ক'রে খুশি পড়াবেন!'

এত সৌভাগ্য বিশ্বাস করতেও পারেন না—যদিচ লোভে চোখ জ্বলে। 'সে কি আর হবে রে!'

'দেখবেন হয় কিনা। এ আমি করবই।'

আরও বছর দুই রিসার্চ করলে বাপি, তারপর মস্তবড় সরকারী চাকরি পেলে। এক মাসের মাইনে হাতে পেয়েই বাপির প্রথম কাজ হ'ল ভাল একটা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে সতীশবাবুর সেই অন্ধকার মেস থেকে তাঁকে উদ্ধার করা।

'এ কি রে, এ কি রে—ওরে ও পাগ্‌লা—'

'আগে ওখানে গিয়ে উঠি, শোনবার সময় ঢের পাবো।' জোর ক'রেই নিয়ে যায় বাপি।

'কতকালের শখ আমার, মাস্টার মশাই, আপনি আর আমি এমনি থাকব দুজনে মিলে পড়াশুনা করব, পড়াশুনোর গল্প করব—সেই স্বপ্ন দেখব। আপনাকে একটু ভাল ক'রে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করতে হবে। কী চেহারা হয়েছে বলুন তো!...'

বিধাতা বুঝি ওর কথাগুলো শুনে বিদ্রূপের হাসি হাসলেন।...

মাস পাঁচ-ছয় পরে হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হ'ল যে নিত্য জ্বর হচ্ছে বাপির। ডাক্তার এলেন হাসতে হাসতে—পরীক্ষা ক'রে মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল তাঁর। সতীশবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এতদিন কেউ লক্ষ্য করেন নি? আশ্চর্য! দুটো দিকই—'

আবার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন সতীশবাবু। বাপি অনুনয় ক'রে বললে, 'আমাকে কোন হাসপাতালে দিন। চেষ্টা করলে কি আর ফ্রি বেড পাওয়া যাবে না? আপনার কাছে কিছুতেই থাকব না। এই তো শরীর আপনার—যদি ছোঁয়াচ লাগে?'

সতীশবাবু বললেন, 'তুই আমার ছেলে হ'লে এ কথা বলতে পারতিস বাপি? তোকে কোথায় রেখে আমি নিশ্চিন্ত থাকব বল্?'

আবার টিউশ্যনীর সংখ্যা বাড়াতে হ'ল। পাঠ্য-পুস্তক লিখলেন, তার জন্যে তদ্বিরও করতে হ'ল। অর্থ-পুস্তক লেখা, প্রুফ দেখা—কোন কাজই বাকি রইল না। শিক্ষার আদর্শ গেল তলিয়ে—দেশের সমস্ত ছেলের মঙ্গল যে ঐ একটি ছেলের মধ্যে সংহত হয়েছে।

বাঁচানো গেল না। যাবে না—তাও জানতেন—শুধু বৎসর-দেড়েক ধ'রে রাখলেন মাত্র। তারপর একদিন বাপি তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেল।

সবাই ভেবেছিল এবার ভেঙে পড়বেন সতীশবাবু কিন্তু অবাক্ হয়ে দেখল যে, তবুও যোদ্ধাবেশ ত্যাগ করলেন না তিনি—তেমনি চলতে লাগল তাঁর অবিরাম সংগ্রাম।

বন্ধু অজয়বাবু বললেন, 'সতীশ, আর ও ফ্ল্যাট কেন? মিছিমিছি অত খরচ—'

সতীশবাবু জিভ কেটে বললেন, 'বাপ রে! বাপি কত শখ ক'রে ঐ ফ্ল্যাটে আমাকে এনে তুলেছিল—ও ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথায় যাব!'

বৃদ্ধ ষোড়শীবাবু একদিন বললেন, 'এখন তো আপনি একা। এ ভূতের পরিশ্রম আর কেন?'

কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন সতীশবাবু, 'কী জানেন, বাপির বড় সাধ ছিল একটা ইস্কুল করার, যে ইস্কুলে আমাদের আদর্শমতো পড়ানো হবে! কত পরামর্শ করেছি দুজনে ব'সে—কত স্বপ্ন দেখেছি। সেই জন্যেই সে বিয়ে-থা করে নি—দুজনের রোজগারের টাকা জমিয়ে ইস্কুল করব এই ঠিক ছিল।...এখন তো সেটা আমাকেই করতে হবে। নইলে বাপি স্বর্গেও সুখ পাবে না!'

'আপনি একটা ইস্কুল করবেন—টাকা জমিয়ে?' অবিশ্বাসের সুর, বিস্ময়ের সুর ষোড়শীবাবুর কণ্ঠে।

'দেখি না চেষ্টা ক'রে—দেখতে দোষ কি। যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি, কোঽত্র দোষঃ। বুঝলেন না। বাপির নামে ওটা ক'রে যাবো এই মনস্থ করেছি—তার স্মৃতি—'

ব্যস্তভাবে ছাতাটা বগলে চেপে চলে যান সতীশবাবু, এক মিনিটও তাঁর দাঁড়াবার অবসর নেই।

আজও চলেছে তাঁর সেই সংগ্রাম—অবিরামভাবে।

ইচ্ছামৃত্যু

অমিয়মাধবের মৃত্যুতে সমস্ত এলাহাবাদ শহরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। আর পড়াই তো স্বাভাবিক। এ তো সাধারণ মৃত্যু নয়—একেবারে যাকে বলে ইচ্ছামৃত্যু। সাধকদের ঈপ্সিত এ মৃত্যু—কিন্তু কজন সাধকই বা এমন মৃত্যু পান? কলিযুগে কেন—সেই ত্রেতা দ্বাপরের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যেই বা কটা এমন মৃত্যুর কথা পাওয়া যায়? অমিয়মাধব পার্থিব দিক থেকে অতি সাধারণ ধরনের মানুষ ছিলেন বলেই তাই—তাঁর ছেলেমেয়েদেরও খুব একটা পাব্‌লিসিটি বা প্রচারের লোভ ছিল না বলেও—নইলে এলাহাবাদ কেন, সারা ভারতেই তো হৈ-চৈ পড়ে যাওয়ার কথা।

অমিয়মাধব ছিলেন কনট্রাক্টর। কিছুদিন রূড়কীতে ইঞ্জিনীয়ারিংও পড়েছিলেন। পড়তে পড়তেই তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় নগদ পাঁচ হাজার টাকা যৌতুক পাওয়া গিয়েছিল, সেটা তাঁর বাবা বিবাহে খরচ করেন নি—পুরোপুরিই ছেলের হাতে দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতের সম্বল ব'লে। অমিয়মাধবের পড়াশুনো আর বেশীদূর এগোয় নি; তার কারণ অবশ্যই নবোঢ়া পত্নীপ্রীতি নয়, প্রধান কারণ বাবার অকাল মৃত্যু। সংসারের ভার ঘাড়ে এসে পড়েছিল। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাতে যে আর বছর-দুই পড়ে পাস করা চলত না তা নয়—সেকালে রূড়কী থেকে পাস করলে সরকারী চাকরিরও অভাব হ'ত না কিন্তু অতদিন অপেক্ষা ক'রে অত কম আয়ের কথাটা ভাবতে ভাল লাগে নি অমিয়মাধবের। তিনি পৈতৃক অর্থ সংসারের জন্য রেখে যৌতুকের টাকাটা নিয়েই ব্যবসায়ে নেমে পড়েছিলেন—এবং তারপর থেকে ক্রমাগত পরিশ্রম ক'রে ত্রিশ বৎসরে ঠিক পাঁচশ গুণ মুনাফা আদায় করেছিলেন।

টাকা রোজগার করতে নেমেছিলেন—কতকটা প্রয়োজনে, কতকটা কৃতিত্ব প্রমাণ করতে, টাকার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে নি। কোথায় কখন থামতে

হয় তা তিনি জানতেন। ঠিক পঞ্চান্ন বছর বয়সে থামলেন তিনি। বললেন, 'আর না। এবার যা করেছি তা ভোগ করব। এর চেয়ে বেশী দেরি করলে সে সময়টুকু বয়ে যাবে।'

এর মধ্যে তাঁর ছেলেরা মানুষ হয়ে গিয়েছিল। যার যা ইচ্ছা তাকে সেই পথেই যেতে দিয়েছিলেন অমিয়মাধব। বড় ছেলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মেজ ছেলে উকীল, সেজ ছেলে ব্যবসাদার, ছোটটি সদ্য সরকারী চাকরিতে ঢুকেছে। মেয়ে একটি, তার বিয়ে হয়েছে এক ডাক্তারের সঙ্গে। মিলিটারী ডাক্তার—কিন্তু অবস্থা ভাল। সবাই সুখী। তাদের কথা ভাববার কোন দরকার ছিল না তাঁর।

তবে কোথায় তাঁর শেষ আড্ডা গাড়বেন সেটা ভাবার প্রয়োজন ছিল। তাঁর জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে মধ্যভারতে। জব্বলপুর, ঝাঁসি, নাগপুর —এর মধ্যেই তাঁর কাজকর্ম হয়েছে বেশীর ভাগ। ছেলেরাও ছড়িয়ে আছে এই দিকে—ঝাঁসি, সাতনা, নাগপুর। মেয়ে থাকে পুনায়। সুতরাং অনেক ভেবে তিনি এলাহাবাদেই বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। জব্বলপুরে করবার জন্যেই সকলে বলেছিল কিন্তু তিনি রাজী হন নি, বলেছিলেন, 'না—চিরকালের কর্মক্ষেত্রে থাকলে বিশ্রাম হবে না। তাছাড়া অগঙ্গার দেশে মরতে চাই না। গঙ্গার কাছে থাকব।'

সে বহুদিনের কথা। এলাহাবাদে বসে একে একে যেমন নিজের ব্যবসা গুটিয়ে এনেছেন তেমনি একখানির পর একখানি বাড়ি কিনেছেন। দেহাতে চাষের জমিও করেছেন কিছু—কিন্তু সে কম। ঠিক নিজেদের প্রয়োজন মতো। বলেছেন, 'আমি মলে ছেলেরা এসব কিছুই উদ্ধার করতে পারবে না, বাড়িগুলো থাকলে ভাড়া দিয়ে না পারুক, বেচে খেতেও পারবে।'

অমিয়মাধব চিরদিনই একরোখা তেজী মানুষ। ধর্মভীরু বলতে যা বোঝায় তেমন মিন্‌মিনে স্বভাবের নয়। ধর্মের ধারণাটা ওঁর ছিল আলাদা। বলতেন, 'মিথ্যে কথা বলেছি বৈকি! ঢের, ঝুড়ি ঝুড়ি বলেছি। ব্যবসা করব আর মিথ্যে কথা বলব না, তা কখনও হয়? তবে তাতে দোষ নেই। বিনা কারণে একটিও মিথ্যে কথা বলি নি, এটা গর্ব ক'রে বলতে পারি। যেটা আপনাদের মধ্যে অনেকেই বুকে হাত দিয়ে হলফ ক'রে বলতে পারবেন না।

অনেকেই অকারণে মিছে কথা বলেন—তা আমি জানি।'

দানধ্যান ছিল ওঁর,—পরিমিত ও নিয়মিত। পূজাপার্বণে স্ত্রী বা বৌমারা যা করতেন, তাতে কখনও বাধা দেন নি, নিজের খুব উৎসাহও ছিল না। স্ত্রী উপবাস করতে বললে করতেন। বলতেন, 'সহধর্মিণী—তার ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেব কেন?' নিজে দীক্ষা নেন নি, স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছিলেন দীক্ষা নিতে। নিজে শুধু ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী স্মরণ করতেন, পর্বদিনে গঙ্গাস্নান করতেন আর ভোরবেলা বিছানায় বসে কী জানি কি নাম বা মন্ত্র জপ করতেন। পরলোকের কাজ বলতে ঐটুকু।

কিন্তু এর জোরেই সাহসের অন্ত ছিল না তাঁর। বার বার ছেলেদের বলে রেখেছিলেন, 'আমার জন্যে তোরা একটুও ভাবিস নি। আমি মরার আগে টের পাব, তোদের জানিয়ে যাব। একটুও বিব্রত হ'তে হবে না আমাকে নিয়ে। শেষ সময় এলে সব ব্যবস্থা ক'রে হেঁটে গঙ্গাতীর পর্যন্ত যাব। চাই কি চিতা সাজিয়ে তার ওপর শুয়েও মরতে পারি। আর তোদের সকলকে রেখেও যাব। আর আমার শোক নেই—তা আমি জনি। গিন্নি তোড়জোড় অনেক করেন মধ্যে মধ্যে, কিন্তু আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।'

বলেছেন অনেকবারই, অনেকই শুনেছে। কেউই তা বিশ্বাস করে নি। কেনই বা করবে? কী এমন লোক অমিয়মাধব রায়? ঘোর বিষয়ী, বদ্ধ জীব। চিরদিন ব্যবসা ক'রে টাকা রোজগার করেছেন, এখনও বিষয় ভাঙিয়ে খান। জপ নেই, তপ নেই—তেমন বড় কোন দান নেই, ত্যাগ নেই—উনি এমন ভাগ্য করবেন যে একেবারে ইচ্ছামৃত্যু হবে? বড় বড় সন্ন্যাসীরা যা পারেন নি, উনি তাই পারবেন? ও কথার কথা। অনেকেই আড়ালে হেসেছে—বেশী আলোচনাও করে নি। অতটা মূল্যও কেউ দিত না তাঁর কথার!

কিন্তু এইভাবেই অবসরের কুড়ি বছর কাটার পর, জীবনের পঁচাত্তর বছর পূর্ণ ক'রে হঠৎ একদিন চমক ভাঙল অমিয়মাধবের। মনে হ'ল তিনি বহুদিন এখানে এসেছেন, বহুদিন কাটল। আর কেন?

মনে পড়ত না হয়ত। হঠাৎ সেবারের জন্মদিনে গৃহিণী একটু বিশেষ

ঘটা করলেন। ওঁকে আগে কিছু বলেন নি—গোপনে চিঠি লিখে ছেলে-মেয়েদের আনিয়ে একেবারে ফাঁস করলেন কথাটা—সেই দিন। ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ নাতি-নাতনী নাতজামাইয়ে পরিপূর্ণ সংসার। হাসির হাট চারিদিকে। ভোর হ'তে না হ'তে সকলে ফুল ও মালায় তাঁকে প্রায় ঢেকে দিল, অসংখ্য উপহারে ভরে গেল ঘর। বহু লোককে নিমন্ত্রণ করা হ'ল—রীতিমতো উৎসব সমারোহ পড়ে গেল চারিদিকে।

অমিয়মাধব কেমন যেন চমকে উঠলেন। জন্মদিনের কথাটা যে না মনে ছিল তা নয়—কিন্তু এবারে জন্মদিন যে পরমায়ুর বিশেষ একটা অঙ্ক পার ক'রে এল, সেই কথাটাই মনে ছিল না। খানিকটা সকলের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'পঁচাত্তর হয়ে গেল, বলিস কি? এ যে অনেকদিন থেকে গেলুম রে!'

তারপর গৃহিণীর দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললেন, 'উৎসবটা আশি বছর বয়স পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে আর সাহসে কুলোল না, না?'

'কি অলুক্ষণে কথা যে তুমি মুখে আনো বাবা!' স্ত্রী উত্তর দেবার আগেই স্ত্রীর কন্যা বলে ওঠে, 'ওভাবে আমরা যাবই না। এই উৎসব করলুম আবার সেঞ্চুরী করব—সেই আমাদের ইচ্ছা!'

আর বেশী কিছু বললেন না অমিয়মাধব, আর একবার মুচকে হাসলেন শুধু।

তারপর থেকে সারা দিনটাই কেমন অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন তিনি। নাতি নাতনী, নাতনীর মেয়ে সকলের সঙ্গে হৈ চৈ যে না করলেন তা নয়—কিন্তু যারা তাঁকে চেনে তারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারত যে, সব কথা সব হাস্যপরিহাসের মধ্যে থেকেও কী একটা গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন তিনি।

ছেলে মেয়ে জামাই সকলকে নিয়ে খেতে বসলেন। এবার মনে হ'ল তাঁর অন্যমনস্কতাটা ঘুচেছে, বরং বেশ একটু উৎফুল্লই হয়ে উঠেছেন। কিন্তু খেতে খেতে একই প্রশ্ন করলেন সব ছেলেকে এবং জামাইকেও—কার কী রকম ছুটি পাওনা আছে, এবং কোন্ সময় ছুটি নেওয়া তার সুবিধা।

খুবই কৌশলে কথাটা এগোচ্ছিল কিন্তু তবু বড় ছেলের হাকিমী বুদ্ধির কাছে গোপন রইল না। তিনি একটু ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন, 'কেন বলুন

তো বাবা, সকলের ছুটির খবর নিচ্ছেন ?'

'না এমনি। আবার কবে সবাই আসতে পারবে তাই ভাবছি। তোর রিটায়ার করার আর কত বাকী রে বিলু ?'

'আর ঠিক ছ' বছর, অবশ্য যদি এক্স্‌টেনশ্যন না পাই। তবে পাব বলেই মনে হচ্ছে।'

মনে মনে একটা হিসেব ক'রে নিয়ে অমিয়মাধব বললেন, 'তোর জন্মমাস আর আমার জন্মমাস এক—তার মানে তুইও পঞ্চাশে পড়লি। কিন্তু এরই মধ্যে তোর সব চুল পেকে গেল ? আশ্চর্য তো!'

'আপনার তো এখনও দাঁতও আছে ঢের। আমার তো সব বাঁধানো। আপনাদের স্বাস্থ্য আর আমাদের স্বাস্থ্য! আকাশপাতাল তফাত!'

'তা বটে!' অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন অমিয়মাধব।

সন্ধ্যার দিকে একটু নিরিবিলি দেখা হ'ল গৃহিণীর সঙ্গে।

অনেকদিন পরে কাছে ডাকলেন তাঁকে, 'ওগো শুনছ, শোন শোন!'

'কী গো, কী চাই ? এত জরুরী তলব কেন ?' ঠাকুর-ঘরে ঢুকতে গিয়েও ফিরে আসেন গৃহিণী মনোরমা।

'তোমার বয়স কত হ'ল বল তো ?'

'সে আবার কি কথা—হঠাৎ আমার বয়সের হিসেবে কী কাজ পড়ল ?' বিদ্যুতের আলোয় ভাল ক'রে মুখটা দেখবার চেষ্টা করেন স্বামীর। বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এ ধরনের প্রশ্ন করার লোক অমিয়মাধব নন।

'কাজ আছে। বলোই না।'

'তোমার পঁচাত্তর হ'লে আমার আটষট্টি। তোমার যখন চব্বিশ আমার সতেরো—বিয়ে হয়। বাবা দু'বছর গোপন ক'রে বিয়ে দিয়ে ছিলেন পনেরো বলে।'

'ও—তোমার আটষট্টি—না ? কাশীর সুধীর ভাদুড়ি তোমার হাত দেখে কবে যেন ফাঁড়া আছে বলেছিল, উনসত্তরে ? ও, তাই সকাল সকাল উৎসবটা সেরে নিলে! আশি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইলে না। তোমার মতলব তো ভাল নয় গিন্নী, ভাবছ আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে!'

'হ্যাঁ—কে কবে হাত দেখে কী বলেছে আমি তাই মনে ক'রে বসে

আছি!' উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন মনোরমা।

'মনে ক'রে যে আছ তা আমি জানি। তাঁর ওপর তোমার অগাধ বিশ্বাস! কিন্তু হবে না। পারবে না গিন্নী, পারবে না—এই তোমাকে বলে দিলুম! আমিই তোমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাব!'

স্থানকালপাত্র, নিজের তসরের শাড়ি—সব ভুলে গিয়ে স্ত্রী মুখটা চেপে ধরেন ওঁর. 'আবার ঐসব অলুক্ষুণে কথা! এখনি আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা করব বলে দিলুম, ফের যদি ঐ কথা মুখে আনবে!'

'আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি পুজোয় যাও। আর কিছু বলব না!' আবারও হাসলেন অমিয়মাধব।

এর পর মাস তিনেক বেশ স্বাভাবিকভাবেই কাটল। যেমন গত কুড়ি বছর ধরে প্রতিদিন কেটে আসছে তেমনিই। অমিয়মাধবের বাহ্যজীবনে অন্ততঃ কোন পরিবর্তন হয় নি—মনে কোন ভাবান্তর এসেছে কি না তা মুখ দেখে বোঝা সম্ভব নয়।

কিন্তু তিন মাস পরে, অর্থাৎ মাঘ মাস কাটতেই তিনি যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। দিনকতক উকিলবাড়ি ছুটোছুটি ক'রে উইল প্রস্তুত করলেন; নগদ টাকা এদিকে ওদিকে যা পড়েছিল, যথাসম্ভব তুলে বাড়ি নিয়ে এলেন; শেয়ার, কোম্পানির কাগজ—অনেক কিছু অগোছালো হয়েছিল, সেগুলো ঠিক করলেন; চাষের জমি বেশির ভাগই বিক্রি ক'রে দিলেন—এক কথায় বিষয়সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত ক'রে যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। অন্যগুলো তত কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করে নি কিন্তু উইলের কথাটা কী ক'রে জানাজানি হয়ে গেল। খুড়তুতো শালা সুহৃদ চৌধুরীকে তিনি এক্‌-জিকিউটার করেছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁর স্ত্রীই কোনমতে টের পেয়ে মনোরমাকে জানিয়ে থাকবেন।

মনোরমা একদিন এসে চেপে ধরলেন, 'তুমি নাকি উইল করেছ?'

চমকে উঠলেন হয়ত মনে মনে, কিন্তু মুখে সে চমক প্রকাশ পেতে দিলেন না অমিয়মাধব। গোপন করার চেষ্টা নিরর্থক দেখে সংক্ষেপে শুধু বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কেন ?'

'কেন কি ? বয়স হয় নি ? অনেক আগেই করা উচিত ছিল, প্রস্তুত হয়ে থাকা ভাল নয় ?'

'কিন্তু এতদিন পরে সে কথাটা মনে পড়ল কেন, তাই তো জিগ্যেস করছি !'

'তুমিই তো বয়সের কথাটা মনে করিয়ে দিলে গো গিন্নী !'

'তা উইল করারই বা এত কী আছে, যা আছে তোমার ছেলেমেয়েরাই তো পাবে। মিছিমিছি ঐ এক সর্বনেশে জিনিস—'

'আরে, কোথায় কী আছে তা জানাতেও তো একটা কিছু লিখে রাখা দরকার। তোমার ছেলেরা তো কোন খবরই রাখে না, তুমিও তথৈবচ।··· কথাটা যখন শুনেছই তখন বলে রাখি, শুধু উইল নয়, আমার অন্য যা সব শেষ ইচ্ছা, হিসেবনিকেশ কাগজপত্র সব ঐ লোহার আলমারিটাতে রইল। চাবি দিয়ে গেলুম সুহৃদের কাছে—ইস্কুল মাস্টার—সাচ্চা লোক, কখনও কোন তঞ্চকতা করবে না—কারুর মুখ চেয়ে আমার শেষ ইচ্ছেরও নড়চড় হ'তে দেবে না। আমি মলে আগে ও আলমারি খুলবে—আমার ইচ্ছাপত্র বার ক'রে সেইমতো সব করবে !'

'থাক্, ঢের হয়েছে। আমার ঘাট হয়ে ছল তোমার সঙ্গে কথা কইতে যাওয়া।'

গলা বুজে আসে মনোরমার। তিনি দ্রুত উঠে গিয়ে ঠাকুরঘরে ঢোকেন।

অমিয়মাধব হাসেন একটু।

এর পরই ছেলে মেয়ে জামাই পৌত্র—যারা যারা বাইরে ছিল তাদের কাছে এক অদ্ভুত পত্র পাঠালেন। লিখলেন, 'আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন আমার স্বর্গতা মাতাঠাকুরানীর মৃতা-তিথি। আমার ইচ্ছা হইয়াছে ঐ তিথিতেই আমি গঙ্গালাভ করিব—যাহাতে আমার শ্রাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-বৎসর তিনিও ঐ তিথিতে এক গণ্ডূষ জল পান। অবশ্য তোমরা যে কতদিন আমার শ্রাদ্ধ করিবে তাহারও ঠিক নাই—তবু, যদি করো এই ভরসাতেই ঐ তিথির দিকে বিশেষ ঝোঁক। ইহাকে পাগলের প্রলাপ বা বৃদ্ধের ভীমরতি বলিয়া মনে করিও না—নিশ্চিত ছুটি লইয়া ঐ দিনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে।

নচেৎ পশ্চাতে পরিতাপ করিতে হইবে। আমি জানাইয়া দিয়া খালাস।'

পূঃ 'এ চিঠির কথা তোমাদের গর্ভধারিণীকে এখন জানাইবার আবশ্যক নাই।'

সব চিঠিই হুবহু এক : কেবল পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের বেলায় 'তোমাদের গর্ভধারিণী'র জায়গায় লেখা হ'ল 'তোমাদের পিতামহী' বা 'তোমাদের মাতামহী'।

এই চিঠি ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন অমিয়মাধব। বাড়িটা এর মধ্যেই সারানো হয়ে গিয়েছিল, কলি দেওয়া রং করা সব—এবার কোন্ জঙ্গল থেকে রাশি রাশি জ্বালানি কাঠ এনে ভেতরের বাগানে জড়ো করাতে লাগলেন। মনোরমা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী হবে এত কাঠ?'

'না। অনেক সস্তায় পেলুম তাই। থাক না, জ্বালানি হবে এখন! যদি ধরো তোমার নাতনীর বিয়েই পেকে ওঠে—'

উড়িয়ে দিলেন কথাটা। মনোরমা বুঝলেন যে এর মধ্যে আর একটা গূঢ়ার্থ আছে, কিন্তু অনেক চিন্তা ক'রেও সেটা ধরতে পারলেন না।

ছেলে-মেয়েরা এসে পড়ল প্রায় সকলেই। এল না বিশেষ কেউ তৃতীয় পুরুষের দল। তারা এটাকে ভীমরতি বলেই ধরে নিয়েছে।

এবার আর মনোরমার কাছে কথাটা চাপা রইল না। তিনি ধরাশয্যা নিলেন।

অমিয়মাধব তাঁর কাছে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে বোঝালেন, 'দ্যাখো, সত্যিই কি আর ইচ্ছামৃত্যু! মরতে আর কার সাধ? তবে মরতে হবেই এটাও তো ঠিক। সেই সময়টাই শুধু আমি টের পেয়েছি—এই মাত্র। টের না পেলেও মরতুম, তোমরা আতান্তরে পড়তে। তার চেয়ে সবাইকে বলে কয়ে ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি এই ভাল নয়? তুমি ওঠো, এতকাল ঘর করলুম—যাবার সময়টা হাসি-মুখে বিদেয় দাও। যেমন কোথাও বিদেশ যাবার সময় গোছগাছ ক'রে দিতে তেমনিই দাও। আর কদিনই বা—দু-চার মাসের হেরফের বই তো নয়!' ইত্যাদি!—

তাতে মনোরমা যে বিশেষ সান্ত্বনা পেলেন তা নয়। তবে ছেলে-মেয়েরা,

বিশেষ ক'রে বৌয়েরা বোঝাতে লাগল—'হ্যাঁঃ, বলেছেন বলেই কি অমনি সত্যিসত্যিই মরছেন, তা নয়! বলে মুনি-ঋষিরাই জানতে পারে না—তা সাধারণ মানুষ!'

সেটাই বরং কিছু মনে লাগল।

এধারে বিশেষ সময়ও ছিল না। এমন সময়েই চিঠি দিয়েছিলেন অমিয়-মাধব যে ওরা এসে পৌছবার পর মাঝে একটা দিনই যাতে বাকী থাকে।

ত্রয়োদশীর দিন সকালে উঠে যথারীতি চা-টা খেলেন। অপর সকলে যে একটু বিশেষ বিচলিত, একটু উদ্বিগ্ন তা দেখেও দেখলেন না। নিজে বাজারে গিয়ে বেশী ক'রে মাছ আনলেন। মহারাজিনকে বললেন, সকাল ক'রে রান্না সেরে ফেলতে—বারোটার মধ্যে সকলের খাওয়া চোকা চাই। বড় মেয়েকে বললেন, 'মাছের মাথা দিয়ে বাঁধাকপিটা তুই-ই রাঁধ্ মা, আর চাটনিটাও। অনেকদিন খেতে ইচ্ছে হয়েছে!'

সকলেই অস্বস্তি বোধ করে একটা। মেয়ের চোখে জল আসে বার বার—অথচ ঠিক যেন বিশ্বাসও করতে পারে না।

এগারোটা থেকে সকলকে তাড়া দিলেন স্নান ক'রে নেবার জন্যে। এক-সঙ্গে খেতে বসবেন, বারোটার মধ্যে খাওয়া চাই।

সাড়ে এগারোটায় সুহৃদ চৌধুরী এলেন। টেগোর টাউনে থাকেন ভদ্র-লোক—একটু বেলাতেই স্নানাহার করা অভ্যাস—আজ জরুরী তলব গেছে এ বাড়ি থেকে—এখানেই খেতে হবে, এবং বারোটার মধ্যে।

'কী ব্যাপার রায়মশাই?' তিনি প্রশ্ন করেন। সকলের শুকনো মুখ দেখে হকচকিয়ে যান একটু।

'কিছু না। সবাই মিলে বসে খাব একসঙ্গে—এই আর কি!'

খেতে বসে অমিয়মাধব বড় ছেলেকে বললেন, 'তোর মাকে ডাক্ বিলু, একসঙ্গে খাব!'

গৃহিণী এসে বসলেন কিন্তু একগ্রাসও মুখে তুলতে পারলেন না। অমিয়-মাধব বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে খাও গিন্নি, এযাত্রা মনে মনে হচ্ছে এটা তামাশাই হয়ে গেল। যা ভেবেছিলুম, তা বোধহয় আর হয়ে উঠল না!'

আশা ও আশ্বাসের একটা বিদ্যুৎচমক খেলে যায় সকলের চোখে মুখে।

মনোরমার মুখেও আবছা হাসি ফোটে একটা। তিনি অনেকটা সহজভাবে খেতে শুরু করেন।

আহারাদির পর সুহৃদবাবুকে নিয়ে নিজের ঘরে গেলেন বিশ্রাম করতে। কী কথা হ'ল দুজনে কে জানে—ঠিক একটার সময় সুহৃদবাবু ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে সকলকে ডাকলেন, 'তোমরা শিগগির এসো সবাই—রায়মশাই—'

উদ্বেগ তো একটা ছিলই—সকলে ছুটে এল। দেখল অমিয়মাধব মেঝেতে একটা বিছানা ক'রে নিয়ে শুয়েছেন। কিন্তু সে শোওয়া যে স্বাভাবিক শোওয়া নয় তা ঘরে ঢুকেই টের পেল সকলে। তাঁর ইতিমধ্যেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে।

তিনি ইঙ্গিতে সকলকে কাছে ডাকলেন। মনোরমাকে বললেন, 'কাছে এসে হাতটা ধরে ব'সো।' ছেলেদের বললেন, 'তোরা সবাই মুখে গঙ্গাজল দে আর নাম শোনা। কী করতে হবে তা সব বুঝিয়ে দিয়েছি, ঐ আলমারি-টাতে সব লেখাও আছে। সুহৃদকে আমি বিশ্বাস করি, ও খাঁটি লোক। সব ও করবে।'

তারপর চোখ বুজে কী একটা নাম জপ করতে লাগলেন।

গঙ্গাজল আনানোই থাকে—ছেলেরা মুখে গঙ্গাজল দিল, সুহৃদবাবু গীতা-পাঠ করতে লাগলেন—মিনিট পনেরোর মধ্যে অমিয়মাধবের নশ্বর দেহ চির-কালের মতো স্থির হয়ে গেল।

আলমারি খুলতে এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল সুহৃদচন্দ্রের। টাকাপয়সা হিসাব ক'রে ক'রে প্যাকেট করা। একটার গায়ে লেখা 'খইয়ের সঙ্গে ছড়া-বার পয়সা', একটার গায়ে লেখা 'কদিনের হবিষ্য খরচা'। এমনি, শ্রাদ্ধের খরচা, লোকখাওয়ানোর খরচা, ঘাটে ওঠার খরচা—সমস্ত বিভিন্ন প্যাকেট করা। মায় সদ্য শ্মশানঘাটে যা লাগবে কাপড়চোপড় সোনার কুঁচি প্রভৃতি,—তা পর্যন্ত কেনা প্যাকেট-করা রাখা রয়েছে।

সুহৃদবাবু দার্শনিক মানুষ, অল্প সুখদুঃখে বিচলিত হন না—তিনিও একটু চোখের জল মুছে বললেন. 'অদ্ভুত মানুষ কিন্তু রায়মশাই, শ্রাদ্ধের সময় যে ম্যারাপ বাঁধা হবে তার পর্যন্ত দরদস্তুর ক'রে বায়না দিয়ে গেছেন। সব হিসেব

করা—মায় যজ্ঞির কাঠ অবধি আনা আছে। উনি বললেন যে ছেলেরা কখনও কিছু করে নি, ওদের সবাই ঠকাবে, তাই সব ঠিক ক'রে রেখে গেলাম। যা যা ফর্দ ধরেছি, ওর মধ্যেই সব সারতে বলো। বেশী খরচ ক'রে ওরা বিপন্ন হয় সেটা আমার ইচ্ছা নয়।'

যাই হোক, যেমন বলে গিয়েছিলেন ঠিক তেমনি তেমনিই করল ওরা। লোকজন খাওয়ানোতে কিছু বেশী খরচা হ'ল—কারণ ছেলেরা সকলে মিলেই নিমন্ত্রিতের ফর্দটা কিছু বাড়ালো। আর দানধ্যানেও অনেক খরচা হয়ে গেল। সেটা দিলে বড় ছেলে নিজেই। সব খরচার পরও 'অচিন্তিতপূর্ব খরচা' বলে একটি প্যাকেট ছিল, সেটা খুলে দেখা গেল তাতে মোট দুশোটি টাকা আছে —বাড়তি লোক খাওয়ার খরচাটা তাতেই কুলিয়ে গেল।

বেশী লোক যে বলতে হ'ল তার কারণ এলাহাবাদের বহুবিস্তৃত ও বহু-বিক্ষিপ্ত বাঙালীসমাজ কদিনে ভেঙে পড়লেন ওঁদের এই বাড়িতে—অমিয়-মাধবের এই ইচ্ছামৃত্যুর খবর শুনে। বায়রানা, নয়া বায়রানা, আতরসুইয়া, মুঠীগঞ্জ, লুকারগঞ্জ, দারাগঞ্জ, নয়া কাটরা, কর্নেলগঞ্জ, টেগোর টাউন, কোন পাড়া বাকী রইল না। সকলেরই মনে এক কৌতূহল, মুখে ঐ এক জিজ্ঞাসা: 'এ কি সত্যিই?' 'এও কি সম্ভব?' 'এই কলিকালে—?'

কাজেই বহুকাল যাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, যাদের বাদ দেওয়া চলত অনায়াসে, তাদের সঙ্গে নতুন ক'রে পরিচয় ঝালানো হয়ে গেল। নতুন অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েও গেল এই উপলক্ষে। ছেলেরাও এটা বেশ যেন উপভোগ করছিল—এই ভিড় ক'রে শহর ভেঙে খবর নিতে আসাটা। বিশেষ ক'রে যে তৃতীয় পুরুষের দল বুড়োর ভীমরতি ভেবেছিল তাদের উৎসাহটাই বেশী। তাদের দাদু যে এদের চোখে বিশেষ এক ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন —এতগুলো লোকের সম্মান ও বিস্ময়ের পাত্র—তার জন্যে তারাও নিজেদের একটা প্রতিফলিত কীর্তির অধিকারী ভাবছিল। ফলে, এই মদিরা পান ক'রে সাধারণ মাতালদের মতোই তারা যদি কিছুটা বেহিসেবী ও অমিতব্যয়ী হয়ে ওঠে তো বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। এতবড় একটা লোকের মৃত্যুতে অন্ততঃ এখানকার প্রবাসী বাঙালীসমাজও যদি সকলে নিমন্ত্রিত না হন, তা'হলে লজ্জার কথা হয়ে দাঁড়ায় বৈকি।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে সমস্ত উত্তেজনাটা থিতিয়ে এল—তখন সকলকার মনেই স্বাভাবিক প্রশ্নটা মাথা তুলল : অমিয়মাধব কি রেখে গেলেন এবং কে কী পেল ?

সেও একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া ছিল বৈকি !

নিয়মভঙ্গের পরের দিনের পরের দিন সুহৃদবাবুই সীল-করা উইলের খাম খুলে উইল পড়ে শোনাবেন সকলকে। তারপর প্রোবেটের ব্যবস্থাও তিনিই করবেন। সে খরচাও অমিয়বাবু রেখে গেছেন। কোন উকীল রেজেস্ট্রী করেছেন —তাঁর কাছে গেলেই কাজের সুবিধা হবে—তাঁরও নামধাম বিবরণ পৃথক খামে মুড়ে লিখে রেখে গেছেন অমিয়মাধব।

অতএব যথানির্দিষ্ট দিনে ও যথানির্দিষ্ট সময়ে—অর্থাৎ বেলা তিনটের সময় সুহৃদবাবু এলেন উইল পাঠ করতে। শেষ যজ্ঞি চুকে যাবারও পর পুরো একটি দিন কেটে গেছে—ঘরবাড়ি সাফ-সুতরা হয়ে গেছে, হিসেবপত্রও গেছে মোটামুটি চুকে—এখন সকলেরই নিরুদ্বেগ অবস্থা। শোকও অনেকটা মন্দীভূত। কৌতূহল প্রবল তো বটেই—সে কৌতূহল প্রকাশ করতেও সংকোচের কারণ নেই। সকলে বেশ ঘনীভূত হয়েই সুহৃদবাবুকে ঘিরে বসলেন।

চা পান শেষ করে সুহৃদবাবু উইলের খামের সীলমোহর ভাঙলেন। সংক্ষিপ্ত উইল। মোট বিষয়সম্পত্তি অর্থাৎ বাড়ি, জমি, নগদ টাকা, সেভিংস সার্টিফিকেট প্রভৃতির বিবরণ দিয়ে তিনি এই ভাবে তা ভাগ করবার নির্দেশ দিয়েছেন : তাঁর এই বসতবাড়ি তাঁর অবর্তমানে মনোরমা পাবেন নির্ব্যূঢ়স্বত্বে অর্থাৎ দানবিক্রয়ের অধিকার পুরোই থাকবে। যদি কোন উইল না করে তিনি মারা যান তো তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকারীরাই তা পাবে। এ ছাড়া নগদ টাকাও সব তাঁর। সেভিংস সার্টিফিকেট ও কোম্পানির কাগজগুলি পাবে তাঁর মেয়ে। বড় ছেলে পাবে জর্জ টাউনের বাড়ি ও অবশিষ্ট যা সামান্য চাষের জমি তিনি বেচতে পারলেন না—তাও। মেজ ছেলে পাবে নয়া বায়রানার বাড়ি—সেজ ও ছোট আতরসুইয়ার পাশাপাশি দুখানা বাড়ি—তা ছাড়া ছেউকীতে তাঁর যে বাগানখানা আছে তাও ওরা দুজন ভাগ করে নেবে। এ সব বাদে বাকী থাকে আর একটি মাত্র বাড়ি—কর্নেলগঞ্জের নতুন বড় বাড়িটা, সেটা

পাবেন শ্রীমতী তরু মল্লিক। এ ছাড়া পুরনো চাকরবাকরদের কী কী দিতে হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত ফর্দ দিয়ে উইল শেষ করা হয়েছে।

উইল পাঠ শেষ হবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত পাঠক ও শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। যাকে বলে একটি ছুঁচ পড়লেও শব্দ পাওয়া যায় এমনি নিস্তব্ধতা। ঘরের মধ্যে বড় ঘড়িটা চলবার শব্দই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে। বাইরে বহুদূর রাজপথ দিয়ে অগণিত সাইকেল রিক্‌শার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কোথায় কে আছড়ে আছড়ে কাপড় কাচছে। কী একটা পাখী ডাকছে কট্ কট্ ক'রে। যে শব্দ কখনও লক্ষ্যে আসে না সেই শব্দগুলোই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেন।

কিন্তু এসব কোনও দিকেই কারুর কান নেই। ঘরে উপস্থিত সকলেই নিজের নিজের মনের গহনে ডুব দিয়েছেন।

তরু মল্লিক!

তরু মল্লিককে একখানা গোটা বাড়ি দিয়ে গেলেন!

সব চেয়ে নতুন এবং বড় বাড়িটা!

আশ্চর্য! তরু মল্লিক যে দীর্ঘদিন এঁদের কারুরই স্মৃতির মধ্যে ছিল না। এবং অমিয়মাধবেরও স্মৃতি থেকে মুছে গেছে বলে সকলের ধারণা ছিল।

আর যদি না মুছে থাকে তো সুগভীর ঘৃণার সঙ্গেই গেঁথে থাকবার কথা ঐ নামটা তাঁর মনের মধ্যে।

অথচ—সেই ঘৃণা ও বিস্মৃতির বদলে—এ কী!

ইংরেজীতে বলে শেষ কিন্তু নগণ্য নয়—এ যে তাই হল। উইলের এই শেষ নির্দেশটিই যে সর্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠল সকলের মনের মধ্যে।

তরু মল্লিক!

ছোটরা না জানুক—মনোরমা ও তাঁর ছেলেমেয়েরা জানেন বৈকি সে কেলেঙ্কারির কথা। ছেলেমেয়েরা শুনেছে, মনোরমা দেখেছেন। অনেক-কালের ব্যবধানে স্মৃতিটা ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে—দূরত্বের ধূলিতে ঢাকা পড়ে গেছে অতীতের সে পৃষ্ঠা কটা—তবু মুছে যায় নি কিছু সত্যসত্যই। আজকের এই বিস্ময়ের দমকা বাতাসে ধূলি ধূম সরে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সে ইতিহাস এদের সকলের মনেই।

আত্মীয় ?

না, খুব নিকট আত্মীয় কেউ নয়। বোনের জা। ভগ্নীপতির ভাইয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে এমনই পছন্দ হয়েছিল যে একেবারে কথা দিয়ে এসেছিলেন তাঁদের। কাজটা ভাল করেন নি, কারণ তাই নিয়ে বিষম অশান্তি হয়েছিল দুই বাড়িতেই। এ পক্ষের বড় বেশী আগ্রহ বুঝে পাত্রীপক্ষ একেবারেই হাত গুটিয়ে ফেলেছিলেন, যা তাঁরা সহজেই দিতে পারতেন তাও দিতে রাজী হন নি। তাঁদের এই অশোভন জিদের ফলে পাত্রপক্ষও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বিয়ে ভেঙেই যেত—এবং কথা দিয়ে আসার জন্যে অমিয়মাধবও অপমানের একশেষ হতেন যদি না শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের পকেট থেকে পাঁচশটি টাকা পাত্রপক্ষকে গুণে দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতেন। অবশ্য সেই উপলক্ষ্যে মিছে কথা বলতে হয়েছিল বিস্তর—নইলে পাত্রপক্ষ এভাবে টাকা নেবেন কেন ?—বলতে হয়েছিল যে, পাত্রীর মামা বেগতিক দেখে এই টাকাটা তাঁকে দিয়ে গোপনে পাঠিয়েছেন এবং অনুনয় করেছেন যে ভাবী বেয়াই যেন এই নিয়েই প্রসন্ন হন। এমন পাত্র হাতছাড়া হয় দেখে তরুর মা—তাঁর বোন ধরাশয্যা নিয়েছেন অথচ এধারে তরুর বাবারও গোঁ, বিয়ে হোক বা না হোক তিনি আর এক পয়সা বেশী বার করবেন না। বোনের চোখের জল সহ্য করতে না পেরেই ভদ্রলোককে এই পথ নিতে হয়েছে—বেয়াই মশাই যেন মাপ করেন—এবং এ কথাটা যেন দয়া ক'রে তাঁর ভগ্নীপতি বা পাত্রীর বাবাকে না বলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অবশ্য কথাটা চাপা থাকে নি। বিয়ের মাস কতকের মধ্যেই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। শুনে দু'পক্ষই যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হয়েছিলেন। পাত্রপক্ষ অর্থাৎ তাঁর বোনের শ্বশুর টাকাটা ফেরত দিতে এসেছিলেন—তরুর বাবাও মাসিক কিস্তিতে টাকাটা শোধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অমিয়মাধব তা নেন নি। বলেছিলেন, 'ও টাকাটা আমি তরুকে যৌতুক দিয়েছি, সেও তো আমার এক বোন। দিতে হয় তাকেই দেবেন।'

বলা বাহুল্য তা কেউ দেন নি। কিন্তু এই ইতিহাস প্রকাশ হয়ে যেতে মেয়ে মহলে যে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়, সেটা অত সহজে থামে নি। প্রথম বিস্ময়ের স্তব্ধতা কাটবার পরই হাসিঠাট্টার ঝড় ওঠে একটা—সে ঝড়ের

সবটাই নির্মল বাতাস নয়, তাতে ধূলিমালিন্যও কিছু ছিল। তরুকে এই অত্যধিক ও অশোভন ভাল লাগার মূলে কোন্ অস্বাভাবিক মনোভাব থাকা সম্ভব, সেটা বিচার করতে গিয়ে আলোচনাটা যে সব সময় শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি, সেটা সহজেই অনুমেয়।

অবশ্য এ ঝড়ে কখনও কখনও কান মাথা গরম হয়ে ওঠবার কারণ ঘটলেও অমিয়মাধবকে খুব বিচলিত করতে পারে নি। তাছাড়া তিনি তখন নিজের কর্মের ঘূর্ণিতে কেবলই নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন—এ কথার ঝড় সে ঘূর্ণি ভেদ করে বিশেষ স্পর্শও করত না তাঁকে।

তবে তরু মল্লিক-পুরাবৃত্তের সেটা শুরু মাত্র, শেষ নয়।

ওদের বিয়ের বছর দুই পরে হঠাৎ খবর এল তরুর স্বামী নগেন মল্লিক বিষম অসুস্থ। নগেন ডুয়ার্সে-এর কোন চা-বাগানে ডাক্তারি করতেন, সেইখানেই কালাজ্বরে ধরে। প্রথম প্রথম অত গ্রাহ্য করেন নি—কিন্তু পরে অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে, কলকাতার হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে হয়। মাস দুই হাসপাতালে থাকার পর ছুটি পেয়েছেন বটে কিন্তু এখনও জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় আছেন, জীবন সম্বন্ধে এখনও কোন নিশ্চয়তা নেই। ক'মাস চিকিৎসাতে পয়সাকড়িও সব শেষ হয়ে এসেছে—এখন কোন ভাল জায়গায় চেঞ্জে যাবেন সে ক্ষমতা নেই। অমিয়মাধবের ভগ্নীপতিও ছাঁপোষা মানুষ—চিকিৎসার জন্যে যেটুকু দিয়েছেন ধার করেই দিয়েছেন। এখন যদি অমিয়মাধব দয়া করে ওদের স্বামী-স্ত্রীকে একটু আশ্রয় দেন তো হয়তো নগেনের জীবনটা রক্ষা পায়।

অমিয়মাধব তখন ঝাঁসিতে কী সব সরকারী বাড়িঘর তৈরি করাচ্ছেন। তাঁর জব্বলপুরের বাসা একেবারেই খালি। মনোরমা ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁর আর একটি শিশু আসন্ন। সুতরাং অমিয়মাধব সানন্দেই ওদের আসতে বললেন। কিন্তু ওরা জব্বলপুরে আসতে দেখা গেল যে শুধু দুজনে ওখানে থাকবে—নগেনের শারীরিক অবস্থা তেমন নয়। অথচ এসে পড়েছে যখন তখন আর ফেরানো যায় না—অগত্যা অমিয়মাধব ঝাঁসিতে একটা বাসা ভাড়া করে ওদের সেখানেই নিয়ে গেলেন।

দু মাসের বেশী থাকবার কথা ছিল না কিন্তু বেশ কয়েক মাসই রাখতে

হ'ল ওদের, কারণ ওখানে গিয়েই নগেন আবার বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবস্থা এমন সংকটাপন্ন হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত টেলিগ্রাম ক'রে বোম্বে থেকে বড় ডাক্তার আনাতে হ'ল একজন। সে ধাক্কা সামলে উঠে শরীরে বল পেতে পেতে চার পাঁচ মাস পেরিয়ে গেল। ততদিনে অবশ্য মনোরমা জব্বলপুরে ফিরে এসেছেন কিন্তু এত কাণ্ডের পর আবার সেখানে এই রোগীর হাঙ্গামা টেনে নিয়ে যেতে অমিয়মাধবের মন চাইল না। তাছাড়া খরচ প্রচুর হচ্ছিল— সেটা মনোরমার চোখের সামনে হলে তিনি মোটেই প্রীত হবেন না—কিছু কিছু অপ্রিয় শব্দের বাণ এদের ওপর নিক্ষেপ করবেনই। এত দিনই যখন কেটে গেছে তখন অল্প কদিনের জন্যে আর ব্যাপারটাকে তেতো ক'রে লাভ কি?

অবশ্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী খরচ করতে দেয় নি তরু। বাস্তবিক তার পরিশ্রম করবার শক্তি দেখে অমিয়মাধব রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন। সংকটাপন্ন রোগীর সেবা, দিনের পর দিন রাত্রি জাগরণ, তার ওপর রান্না চা জলখাবার যোগানো—সব একা একহাতে করত তরু। একটা ঝি ছিল শুধু বাসন-মাজা ঘর-মোছার জন্যে। তাও অমিয়মাধব জোর ক'রে রেখেছিলেন, কিছুতেই ছাড়াতে চান নি তাই—নইলে সেটাও সে-ই করতে চেয়েছিল। মহারাজিন রাখবার প্রস্তাবে বলেছিল, 'রাখতে চান রাখুন—আপনার রান্না করবে। আমার হাতে আপনার খেতে ঘেন্না করে সে আলাদা কথা কিন্তু আমরা দুজন মহারাজিনের হাতে খেতে পারব না।'

এরপর আর মহারাজিন রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

সংসার অবশ্য ছোটই কিন্তু খাওয়ার লোক কম ছিল না,—অমিয়মাধবের কেরানী, ওভারসীয়ার, মিস্ত্রীর ঠিকাদার, বহু লোকই নিশ্চিন্ত নিরাপদ ও উত্তম আহারের লোভে এসে জুটেছিল একে একে। চা যে কতবার করতে হ'ত তার সীমাসংখ্যা নেই। কিন্তু এ সব ভারই হাসিমুখে হাতে তুলে নিয়েছিল তরু—স্বেচ্ছায় শুধু নয়, সাগ্রহে।

এরই মধ্যে একদিন প্রসন্ন আকাশের কোণে মেঘের আভাস দেখা দিল।

নগেন অমিয়মাধবকে রাস্তায় ডেকে নিয়ে গিয়ে দারুণ উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'দাদা, এদিকে যে এক গুরুতর ব্যাপার চলছে—সে সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন কি?'

অমিয়মাধব কথাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে তা ঠিক বুঝতে না পারলেও নগেনের কথা বলার ধরনে এবং তাঁর উত্তেজিত আরক্ত মুখ দেখে বেশ একটু শঙ্কিতই হয়ে উঠলেন।

'কই না তো! কী ব্যাপার?'

'আপনার বোনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন এর ভেতর—ভাল ক'রে? ওর দৈহিক অবস্থা কিছু লক্ষ্য করেছেন?'

'দৈহিক অবস্থা? মানে—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তো!'

'আপনারা এত তাড়াতাড়ি বুঝতেও পারবেন না। তবে এল.এম.এস-ই হই আর যাই হই—আমি ডাক্তার, আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। অন্ততঃ চারটি মাস ক্যারি করছে ও। তার মানে আমি যখন প্রায় মৃত্যু-শয্যায়—। আর তাই বা কি, অসুখ করে ইস্তক আজ পর্যন্ত বিশ্বাস করুন দাদা, ওর সঙ্গে আমার ওরকম কোন সম্পর্কই হয় নি।

স্তম্ভিত হবারই কথা। স্তম্ভিত হয়েছিলেনও অমিয়মাধব। বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখ। অনেকক্ষণ পরে অতিকষ্টে বলেছিলেন, 'তার মানে—আমি তো এসব কিছুই বুঝতে পারছি না নগেনবাবু!'

'কী ক'রে বুঝবেন দাদা, কাজপাগলা লোক আপনি—কাজের বাইরে আর কোন খবরই তো রাখেন না, তাছাড়া আপনার দেবতুল্য চরিত্র, এসব নোংরামির কথা আপনার মাথাতেও ঢুকবে না। কিন্তু তবু আপনাকেই এর যা হয় বিহিত করতে হবে। কথাটা মাথায় যাওয়া ইস্তক এমন রক্ত চড়ে গেছে যে, সমস্ত শরীর এখনই ঝিমঝিম করছে—দুর্বল শরীর, য়্যাপোপ্লেটিক স্ট্রোক না হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রে তো একটা খুনজখম হয়ে যাওয়ারই কথা—অথচ দেখলেন তো দাদা কী সেবাটাই করলে সে—ভাল না বাসলে এই ছ-সাত মাস ধরে এমন সেবা কেউ করতে পারে? যমের সঙ্গে যুদ্ধ করা যাকে বলে তাই করলে ঠিক। না দাদা, আমি আর ভাবতে পারছি না। ভোরবেলা পেটে হাত দিয়ে দেখা পজ্জন্ত কী যে হচ্ছে শরীরে—'

নগেন মল্লিক রাস্তার ওপরেই বসে পড়লেন বলতে বলতে।

অতঃপর হৈ-চৈ ছুটোছুটি—ডাক্তার ডাকা। সারাদিনই অজ্ঞান হয়ে রইলেন তিনি। সন্ধ্যায় যখন জ্ঞান হল তখন তরুকে দেখতে পেলেন না।

প্রশ্ন করতে উত্তর পেলেন সে কাজে ব্যস্ত আছে। অমিয়মাধব মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'আপনি শান্ত না হলে তার কথা বলব না কিছু। তার দেখাও পাবেন না।'

পরের দিন সকালেই নগেন সুস্থ ও শান্ত হয়ে উঠলেন কিন্তু তরুর আর দেখা পেলেন না। পেলেন এক টুকরো চিঠি। তাতে লেখা ছিল :

"শ্রীচরণেষু

তোমার আশঙ্কাই সত্য। তোমার অনুমানও। এর পর আর আমার মুখ দেখা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়—তাই আমিই সরে গেলাম। আগেই যাওয়া উচিত ছিল হয়ত, যেতামও। শুধু—এইটুকু বিশ্বাস করো, তোমার শরীরের কথা ভেবেই যেতে পারি নি। কথাটা পরিহাস শোনাবে—তবু সত্যি। এরকমও হয়। তোমার সেবা করেছি সেটা তুমি স্বীকার করেছ—যদি সত্যিই মনে করো যে আমার সে বাবদ কিছু পাওনা আছে তাহলে আমাকে ক্ষমা করার চেষ্টা ক'রো। তুমি সেরে উঠেছ, আর আমাকে দরকারও নেই। তুমি দেশে ফিরে গিয়ে আর একটি বিয়ে ক'রে সুখী হও। ওদের ব'লো যে কলেরায় আমার মৃত্যু হয়েছে। প্রণাম নিও।— ইতি—

অভাগিনী

তরু"

নগেন আর কোন প্রশ্ন করেন নি। কোথায় গেল, কীভাবে গেল তরু তাও জানতে চান নি। তবে দিনকতক পরে কার কাছে যেন শুনেছিলেন যে সেই দিন থেকে অমিয়মাধবের তরুণ ওভারসীয়ারটিকেও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অতঃপর কার্যকারণ সম্পর্কটা অনুমান করতে বিলম্ব হয় নি।

কয়েকদিন পরেই নগেন দেশে চলে গেলেন। তবে তিনি আর বিবাহ করেন নি। শুধু তাই নয়—যে রকম আশ্চর্যজনক শান্তভাবে তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছিলেন তাতে মনে হয়—অবিশ্বাসিনী স্ত্রীকে তিনি ক্ষমাই করেছিলেন শেষ পর্যন্ত।…

এর পর দীর্ঘকাল আর তরুর কোন খবর পাওয়া যায় নি। কুলত্যাগিনী অসতীর খবরের জন্য খুব ব্যগ্রও ছিল না কেউ। ওর আত্মীয়স্বজনরা কায়মনো-বাক্যে সেদিন বরং এই প্রার্থনাই জানিয়েছিলেন যে আর কোনও দিন যেন ওর

কোন খবর পাওয়া না যায়।

কিন্তু সে প্রার্থনাও ঈশ্বর শোনেন নি। নগেন মারা যাবারও অনেক পরে খবর পাওয়া গেল যে তরু কাশীবাস করছে। নিষ্ঠাবতী বিধবার বেশ তার, আচরণও কঠোর আচারপরায়ণা বিধবার মতোই। তপজপ দেবদর্শন ও হবিষ্য-গ্রহণ এই ভাবেই তার দিন কাটে। বহুকালের কথা তবু কথাটা শুনে ঘৃণা আর তীব্র বিদ্রূপে এদের সকলেরই ওষ্ঠ বক্র হয়ে উঠেছিল—সে ঘৃণা আর বিদ্রূপ শব্দে আত্মপ্রকাশ করতেও বিলম্ব হয় নি। কিন্তু তরু তা গ্রাহ্যও করে নি—আজও করে না। যেন কাউকেই তার কোন পরোয়া নেই—এক বিশ্বনাথ ছাড়া।

এই তরু মল্লিক!

একেই অমিয়মাধব তাঁর নতুন কেনা সবচেয়ে ভাল বাড়িটা নিব্যূঢ়স্বত্বে দান ক'রে গেলেন!

অনেকক্ষণ সবাই চুপ ক'রে রইলেন। নিঃশব্দে বসে রইলেন সবাই। নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না কারুর। শুধু ঘড়িটা টিকটিক করছিল একভাবে, আর বাইরে থেকে ভেসে আসছিল সাইকেল রিক্‌শার প্যাঁক প্যাঁক শব্দ এবং কোথায় যেন একটা কাপড় আছড়ানোর আওয়াজ।

অনেকটা পরে সুহৃদবাবুই আবার কথা কইলেন। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, 'এর সঙ্গে একটা চিঠিও আছে দেখছি, খামে আঁটা। ওপরের শিরোনামাটাও অদ্ভুত, "আমার স্ত্রীপুত্র-কলত্র সমীপে।" এ চিঠির কথা তো কিছু বলে যান নি! এটা দেখবে না কি ছোড়দি?··· লেখা আছে "উইল পড়া শেষ হইলে পঠিতব্য"। দেখবে—কী লেখা আছে?'

অতিকষ্টে মনোরমার কণ্ঠস্বর ফুটল। বললেন, 'তুইই পড়্‌, সুরো—পড়ে শোনা। সকলকার জন্যেই যখন—'

অগত্যা সুহৃদবাবুই খাম ছিঁড়লেন।

অমিয়বাবুর কাঁপা-কাঁপা স্বহস্তে লেখা চিঠি। কোন সম্বোধন নেই, কতকটা স্টেটমেন্ট ধরনে লেখা।

লিখছেন : "আমার উইলে তরু মল্লিককে একটি বাড়ি দেওয়ার কথা আছে। কথাটায় আমার আত্মীয়মহলে একটা বিস্ময়ের ঢেউ উঠিবে তাহা জানি। তবে সে জন্য আমার এ চিঠির অবতারণা নয়, কারণ সর্বদা তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে আমি বাধ্য নই।

"এ চিঠি লিখিতেছি অন্য কারণে। কখনও অকারণে মিথ্যা কথা বলি নাই এই একটা অহঙ্কার ছিল। আইনতঃ এ অহঙ্কার আজও করিতে পারি কারণ জীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যাটা—মিথ্যা কথা না হউক মিথ্যাচরণ তো বটেই—সেটাও অকারণে করি নাই। প্রাণরক্ষার্থ মানরক্ষার্থ মিথ্যা কথা বা মিথ্যাচরণে পাপ নাই—শাস্ত্রেই সে কথা স্বীকার করে। তবু আমার মানরক্ষার্থ আর একজনের মাথায় মিথ্যা ও অপমানের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছি—এ অপরাধেরও মার্জনা নাই। আজ এতকাল পরে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে গিয়া দেখিতেছি যে, এই অপরাধটা পর্বতপ্রমাণ হইয়া জীবনের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, এ বোঝা নামাইতে না পারিলে ছুটি মিলিবে না। অর্থাৎ মরা হইবে না।

"সংক্ষেপেই বলি, কারণ সত্যই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। দেহে তো বটেই—মনেও। যে অপরাধের জন্য তরুকে সেদিন গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছিল সে অপরাধ আমার—তাহার নহে। একদিন রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হাতের কাছে পাইয়া গুণ দেখিয়া আরও মুগ্ধ হইলাম। মুগ্ধ শব্দটা শুধু কথার কথা হিসাবে ব্যবহার করি নাই, সত্যই এক নিদারুণ মোহ পাইয়া বসিয়াছিল। এমন অক্লান্ত স্বামীসেবা, এমন সুনিপুণ গৃহিণীপনা, সকলের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য এমন সজাগ সতর্ক দৃষ্টি—এ আর কখনও চোখে পড়ে নাই। সব দিক দিয়াই তরু রমণীরত্ন কিন্তু সে রত্ন যে জোর করিয়া ভোগ করা যায় না—মোহের বশে সে কথাটাও ভাবিবার অবকাশ পাই নাই। তাই গভীর রাত্রে রুগ্ন স্বামীর শয্যাপার্শ্ব হইতে জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে বাধে নাই। সেও যে খুব বাধা দিতে পারে নাই তাহার কারণ তাহার সম্মতি নয়—কৃতজ্ঞতা। আমি তাহার বিবাহের জন্য যাহা করিয়াছিলাম তাহা সে জানিত, এখন তাহার স্বামীর জন্য যাহা করিতেছিলাম তাহা তো সে চোখেই দেখিতেছিল। তাই হতবুদ্ধির মতোই কতকটা চুপ করিয়া-

.ছিল সে, চেঁচামেচি করিয়া লোকজন ডাকিয়া এতবড় দুষ্কৃতকারীকে তাহার প্রাপ্য শাস্তি দিতে পারে নাই।

"দিতে পারে নাই সেদিনও, যেদিন নগেনবাবু ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন। সেদিন আমাকে বাঁচাইতে সে-ই নিজের মাথায় এই নিদারুণ কলঙ্কের বোঝা লইয়া গৃহত্যাগ করিল। আমার গুভারসীয়ার শঙ্করীপ্রসাদকে মোটা টাকা দিয়া সরাইয়া দিবার বুদ্ধিটা পরে আমার মাথায় আসিয়াছিল। আমি যে বাঁচিয়া গেলাম, তখন সেই স্বস্তিটাই আমার কাছে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল যে তরু মল্লিকের আত্মত্যাগের পরিমাণ ও সম্যক অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই।

"যখন পড়িল তখন অবশ্য তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করার কম চেষ্টা করি নাই। অবশেষে যখন খোঁজ পাইলাম তখন সে বিধবা হইয়াছে। সে খবরটাও সে আমার কাছ হইতেই পাইল। গুজরাটের এক দেবমন্দিরে দাসীর কাজ করিত সে। আমার অনুনয় বিনয়েই সে কাশীতে আসিয়া থাকিতে রাজী হইল। নগেন আর বিবাহ করে নাই—সেই খবরটাই তাহার বেশী বাজিয়াছিল সেদিন। স্বামী যে অমন অপরাধিনীকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন সে কথা শোনার পর সে আর নিজেকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া চলিতেছে সে আজও—কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া। চিরদিন আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে-ই করিয়া গেল, তবু আমাকে কোন দিন কড়া কথা বলে নাই। আজ, এই মৃত্যুর সামনে দাঁড়াইয়া সন্দেহ হয় যে—স্বামীর প্রতি প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র কারণে হয়তো এই ঘৃণ্য জীবটা সম্বন্ধেও কোথায় এতটুকু স্নেহ ছিল তাহার অন্তরে!

"কাশীতে তাহাকে সুখে রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু তরু রাজী হয় নাই। কোন রকমে প্রাণধারণের মতো যেটুকু দরকার সেইটুকুই সে লইয়াছে। তাহার—তাহার কেন আমারও—সন্তানকে সে একদিন অর্থাভাবে বাঁচাইতে পারে নাই, এ জন্য আমার দেওয়া সুখের অন্ন তাহার বিষ লাগিবে বুঝিয়া আমিও পীড়াপীড়ি করি নাই। যেটুকু লইয়াছে সেটুকুর জন্যও তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে আর কোনদিন তাহার সামনে যাইব না বা চিঠি লিখিব না। তবে যদি তাহার আগে আমি মরি তো সে যেন আমাকে ক্ষমা

করে এবং সেই মরণের মুখে যদি তাহাকে কিছু উপহার দিতে চাই তো সে দয়া করিয়া সেটুকু যেন গ্রহণ করে—সেদিন করজোড়ে এই অনুনয় জানাইয়াছিলাম ; তাহাতে সে চুপ করিয়া ছিল। সেই ভরসাতেই বাড়িটা তাহাকে লিখিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি।

"মনোরমা ও ছেলেমেয়েরা আমাকে ক্ষমা করিবে না তাহা জানি। এতটা গর্হিত অপরাধ—এতখানি প্রতারণা ও অপমানের পরে ক্ষমা চাহিয়া নাটক করিতেও চাই না। তরু আমাকে বহুদিনই ক্ষমা করিয়াছে, সেইটুকুই ইহলোকে ও পরলোকে আমার বড় সম্বল। তবে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াইতে আমার ভয় নাই—যে প্রবৃত্তির জন্য এমনটা হইল, সেটাও তো তাঁহারই দেওয়া। তিনিই কি এজন্য দায়ী নন? ইতি—

হতভাগ্য
অমিয়মাধব।"

জীবন্মৃত রহস্য

সংবাদটা অনেকেরই চোখে পড়ে নি, পড়বার কথাও নয়। প্রথমত এমন এক অবজ্ঞাত প্রান্তে ছাপা হয়েছিল—এত ক্ষুদ্র, এত সংক্ষিপ্তভাবে—যেখানে চোখ যদিবা পড়ে, দৃষ্টি পড়ে না। বর্তমানে সংবাদপত্র ছাপা হয় প্রধানত বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্যে। পৃষ্ঠাসংখ্যা সীমিত, তার মধ্যে বিজ্ঞাপন ছেপে যেটুকু স্থান বাঁচে তাতে উত্তেজক রোমহর্ষক সংবাদ (কাব্যধর্মী ভাষায় লেখার জন্যে তাও কিছু দীর্ঘ হয়ে যায়), গরম সম্পাদকীয় ইত্যাদিতেই ভরে যায়—রাজনীতিক কেউ পরলোকগমন করলে কিছু বেশী স্থান দিতেই হয়—কোন এক ভুলে-যাওয়া লেখকের মৃত্যুসংবাদ ছাপার স্থান কোথায়? তবু তো এখন ফোটো অফসেটের কল্যাণে ক্ষুদ্রতম অক্ষরের ব্যবস্থা হয়েছে। আর সেইজন্যেই এক অবজ্ঞাত নরহরি মল্লিকের জন্যে এই তিন লাইন খরচ করা সম্ভব হয়েছে।

আর, বড় ক'রে খবর দিলেই কি কেউ চিনতে পারত? বুঝতে পারত ব্যক্তিটি কে? না, পারত না। বস্তুত উক্ত নরহরি মল্লিকের মৃত্যু ঘটেছে

আজ থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর আগেই। তিনি যে এতদিন বেঁচে ছিলেন, থাকতে পারেন—তাই কেউ ভাবে নি। অথচ এককালে তাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরত, বইও কাটত রাশি রাশি। তাঁর জনপ্রিয়তা একদা পাঁচকড়ি দেকেও ম্লান ক'রে দিয়েছিল। আজকের ঐ সামান্য খবরটুকু দেখে—"পরলোকে বিখ্যাত লেখক নরহরি মল্লিক। বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয় লেখক নরহরি মল্লিক গত বৃহস্পতিবার রাত্রে উত্তর কলিকাতাস্থ নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৯৩ বৎসর।" —সেদিনের সে অসামান্য খ্যাতি ও সমাদরের কথা কারও মনে পড়া সম্ভব নয়। কারণ সে সময়ের কেউই আজ আর বেঁচে নেই।

স্থানাভাবেই—মৃতের খ্যাতির অভাবেও কতকটা—একটা বড় খবর দেওয়া যায় নি। এই রহস্য কাহিনী লেখকের রহস্যজনক মৃত্যুর সংবাদটা। যিনি এতকাল এ জগতের বাইরে বাস করেছেন, তিনি এতকাল পরে মৃত্যুতে এক রহস্য কাহিনী রচনা ক'রে গেলেন। বিরাট তিনতলা বাড়ির মধ্যে একাই মরে পড়ে ছিলেন—তিন কি চারদিন। পাড়ার লোকে দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিসে খবর দিতে অনেকগুলি দরজা ও কোলাপ্‌সিবল গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে তারা ঐ গলিত শীর্ণ দেহ উদ্ধার করেছে।

তার অর্থ? বলছি। তবে সে রহস্য বুঝতে হলে অন্তত পঞ্চান্ন বছর আগে ফিরে যেতে হয়।

নরহরি মল্লিক শ্বশুরের অর্থে পরপর দু-তিনটি ব্যবসায় ফেঁদেছিলেন। বলা বাহুল্য কোনটাতেই কিছু সুবিধা করতে পারেন নি। শেষে শ্বশুরমশাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে এক প্রায় অচল (এবং অনড়ও) পুরনো ছাপাখানা জলের দামে কিনে দিয়ে বলেছিলেন, 'যদি এতেই ক'রে-খেতে পারো তো খাও, আর আমার কিছু করার নেই। তোমার মতো অপদার্থ লোকের জন্যে আমি এক পয়সাও খরচ করতে রাজী নই। আমার আরও ছেলেমেয়ে আছে।'

সে প্রেসকে সচল করতে অবশ্যই আরও টাকা বার করতে হল। চেয়ার টেবিল পেতে একটি কম্পোজিটার ও একটি জমাদার নিয়ে সাজিয়ে বসলেনও,

সে সবদিকে কোন ত্রুটি ঘটল না, অসুবিধা হল খদ্দেরের সমাগম না হওয়ায়।

একদিন এইভাবে শূন্য প্রেসঘরের সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে ভাবছেন এবার কি করবেন—দুটো রাস্তা খোলা আছে, এক সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে পালানো, দুই চুরি ডাকাতি করে জেলে যাওয়া—সামনে কে যেন একজন এসে দাঁড়াল। অর্থাৎ চোখটা বাইরে মেলা থাকলেও মনটা ডুবে ছিল চিন্তার গভীরে, সেখান থেকে ফিরিয়ে এনে ভাল ক'রে চাইতে দেখলেন—বিচিত্রমূর্তি একটি লোক।

বিচিত্র যথার্থ অর্থেই। পরনের ধুতিখানা যৎপরোনাস্তি ময়লা এবং সেলাই করা। তার ওপর একটা নতুন পাঞ্জাবি কিন্তু তাতে চা, বোধহয় অন্য কোন পানীয়ের দাগও পড়েছে। খানিকটা লালচে হলুদ রঙ কোলের কাছে। বোধহয় মাংস কি ডিমের কারীর ঝোলের চিহ্ন। পায়ে একটা জরাজীর্ণ চটি, হাতে একটা গামছা জড়ানো কতকগুলো খাতার মতো কি। উগ্র মদের গন্ধ এ পর্যন্ত এসে পৌঁচচ্ছে।

মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'যাও, যাও। এখানে কিছু হবে না। বলে আমি মরি লিক্‌লিকিয়ে—আমার বাড়ি লিকে!'

লোকটা ভ্রূকুটি ক'রে উত্তর দিল, বললে, 'না মশাই, যা ভাবছেন তা নয়। আমি ভিক্ষে চাইতে আসি নি। বিজনেস প্রোপোজিশন নিয়েই এসেছি। হ্যাঁ, মদ খাই, আর তা খেলেই কাপড় জামার এই হাল হবে সে তো জানা কথা। মশাই, মানুষেই মদ খায়, কুকুর বেড়ালে খায় কি? আপনারও যা প্রেসের অবস্থা দেখছি তাতে দুদিন পরে আপনাকেও এই বন্ধুটি ধরতে হবে। সর্বসন্তাপহারিণী বান্ধবী এই সুরা।'

বেশ ভরাট গম্ভীর গলা। শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো কথা বলার ভঙ্গী। বক্তব্যও কোথাও অসংলগ্ন নয়। নেশা করলেও পেঁচো মাতাল নয়।

নরহরিবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, 'না না। তা নয়। ভেতরে আসুন, বসুন। আসলে মনটাই ভাল নয় বলে—। প্রোপোজালটা কি?'

নরহরিবাবু টেবিলের সামনে দরজার ঠিক পাশে অদ্বিতীয় লোহার চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক চেয়ারে জুৎ ক'রে বসে বললেন, 'আপনার প্রেস তো বসেই

আছে। কম্পোজিটার ঢুলছে বসে, জমাদার বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। একটা বই ছাপবেন? মানে পাবলিশ করবেন?'

'আমার তো ট্রিড্‌ল্‌ দেখছেনই। বই ছাপার মতো মেশিন তো নয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, এতেও ছাপা যায়। আট পাতা করে ছাপতে হয়। বরেণবাবু এতে করেই অতবড় লাইব্রেরী চালাচ্ছেন। তবে আপনি যা ভাবছেন তা নয়— কবিতার বই ছাপাতে আসিনি। খরচও আমি করতে পারব না। আমি নভেল লিখি। এককালে ভালই লিখতুম, ছাপাও হয়েছে। গুরুদাসবাবুরাই ছেপেছেন। এখন তো এই হাল—বুঝছেনই। ভাল বই আর কিছু মাথায় যায় না। ভাল ভাল ইংরেজী বই পড়ে তা থেকে না-বলে-নিই, একে বলা চলে য়্যাসিমিলেশ্যন। মিস্টারকে বাবু ক'রে আর কি। কপিরাইটে পড়তে হবে না। গোয়েন্দা কাহিনীই লিখি। এই ছেপেই পাঁচকড়ি দে বড়লোক হয়ে গেল। ভেবে দেখুন। এই দেখুন, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, কায়স্থ সন্তান দলিল ছাড়া কথা বলে না। শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, এককালে ইংরেজী বই লিখেছি, বিলিতি পাবলিশাররা ছেপেছে। হয় না হয় মিলিয়ে নিন, এই বইয়েরই মলাটের পেছনে আমার ছবি আছে—'

ভদ্রলোক গামছার পুঁটুলি খুলে কখানা বই বার করে টেবিলে রাখলেন। সত্যিই একখানা ইংরেজী বই, প্রকাশ করেছে ম্যাকমিলান কোং—তার মলাটের ভাঁজে যে লেখকের ছবি ও পরিচয় আছে, সে ব্যক্তি যে এই লোকটিই তাতে কোন সন্দেহ নেই। শান্তশীল পাল, ভদ্রলোকের নাম। ইনি যে বেশ জনপ্রিয় কিছু বাংলা বইয়ের লেখক, সে কথাও বলা আছে সে বিজ্ঞপ্তিতে।

অকস্মাৎ নরহরির মনে হয়—এ যোগাযোগ ঈশ্বরপ্রেরিত। তিনি বলেন, 'বেশ একখানা খাতা রেখে যান, পড়ে দেখি—'

'তা দেখুন। মোদ্দা শুধু হাতে ছেড়ে যাবো না। যেতে পারব না। কিচ্ছু নেই হাতে। নিদেন পাঁচটা টাকা দিন।'

'তারপর? যদি পছন্দ না হয়?'

'তাহলে অবিশ্যি ও টাকাটা গেল। তবে পছন্দ হবে। গোয়েন্দা বই কিছু পড়েছেন? পড়াশুনোর অব্যেস আছে?'

পড়াশুনোর অব্যেস নেই তেমন, এটা ঠিক। তবু যা পড়েছেন নরহরি—এই রকমের দু-একখানা বইই। দারোগার দপ্তর, পাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত তিন-চারখানা। কাজেই বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, 'তা আছে। তবে অত টাকা দিতে পারব না, হাতে কিছুই নেই। একটা টাকায় হবে?'

অনেক ধস্তাধস্তি ক'রে দু টাকা আদায় ক'রে নিয়ে শান্তশীল চলে গেলেন সেদিনের মতো।

দু-চার পাতা পড়ারই পরই জমে গেলেন নরহরিবাবু। বলতে গেলে এক নিঃশ্বেসেই পড়লেন বাকীটা। তারপর ভাবতে শুরু করলেন। না, বই নিয়ে নয়—ব্যবসা নিয়েই। বই চালাতে গেলে অনেকগুলিই ছাপা দরকার। ভাল করে 'বুম্' করারও। এ লোকটির নাম ক'রে বই ছাপলে—যদি সিরীজ দাঁড়িয়ে যায়—লোকটি দর বাড়াবে। অন্য প্রকাশকরা এসে টানাটানি করবে, সে ক্ষেত্রে ওকেও বাপের সুপুত্র হয়ে সে বাড়তি টাকা গুনে দিতে হবে।

না, সে কোন কাজের কথা নয়।

কাজের কথা যা তাই তিনি করলেন। পরের দিন শান্তশীলবাবু আসতে বললেন, 'দেখুন আপনার বই আমি নিতে পারি। মাসে মাসেই নেব—তবে একেবারে কপিরাইট নেব, আর লেখক হিসেবে আমার নাম থাকবে—আপনার নয়। সেটাও ঐ দলিলে লিখে দিতে হবে।'

একটা হতাশার বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে শান্তশীলবাবুর মুখে। খানিকটা রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে বলেন, 'বেশ, তাই হবে। যে পথে নেমেছি তার এই তো যোগ্য পুরস্কার। নাচারকে কেই বা রেয়াৎ করে। তা কত ক'রে দেবেন?'

নরহরিবাবু ত্রিশ থেকে শুরু করলেন, উনি চাইলেন একশো হিসেবে। বললেন, 'একেবারে এতটা মারবেন না। আখেরটা তো নষ্ট করলেনই—কাগজ-কালি আর ধেনোর দামটা অন্তত দিন!'

অনেক ধস্তাধস্তির পর পঞ্চাশ টাকাতেই রাজী হতে হল শান্তশীল বাবুকে।

স্ত্রী মারা গেছেন। রূপবতী না হলেও গুণবতী, প্রেয়সী স্ত্রী। সেই থেকেই এই নেশা ঢুকেছে। ছেলে একটা আছে, সে দিদিমার কাছে মানুষ হয়। তার

জন্যে মাসে কুড়ি-পঁচিশটা টাকা পাঠাতে হয়। আর উনি, এই বলতে গেলে পথে পথেই কাটান। কখনও কখনও কোন বাল্যবন্ধুর বাড়ি গিয়ে পড়েন, কাপড় জামা সাবানকাচার কি খেউরি হবার দরকার পড়লে। অনেক সময় এক কালী মন্দিরের চত্বরে গিয়ে পড়ে থাকেন—যাতে মদের গন্ধটা না বেমানান লাগে। পয়সা থাকলে রুটি মাংস খান—না হ'লে ঝালবড়া আর বেগুনি ভরসা।

নিজের জীবনযাত্রার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে, আবারও সেই রকম একটা বিচিত্র দুর্বোধ্য হাসি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে তিনখানা পুরো বইয়ের পাণ্ডু-লিপি বুঝিয়ে দেন। নরহরির অবশ্যই তখন পুরো দেড়শো টাকা দেবার অবস্থা নয়। কুড়ি টাকা দিয়ে আবার সামনের সপ্তাহে আসবেন বলে দিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই নরহরি মল্লিকের ভাগ্য খুলে গেল। যাকে বলে 'টক অফ দ্য টাউন' তাই হয়ে উঠলেন। সকলেরই বিস্ময়—যার এমন অসাধারণ গোয়েন্দাকাহিনী রচনার শক্তি—সে "এতকাল এত ক্ষুদ্র হয়ে কোথা ছিল ঢাকা!"

বছর কয়েকের মধ্যেই বাড়ি হল, বড় প্রেস হল, একটা জুড়ি গাড়িও হল। বড় ছেলেকে একটা পাস করার পরেই প্রেসে ঢুকিয়ে নিলেন, ছেলে-বেলা থেকে কাজ শেখা দরকার। নইলে ব্যবসা রাখা যায় না। মেজ ছেলেকে বসালেন কাউন্টারে। ছোট ছেলের মাথা ভাল—সে পড়াশুনো করতে লাগল। নরহরির আশা তাকে উকিল করবেন।

কাজ আরম্ভ করার বছর দশেকের পরই শান্তশীল মারা গেলেন। তবে তাতে খুব ক্ষতিবৃদ্ধি হল না নরহরির।

ইতিমধ্যেই খান-কুড়ি বই বেরিয়ে গেছে তাঁর। আরও এগারোখানা পাণ্ডুলিপি করায়ত্ত। ইদানীং অবস্থা বুঝেই—চাপ দিয়ে বই লিখিয়ে নিচ্ছি-লেন। তার জন্যে কখনও কখনও কোন হোটেলে তুলে বিলিতি মালের বরাদ্দ ক'রে, তার সঙ্গে কিছু মাংস বা চপ কাটলেটের যোগান দিয়ে দুদিনে এক একখানা বই শেষ করিয়ে নিচ্ছিলেন। এছাড়াও কিছু খরচ করতে হত তাঁকে। ওঁর ফরমাশমতো বিলিতী গোয়েন্দা বই কিনে দিতে হত। তবে অসামান্য ক্ষমতা শান্তশীলের, তা স্বীকার করতে নরহরি বাধ্য। বই যখন শেষ

হ'ত তখন সাহেবী গন্ধ একটুও থাকত না তাতে।

না, বইয়ের অভাব হয় নি। পয়সারও না। ঈশ্বর মারলেন নরহরিকে অন্য দিক দিয়ে।

কী যে হ'ল ওঁর, মাথার গোলমালই বলতে হবে—উনি এই সব বইয়ের মূল গোয়েন্দা যে কামবক্স সাহেব, তার সঙ্গে একটা একাত্মতা বোধ করতে লাগলেন। বা সেইভাবে নিজেকে তৈরী করতে। এর মূলে নতুন বাজারের যে মাতাল শিল্পীটি ছবি আঁকত—সেই-ই প্রধানত দায়ী। কতকটা রহস্যছলেই সে যেন কামবক্স সাহেবের চেহারাটা 'নরহরি'র আদলে আঁকত। বইয়ের গোড়ায় লেখকের ছবি, অর্থাৎ নরহরির ছবি এবং ভেতরে গোয়েন্দার ছবি দেখে, এসব অসমান্য কীর্তি নরহরি মল্লিকেরই একথা কেউ বলাবলি করত কিনা তা আমাদের জানা নেই—তবে নরহরিবাবুর মনে হত তাই করে। এবং ক্রিমিন্যাল, বিশেষ সাংঘাতিক অপরাধীরা এত বড় শত্রুকে সরিয়ে দেবার জন্যে তৎপর হবে—এ স্বাভাবিক। তিনি সেই ভাবে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

ওঁর পাইকারী কাউন্টার ছিল নতুন বসতবাড়িরই এক তলায়। আগে সেটাকে বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। তার পর শুরু হ'ল, তলায় তলায় সিঁড়ির প্রবেশপথে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট।

তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। শুরু হ'ল সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে। এমন কি দুই ছেলের মহলও আলাদা ক'রে দিলেন একসময়। উনি থাকতেন তেতলায়, সেখানে বহুদিনের সেবক রামবিলাস আর গৃহিণী ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার রইল না। তাও তাঁদেরও তিনদফা তালা পেরিয়ে ওপরে আসতে হত—এবং ওঁকে না জানিয়ে কেউ নিচে যেতে পারত না। কারণ শেষ তিনটি গেটের চাবি থাকত ওঁর কাছেই।

শেষে মনে হতে লাগল ছেলেদেরই বা বিশ্বাস কি? আওরঙ্গজেব, সেলিম শাহ তো ইতিহাসের কথা—আধুনিক কতই কাহিনী তো খবরের কাগজে বেরোচ্ছে।

অতঃপর অনেক ভেবে একটা মতলব ঠিক করলেন। আহিরীটোলা অঞ্চলে কাছাকাছি তিনটি পুরনো বাড়ি সস্তায় কিনে সারিয়েসুরিয়ে নিয়ে

ছেলেদের বললেন, 'ভবিষ্যতে দুই ভাই না ঝগড়াঝাঁটি করে সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা—তোমরা যার যেটা পছন্দ সেইটেতে-ই চলে যাও। তারপর আমি আর কদিন ? এ বাড়ি তো রইলই—তখন যা খুশি করো।'

ছেলেদের একবার মনে হয়েছিল যে বাবার মাথা খারাপ বলে ঘোষণা করার জন্যে তারা আদালতে দরখাস্ত করবে কিন্তু রামবিলাস সাবধান করে দিলে। বললে, 'তাহ'লে তো বাবুর 'সোবে'ই ঠিক প্রমাণ হয়ে যাবে। উনি জোর পাবেন। অন্য দিকে তো পাগল নন, টাকাপয়সার জ্ঞান তো টনটনে। ডাক্তার পাগল প্রমাণ করবে কি ক'রে ?'

অগত্যা তারা চলে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে গেলেন গৃহিণীও।

ছেলে বৌ নাতি নাতনী ছেড়ে একটা পাগলের সঙ্গে এই এত বড় শূন্য বাড়িতে থাকতে রাজী হলেন না—তিনি ছোট ছেলের সঙ্গে গিয়ে উঠলেন তার বাড়িতে। মৃত্যুকালে তাঁর বাবা কিছু টাকা তাঁকে দিয়ে গিছলেন, ছেলে বৌ অযত্ন করবে না—এটুকু জোর ছিল।

এইবার একটু মুষড়ে পড়লেন নরহরি মল্লিক। শ্বশুর-কন্যাই তাঁর লক্ষ্মী—এ ধারণা ছিল।

তবে আর একটা ব্যাপারে জোরও পেলেন। এই তো কেউ কারও নয়—তাই প্রমাণ হয়ে গেল। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।

তাহলে এ বাড়িতে রামবিলাস আর তিনি। তাও, রামবিলাসের সঙ্গেও তিনটে তালার ব্যবধান বজায় রাখতেন। ঘি তেল শীল করা টিন ছাড়া কিনতেন না। রান্না করত রামবিলাস—তেমনি তাকেও ওঁর সামনে এক হাঁড়ি কড়া থেকে খাবার নিয়ে ওঁর আগে খেতে হত। কর্মচারীরা টাকাকড়ি হিসেবপত্র দিত (ছেলেরা আর কথা কইত না)—কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট গলিয়ে রামবিলাসের হাতে। কোন চিঠি লেখার বা চেক সই করার দরকার হ'লে উনিও সেই বন্দোবস্তে নিচে পাঠাতেন।

কিন্তু বিধি বাম। রামবিলাসও একদা মারা গেল।

অবশ্যই আকস্মিক নয়। আমরা যত দ্রুত এ কাহিনী বা ক্রমবিকাশ বিবৃত করলুম তত দ্রুত কিছু ঘটে নি। শান্তশীলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পর বহু বৎসর কেটে গেছে। শান্তশীল মারা গেছেন কবেই—

তারপরও প্রায় ত্রিশ বৎসর কেটেছে। যা বই লেখা ছিল তা সব ছাপার পর আর বই বেরোয় নি। উনি ক্লান্ত, অবসর নিচ্ছেন ঘোষণা ক'রে থেমে গেছেন। ওঁর বয়সও বিস্তর হয়ে গেছে। উনি রামবিলাসের চেয়ে বয়সে বড়ই ছিলেন।

সে যাই হোক—এখন থেকে নিজেই রেঁধে খাবেন ঠিক করলেন। অসুবিধেও নেই। এখন ইলেকট্রিক হয়েছে, গ্যাস হয়েছে। ফ্রীজ আছে। একদিন ছেলেদের কাউকে স্লিপ লিখে পাঠিয়ে কিছু বাজার হাট আনিয়ে নিলে এক মাস চলে। ছেলেদের শত্রুতা (কাল্পনিক অবশ্যই) থেকে রেহাই পাবার জন্যেই লেখাপড়া ক'রে ছেলেদের সব উইল ক'রে দিয়েছেন এবং এখনকার মতো একটা আমমোক্তার নামাও দিয়েছেন। তাছাড়া এসব বইয়ের বিক্রিও কমে এসেছে। কদাচিৎ দু-চারখানা বিক্রি হয়। ছেলেরা এখন অন্য বই প্রকাশে মন দিয়েছে এখন কেউ কামবক্স সাহেবের নামের আসল গোয়েন্দাকে খুঁজে বার ক'রে খুন করবে তা আর মনে হয় না। তবে নাকি অভ্যাসটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, ছাড়তেও পারেন না।

এর মধ্যেই উনি কবে নিঃশব্দে মারা গেছেন তা কেউ টের পায় নি। ইদানিং মাসে একবার রসদ আসত, তাই কারও মাথাতেও যায় নি প্রশ্নটা।

নূতন ও পুরাতন

একে গরমের দিন তায় দুপুরবেলা, সমস্ত প্ল্যাটফর্ম দিয়া যেন আগুনের শিখা উঠিতেছে। যে ট্রেনটা এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইল সেটার দিকে চাহিলেও ভয় করে।

কিন্তু তবুও জগদীশবাবুকে ছুটাছুটি করিয়া উঠিতে হইল। প্রচুর মালপত্র ও প্রচুর চেঁচামেচির মধ্যে কোনমতে স্থূলকায়া গৃহিণীকে সংকীর্ণ দ্বারপথে ঠেলিয়া দিয়া নিজেও শেষ পর্যন্ত যখন উঠিয়া পড়িলেন তখন গার্ড সাহেব গাড়ি ছাড়িবার বাঁশী দিয়াছেন। গৃহিণী কাত্যায়নীর বাতের দেহ, তাহার উপর একটা ষণ্ডা হিন্দুস্থানী দিয়াছে পায়ের উপর পা তুলিয়া, তিনি সামনের একটা বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া পড়িয়া পায়ে হাত বুলাইতে ছিলেন, সেইখান

হইতেই প্রশ্ন করিলেন, 'সব উঠল তো? কটা মাল আমাদের—ষোলটা না সতেরটা? মনেও থাকে না ছাই। আমার সেই সাজিটা?'

জগদীশবাবু খিঁচাইয়া উঠিয়া কহিলেন, 'জানি না কটা উঠল। যা উঠেছে তাই উঠেছে, এখন তো আর পড়ে থাকলেও তোলা যাবে না, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। যত সব হয়েছে আমার পঙ্গু আর অকেজো লোক নিয়ে কারবার!'

জগদীশবাবুর মেজাজ খারাপ হইতেই পারে। পশ্চিমের গরমের দুপুরে যাঁহাদের ট্রেনে যাইতে হইয়াছে তাঁহারাই কারণটা বুঝিবেন। বড় ছেলে সতীশ দিল্লীতে কাজ করে, সম্প্রতি সে তার করিয়াছে, বড় বৌয়ের ভারী অসুখ, দেখিবার লোক নাই, মা আসিলে ভাল হয়।

জগদীশবাবু তার পাইয়াই কলিকাতা হইতে তুফান মেলে রওনা হইয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণী প্রয়াগের উপর দিয়া এমনি চলিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অথচ দেরি করাও এক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং সেইদিনই ভোরবেলায় নামিয়া মালপত্রসহ সোজা প্রয়াগঘাটে গিয়া স্নান ও ফোর্টের মধ্যে দর্শনাদি সারিয়া আবার তখনই বারোটার এক্সপ্রেস ধরিবার জন্য স্টেশনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। আহার হয় নাই, বিশ্রামের তো কল্পনা পর্যন্ত করা যায় না, এমন কি ভাল রকম জলযোগের পর্যন্ত সময় হয় নাই। কারণ তাড়াতাড়ি যতই থাক এবং বধূর জন্য মন যতই খারাপ হউক না কেন, গাড়ি থামাইয়া পথে পথে বাজার কিছু কিছু জগদীশবাবুকে করিতেই হইয়াছে। গৃহিণীর যুক্তি অকাট্য, 'এসব কি আমার সঙ্গে চিতেয় উঠবে? তাদের জন্যেই তো নেওয়া এসব, নতুন ঘর-কন্না আমি না গুছিয়ে দিলে কে গুছোবে?'

যাহা হউক—জগদীশবাবুর বিরক্তি আর বেশী দূর প্রকাশ পাইল না। তিনি যতটা পারিলেন টানাটানি করিয়া মালপত্র উপরে তুলিয়া দিলেন, কতক বা বেঞ্চির নীচে রাখিলেন। এবং মালপত্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গৃহিণীর নিকট সহস্র কৈফিয়ৎ দিতে দিতে শতরঞ্জি ও সুজনি বিছাইয়া ওপাশের বেঞ্চিতে নিজেদের বসিবার মতো একটা স্থানও করিয়া লইলেন।

এতক্ষণে কাত্যায়নীর গাড়িটার ভিতরে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিবার অবসর হইল। সৌভাগ্যক্রমে কামরাটা খালিই ছিল, এত গরমে দুপুরবেলা নিতান্ত গরজ না থাকিলে কেহ যায় না; শুধু ওধারের বেঞ্চে একটি প্রবীণ

হিন্দুস্থানী এবং কাত্যায়নীর সামনে অন্যদিকের জানালার ধারে বেঞ্চিতে ছুটি বাঙালী তরুণ-তরুণী, গাড়ির ইহাই মোট যাত্রী। কাত্যায়নী বাতের পা-টা বিছানার উপর তুলিয়া গাঁটে হাত বুলাইতে বুলাইতে এই ছুটি যাত্রীর দিকেই মনোযোগ দিলেন।

মেয়েটির বয়স বছর সতেরো-আঠারো হইবে, দেখিতে সুশ্রী, এমন কি কাত্যায়নীর মতে সুন্দরীই বলা চলে, ছেলেটিও দেখিতে মন্দ নয়, বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ কিংবা আরও কম। যতদূর মনে হয় নববিবাহিত দম্পতি, কর্মস্থলে চলিয়াছে; কিন্তু তাহাদের রূপ বা বয়স নয়, কাত্যায়নীকে যাহা আকৃষ্ট করিল, তাহা তাহাদের অদ্ভুত বেহায়াপনা। কেন যে তাহারা রৌদ্রের দিকে বসিয়াছে তাহার কোন কারণই জানা যায় না; হয়ত পূর্বে ভীড় ছিল, বাধ্য হইয়াই তখন ঐদিকে বসিতে হইয়াছে, কিন্তু রৌদ্রের ভয়ে জানালা তুলিয়া দিয়া তাহাদের অবস্থা হইয়াছে আরও খারাপ। ছুজনেরই কাপড়-জামা ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে, মুখ-চোখের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে। কাত্যায়নীর যখন চোখ পড়িল, তখন মেয়েটি স্বামীর কোলের উপর এলাইয়া শুইয়া রহিয়াছে এবং ছেলেটি একটা আঙুল দিয়া তাহার ললাটের উপর হইতে ঘামে ভেজা চুলগুলি সরাইয়া দিতেছে। কিন্তু সে অতি অল্লক্ষণ মাত্র। মেয়েটি অকস্মাৎ সেই অবস্থাতেই স্বামীর গলা জড়াইয়া তাহার মুখখানা নিজের কাছে টানিয়া আনিল এবং তাহার চুলগুলি ধরিয়া সজোরে টানাটানি করিতে লাগিল।

কিন্তু সেও ঐ এক মিনিট। সহসা বৌটি উঠিয়া বসিল এবং ছেলেটিও কালবিলম্ব না করিয়া স্ত্রীর গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল। মিনিটখানেক পরেই আবার বৌটি কাতুকুতু দিয়া চিম্‌টি কাটিয়া তাহাকে তুলিয়া দিল। সেই উপলক্ষে ছোটখাটো একটা কৌতুকের মারামারিও হইয়া গেল। এ মারিল সোহাগের ঘুষি, ও দিল গালে ঠোনা। মেয়েটিই চঞ্চল বেশী, সে একবার বসে, একবার দাঁড়ায়, একবার শুইয়া পড়ে। কখনও স্বামীকে বলে কোঁচার খুঁটে করিয়া বাতাস করিতে, কখনও নিজেই আঁচল দিয়া তাহার মুখের ঘাম মুছাইয়া বাতাস করিতে বসে। তাহারা গরমের জন্য হা-হুতাশ করিতেছিল যতটা, চুপিচুপি রসিকতা করিয়া হাসাহাসি করিতেছিল তাহার চেয়ে ঢের

বেশী। অর্থাৎ এই গাড়ির কষ্ট, এই অসহ্য গরম, সবটাই যেন তাহাদের কাছে একটা বড়গোছের রসিকতার ব্যাপার।

তাহাদের দিকে চাহিয়া কাত্যায়নী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। বৌটির মাথায় কোন প্রকার অবগুণ্ঠনের বালাই তো ছিলই না, গাড়িতে যে অন্য লোক আছে একথাও যেন তাহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। সর্বাপেক্ষা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল তখনই, যখন বৌটি তাহার দুইটা পা স্বামীর কোলের উপর তুলিয়া দিয়া অম্লানবদনে কহিল, 'একটু টিপে দেবে পাটা? দাও না।'

কাত্যায়নী স্বামীর দিকে হেলিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন, 'কি এরা? বেহ্ম-টেম্ম নয় তো? কি বেহায়া মেয়ে বাবা, আমরা যে গাড়ির মধ্যে আছি তা ভ্রূক্ষেপ নেই।'

জগদীশবাবু কাগজ পড়িতেছিলেন, তিনি চুপিচুপি জবাব দিলেন, 'ওরা যা খুশি করুক না, তোমার ওদিকে চাইবার দরকার কি? আজকালকার ছেলেমেয়ে ওরা, ওদের ঐ ধরন।'

তিনি কাগজটা পাশে রাখিয়া জানলার কাঠে হেলান দিয়া চোখ বুজিলেন। কাত্যায়নীও স্বামীর কাছে ধমক খাইয়া তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার ঘুম আসিল না, চোখ বুজিয়া নিজের যৌবনকালের কথাটা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর প্রেমও বড় কম ছিল না, রোজ শ্বশুরবাড়ি আসিতে লজ্জা করিত বলিয়া জগদীশবাবু বিবাহের পরে প্রথম প্রথম প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে শ্বশুরবাড়ির সামনের পথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন। সেই সময়ে কাত্যায়নী সমস্ত কাজ ফেলিয়া জানলার ধারে অপেক্ষা করিতেন—শুধু চার চোখের একবার সাক্ষাতের জন্য। কথাটা যেদিন তাঁহার বোনের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছিল সেদিন তাঁহাকে কি লজ্জাতেই না পড়িতে হইয়াছিল। তা হউক, তা বলিয়া প্রকাশ্যে এমনভাবে ঢলাঢলি করিবার কল্পনাও বোধ করি তাঁহারা করিতে পারিতেন না। বিবাহের পরেই তাঁহাদের একবার স্টীমারে করিয়া যাইতে হইয়াছিল, সমস্ত পথটা শুধু অপরে চাহিয়া দেখিতেছে মনে করিয়া একটি কথাও তিনি স্বামীর সহিত কহিতে পারেন নাই। তাহার জন্য জগদীশবাবু বরং কত অনুযোগ করিয়াছিলেন। আর ইহারা—

সহসা তাঁহার কানে গেল বধূটি বলিতেছে, 'বুড়ীটা ঘুমিয়েছে? বাব্‌বা কি মোটা!'

ছেলেটি কহিল, 'চুপ, চুপ, শুনতে পাবে—'

বৌটি জবাব দিল, 'শুনতে পাবে না ছাই, দেখছ না বুড়োটার বসে বসে নাক ডাকছে!'

স্বামী কহিল, 'কিন্তু বুড়ী যদি জেগে থাকে? ওর তো নাক ডাকছে না—'

বৌটি প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'পাগল! এই গরমে বুড়োমানুষ জেগে থাকতে পারে? ওর নাকও ডাকল ব'লে, দেখ না একটু।'

তাহার পর আরও চুপি চুপি কি একটা কথা বলিয়া দুজনেই হাসিয়া উঠিল। একটু পরে ছেলেটি কহিল, 'তুমিও একদিন ঐ রকম হবে, ঐ রকম মোটা আর বুড়ো।'

মেয়েটি জবাব দিল, 'ইস্‌ তাই বৈকি। দেখো তার অনেক আগেই আমি মরে যাবো।'

ছেলেটি কহিল, 'যদি না যাও?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'নিশ্চয়ই মরবো, তুমি বরং দেখে নিও। আর নিতান্ত যদি না মরতে পারি তো নিদেন গলায় দড়ি দিয়েও মরবো। তবু ঐ রকম বুড়ি হয়ে আমি কিছুতেই বেঁচে থাকবো না, কিছুতে না!'

অপমানে কাত্যায়নীর দুই কান হইতে যেন আগুন-বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু তবু মনে মনে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইল যে তিনিও ফুলশয্যার দুইদিন না তিনদিন পরে স্বামীর কাছে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন! তাঁহার শ্বশুরের এক পিসী পাশের ঘরে বাতের যন্ত্রণায় চিৎকার করিতেছিলেন, দুইজনে প্রেমালাপে মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাহা কানে আসিতেছিল। শুনিয়া শুনিয়া কাত্যায়নী স্বামীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'আচ্ছা বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকা কি যন্ত্রণা বলো দেখি—'

জগদীশ জবাব দিয়াছিলেন, 'কি করবে বলো বেচারী, মরণের ওপর তো আর কারুর হাত নেই!'

কাত্যায়নী কহিয়াছিলেন, 'হাত নেই তো কি! আমি হলে বিষ খেয়ে মরতুম তবু অত বুড়ো, অত বিচ্ছিরি, সবাইকার আপদ-বালাই হয়ে বেঁচে

থাকতুম না—'

কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। চল্লিশ বছরের স্মৃতি আজ মনের মধ্যে অস্পষ্ট, ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। আজ তিনিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, সকলকার আপদ-বালাই-ই হইয়াছেন, কিন্তু তবু তো মৃত্যুর কথা ভাবিতেও পারেন না। বাতের যন্ত্রণায় তাঁহাকে প্রায়ই দুর্গন্ধ কবিরাজী তেল মাখিতে হয় বলিয়া স্বামী পাশের ঘরে শয্যা লইয়াছেন—যে স্বামী ঘুমের মধ্যেও কাত্যায়নী বাহিরে গেলে বুঝিতে পারিতেন, অন্ধকারে বিছানার মধ্যে হাত বাড়াইয়া খুঁজিতেন। কিন্তু তবু সংসারের উপর কি কম মায়া! ছেলে-বৌ, নাতি-নাতিনী, তিন কন্যা এবং অসংখ্য দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে তাঁহার জাজ্বল্যমান সংসার। মনে হয় প্রত্যেকটি ডালা-চুপ্‌ড়ি পর্যন্ত অদৃশ্য অমোঘ আকর্ষণে প্রতিদিন নাগপাশের মতো তাঁহাকে মায়ায় জড়াইতেছে।...

কানে গেল মেয়েটি বলিতেছে, 'আর দরকারটাই বা কি বাপু? আমার দিদিমা অমনি, কেউ তাঁকে চায় না, কারুই কাজে আসেন না তিনি, অথচ প্রত্যেকের প্রতেকটি কাজে তাঁর মাথা দেওয়া চাই। তাঁর বিশ্বাস তিনি না হলে আমাদের কারুর ঘর চলবে না।...ওমা, কাল আবার আমাকে তিনি সাজিয়ে দিতে চাইছিলেন। হেসে মরি আর কি—'

এই সময়ে কি একটা স্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, 'দেখ দেখ, আহা ঐ মেয়েটি কে বলো দেখি, শুক্‌নো মুখে একপাশে বসে আছে? কি চমৎকার দেখতে, বয়সও খুব অল্প, না? দাও না দু'আনা পয়সা!'

ছেলেটি কহিল, 'ও যদি ভিখিরী না হয়, শেষে রেগে উঠবে না তো? হয়ত ঝাড়ুদারের বৌ-টৌ হবে।'

মেয়েটি কহিল, 'তা হোক—দু'আনা পয়সায় না হয় মিঠাই কিনে খাবে। দাও দাও—'

চারিদিকে শুধু যৌবনেরই জয়গান। কিন্তু ইহাদেরই বা দোষ কি? কাত্যায়নীর মনে পড়িল কোন অল্পবয়সের মেয়ে ভিক্ষা করিতে আসিলে তিনিও শাশুড়ীকে লুকাইয়া তাহাকে বেশী করিয়া চাল, আলু প্রভৃতি দিতেন।...

সব কথাই তো সত্য। তিনি সকলকেই জড়াইয়া থাকিতে চান কিন্তু তাঁহাকে যে কাহারও প্রয়োজন আছে বলিয়া তো মনে হয় না। এই তো সেদিন, বোধ হয় গত বছরের কথা, তিন কন্যা ও বধূ উপরের ঘরে বসিয়া দুপুরবেলা হাসাহাসি করিতেছিল ; তিনি তাহাদের সান্নিধ্যের লোভে সেই ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতে চারজনেই নানা ছুতায় একে একে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নাতনীদের তিনিই জোর করিয়া ডাকিয়া বসান বটে কিন্তু তাহারা সরিয়া পড়িবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। ছেলে সতীশের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই তিনি বধূর সহিত টিক্‌টিক্‌ করেন বলিয়া সতীশ যে বিরক্ত হয় তাহাও তো তাঁহার অবিদিত নাই। তবে এ সংসারে কাহার প্রয়োজনে তিনি লাগেন? স্বামীর? হায় রে!

সকাল হইতে সন্ধ্যার মধ্যে কতটুকুর জন্যই বা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়! রান্নাবাড়া প্রভৃতি নানান গৃহ-কর্মে ঝি-চাকর-ঠাকুরের পিছনেই তো সারাদিন তাঁহার চলিয়া যায়। বাতের জন্য নিজে কিছু করিতে পারেন না, কিন্তু প্রত্যেকটি কাজে তত্ত্বাবধান করিতে হয়, নহিলে সংসারে হয়ত একদিনেই প্রেতের নৃত্য শুরু হইবে।...স্বামী?...সারা দিন-রাতের মধ্যে হয়ত কোনদিন শয়নের পূর্বে তিনি একবার এ ঘরে আসিয়া প্রশ্ন করেন 'কেমন আছ'—কোন-কোনদিন সেটুকু অবসরও তাঁহার হয় না।...এই তো তাঁহার সহিত সম্পর্ক!

কাত্যায়নীর যেন দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল, তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ঐ দম্পতির দিকে আর চাহিবেন না, এইরূপই একটা প্রতিজ্ঞা হয়ত মনের মধ্যে ছিল এবং সেজন্য জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্রাণপণে বাহিরের দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিলেন বটে কিন্তু কখন আবার নিজেরই অজ্ঞাতসারে দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল এই দুটি অল্পবয়স্ক নরনারীর দিকে। তাহাদের প্রণয়লীলার খুঁটিনাটি দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতে করিতে এই কথাটাই তাঁহার বার বার মনে হইতে লাগিল যে, এ সংসারের যাহা কিছু আনন্দ সব ইহাদেরই জন্য ভগবান ঢালিয়া দিয়াছেন, জগতের যত কিছু স্নেহ, মায়া, মোহ সব এই বয়সের নরনারীর জন্যই। তাঁহাদের জন্য জীবনের পাত্রে ফেনাইয়া উঠিয়াছে শুধু বিষ! সারা জীবনের বিনিময়ে জমাইয়াছেন শুধু জঞ্জাল, শুধু তিক্ততা—

সন্ধ্যা নাগাদ এটোয়াতে গাড়ি আসিয়া থামিতেই সেই তরুণ দম্পতিটি যথেষ্ট কলরব করিতে করিতে নামিয়া গেল। হয়ত এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে। নয়ত কোন কাজে। কোথায় থাকে, কি করে, কতদিন বিবাহ হইয়াছে, এই সমস্ত প্রশ্ন কাত্যায়নীর ঠোঁটের কাছাকাছি আসিয়া বারবার ফিরিয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছুতেই মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। পাঁচ ঘণ্টা আগে হইলে তিনি নিশ্চয়ই ইহাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব না জানিয়া লইয়া ছাড়িয়া দিতেন না; কিন্তু সেই মুহূর্তে কোথায় যেন তাঁহার আত্মসম্ভ্রমে বাধিল, তিনি একটি প্রশ্নও করিতে পারিলেন না।

কর্তারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, তিনি প্লাটফর্মে নামিয়া মুখে হাতে জল দিয়া এক পেয়ালা চা লইয়া আসিয়া বসিলেন। গাড়ির অপর আরোহীটিও সিকোহাবাদে নামিয়া গিয়াছিল, সেই বেঞ্চটার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, 'গাড়িটা বেশ ফাঁকা পাওয়া গেছে, না—? কিন্তু এত খালি থাকলে আবার একটু ভয়-ভয়ও করে।'

সহসা গৃহিণীর মুখের দিকে চোখ পড়িয়া যেন তাঁহার মনে হইল, কোথায় কি গোলযোগ বাধিয়াছে, তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার মুখটা যে বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি? তোমার তো আবার চা-ও সহ্য হয় না, একটু দুধ কিনে দেব, খাবে?'

এই সামান্য কথাতেই কাত্যায়নীর চোখে জল আসিয়া পড়িল, তবু তিনি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। জগদীশবাবু তাঁহাকে দুধ কিনিয়া দিয়া আবার কাগজটা তুলিয়া লইলেন। অন্য সময় হইলে কাত্যায়নী এত নিভৃতে স্বামীকে পাইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন না, ঘর-কন্নার সমস্ত কথা আলোচনা করিতে বসিতেন; কিন্তু সেদিন কোন কথাই কহিলেন না, শুধু বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এক্সপ্রেস ট্রেন হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রমশঃ রাত্রিও গভীর হইয়া আসিল, বাতের যন্ত্রণা অসহ্য, সমস্ত ডান পা-টা যেন কোন জন্তুতে চিবাইতেছে, এত যন্ত্রণা। ইহারই জন্য কতবার তাঁহার মনে হইয়াছে যে, এমন করিয়া বাঁচিয়া কোন ফল নাই, তবু তো কোনদিন তিনি মরিবার প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, কেবলই মনে করিয়াছেন যে, তিনি গেলে তাঁহার

সংসারের কি হইবে। অথচ সে সংসারে কি সত্যই তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে?

জগদীশবাবু টুণ্ডলা স্টেশনে খাবার কিনিলেন। কাত্যায়নী এতক্ষণে যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিলেন, তিনিই হাত বাড়াইয়া খাবারগুলি লইয়া স্বামীকে গুছাইয়া খাইতে দিলেন, নিজের জন্যও আর একটা পাতায় রাখিয়া দিলেন। কিন্তু জলেরও যে প্রয়োজন সে কথাটা তাঁহার মনে হইল ট্রেন ছাড়িয়া দিতে, 'ঐ যা, জল নিলে না তো? কুঁজোতে বোধ হয় একটুখানি জল পড়ে আছে—'

জগদীশবাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'বেশ হয়েছে। স্টেশনে গাড়িটা থাকতে মনে হ'ল না বুঝি? এক্সপ্রেস ট্রেন, আবার কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে? যে কথাটা আমি না মনে করব, সেইটিই ভুল হবে—'

কাত্যায়নী চুপ করিয়া রহিলেন। খানিকটা পরে জগদীশবাবু আবার অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন, কহিলেন, 'সুরেন অনেকদিন ধরেই সিমলে যেতে বলছে, কখনও যাওয়া হয় না। বৌমা একটু সেরে উঠলে ভাবছি দিনকতক অমনি ঘুরে আসব। তুমি সতীশের কাছেই থাকবে, আবার আসবার সময় তোমাকে নিয়ে চলে আসব—'

সুরেন জগদীশের ভাগিনেয়, সিমলাতে লাটসাহেবের দপ্তরে মোটা মাহি-নার চাকুরি করে। কাত্যায়নীকেও বহুবার সে যাইতে লিখিয়াছে; কিন্তু কখনই যাওয়া হয় নাই, সংসার হইতে ছুটি লওয়া আর তাঁহার ঘটিয়া ওঠে না। তিনি সাগ্রহে কহিলেন, 'আহা, সুরেন আমাকে যেতে বলে নি বুঝি। আমিও তাহলে তোমার সঙ্গেই যাবো—'

মুখ বিকৃত করিয়া জগদীশবাবু কহিলেন, 'হ্যাঁ, তা আর নয়। সেই ঠাণ্ডা দেশে বেতো রুগীকে নিয়ে গিয়ে আমি মরি আর কি? যাবো দুদিনের জন্যে বেড়াতে, না নেমেই কোথা ডাক্তার, কোথা কবিরাজ খুঁজে বেড়াই—। তুমি দিল্লীতেই থেকো, টানের দেশ, ভালই থাকবে।'

কাত্যায়নী আর কথা কহিলেন না। এ কথা কাল শুনিলেও বোধ হয় ঝগড়া করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহার অভিমানে না-কি নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তিনি কোন প্রতিবাদই করিলেন না।

পরের একটা ছোট স্টেশনে জল লওয়া হইল, জগদীশবাবু ভোজন সমাপ্ত করিয়া বেশ আরামেই শয্যা লইলেন। একবার শুধু প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি খেলে না?' কাত্যায়নী জবাব দিলেন, 'এখনও আমার আহ্নিক সারা হয় নি। খাবো এখন আমি, তুমি ঘুমোও—'

জগদীশবাবুকে সে অনুরোধ করা বাহুল্য, একটু পরেই তাঁহার নাক ডাকিতে শুরু হইল। কিন্তু কাত্যায়নীর চোখে কিছুতেই ঘুম আসিল না। কেবলই তাঁহার ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ কথাটাই মনে আসিতে লাগিল সে সংসারে তাঁহার আর কোন কাজ নাই, কোন প্রয়োজন নাই—তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সংসার ঘুরিত, সেই সংসারের আজ তিনি আবর্জনামাত্র, নিতান্তই বোঝার মতো।...

সারাদিনের অনাহার, পরিশ্রম ও অত্যধিক গরমে কাত্যায়নীর মাথাও গরম হইয়া উঠিয়াছিল, নহিলে সুস্থ দেহে যাহাদের নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা, সেই কথাগুলিই তাঁহাকে এমন করিয়া বিচলিত করিয়া তুলিবে কেন?

আঃ—আর অসহ্য এই বাতের যন্ত্রণা, আজ যেন রোগও তাঁহাকে প্রবল-ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। কিসের জন্য তাঁহার এই যন্ত্রণাভোগ, কাহার জন্য? মনে পড়িল, অনেকদিন আগে, একদিন অনেক রাত্রে স্বামী বাড়ি ফিরিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমি এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলুম, জিজ্ঞেস করলে না তো? তোমার সন্দেহ হয় না আমার ওপর?'

কাত্যায়নী সগর্বে উত্তর দিয়াছিলেন, 'যেদিন বুঝব আমার ওপর থেকে তোমার ভালবাসা চলে গেছে, সেদিন আর তোমাকে কিছু বলব না,—তখনই গলায় দড়ি দিয়ে মরব!'

আজ সে সব প্রতিজ্ঞা তাঁহার গেল কোথায়? এই তো, স্বামী কিছু পূর্বেই জানাইয়া দিলেন যে কাত্যায়নী তাঁহার জীবনের বোঝা মাত্র, সে বোঝা টানিয়া তিনি সিমলাতে বেড়াইতে যাইতে পারিবেন না, তিনিও আজ স্ত্রীর হাত হইতে রেহাই চান।

তবে—?

তেত্রিশ বৎসর পূর্বেকার সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আজ বাধা কি?

রুগ্‌ণ, অকর্মণ্য দেহ লইয়া সকলকার, এমন কি স্বামীরও আপদ-বালাই হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে ?

দারুণ উত্তেজনায় কাত্যায়নীর দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিতে লাগিল, তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মৃত্যুর উপায় তো এই সামনেই রহিয়াছে, হু-হু করিয়া ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে, শুধু কপাটটা খুলিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়ার অপেক্ষা—

টলিতে টলিতে কোনমতে উঠিয়া গিয়া কাত্যায়নী দরজাটা খুলিয়া ফেলিলেন, সম্মুখেই অতলস্পর্শী অন্ধকার, নিশ্চিত মৃত্যু। আর কয়েক মুহূর্ত-মাত্র—তাহার পরেই সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে—

অকস্মাৎ মুক্ত দ্বারপথে এক ঝলক বাতাস লাগিতে জগদীশের ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মেলিতেই চোখে পড়িল দরজা খোলা এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাত্যায়নী— !

'সেজবৌ!'

প্রায় আর্তনাদ করিয়া জগদীশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'কি হয়েছে সেজবৌ, এমন ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে কেন, গাড়ি দুলছে, যদি পড়ে যেতে ?'

এতক্ষণে তাঁহার চোখে পড়িল স্ত্রীর অবস্থা। বেশ আলু-থালু, মাথার চুল খুলিয়া পড়িয়াছে, দুই চোখে জল, সারা দেহ থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে, অত্যন্ত অসহায় ভাব—

কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি সামনের বেঞ্চিতে বসাইয়া দিয়া জগদীশ প্রশ্ন করিলেন, 'সেজবৌ, চুপ ক'রে থেকো না, আমার বুকের মধ্যে কি রকম করছে! যদি পড়ে যেতে! কি হয়েছে বল দেখি—। তুমি কি ভয় পেয়েছিলে ?'

তবে কি জীবনের যন্ত্রে এখনও কিছু সুর আছে ? সামান্য কিছু রঙ ?

কাত্যায়নীর চোখের জল আর বাধা মানিল না। তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, 'আমি মরতে যাচ্ছিলুম। এমন ক'রে সকলকার আপদ-বালাই হয়ে আর বেঁচে থাকতে পারি না।'

ভয়ে যেন জগদীশের মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, 'ছি, ছি, সেজবৌ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কী সর্বনাশ করতে বসেছিলে বলো দেখি, তুমি গেলে আমি বাঁচতুম কি ক'রে!'

তাহার পর সস্নেহে তাঁহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, 'সিমলে নিয়ে যেতে চাই নি এইতেই এত অভিমান? সে কি আমার জন্যে—না তুমি কষ্ট পাবে বলে?...তুমি হয়েছ আপদ-বালাই? তাই সতীশ বৌয়ের অসুখ হতে আগে তোমাকে তার করলে?...ছি ছি, তুমি এত অবুঝ—চল, বিছানায় বসবে চল, আমার হাত ধরো না হয়—'

কাত্যায়নী স্বামীর হাত ধরিয়া নীরবে অভিভূতের মতো নিজের জায়গায় আসিয়া বসিলেন। তাঁহার খাবারগুলার দিকে চোখ পড়িতে জগদীশ বলিলেন, 'ও-কি, খাবারগুলোও খাও নি বুঝি? থাক্—ও আর খেয়ে দরকার নেই। সামনের স্টেশনে আমি আবার গরম খাবার কিনছি—'

কাত্যায়নী জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, সত্যিই কি একটা স্টেশন কাছে আসিতেছে। অন্ধকার তরল হইয়া আসিয়াছে, স্টেশনের উজ্জ্বল আলোর আভায় মনে হইল যেন অন্ধকার চিরকালের জন্যই পিছনে পড়িয়া গেল। সে আলো তাঁহারও মুখে আসিয়া পড়িল—

গাড়ি তখন আলিগড় স্টেশনে প্রবেশ করিতেছে।

সম্মানের নিরিখ

লোকটিকে আগে কোথাও দেখি নি। এতকাল এ পাড়ায় আছি, কাছাকাছি কোন পাড়ার বাসিন্দা হ'লেও মুখটা চেনা-চেনা লাগত অন্তত। একেবারেই উট্‌কো লোক যাকে বলে। সেদিনের পরও আর চোখে পড়ে নি। যেন বাতাস থেকে মূর্তি নিয়ে এসে আবার বাতাসেই মিলিয়ে গেল।

আমাদের পাশের বাড়িতেই বিয়ে। আজকালকার সঙ্কুল স্থানাভাবে ছাদ ঘিরেও অভ্যাগতদের বসাবার ব্যবস্থা করা যায় নি, কর্তাদের একজনকে দশটা টাকা উপার্জনের সুযোগ দিয়ে বিনা অনুমতিতেই রাস্তার অনেকখানি ঘিরে ভোজনের আয়োজন করা হয়েছিল।

কর্তব্যের অনুরোধেই সকালে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। এসব ক্ষেত্রে অযাচিত উপদেশ বা ফপরদালালি ছাড়া আর কিছু করার নেইও অবশ্য। সুতরাং অলসভাবেই সেই কানাত্‌ঘেরা স্থানটিতে ঘোরাঘুরি করছিলুম। তার মধ্যেই হঠাৎ নজরে পড়ল।

ময়লা ধুতি, সুতির কোটের ওপর একটা ঢিলে সোয়েটার, রুক্ষ চুল, খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, পায়ে তালি দেওয়া চটি। মূর্তিমান দারিদ্র্য বলাই উচিত। রবাহূত হয়ে এসেছে। রাস্তা ঘেরা এবং মাইকে সানাই বাজছে (রেকর্ডে), উৎসবের আয়োজন বুঝতে কোন অসুবিধে নেই।

এমন তো আসেই, তবু মনটা বিরক্ত হয়ে উঠল। যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া সন্ধ্যার পর—রবাহূতদের অবসর মিলবে শেষ ব্যাচের সঙ্গে বা তারও পরে—অর্থাৎ রাত এগারোটার আগে নয়। এখন থেকেই ধন্না দিতে এসেছে। দুপুরবেলাও যদি কিছু জুটে যায়—এই আশায় ?

বিরক্ত হয়েই এগিয়ে গিয়েছিলুম, কড়া কথা কিছু ঠোঁটের ডগায় তৈরীই ছিল, কিন্তু কাছে গিয়ে লোকটার মুখ দেখে কেমন যেন আটকে গেল সেগুলো।

দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট—তার চেয়েও বেশী, ভবঘুরে ভিখিরীরই ধরন—কিন্তু চলনে চাহনিতে, হাতনাড়ার ভঙ্গীতে কোথায় একটা আভিজাত্যের ছাপও আছে। সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বড় ঘরেরই ছেলে, হয়ত নেশাভাঙ বদখেয়ালি করে সব উড়িয়ে দিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, এই ভাবে পেট টেলে বেড়ায়।

কড়া কথা না বলতে পারলেও বেশ একটু কড়া গলাতে প্রশ্ন করলুম, 'তোমার কি চাই বাপু ?'

'আমার ? কিছু চাই না। এমনিই দেখছি। পথ ঘিরে খাবার ব্যবস্থা, দেখে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে।'

মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গেল, 'কি মনে পড়ছে ? আর তোমার ছেলেবেলা আর এখন থেকে কদিনের কথা ?'

'হ্যাঁ, আমার ছেলেবেলা—সে এমন কিছু বেশীদিনের কথাও নয়। বড় জোর বছর চল্লিশেক আগে হবে। তখনও এ যুদ্ধটা শুরু হয় নি বোধ হয়—

এক বড়লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন গিয়েছিলুম—ছাদে সব কুলোয় নি, উঠোনের ওপর তেরপল ফেলে বাড়তি খাবার জায়গা হয়েছিল—তা আমার বাবা আমাদের সেখানে বসতে দেন নি, বলেছিলেন উঠোনে বসে খায় কাঙাল গরিব ভিখিরীরা—আমরা বসব কেন। বাড়ির কর্তা এসে হাত জোড় ক'রে মাপ চেয়ে পরের ব্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে ছাদে ব্যবস্থা করতে তবে বাবা আমাদের খেতে দিলেন। তাই এই ভাবছিলুম—এই যে এখন সব রাস্তায় খেতে দেওয়া হয়েছে—টিনটিনে কেরোসিন কাঠের টেবিলে—দেখলে বাবা কি বলতেন!'

বলতে বলতেই দু হাত জোড় ক'রে বলল, 'মাপ করবেন স্যার, আমার এসব ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ইঙ্গিত ক'রে কিছু বলি নি—এ তো হামেশা ঘরে-ঘরেই হচ্ছে প্রায়—ছোটবেলার কথাটা মনে পড়ল বলেই বললুম!'

লোকটি ভদ্রঘরের ছেলে তাতে কোন সন্দেহই রইল না আর। মনটা নরম হয়ে এল; বললুম, 'তোমার—মানে আপনার বাড়ি কি এই দিকেই?'

'না না, আপনি নয় আপনি নয়—তুমিই ঢের, তুই বললেও রাগ করব না। আমি তো পথের ভিখিরী—আমার আর সে ঘিয়ের ঢেঁকুর না তোলাই ভাল। হ্যাঁ, এইখানেই জন্ম, খাস কলকাতাতেই। তবে পরিচয়টা আর দোব না—বাপ-মার বংশের নাম ঢের ডুবিয়েছি—আর তাঁদের অপমান করতে পারব না।'

'তা তোমার এমন হাল হ'ল কেন?'

'গেরো। গ্রহ মানেন তো। জন্মলগ্নে এই লেখা ছিল। অবস্থাপন্ন মানী ঘরের ছেলে, তবে সেইজন্যেই চাকরবাকরের হাতে মানুষ—লেখাপড়া হ'ল না। মদ ভাঙ খেতে শিখলুম। বাবা মনের দুঃখে সব বিষয় মেয়ে-জামাইকে লিখে দিলেন। সেটা জানলুম তিনি মরার পর। জামাইবাবু কিছু কিছু মাসো-হারা দিতে চেয়েছিলেন—আমি নিই নি। বাপের টাকা ভিক্ষে নেবো কেন? সেই থেকে বাড়ি ছাড়া, ভবঘুরে, ভ্যাগাবণ্ড। কখনও কিছু কাজ পেলে করি—আর কীই বা শিখেছি যে করব, এক রান্না—তা এই বেশভূষা দেখে কে ঘরে ঢুকিয়ে রাঁধতে দেবে বলুন বিশ্বাস করে? বেশির ভাগই—পথে কিছু জোটে

তো করি—এই ফাইফরমাসের কাজ—তাতে খাওয়া মেলে তো মিলল, নইলে পেটে কিল মেরে কোথাও গঙ্গার ঘাটেটাটে পড়ে থাকি। পয়সার অভাবে নেশাও ছাড়তে হয়েছে। তাই ভাবি যদি আগে ছাড়তুম!'

আবারও একটা নমস্কার ক'রে চলে যাচ্ছিল, বললুম, 'তা একটু থেকে যাও না, দুপুরবেলা এখানেই একটু ভাত খেয়ে যাও, এবেলা একটা ছোট যজ্ঞি তো হবেই।'

'ঐটি পারব না বাবু, মাপ করবেন। আপনি ভাববেন—এর জন্যেই এত ভণিতা করলুম, মিথ্যে কথার ঝাঁপি খুললুম। না, ও থাক—একমুঠো ভাত খেয়ে আর কি দুঃখু ঘুচবে বলুন।'

'তা, রাত্রে এসো না হয়!'

'না না। আপনি যে দয়া করতে চাইলেন এইটেই মনে রইল। ভিক্ষের ভাত খাই, কেউ অযাচিত পথে এসে দেয় সে একরকম—দয়ার ভাত খেতে বড় খারাপ লাগে, তখনই বংশের কথা বাবার কথা মনে পড়ে।'

সত্যিসত্যিই চলে গেল লোকটি।

আমি দু-একজনের কাছে গল্প করলুম। কেউ বললে, পাগল, অতিরিক্ত নেশায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কেউ বললে, চোর—চুরির মতলবে ঘুরছিল। আপনার চোখে পড়তে নভেল ফেঁদে পালিয়ে গেল।

আমিও বিকেলের দিকে তার কথা ভুলেই গেলুম।

কিন্তু লোকটিকে আবারও একবার দেখা গেল—পরের দিন সকালে।

রাত্রে অনেকে আসে নি, খাবার বেঁচে ছিল ঢের। তার মধ্যে মাছ মাংস গরম ক'রে বাড়ির জন্যেই রাখা হ'ল, স্থির হ'ল ভাত-ভাজা, লুচি ডাল আর কপির তরকারি—ঐ যারা ভোর থেকে ভাঙা কলাই-করা থালা নিয়ে এসে চেঁচামেচি করছে তাদের ভাগ ক'রে দেওয়া হবে। সেই মতোই কাজ শুরু হয়েছে, আমি ভেতরে বসে দেখছিলুম—খুব চেঁচামেচি শুরু হ'তে (এসব ক্ষেত্রে কাড়াকাড়ি চেঁচামেচি তো হবেই)—একবার একটু বাইরে আসতেই নজরে পড়ল একেবারে শেষ প্রান্তে আগের দিনের লোকটি—কোথা থেকে একটা পাতা যোগাড় ক'রে এনে স্থির ভাবে বসে অপেক্ষা করছে পরিবেশন-

কারীদের পৌঁছবার।

আমি এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'তা তুমি এখানে—। কী আশ্চর্য! এসো এসো, ভেতরে এসো।'

'না বাবু। কালই তো বলেছি। দয়ার ভাত খেতে পারব না। এ তো ভিক্ষের ভাত, আপনারা ফেলেই দিচ্ছেন—এ খেতে দোষ নেই। সকলের সঙ্গে বসে, এই ভাল। এ একরকম আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তও, বুঝলেন না!'

তব দক্ষিণ পাণি

হরকিষেণ বাইরে বেরোবার আগে একবার উদাসভাবে তাকিয়ে দেখল চারদিকে। বহুদিনের পরিচিত পরিবেশ। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা এই ক-বিঘে জমির মধ্যে কাটল তার দীর্ঘকাল। কিছু-কম পাঁচ বছর। এর প্রতিটি কণা মাটি তার পরিচিত হয়ে গেছে গত ক-বছরে। বোধ হয় সমস্তটুকু জমির ওপরই তার পায়ের চিহ্ন পড়েছে বার বার। নানা সময়ে নানা জায়গায় কাজ করতে হয়েছে তাকে। কাজ না থাকলেও ঘুরে বেড়িয়েছে। বাগানেও কাজ করেছে সে, ইচ্ছে ক'রেই করেছে। ইদানীং কেরানীর কাজটা দেওয়া হয়েছিল তাকে, এসব কাজ করার কথা নয়—কিন্তু তবু সে করেছে। এইটুকুই ছিল তার অবকাশ। এখানে এই মাটিই ছিল তার বন্ধু।

এখানে যেদিন প্রথম আসে সে—তখন এই মাটি, এই বাড়িগুলো, ঐ উঁচু পাঁচিলটা—এই সমস্ত পরিবেশটাই ছিল ঘৃণার্হ, শ্বাসরোধকারী। যেন শুধু একটা অপরিমেয় ঘৃণাই বোধ করেছে সে, ঘৃণা আর বিদ্বেষ। মনে হয়েছে নরকে এসেছে, জীবন্ত সমাধিতে প্রবেশ করেছে। মনে হয়েছে যে আর কখনও সে বাইরের পৃথিবী দেখতে পাবে না, আর বাঁচবেও না সে বেশীদিন। তার যা কিছু শেষ হয়ে গেছে—চিরকালের মতোই। তারপর একটু একটু ক'রে সময় কেটেছে। দিন গেছে, সপ্তাহ গেছে, মাস গেছে। একটি একটি ক'রে ঋতু এসেছে ও চলে গেছে। বছরও কেটেছে। এক দুই তিন চার। অসহ্য ভাবটাও কমে গেছে সেই সঙ্গে। এই একই পরিবেশে, একই গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকা যতটা শ্বাসরোধকারী

বলে মনে হ'ত কল্পনায় এর আগে—কার্যত ততটা হয় নি।

একেবারে যে বেরোয় নি এর মধ্যে থেকে তা নয়—দু-একবার কাজে এরাই নিয়ে গেছে অন্যত্র, প্রিজ‍্‌ন্ ভ্যানে ক'রে—হাসপাতালেও যেতে হয়েছে একবার, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, গলায় একটা ঘা হয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছিল, এখানকার ডাক্তার ঠিক বুঝতে পারেন নি, তিনিই পাঠিয়েছিলেন ওখানে। কিন্তু সে দু-চারদিন, নিতান্তই গোনা-গাঁথা কটা ঘণ্টা। সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর মতোই এই দীর্ঘ সাড়ে চার বছর সময়ের কাছে তা নগণ্য। এই পাঁচিলের বাইরেকার বিপুলা পৃথ্বীর সঙ্গে সে সাক্ষাতের কথা মনেও পড়ে না তার। না, এই সমস্ত সময়টা বলতে গেলে তার এখানেই কেটেছে। একটানা, নিরবচ্ছিন্ন। অসহ্য লাগবারই কথা। অসহ্য ও বিরক্তিকর। কিন্তু কে জানে কেন, কী এক রহস্যময় কারণে তা আর লাগছে না। বরং কেমন মায়া বোধ হচ্ছে আজ, ছেড়ে যেতে ব্যথাই লাগছে। মনে হচ্ছে যে, এক পরিচিত পুরাতন বন্ধুকে ছেড়ে যাচ্ছে সে, ছেড়ে যাচ্ছে এক নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়। মনে হচ্ছে যে, যেতে না হ'লেই ভাল হ'ত তার, এইখানেই যদি এই-ভাবে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারত সে তো বেঁচে যেত। আর কোন কিছু ভাববার দরকার হ'ত না। এ জীবনটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'ত না আর।

অনেক ভাবনা এখন তার সামনে। যে জীবন তার ছিল, যাতে সে অভ্যস্ত, তার মূলসুদ্ধ উৎপাটিত হয়ে গেছে। অথবা ঠিকমতো বলতে গেলে—আদৌ কোন মূল ছিল না তার! মূল থাকলে হয়ত আজ এতটা অসহায় বোধ হ'ত না। সে মূল বহুকাল আগেই নিজে হাতে কেটে দিয়ে এসেছে সে। বাবা-মা তার ছিলেন না। কিন্তু ভাই ছিল, ভাবী ছিল, ভাতিজা ছিল। এক সামান্য অভিমানের বশে দেশের সমস্ত জমি জায়গা ঘরবাড়ি ভাইকে লিখে দিয়ে একবস্ত্রে সে চলে এসেছিল দিল্লীতে। সেখানে সাইকেলে ক'রে দুধ যোগান দিয়ে কলেজে পড়েছে সে—সেই গোয়ালার কাছেই থেকে ও খেয়ে। তারপর ওখানেই চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে একটা। সে চাকরি থেকে—এই চাকরি। দিল্লীতে থাকলে প্রতিনিয়তই কোন না কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। নানা অপ্রীতিকর কথা কানে আসে, নানা অপ্রিয় কথা কইতেও হয়। জালন্ধরের বহু লোকই দিল্লীতে থাকে, আসা-

যাওয়াও করে অনেকে নিয়মিত। যদিও ঠিক জালন্ধর শহরে তাদের বাড়ি নয়, তবু এতদূরেও নয় যে সেখানকার খবর শহরে তথা দিল্লীতে পৌঁছবে না। সেই জন্যেই সে দিল্লী ছেড়েছিল। এক শ্রেণীর লোক আছে, অকারণ কথা-চালাচালি ক'রে আত্মীয়বিরোধ বাড়িয়ে তোলাতেই যাদের আনন্দ। তাদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতেই পালিয়ে এসেছিল সে। যতই হোক, নিজের ভাই এবং ভাবী। তাদের সম্বন্ধে মনে বিদ্বেষ দেখা দিলে সে বিদ্বেষ শুধু তিক্ততাতেই শেষ হয় না, একটা জ্বালারও সৃষ্টি করে। আর সে জ্বালা বিদ্বেষের পাত্র পর্যন্ত পৌঁছয় না, নিজেকেই দগ্ধ করে। তার চেয়ে দূরে চলে যাওয়াই ভাল, বহুদূরে—যেখানে আত্মীয়-পরিজন ও পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম।

সেই জন্যেই এই সুদূর বাংলা মুলুকে, এই কলকাতা শহরে চলে এসেছিল সে। চাকরি ভালই পেয়েছিল অবশ্য। বেশ উচ্চমধ্যবিত্ত আধা-ফিরিঙ্গী হোটেলে থেকেও কুলিয়ে যেত তার। তাছাড়া শুধু চাকরিই করত না—সেই সঙ্গে কিছু কিছু টুক্‌টাক্ ব্যবসাও করত। সুদূর প্রবাসের নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটাবার জন্যেই আরও ওটা ধরেছিল সে, অফিসে অফিসে স্টেশনারী সরবরাহের কারবার। কিন্তু সময়টা তাতে এমনি কাটে নি, কিছু কিছু এসেছেও। হেলায়-ফেলায় মাস গেলে দুশো-আড়াইশো টাকা এসেছে তার।

হয়ত এটা না এলেই ভাল হ'ত। আজ তাই মনে হয়। আর্থিক সচ্ছলতা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই আনে না শুধু, তার আড়ালে বহু কু-অভ্যাস এবং কুফলও নিয়ে আসে। টাকাটা যদি সদ্ব্যয়ে না যায় তো অসদ্ব্যয়েই যাবে। শুধু টাকা জমানোতেই যাদের আনন্দ, হরকিষেণ তাদের দলে নয়। টাকা রোজগার করা খরচের জন্যেই—টাকার বিনিময়ে আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবার জন্যেই। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার এই ধারণা ছিল। বিয়ে করে নি সে—কেউ উদ্যোগী হয়ে দেয় নি বলেই। আত্মীয়-স্বজনরাই এ বিষয়ে তৎপর হয় সাধারণত। তার বেলাও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। দিল্লীতে থাকার সময় কথাটা উঠেছিল। দু-চারজন পরিচিত ভদ্রমহিলা তাঁদের বয়স্থা কন্যাকে এগিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তার আত্মীয়

—কাজেই কোন প্রলোভনেই টলে নি সে। যাদের কাছ থেকে পালাতে চায়, স্বেচ্ছায় তাদের ফাঁস গলায় পরবে কেন?…সেখানে বিয়ে হয় নি আত্মীয়-আত্মীয়ারা উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে—এখানে হয় নি উদ্যোগী হবার মতো কোন আত্মীয়-আত্মীয়া ছিলেন না বলে।

কিন্তু বিবাহ হয় নি বলেই নারীর স্বাদ পাবে না—এমন কোন নিয়ম নেই। সুস্থ সমর্থ তরুণ, তার হাতে যদি প্রচুর পয়সা থাকে এবং কলকাতার মতো শহরে একা অভিভাবকহীন অবস্থায় বাস করে সে—তো স্ত্রীলোকের সঙ্গ-সাহচর্যের অভাব হবার কথা নয় তার। হরকিষেণেরও হয় নি। তবে যাদের সঙ্গ সে করেছে তাদের বেশীর ভাগই বাজারের মেয়েছেলে। হোটেল-ক্যাবারের নাচওয়ালী—অথবা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ঐ ধরনের গণিকা, যারা রাত আটটার পর চৌরঙ্গী-ধরমতলার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ভদ্র পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার সুযোগ যে একেবারে হয় নি তা নয়—অফিসের বাঙালী বন্ধুরা অনেকেই নানা উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেছে তাদের বাড়িতে, বিনা উপলক্ষেও ডেকে নিয়ে গেছে আড্ডা দেবার জন্য। হরকিষেণ সে সব নিমন্ত্রণ নিতে দ্বিধা করে নি—তবে সেখানে সে সাবধানেই থেকেছে বরাবর। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং ওপক্ষ থেকেই প্রশ্রয় এসেছে কিছু কিছু—কিন্তু সে-সব ক্ষেত্রে, বিপদের সঙ্কেত পাওয়া মাত্র, সভয়ে সরে এসেছে। লোকে যাই ভাবুক বা আজ যাই-ই কেন না প্রমাণিত হোক—তার মনের কাঠামোটা মোটামুটি ভদ্রই, অযাচিত সৌজন্যের ঋণ অকৃতজ্ঞতায় শোধ দিতে মন চায় নি তার।

এই সব হোটেল-ক্যাবারে বা কোন গণিকালয়েই সম্ভবত জোন্‌স্‌-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। আজ আর সে প্রথম পরিচয়ের কথা মনেও নেই। কে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল—কী সূত্রে, তা সে অনেক চেষ্টা ক'রেও মনে আনতে পারে না। সাধারণত এই ধরনের হতভাগ্য লোককে সে এড়িয়েই চলত সযত্নে—কেন যে এর বেলায়ই অন্যথা ঘটেছিল, তা সে ভেবে পায় না। নিতান্ত ভাগ্যটা খারাপ ব'লেই হয়ত এ দুর্বুদ্ধি হয়েছিল ওর।

পুরোপুরি হতভাগা বলতে যা বোঝায় বুড়ো জোন্‌স্‌ ছিল তাই। অবশ্য ঠিক বুড়োও সে হয় নি তখনও, বয়স তার পঞ্চাশেরও নিচে ছিল সে সময়ে—অন্তত সমস্ত হিসেব গুনে তাই মনে হয়—তবে বয়স যাই হোক, বুড়ো যে সে

হয়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অপরিমিত মদ্যপান এবং অমানুষিক অত্যাচার তাকে বহুদিন আগেই জরাগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল। চুল পেকে, পাতলা হয়ে, দাঁত পড়ে গিয়ে—সত্তর বছরের মতোই চেহারা দাঁড়িয়েছিল তার। নইলে গায়ের রঙটা যে তার বয়সকালে খাঁটি সাহেবদের মতোই ছিল, তা মানবদেহের সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়েও বোঝা যেত বেশ।

সব চেয়ে মজার কথা—জোন্‌স্ নাকি এককালে লেখাপড়াও শিখেছিল। চাকরিও করত ভাল অফিসে। কিন্তু সে সব নিতান্তই কোন্ পুরাযুগের কাহিনী। হরকিষেণের সঙ্গে যখন পরিচয় হয়েছে তার, তখন জোন্‌স্‌ও ঐসব পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়—তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে, শৌখীন ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করলে দু-এক আনার বেশী মিলবে না, এখানে ভদ্র-ভাবে 'ধার' চাইলে দু-এক টাকা তো বটেই—চার-পাঁচ টাকাও মিলতে পারে।

আর তা-ই দিয়েছিল হরকিষেণও। কে জানে কেন, লোকটার ওপর দয়াই হয়েছিল তার। বোধহয় ওর কথাবার্তার ধরনে, ভাষার মার্জিত ব্যবহারে—এক কথায় ওর প্রাক্তন জীবনের সম্ভ্রান্ততার পরিচয়ে। শিক্ষিত ভদ্রলোক, এই অবস্থায় এসে পৌঁচেছে—হোক নিজের দোষে—তবু সে অনুকম্পারই পাত্র। আর ঠিক নিজের দোষে কিনা তাই বা কে জানে। ভাগ্য অনেক সময়ে অকারণেই অকরুণ ব্যবহার করে মানুষের সঙ্গে, সে পরিচয় তো সে অনেকবারই পেয়েছে তার এই জীবনে। বুদ্ধিনাশ, সে তো ভাগ্যেরই প্রভাব।

প্রথম দিন পুরো দশটি টাকাই দিয়েছিল সে জোন্‌স্‌কে। তারপর যখনই চাইত পাঁচ সাত—খুচরো যা থাকত পকেটে—নির্বিচারে দিয়ে দিত ওর প্রসারিত হাতে। তবে জোন্‌স্-এরও একটা গুণ ছিল, রোজ রোজ বিরক্ত করত না সে। একই লোকের কাছে মাসে একবারের বেশী সে ধার চাইত না। কখনও কখনও, সম্ভব হ'লে সময়ের ব্যবধান আরও বেশী রাখত সে, অর্থাৎ পারতপক্ষে, অন্য কোথাও কোন ব্যবস্থা করতে পারলে সে আর এক-জনকে ঘন ঘন বিরক্ত করত না। অকারণে দাতার চিত্তকে তিক্ত ক'রে তুলতে নেই—ভিক্ষান্নে জীবন-ধারণের এই বড় সত্যটা তার জানা ছিল।

যাই হোক—বোধ করি ওর দানের অঙ্ক দেখেই—ওর সচ্ছলতার গন্ধ

পেতে দেরি হয় নি জোন্‌স্‌-এর। ফলে ক্রমশ ওর ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে হোটেলেও আসতে শুরু করল সে। সেটা খুব ভাল লাগত না হরকিষেণের, তবু চক্ষুলজ্জাতেই কতকটা—নিষেধও করতে পারত না। হয়ত ওর মানবতা-বোধেও বাধত খানিকটা।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল হরকিষেণ, জোন্‌স্‌ রেস খেলে। ভিক্ষা ক'রে পাওয়া টাকা নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। নিজ-চোখেই দেখল সে। হরকিষেণের ও ব্যাধি ছিল না, দৈবাৎ এক-আধ দিন বন্ধুবান্ধব-দের পাল্লায় পড়ে হয়ত মাঠে যেত, তাও সব সময় নিজে খেলতও না, সুদ্ধ মাত্র দর্শক হিসেবেই যেত সে। জোন্‌স্‌কে দেখেও প্রথমে ওর মনে হয়েছিল যে, সে এখানে তার শিকারের খোঁজেই এসেছে। কিন্তু সে ভুলও ভাঙল। নিজ-চোখেই দেখল পর পর দুবারের খেলায় বাজী ধরতে—এবং হারতেও। অবিশ্বাস্যই মনে হয়—কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে কেমন ক'রে! তাছাড়া, এবার ওর মনে পড়ল—মনে মনে হিসেব ক'রে মিলিয়ে দেখল—রেসের সিজ্‌নে সাধারণত শনিবারেই ওর স্ত্রীর অসুখ বাড়ে, ছেলেমেয়েরা কোন-না-কোন দুর্ঘটনায় পড়ে। এতদিন এর কার্য-কারণ অত তলিয়ে বোঝে নি সে—আজ বুঝল।

হরকিষেণ ওকে দেখলেও জোন্‌স্‌ দেখে নি। সে পরের দিনই যথারীতি স্ত্রীর দুঃসহ কলিক-পেনের ফিরিস্তি নিয়ে এসেছিল আটটা টাকা ধার চাইতে। স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে—যাওয়া-আসার ফিটন ভাড়া চাই—তা-ছাড়াও যদি ওষুধ কিনতে হয়। তার হাতে একেবারে কিছুই নেই।

হরকিষেণ আর সেদিন সামলাতে পারে নি নিজেকে। যা নয় তাই বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল ওকে। শাসিয়ে দিয়েছিল যে, এবার হোটেলে এলে কি পথে কোথাও তাকে বিরক্ত করলে সে পুলিসে খবর দেবে। সেদিনের মতো মুখ ম্লান ক'রেই চলে গিয়েছিল জোন্‌স্‌। কিন্তু তাই বলে সে একেবারে ওর ভরসা ত্যাগ করে নি। ওর ভরসা ত্যাগ করলে তার চলবে না—তা সে জানত। তাই নিজের আর তখন-তখনই আসবার সাহস না হ'লেও প্রার্থনার হস্ত প্রসারিত করেছিল ঠিকই। বেশী দিনও নয়—মাত্র দিনতিনেক পরেই। তার প্রতিনিধি হিসাবে এসেছিল লুসী—জোন্‌স্‌-এর বছর পনেরো বয়সের

বড় মেয়ে। বাপের হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে তারই একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়েছিল সে।

লুসীকে সেই প্রথম দেখল হরকিষেণ। মলিন সুতো-বার-হয়ে যাওয়া পোশাকে আর দুঃখ-কষ্ট-দুশ্চিন্তায়—অনাহার-অত্যাচারে মলিন, শীর্ণ দড়ি-পাকানো চেহারায় জোন্‌স্‌-এর যে সাম্প্রতিক আকৃতি দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে লুসীর মতো মেয়ের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক কল্পনাই করা যায় না। হরকিষেণও কোন দিন কল্পনা করে নি। তার ধারণা ছিল পথে ঘাটে যে সব শ্যামাঙ্গী য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে দেখা যায়—জোন্‌স্‌-এর স্ত্রী-কন্যারাও সেই-রকম কিছু হবে।

কিন্তু লুসী এসে দাঁড়াল ওর চোখের সামনে খাঁটি ইংরেজ-দুহিতার মতোই। হয়ত চর্মের শুভ্রতায় সামান্য একটু তফাত আছে—কিন্তু সেটাও হঠাৎ বোঝা যায় না। বরং হরকিষেণের বিশ্বাস তাতেই আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। লুসীর দিকে চেয়ে সেদিন মনে হয়েছিল হরকিষেণের—একটি সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুল। তেমনি ভঙ্গুর, তেমনি শুদ্ধ—পবিত্র। তাই ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সত্ত্বেও ওর ওপর কঠোর হ'তে পারে নি। ওর মুখের ভাবে, বিনত ভঙ্গীতে এবং কুণ্ঠিত কাতর কণ্ঠস্বরে, হরকিষেণের দৃষ্টি স্নিগ্ধ কোমল হয়ে এসেছিল। বরং সে-ই কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করেছিল নিজেকে—এই মেয়ের বাপকে অপমানিত ক'রে তাড়াবার জন্যে। তাই জোন্‌স্‌-এর সঙ্গে সম্পর্ক জানবার পরও লুসীকে বসতে বলেছিল সে। হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়েও ছিল। এবং যদিচ সে চিঠির এক বর্ণও বিশ্বাস করে নি, তবুও প্রার্থিত সমস্ত টাকাটাই দিয়েছিল। তারপর লুসীকে চা-খাইয়ে, অতিরিক্ত পাঁচটা টাকা দিয়ে অনেক মিষ্টি কথা বলে বিদায় দিয়েছিল।

সে-ই প্রথম—কিন্তু সেই শেষ নয়।

এর সপ্তাহ দুই পরে লুসী আবার এল। কিন্তু হরকিষেণের মনে হ'ল এর আগে এলেও মন্দ হ'ত না। মনে হ'ল এ ক'দিন ধরেই যেন সে এর আগমনের আশা করেছিল। না আসাতে একটা সূক্ষ্ম হতাশা বোধই করেছে যেন। তখন হরকিষেণের বয়স তেত্রিশ-চৌত্রিশের কম নয়। অর্থাৎ প্রায়

মেয়ের বয়সী লুসী। সুতরাং এই আগ্রহ বা আকর্ষণে যে দোষণীয় কিছু থাকতে পারে, তা তখনও বুঝতে পারে নি হরকিষেণ।

বুঝতে পারল অনেক পরে, যখন আরও বারকতক লুসীকে পাঠিয়ে যথেষ্ট প্রশ্রয় এবং উৎসাহ পাবার পর ভরসা ক'রে জোন্‌স্ নিজেই আবার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল। এবার আর জোন্‌স্‌কে তাড়াল না বটে তবে আকার-ইঙ্গিতে সে স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল যে, অতঃপর সে পিতার চেয়ে পুত্রীকে দেখলেই বেশী খুশী হবে এবং তাতে জোন্‌স্-এরও অধিকতর সুফল প্রাপ্তি ঘটবে।

জোন্‌স্ বোধকরি এর জন্যে তৈরীই ছিল। সে আর, ইংরেজীতে যাকে বলে ঝোপেঝাড়ে লাঠি চালানো, তা না ক'রে একেবারে খোলাখুলিই বন্দোবস্তের কথাটা তুলল। এক বছরের ওপর ওদের ঘরভাড়া বাকী পড়েছে, বাড়ওলা ডিগ্রীও পেয়েছে ওদের উচ্ছেদের—এখন যদি অবিলম্বে তাকে অন্তত দুশো টাকা না দিতে পারে, তাহলে তিন-চারদিনের মধ্যেই তাদের ফুটপাথে এসে দাঁড়াতে হবে। এছাড়াও তাদের কিছু পোশাক-আশাক না করালেই নয়, সেও অন্তত একশো টাকার ধাক্কা। হরকিষেণ যদি দু-একদিনের মধ্যে এই তিনশো টাকা দিতে পারে, তাহ'লে সপ্তাহখানেকের জন্যে লুসীকে ওর সঙ্গে ছেড়ে দিতে রাজী আছে সে। যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে হরকিষেণ।

অতি ঘৃণিত প্রস্তাব, এ প্রস্তাবের জঘন্যতা উপলব্ধি করার মতো শিক্ষা-দীক্ষা হরকিষেণের যথেষ্টই ছিল, সুতরাং সেই মুহূর্তেই শুধু প্রত্যাখ্যান করা নয়—প্রস্তাবকারীকে যথোচিত অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত ছিল তার—কিন্তু তা সে পারে নি। সে-মুহূর্তে যেন এক শয়তান ভর করেছিল তার মাথায়, তাই লোভেরই জয় হয়েছিল। সে তখনই তিনশো টাকার বেয়ারার চেক লিখে দিয়েছিল জোন্‌স্-এর হাতে।

তবু তখনও হয়ত বাঁচার পথ ছিল। তখনও পিছিয়ে আসা চলত। তখনও নিষেধ করা চলত জোন্‌স্‌কে। কিন্তু মধুর মরণে যে মরতে চায় সে পিছিয়ে আসবে কেন? সে বরং অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষাই করেছিল মহাসর্বনাশের সেই দিনটির।

জোন্‌স্ অবশ্যই তার কথার খেলাপ করে নি। আরও শ'খানেক টাকা

আদায় ক'রে নিয়ে সে একদিন কন্যাকে নিজে এনে হরকিষেণের গাড়িতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। আসানসোলের এক রেল-বাংলোতে সে-ই ঘর ঠিক ক'রে দিয়েছিল—কোন এক বন্ধু ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে ব'লে। ব্যবস্থার কোন ত্রুটিই হয় নি—জোন্‌স্‌-এর দিক থেকেও অকৃতজ্ঞতার অভাব ঘটে নি কিছু। সবটাই সেদিন মসৃণ গতিতে চলে গিয়েছিল।

হরকিষেণ বোধহয় উন্মত্তই হয়ে উঠেছিল—নইলে লুসীর মুখের দিকে চেয়েও সেদিন প্রতিনিবৃত্ত হ'তে পারে নি কেন? শান্তভাবেই সঙ্গে গিয়েছিল—প্রতিবাদ চেঁচামেচি কি কান্নাকাটিও করে নি—তবু তার মুখের সে প্রফুল্ল শতদলটি যে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তা তো ওর নজর এড়াবার কথা নয়। তাছাড়া—তখন না হ'লেও, পরে নিভৃতে যে সে চোখের জলও ফেলেছিল তাও তো হরকিষেণ দেখেছে! তখনও অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসতে পারত সে। কিন্তু সে সব কিছুই করে নি—নিদারুণ নিপাতের পথেই এগিয়ে গিয়েছিল।...

লুসী মুখ বুজে সব সহ্য করলেও লুসীর মা করতে পারেন নি। স্বামীর এই হীন জীবনযাত্রায় যে তাঁর বরাবরই একটা নীরব প্রতিবাদ ছিল তা জানত না হরকিষেণ, কখনও কল্পনাও করে নি। আসলে মাথাও ঘামায় নি, ওদের জানাশোনার বাইরে এমন একটা মানুষ যে আছে তা কোনদিন ভেবে দেখে নি। তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যখন সচেতন হ'ল তখন আর ভাববার অবসর রইল না।

ওরা আসানসোল থেকে ফিরতে লুসিকে নিয়ে তার মা সোজা চলে গিয়েছিলেন লুসীর ইস্কুলে। ক্রীশ্চান মিসনারী ইস্কুলে পড়ত লুসী। পড়ত অনেক আগে, অর্থাৎ ইদানীং অর্থাভাবে সে পড়া বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। তবু সেখানে গিয়েই কেঁদে পড়লেন লুসীর মা। মাদার সুপিরিয়র সব শুনে তাঁকে আশ্বাস দিলেন, লুসীকে দিলেন আশ্রয়। কথা দিলেন যে আর কেউ কখনও লুসীর কোন অনিষ্ট যাতে করতে না পারে—সে ব্যবস্থা তিনি করবেন এবং এ অনিষ্টেরও যথোচিত প্রতিকার হবে—লুসীর মা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। মাদার সুপিরিয়রই লুসীকে নিয়ে গিয়েছিলেন পুলিসের কাছে। সেখানে সমস্ত কথাই বলেছে লুসী, কিছুই গোপন করে নি। কেনই বা করবে—হরকিষেণও তা

আশা করে নি, দোষও দেয় নি লুসীকে সে জন্যে। আজও তা দেয় না। তার পর বিধাতার রুদ্ররোষ নেমে এসেছে রাজপুরুষের ন্যায়দণ্ডের মধ্য দিয়ে। ডাক্তারী পরীক্ষা, সাক্ষীসাবুদ কিছুই বাদ দেয় নি পুলিস। এখানকার হোটেলের ভৃত্যরা, আসানসোলের বাংলোর মালিক, সেখানকার চাকরবাকর—সবাই ঠিক ঠিক বলেছে—সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অভাবই হয় নি। মামলা চলে গেছে তার সহজ সত্য পথ ধরে।

হয়ত হরকিষেণ প্রাণপণ চেষ্টা করলে, প্রচুর টাকা খরচ করলে কিছু একটা ব্যবস্থা হ'তে পারত, সাক্ষীগুলোকে অন্তত ভাঙিয়ে নেওয়া চলত। কিন্তু সে চেষ্টাও করে নি হরকিষেণ। হয়ত একটু অনুতপ্তই হয়েছিল মনে মনে। লুসী সম্বন্ধে তার আচরণের কোন সৎব্যাখ্যা বা সমর্থন খুঁজে পায় নি সেও—নিজের মনের মধ্যে। তার চেয়ে, ন্যায়বিচারকে তার সহজ পথ ধরে চলতে দিলে অপরাধ যদি কিছুটা কমে তো কমুক—এই কথাই বুঝিয়েছে নিজেকে। আর তার ফলেই একদা তার অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গিয়ে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ব্যবস্থা হয়েছে।

সেই কারাদণ্ডের মেয়াদ আজ শেষ হ'ল আজই তার মুক্তির দিন। এই মাত্র বড় সাহেব তাকে ডেকে তার পোশাক, প্রাপ্য টাকা-পয়সা সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার যে সব মালপত্র হোটেল থেকে এনে পুলিসে জমা ক'রে দেওয়া হয়েছিল তার জন্যেও একটা চিরকুট কেটে দিয়েছেন। এই চিরকুট দেখালেই সব ফেরত পাবে সে। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে আবার সে তার পূর্বের জীবনে না হোক পূর্বের পরিচিত ও অভ্যস্ত পরিবেশে ফিরে যেতে পারে। অন্তত সরকারের তরফ থেকে কোন বাধা রইল না আর।

কিন্তু সত্যিই তাই পারে কি?

তা কি সম্ভব আর?

চাকরিটা আর নেই। সে খবর হাজতে থাকাকালীনই পেয়েছে সে। থাকবে অবশ্য এমন আশাও করে নি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, আর কোন ভদ্র চাকরি পাবারও ভরসা রইল না কোথাও। যে সব ছোটখাটো সরবরাহের কাজ করত—সেও ঐ অফিস-সংক্রান্ত পরিচয়ের দৌলতেই।

তারা আর নিশ্চয় জেলখাটা কয়েদীকে সে সব অর্ডার দেবে না। দিলেই বা তাদের কাছে মুখ দেখাচ্ছে কে? তাছাড়া সেখানে ওর অভাবে কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে নেই নিশ্চয়ই, আর কেউ যোগান দিচ্ছেই—তাকেই বা সরাবে কেন তারা?

না, এখানে আর ওর জীবিকা সংগ্রহের কোন পথ নেই। অফিসে কিছু টাকা হয়ত পাওনা হবে—শেষ ক'দিনের মাইনে এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা বাবদ। কিন্তু তাও তারা দেবে কিনা কে জানে। কী আইন এ ক্ষেত্রে—তাও সে ভাল জানে না। সে নিজে গিয়ে তদ্বির করতে পারবে না এটা ঠিক—যদি চিঠি লিখে আদায় হয় তো হবে। কিন্তু তা কি হবে কিছু।

এক ভরসা—ব্যাঙ্কে বোধ হয় কিছু আছে। তবে সেও বেশী কিছু নয়। টাকা জমানোর প্রয়োজন কোন দিনই বোধ করে নি সে। চাকরি রয়েছে, চাকরি যেদিন যাবে পুরোপুরি ব্যবসায় ভর দেবে। তাছাড়া প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা আছে। ইন্‌সিওরেন্সের টাকা আছে—ভাবনা কি? টাকা জমাতে যাবে কী দুঃখে?···যেটুকু জমা আছে, খরচ করে উঠতে পারে নি বলেই আছে। সে হয়ত বড় জোর হাজার দেড়েক কি হাজার দুয়েক হবে—এর বেশী নয়। আপাতত সেই কটি টাকাই অবলম্বন। কিন্তু তাতে কদিনই বা চলবে? বিশেষ এই শহরে যদি হোটেলে থাকতে হয় কোথাও।

না, এখানে থাকা চলবে না। বড় বেশী পরিচিত লোক এখানে। সবাই জেনেছে কথাটা, সংবাদপত্রে নাম-ধাম-বিবরণ সবই ছাপা হয়েছে। অতঃপর তাকে সকলেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে, হয়ত সামনাসামনি পড়লেও মুখ ঘুরিয়ে নেবে। হরকিষেণের থেকে চরিত্রবান নয় তারা বেশির ভাগই—হয়ত আরও ঢের বেশী চরিত্রহীন, ঢের বেশী অমানুষ, তবু তার দিকে অবজ্ঞা-বিদ্রূপ-ঘৃণা মেশানো দৃষ্টিতেই চাইবে। আইন তাদের সে অধিকার দিয়েছে। তারা এখনও কেউ ধরা পড়ে নি—সেইটেই তাদের জোর।

এখান থেকে চলে যেতে হবে। দূর কোনও বাইরে কোথাও। অবিলম্বেই—হাতের ঐ কটি টাকা নিঃশেষ হবার আগেই। অফিসের টাকা পাবার জন্যেও অপেক্ষা করা চলবে না। কারণ তা পেতে পেতে এ সামান্য টাকার হয়ত কিছু অবশিষ্ট থাকবে না আর। সেটা শেষ অবধি আদৌ পাবে

কিনা ঠিক কি? অনিশ্চিতের জন্য এ নিশ্চিতটুকু হারানো চলবে না। এই সম্বল ক'রে দূর কোন শহরে গিয়ে যদি কোন ছোটখাটো ব্যবসা করতে পারে তবেই বাঁচবার সম্ভাবনা। সামান্য কোন ব্যবসা—যা চার-পাঁচশো টাকা মূলধনেই করা যাবে। যা বেশির ভাগ নির্ভর করবে ওর কায়িক পরিশ্রম করার শক্তির ওপর। তাতে প্রাচুর্যের মুখ দেখবে না হয়ত কোনদিনই। দিন রাত পরিশ্রম ক'রে হয়ত কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাটুকুই হবে মাত্র। কিন্তু তাতে ওর দুঃখ নেই। সাচ্ছল্য, স্বাচ্ছন্দ্য—নিছক প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা —তা সুখের চেয়ে দুঃখই ডেকে আনে বেশী।···

না, বেশী সে আর চায় না। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্যেই শুধু যেটুকু দরকার—তারই কি হাঙ্গামা কম? যে জীবন এখন তার সামনে, যে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে—সে জীবনে যে বিস্তর সমস্যা। এত কি পোষাবে—এই তুচ্ছ জীবনটার জন্যে? এসব হাঙ্গামা কি নিতান্তই অর্থহীন মনে হবে না? কী আশা আছে তার, কী ভবিষ্যৎ—কিসের জন্যে এত কাণ্ড করবে সে?

আত্মহত্যা করতে সে চায় না—তবে এখান থেকে বেরিয়ে আবার ভালভাবে বাঁচবে, সভ্য মানুষদের মধ্যে তাদের একজন হয়ে—এ আশাও আর তার নেই। আশা-আকাঙ্ক্ষা কোনটাই না। এইখানেই যদি বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারত!

দেয় না এরা—কোনমতেই দেয় না? সম্ভব নয় কি একেবারেই?···

কদিন আগে রহস্যছলে জিজ্ঞাসা করেছিল সে বড় সাহেবকে। বড় সাহেব আবার সাহিত্যিক, তিনি নাকি এইসব কয়েদীদের নিয়েই বইটই লেখেন। তিনিও বোধ হয় ওর সমস্যাটা বুঝেছিলেন, মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বলছিলেন, 'এর জন্যে আর এত ভাবনা কি, বাইরে বেরিয়ে কাউকে খুন-জখম কি রাহাজানি-গুণ্ডামি কিছু একটা ক'রে ফ্যালো —তা হলেই আবার নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারবে। আবার অন্তত দুটি-তিনটি বছরের জন্যে তো নিশ্চিন্ত বটেই—যদি খুন কি আধাখুন করতে পার কাউকে তো কম ক'রে চোদ্দ বছর। জেলে আসবার উপায়ের অভাব কি?'

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'কিন্তু কেন হরকিষেণ, জীবনে একটা ভুল করেছ বলেই কি জীবনের কাছ থেকে সব পাওনা শেষ হয়ে গেছে? লাইফ ইজ গ্রেটার—বহু রহস্য, বহু আনন্দ, অজানিতের বহু রোমাঞ্চ এখনও জমা আছে জীবনে, সাহস ক'রে এগিয়ে যাও। সংসারের মুখোমুখি দাঁড়াও—সবই আবার পাবে। দু হাত ভরে দেবেন ভগবান। এখনই হতাশ হচ্ছ কেন?'

বড় সাহেব লোক ভাল—ওকে উৎসাহ দেবার জন্মেই এসব কথা বলেছেন। কিন্তু কোন্ পথে কী ভাবে সে আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবে—এ কথার বোধ করি—আর একটু জেরা করলে—কোন উত্তরই দিতে পারতেন না তিনি। ও সব কথার কথা, বইতেই পড়া ভাল। জীবন ঢের বেশী রূঢ়, ঢের বেশী বাস্তব।

ভাবতে ভাবতে কখন ফটকের দিকেই এগিয়ে এসেছে হরকিষেণ তা বুঝতে পারে নি, এখন ক্যাঁচকোঁচ ঘড়ঘড়াং ক'রে লোহার মজবুত দরজা দুটো খোলার আওয়াজ হ'তে চমক ভাঙল তার। ফটক খুলে সান্ত্রীরা অপেক্ষা করছে, একটু বিস্মিত হয়েই ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে তারা। এখানে ঢুকতেই লোকে দ্বিধা করে, বেরোতে করবে কেন? ওদের অভিজ্ঞতায় এমন কখনও দেখে নি বোধ হয়। হরকিষেণ লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল তার পিছনে সশব্দে। আজ ও-ই একমাত্র কয়েদী মুক্তি পেল সম্ভবত, আর কেউ বেরোল না—ওর আগে বা পরে।

বেরিয়ে এসে আবার থমকে দাঁড়াল হরকিষেণ।

সেই সমস্যা—এখন কোথায় যায়? এখনই এই মুহূর্তে কোথায় গিয়ে ওঠে সে?

হোটেলে-টোটেলে নাকি আজকাল আর জায়গা পাওয়া যায় না। হয়ত খুব বেশী দামের হোটেলে গেলে স্থান মিলতে পারে—কিন্তু সে সঙ্গতি কই তার? অথচ আর কোথায়ই বা যাবে—আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউই তো তার নেই। আগেও ছিল না, এখন তো আরও নেই। সোজা স্টেশনেই

যাবে নাকি সে ? না, আগে দু-একটা হোটেল ঘুরে দেখবে ? কোথায় যাবে, কিসের ব্যবসা করবে সেটাও তো ভাবা দরকার একটু। বাজারটা ঘুরে দেখা দরকার—এখন কি ভাবে কি কাজ-কারবার হচ্ছে।

অন্যমনস্ক উদাসীনভাবে সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল তেমনি। এখনও অফিসের ভিড় শুরু হয় নি, এ পথে গাড়ির সংখ্যা কম। একটু দূরেই বড় রাস্তার মোড়, সেখানে ট্রাম-বাস যাচ্ছে শব্দ ক'রে—গাড়িও যাচ্ছে এখানকার চেয়ে বেশী। কিন্তু এসব শব্দ তার কাছে অপরিচিত নয় বলেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারল না ; এ সব তো সে প্রত্যহই শুনত জেল থেকে। দেখতেও পেত মধ্যে মধ্যে—দোতলায় উঠলে। গাড়ির শব্দ শুনেই সে বলে দিতে পারে কখন অফিসের সময় শুরু হ'ল, কখন নটা বাজল। নটা-দশটা চারটে-পাঁচটার শব্দ তার বিশেষ পরিচিত।

না, মন তার এসব দিকে ছিল না। আশে পাশে ডাইনে বাঁয়েও নয়। অন্যমনস্ক ভাবেই বেরিয়ে এসেছে। তেমনি ভাবেই সামনের দিকে তাকিয়ে আছে, সে চেয়ে থাকার মধ্যে দেখার কাজটা নেই একেবারেই। তাই কখন যে ও আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে তাও টের পায় নি। নিজের প্রত্যক্ষ ভবিষ্যতের চিন্তাতেই ডুবে তলিয়ে গিয়েছিল সে তখন। একে-বারে চমক ভাঙল যখন আস্তে আস্তে পিঠে ভীরু হাতখানি অতি সন্তর্পণে ছুঁয়াল ও একবার—

চমকেই ফিরে তাকাল, কিন্তু তাকিয়ে যেন আরও চমকে উঠল।

দীর্ঘ চাড়ে চার বছরের ব্যবধান। না, আরও বেশী, পৌনে পাঁচ বছর হবে বোধ হয়, হাজতে থাকার দিনগুলো ধরলে। সেদিন যে ছিল কিশোরী আজ সে তরুণী, চিনতে পারার কথাও নয়। প্রথমটা সেইজন্যেই চমকে উঠেছিল। একটি অপরিচিতা তরুণী ইংরেজ-কন্যা এসে তার গায়ে হাত দেয় কেন ? তাকে আবার ওর কি দরকার !

কিন্তু তার পরই মনে হ'ল এ যেন তার পরিচিত। কোথায় যেন এর একটা নিবিড় যোগসূত্র আছে তার জীবনের সঙ্গে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরে আরও একবার চমকে উঠল সে—প্রবলতর বিস্ময়ে।

লুসী। লুসী এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে? লুসী তাকে স্পর্শ করেছে, তার সঙ্গে কথা কইতে চাইছে? লুসী?

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল হরকিষেণ। এমন বিহ্বল বোধ হয় সে সেই প্রথম দিনেও হয় নি—যেদিন পুলিসে এসে তাকে ধরে। সে কোন কথাই কইতে পারল না, লুসীকে কোন প্রশ্ন করতেও পারল না। কেন এসেছে ও, কী জন্যে আসা সম্ভব—তাও কিছু ভেবে পেল না। ভাববার ক্ষমতাই যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল—

লুসীই কথা কইল। আস্তে আস্তে, যেন আর একটু ভরসা খুঁজে পেয়ে তার হাতটা ধরে বলল, 'চল, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আমাকে? আমাকে তুমি নিয়ে যেতে এসেছ?'

তেমনি বিহ্বলভাবেই প্রশ্ন করল হরকিষেণ।

'হ্যাঁ, আর কে আসবে বলো? বাবা, বাবা থাকলে বোধ হয় আসতেন—কারণ তিনি সত্যিই খুব অনুতপ্ত হয়েছিলেন—কিন্তু তিনি তো আর নেই।'

'নেই? ও বুড়ো জোন্‌স্‌ মরে গেছে তাহ'লে?'

কেমন যেন খাপছাড়াভাবে বলে কথাগুলো। খাপছাড়াভাবে যে বলে তা সেও বুঝতে পারে।

'হ্যাঁ, গত বছর। হঠাৎ পথ চলতে চলতে হার্ট ফেল করে। কিন্তু সে সব কথা পরে শুনো। এখন চলো—দেরি হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওখানে, বেশীক্ষণ থাকতে দেবে না—।'

'গাড়ি? গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে? কার গাড়ি লুসী?'

'গাড়ি আমাদের অফিসের। ম্যানেজারকে বলে চেয়ে এনেছি। এগারো-টার মধ্যে ফিরিয়ে দেবার কথা। চল চল, আর দাঁড়িও না। আমারও ঐ পর্যন্ত মেয়াদ—'

'কিন্তু কোথায় যাব—মানে—'

কথা শেষ করতে পারে না। তবে লুসীর আকর্ষণে অভিভূতের মতোই তার সঙ্গে চলতে শুরু করে।

চলতে চলতেই শোনে, 'তোমার জন্যে একটা ঘর ঠিক করে রেখেছি। আমিও থাকি সে বাড়িতে, আমি থাকি দোতলায়, তোমারটা তেতলায়।

ফার্নিশ্‌ড্‌ ঘর, যেমন হয় আমাদের পাড়াতে। ইলিয়ট রোডে—তোমার কি অসুবিধা হবে?'

'না না, অসুবিধা হবে কেন? কোথায় যাব—কোথায় গিয়ে একটু মাথা গোঁজার স্থান পাব—সেইটেই তো ভাবছিলুম দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে কথা নয়—লুসী, তুমি—তুমি আমার জন্যে এসব করছ, এইটেই যে ভাবতে পারছি না।'

'আমি করব, সেইটেই তো স্বাভাবিক মিঃ লাল,—তুমি যে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের সমস্ত পরিবারকে উপবাসের হাত থেকে বাঁচিয়েছ, সে কথা মা হয়ত সবটা জানত না, কিন্তু আমি তো জানতাম। শেষ মুহূর্তে একেবারে রাস্তায় বসার হাত থেকেও তুমিই বাঁচিয়েছ, নইলে আদালতের পেয়াদা এসে জোর ক'রে বার ক'রে দিত ঘর থেকে—সে অপমান থেকে তুমিই রক্ষা করেছ। এটা যদি ভুলি স্বয়ং ক্রাইস্টকেই অস্বীকার করা হয় যে। সেদিন ছেলেমানুষ ছিলুম, মনে অনেক স্বপ্নও ছিল, তুমি আমার সর্বনাশ করলে এই চিন্তাটাই বড় হয়েছিল। মার কাছে এসে কেঁদেছিলুম, মাও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, তাঁদের আমলের হিসাবে শিক্ষিতাও ছিলেন, অতটা হীনতা সহ্য করতে পারেন নি—ছুটে গিয়েছিলেন একটা যা-হোক প্রতিকারের আশায়। সেদিন আমিও মিথ্যা বলবার কোন কারণ খুঁজে পাই নি। তাছাড়া—তাছাড়া তোমার হয়ত এটুকু প্রায়শ্চিত্তের দরকারও ছিল।'

গাড়িতে উঠে বসেছে ততক্ষণে, কলকাতার চিরপরিচিত রাস্তা দিয়ে বড় গাড়িখানা ছুটে চলেছে। পাশাপাশি বসে ওরা, লুসীর প্রসাধনের গন্ধ ওর নাকে—ঝুঁকে-পড়া-মাথাটার চূর্ণ কুন্তলের স্পর্শ ওর গায়ে। এ কি স্বপ্ন দেখছে সে? কোন সুদূর কল্পনা এসব?

'তুমি—তুমি কি চাকরি করছ লুসী?'

কতকটা যেন ভয়ে ভয়ে সম্ভ্রমের সঙ্গে প্রশ্ন করে হরকিষেণ।

'হ্যাঁ—সেই মাদার সুপিরিয়রই বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে আমাকে পড়িয়ে দু বছরে জুনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক'রে দেন। তার মধ্যেই শর্টহ্যাণ্ড শিখতে শুরু করেছিলাম—ওঁদেরই অনুগ্রহে চাকরি পেতেও দেরি হয় নি। এ একটা আমেরিকান ফার্ম। মাইনে ভাল, অনেক সুবিধেও আছে।'

'কিন্তু—' একটু থেমে প্রায় মরীয়া হয়েই বলে হরকিষেণ, আর না বললেও

নয়—তাছাড়া বিহ্বলতাটা অনেকখানি কেটে এসেছে, থিতিয়ে ভাবতে পারছে এবার অনেকটা, 'কিন্তু ঘরের ভাড়া—মানে এসব খরচা কদিনই বা টানতে পারব। পুঁজি আমার হাতে খুবই কম, সেটা ভেঙে বেশী দিন খাওয়া চলবে না!'

'না না—তা খেতে হবে কেন। আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি। আমি তোমার জন্যেও একটা চাকরি ঠিক ক'রে রেখেছি যে। ভাল চাকরি—এখনই শ-তিনেক ক'রে পাবে সব মিলিয়ে। তোমার ঘরের ভাড়া তো মোটে ষাট টাকা!'

'চাকরি? কোথায়? কী চাকরি? আমাকে আমার পরিচয় জেনে চাকরি দেবে কেউ?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে হরকিষেণ।

খুব সহজ শান্তভাবেই উত্তর দিল লুসী, 'চাকরি আমাদেরই অফিসে। বুড়ো ম্যানেজার আমাকে খুব ভালবাসেন, মেয়ের মতো দেখেন। তাঁকে সব বলেছি, তিনি জেনে শুনেই দিচ্ছেন। আর সে কথা তিনি আর কাউকে বলবেনও না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো। তবে একটা কথা—তাঁকে বলতে হয়েছে যে, তুমি আমার ফিয়াসেঁ, আমরা পরস্পরের কাছে বাগ্‌দত্ত!'

তবে কি জেলার সাহেবের কথাই ঠিক? অজানার রোমাঞ্চ এখনও তার ভাগ্যে ছিল? ছিল আনন্দ, ছিল আশা? বুকের রক্ত যেন চল্‌কে উঠল, বহুক্ষণ কোন কথা কইবারও শক্তি রইল না। তারপর আস্তে আস্তে লুসীর একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে স্খলিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'লুসী, এ কি সত্যি! সত্যিই তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ? এতটা অনুগ্রহের কথা যে আমি ভাবতেই পারি না।'

হাত টেনে নিল না লুসী, তবে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেই উত্তর দিল, 'ভয় নেই, আমি তোমাকে এ নজীর দেখিয়ে বাধ্য করব না—যদি ইচ্ছা না হয় তোমার পথ খোলাই রইল। আমি এ স্বাধীনতাটুকু নিয়েছি শুধু তোমার চাকরির খাতিরেই—'

'কিন্তু লুসী, তুমি কি বুঝতে পারছ না—এ আমার আশাতীত, কল্পনাতীত সৌভাগ্য? এ যদি সম্ভব হয়—একদিনের জন্যেও তোমাকে স্ত্রী-রূপে পাই—তাহ'লে পরমুহূর্তেই আমি মরে যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু লুসী, তুমি—তুমি

মন স্থির করেছ তো? এ আমি আকাশে প্রাসাদ রচনা করছি না তো?'

'মন আমার স্থির হয়েই আছে—বহুদিন ধরেই। অবশ্য এজন্যে বোধ হয় বাবাই কতকটা দায়ী। জানো, ঐ ব্যাপারের পর থেকে বাবা অন্য রকম মানুষ হয়ে গিয়েছিল একেবারে? প্রায়ই আমার কাছে চোখের জল ফেলত আর বলত, এ আমি কী করলুম! কী করলুম! সে এঞ্জেল, উপকারের বদলে কোন দিন তো কিছু চায় নি—আমি কেন লোভ দেখিয়ে তাকে এ পথে টেনে আনলুম! এতখানি বেইমানী কি ঈশ্বর ক্ষমা করবেন?...আর বলত, আমার দিন ফুরিয়ে এল মা—পারিস তো তুই আমার হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিস। ...শেষের দিকে মাও বুঝেছিল, প্রার্থনার সময় নিত্য প্রার্থনা করত তোমার যাতে কোন অনিষ্ট না হয় সেই জন্যে।'

বলতে বলতেই তার সেই সুন্দর দুটি চোখের কূল ছাপিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল, সে গাঢ় স্বরে বলল, 'তারা সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছিল হরকিষেণ। পার তো তাদের ক্ষমা ক'রো।'

'ছিঃ! একথা বলে তুমি আমার অপরাধ বাড়িয়েই দিচ্ছ। তাঁদের কোন দোষ নেই—দোষ আমার মনের, আমার লালসার। আমি যা ভোগ করেছি তা তারই শাস্তি। ..তা নয়, কিন্তু আমি কি ভাবছি জান লুসী, আমার বোধ হয় তোমার জীবন থেকে সরে যাওয়াই উচিত।'

'কেন—?' চমকে ওঠে লুসী, বিবর্ণ হয়ে ওঠে যেন নিমেষে।

'এ তুমি যা করতে চাইছ—এ হয়ত শুধুই কৃতজ্ঞতা, কিংবা অল্প বয়সের আবেগ—তুমি হয়ত এটাকেই কর্তব্য বলে ভেবেছ,—কিন্তু আমারও একটা কর্তব্য আছে লুসী; তোমার আমার বয়সের ব্যবধান অনেক, আমার এই প্রায়-প্রৌঢ় জীবনটাকে বোঝার মতো তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া—না লুসী, দরকার নেই, আমি দূরে কোথাও চলে যাই। তুমি আমার কথা ভুলে যাও, তুমি নতুন করে জীবন শুরু করো, সুখী হও।'

শেষের দিকে কি ওর গলা কেঁপে যায়? এবার লুসী হাসে একটু। বোধ হয় আশ্বস্তও হয় কতকটা। বলে, 'এতদিন যে দণ্ড ভোগ করলে—দেশের আইনের কাছে যে অপরাধ করেছ তার জন্যে। কিন্তু আমার কাছেও তো তোমার কিছু অপরাধ ঘটেছে—সে শাস্তি ভোগ না করেই যাবে

কোথায়? এখন থেকে তোমার সেই কারাদণ্ড শুরু। চল—এসে গেছি আমরা।'

হরকিষেণের চোখেও জল এসে গিয়েছিল। সে প্রাণপণে সেটা দমন করে বলল, 'এ কারাদণ্ডটা যাবজ্জীবন হলে আর বলবার কিছু নেই লুসী—আমার ভয় অল্পে না শেষ হয়। না পাওয়া একরকম, পেয়ে হারালে পাগল হয়ে যাব।'

'সে তখন দেখা যাবে। কয়েদী নিজে পালাতে চেষ্টা না করলে এ কারাবাস শেষ হবে না, আমি কথা দিচ্ছি।'

আর কোন কথা কয় না হরকিষেণ। লুসীর হাত ধরে একান্ত নির্ভয়ে উঠতে থাকে ওপরে।

স্বপ্ন?

স্বপ্ন নিয়ে লিখতে হবে—হুকুম এসেছে।

কিন্তু কি লিখব?

কোন স্বপ্নের কথা?

স্বপ্ন তো মানুষের একটা নয়। একটা স্বপ্নকে নিয়ে আঁকড়ে থাকে না কেউ। যে থাকে, থাকতে পারে—সে হয় মহাপুরুষ, না হয় পাগল। অথবা দুই-ই।

সাধারণ মানুষের সারা জীবনই তো স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। এই স্বপ্নর মধ্যেই তার মুক্তি। মনের মধ্যে এই স্বপ্ন সৃষ্টি করার জন্যেই রূপকথার প্রয়োজন। স্বপ্ন আশা এসব না থাকলে মানুষ বাঁচত কি ক'রে? বাঁচার অর্থ কি?

আমার জীবনও কিছু সাধারণ জীবনের বাইরে নয়। সুতরাং স্বপ্ন দেখা দেবে এ তো স্বাভাবিক। বহু স্বপ্ন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নের চেহারা পালটেছে, কিন্তু স্বপ্ন ছাড়ে নি। আজও, এখনও আমি নানা স্বপ্ন দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখছি।

ছোটবেলার স্বপ্ন সেই বয়সের মাপেই ছিল। এক এক সময় মনে হ'ত গাইয়ে হব। যেদিন স্কুলে গানের ক্লাসে যোগ দিতে গিয়ে শুনলাম আমার

গলায় সুর নেই, সেদিন প্রতিজ্ঞা করলুম গাইয়ে হবোই। বোপদেবের গল্প তখন সন্থ পড়েছি। মাটির কলসী বসাতে বসাতে পাথরে গর্ত হয়ে যায় দেখে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন—গণ্ডমূর্খ থেকে বিখ্যাত বৈয়াকরণ হলেন। চেষ্টায় কি না হয়। গান তো সামান্য জিনিস (!!)।

তারপর বয়স আর একটু বাড়ল, কাশীতে কেটেছে বাল্যকাল, বড় বড় গাইয়ের অভাব ছিল না তখন, বিলেত-ফেরৎ দিলীপকুমারও তখন অহল্যাবাই ঘাটে গান গাইতেন বসে—ক্রমশ বোধগম্য হল, সত্যিই ওটা আমার দ্বারা হবে না।

খুব ছোটবেলায় ইঞ্জিনীয়ার হবার স্বপ্ন দেখতুম প্রায়ই। হ্যাঁ, সাধারণ সাধ বা ইচ্ছা নয়, স্বপ্নই। কারণ সে ইঞ্জিনীয়ার এমন সব কাণ্ড করবে যা পৃথিবীতে কেউ কখনও করে নি। এমন ব্রীজ বানাবে সে—যাতে কলকাতা থেকে ট্রেন ছেড়ে সোজা বদরীনারায়ণে গিয়ে থামবে, যাত্রীদের পাহাড় ভাঙার নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে হবে না (তখন নিদারুণ কষ্টই ছিল) চাই কি বদরী-নারায়ণ থেকে লণ্ডন কি কেপটাউনও চলে যেতে পারে, মাটিতে পা দিতে হবে না।

এমন কি, বিশ্বাস করুন, সন্ন্যাসী হবার স্বপ্নও দেখেছি বহুদিন পর্যন্ত। বহু ভক্ত পায়ে লুটোবে, কত লোক দেবতার মতো পূজো করবে, শিষ্যদের পয়সায় সারা পৃথিবী ঘুরবো—বিলেত আমেরিকার সাহেব মেম পর্যন্ত শিষ্য হবে।

পরবর্তী জীবনেও সে স্বপ্ন, সে ইচ্ছা যায় নি, রঙ বদলেছে মাত্র। ততদিন কিছু কিছু সত্যকার সাধু দেখেছি, তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি—তখন মনে হয়েছে আমিও একজন সিদ্ধ সাধক হবো। যা বলব তাই ফলবে, হিমালয়ের কোন গুহায় অনন্ত আনন্দরসে ডুবে থাকব।

আবার এক সময় এটা মতলবেও দাঁড়িয়েছিল। জীবন যুদ্ধের শুরুতে হতাশ হয়ে পড়ে মানুষ অতি সহজে। অভিজ্ঞতা বেশী হলে, পোড় খেয়ে শক্ত হয়। সেই সব ভেঙেপড়া মুহূর্তে মনে হত—'দুত্তোর, তার চেয়ে মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পরে রাতারাতি সন্ন্যাসী হয়ে যাই। খাওয়া-পরা আরামের তো অভাব থাকবে না।' ব্যবসার কৌশলও কিছু কিছু এমনি পেটটালা সাধুদের দেখে শিখে নিয়েছিলুম। গীতা ভাগবত আর চৈতন্য-চরিতামৃত—

ভাল পড়া না থাক, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি। দিতে পারলেই বেশ চলে যাবে। চেহারা সুন্দর হলে অত কিছুও লাগে না বোধ হয়। আমার অবশ্য অত ভাল নয়—S. A. ছিল না কখনই, তবু সন্ন্যাসী সাজার পক্ষে একেবারে মন্দ ছিল না তখন।

তবে লেখক হবার স্বপ্নই প্রধান এবং স্থায়ী—তা বলা বাহুল্য। সে স্বপ্নের ফল কি দাঁড়িয়েছে বা কি দাঁড়াবে তা 'বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালই বলতে পারবেন, কোন 'সমানধর্মাও' হয়ত উৎপন্ন হবেন কখনও।

বড় কষ্টদায়ক এ স্বপ্ন। প্রতিদিন রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগের ইতিহাস। কত অকারণ লাঞ্ছনা, কত দুর্ভোগ—তার মধ্যে যদি ঐ বড় হবার, অমর হবার স্বপ্ন না থাকত তাহলে তো পাগল হয়ে যেতুম।

সে কথা থাক।

সম্পাদক মশাই এসব কথা শোনার জন্যে কি এ ফরমাশ করেছেন? বোধ হয় না। পাঠকরা আগেও যা (প্রধানত) চাইতেন—এখনও বোধহয় তাই চান—রোম্যান্স।

নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের বিবিধ বিচিত্র কাহিনী। স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার অসংখ্য অজস্র ইতিহাস।

দারিদ্র্যের মধ্যে যাকে মানুষ হতে হয় তার কাছে জীবনযুদ্ধের কথাটাই প্রধান। অগ্রগণ্য। আমার কাছেও তাই ছিল। সেজন্যে একসময় শিক্ষক হওয়ারও সাধ (স্বপ্নও বলতে পারেন) ছিল, কিন্তু উপার্জনের প্রয়োজনটা বড় হয়ে পড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলো নেওয়া হল না। ফলে—'হৃদিরুত্থায় বিলীয়ন্তে' সে-সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল।

এর মধ্যে রোম্যান্স? স্বপ্ন?

হ্যাঁ, তাও হয়েছে, সে সব স্বপ্নর কোন-কোনটা দীর্ঘকাল বহন করেছি, আজও করছি। আমার উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে ট্রেনে একদিন এক রাত্রি যে পনেরো-ষোল বছরের মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, তাকে ঘিরে বহু স্বপ্ন দীর্ঘকাল দেখেছি, আজও সে স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নি। সে স্মৃতি নিয়ে যে গল্প লিখেছি—কোন কোন বন্ধু বলেন সে-ই নাকি আমার শ্রেষ্ঠ গল্প।

আমি জানি অতটা কিছু নয়।

আর সেই এলাহাবাদের শিক্ষিকা—তরুণী হেডমিস্ট্রেস, তাকে নিয়েও স্বপ্ন দেখেছি। আজও হয়ত দেখি। অমন সুন্দরী খুব কম দেখেছি জীবনে। সে-সময় কিছুদিন কারণে অকারণে এলাহাবাদ গেছি। তারপর আর হয় নি। বহুকাল পরে সেনেট হল থেকে বেরোতে দেখেছি এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে। দাঁড়িয়ে কথাও বলেছি। লক্ষ্য করেছি সিঁথিতে সিঁদুর নেই কিন্তু লালপাড় শাড়ি পরনে। অর্থাৎ তখনও অবিবাহিতা। ভাবতে ভাল লাগে যে আমার জন্যেই আর কাউকে বিয়ে করেন নি।

তবে এদের নিয়ে গল্প লেখা হয়ে গেছে।

সেগুলো অবশ্য গল্পই—'কিছু তার আলো, কিছু ঢাকা ছায়ে।'

তবে গল্পও লেখা হয় নি—এমন একটি স্বপ্নও আছে বৈকি। এই দীর্ঘকাল সে স্বপ্ন অন্তরে লালন করছি।

তবে তার কথাও সোজাসুজি লিখব, এমন কথা কখনও ভাবি নি। মনের গোপন স্বপ্ন মনেই থাকবে—এই রকম ধারণা ছিল। খুব গোপনে, খুব নিভৃতে একটি বিশেষ বেদনার মধ্যে সে থাক না—ভেবেছিলুম।

কিন্তু আজ যে সম্পাদক মশাই এ লেখার ফরমাশ করেছেন তিনি রসিক পাঠক—মনে হচ্ছে তাঁর হাতে হয়ত এ স্বপ্নর কথা তুলে দেওয়া যায়।

ক্ষতিই বা কি। বয়সও তো হল চুয়াত্তর। কদিন বা বাঁচব। যার কথা সেও হয়ত বেঁচে নেই। থাকলেও এ লেখা তার হাতে পড়বে না।

ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরি, বই বিক্রীর চেষ্টায়। বহু শিক্ষক স্নেহ করেন, সাহায্যও করেন। এটা আমার একুশ-বাইশ বছর বয়সের কথা। জীবন-যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল। তখন এ স্নেহের বড় প্রয়োজন ছিল।

অন্তরঙ্গতা যাঁদের সঙ্গে হয়েছে—তাঁদের বাড়িতে যেতেও অসুবিধা নেই। আর তা গেলে রবিবারগুলোও কাজে লাগানো যায়।

এমনিই এক হেডমাস্টার—গোকুলপুরের জগদীশবাবু। অতি সজ্জন, সেই জন্যে প্রায় নিঃস্ব। আধা সন্ন্যাসী—গেরুয়া পরেন না, কিন্তু সাধন-ভজনের বহু চিহ্ন দেখা যায় তাঁর বেশভূষায়। এক রবিবার অপরাহ্নে তাঁর বাড়ি পৌঁছে প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ে আটকে গেলুম। তখনকার দিনের

ভাল পড়া না থাক, তা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি। দিতে পারলেই বেশ চলে যাবে। চেহারা সুন্দর হলে অত কিছুও লাগে না বোধ হয়। আমার অবশ্য অত ভাল নয়—S. A. ছিল না কখনই, তবু সন্ন্যাসী সাজার পক্ষে একেবারে মন্দ ছিল না তখন।

তবে লেখক হবার স্বপ্নই প্রধান এবং স্থায়ী—তা বলা বাহুল্য। সে স্বপ্নের ফল কি দাঁড়িয়েছে বা কি দাঁড়াবে তা 'বিপুলা পৃথ্বী ও নিরবধি কালই বলতে পারবেন, কোন 'সমানধর্মাও' হয়ত উৎপন্ন হবেন কখনও।

বড় কষ্টদায়ক এ স্বপ্ন। প্রতিদিন রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগের ইতিহাস। কত অকারণ লাঞ্ছনা, কত দুর্ভোগ—তার মধ্যে যদি ঐ বড় হবার, অমর হবার স্বপ্ন না থাকত তাহলে তো পাগল হয়ে যেতুম।

সে কথা থাক।

সম্পাদক মশাই এসব কথা শোনার জন্মে কি এ ফরমাশ করেছেন? বোধ হয় না। পাঠকরা আগেও যা (প্রধানত) চাইতেন—এখনও বোধহয় তাই চান—রোম্যান্স।

নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের বিবিধ বিচিত্র কাহিনী। স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার অসংখ্য অজস্র ইতিহাস।

দারিদ্র্যের মধ্যে যাকে মানুষ হতে হয় তার কাছে জীবনযুদ্ধের কথাটাই প্রধান। অগ্রগণ্য। আমার কাছেও তাই ছিল। সেজন্যে একসময় শিক্ষক হওয়ারও সাধ (স্বপ্নও বলতে পারেন) ছিল, কিন্তু উপার্জনের প্রয়োজনটা বড় হয়ে পড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলো নেওয়া হল না। ফলে—'হৃদিরুত্থায় বিলীয়ন্তে' সে-সাধ অপূর্ণই রয়ে গেল।

এর মধ্যে রোম্যান্স? স্বপ্ন?

হ্যাঁ, তাও হয়েছে, সে সব স্বপ্নর কোন-কোনটা দীর্ঘকাল বহন করেছি, আজও করছি। আমার উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে ট্রেনে একদিন এক রাত্রি যে পনেরো-ষোল বছরের মেয়েটির সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, তাকে ঘিরে বহু স্বপ্ন দীর্ঘকাল দেখেছি, আজও সে স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নি। সে স্মৃতি নিয়ে যে গল্প লিখেছি—কোন কোন বন্ধু বলেন সে-ই নাকি আমার শ্রেষ্ঠ গল্প।

আমি জানি অতটা কিছু নয়।

আর সেই এলাহাবাদের শিক্ষিকা—তরুণী হেডমিস্ট্রেস, তাকে নিয়েও স্বপ্ন দেখেছি। আজও হয়ত দেখি। অমন সুন্দরী খুব কম দেখেছি জীবনে। সে-সময় কিছুদিন কারণে অকারণে এলাহাবাদ গেছি। তারপর আর হয় নি। বহুকাল পরে সেনেট হল থেকে বেরোতে দেখেছি এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে। দাঁড়িয়ে কথাও বলেছি। লক্ষ্য করেছি সিঁথিতে সিঁদুর নেই কিন্তু লালপাড় শাড়ি পরনে। অর্থাৎ তখনও অবিবাহিতা। ভাবতে ভাল লাগে যে আমার জন্যেই আর কাউকে বিয়ে করেন নি।

তবে এদের নিয়ে গল্প লেখা হয়ে গেছে।

সেগুলো অবশ্য গল্পই—'কিছু তার আলো, কিছু ঢাকা ছায়ে।'

তবে গল্পও লেখা হয় নি—এমন একটি স্বপ্নও আছে বৈকি। এই দীর্ঘকাল সে স্বপ্ন অন্তরে লালন করছি।

তবে তার কথাও সোজাসুজি লিখব, এমন কথা কখনও ভাবি নি। মনের গোপন স্বপ্ন মনেই থাকবে—এই রকম ধারণা ছিল। খুব গোপনে, খুব নিভৃতে একটি বিশেষ বেদনার মধ্যে সে থাক না—ভেবেছিলুম।

কিন্তু আজ যে সম্পাদক মশাই এ লেখার ফরমাশ করেছেন তিনি রসিক পাঠক—মনে হচ্ছে তাঁর হাতে হয়ত এ স্বপ্নর কথা তুলে দেওয়া যায়।

ক্ষতিই বা কি। বয়সও তো হল চুয়াত্তর। কদিন বা বাঁচব। যার কথা সেও হয়ত বেঁচে নেই। থাকলেও এ লেখা তার হাতে পড়বে না।

ইস্কুলে ইস্কুলে ঘুরি, বই বিক্রীর চেষ্টায়। বহু শিক্ষক স্নেহ করেন, সাহায্যও করেন। এটা আমার একুশ-বাইশ বছর বয়সের কথা। জীবন-যুদ্ধের প্রারম্ভ কাল। তখন এ স্নেহের বড় প্রয়োজন ছিল।

অন্তরঙ্গতা যাঁদের সঙ্গে হয়েছে—তাঁদের বাড়িতে যেতেও অসুবিধা নেই। আর তা গেলে রবিবারগুলোও কাজে লাগানো যায়।

এমনিই এক হেডমাস্টার—গোকুলপুরের জগদীশবাবু। অতি সজ্জন, সেই জন্যে প্রায় নিঃস্ব। আধা সন্ন্যাসী—গেরুয়া পরেন না, কিন্তু সাধন-ভজনের বহু চিহ্ন দেখা যায় তাঁর বেশভূষায়। এক রবিবার অপরাহ্ণে তাঁর বাড়ি পৌঁছে প্রচণ্ড কালবৈশাখী ঝড়ে আটকে গেলুম। তখনকার দিনের

মাঠ বা ডাঙায় পূর্ণ বীরভূমের কালবৈশাখী যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন, সে কি ভয়ানক জিনিস। তার মধ্যে পথে বেরোনোর কথা ভাবা যায় না।

অগত্যা থেকে যেতে হল। জগদীশবাবু অম্লানবদনে নির্দ্বিধায় এই অপরিচিত অতিথির আপ্যায়নের ভার তাঁর পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে গোপার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের সাধনকুটিরে চলে গেলেন সারারাতের জন্যে। কারণ সেদিন অমাবস্যা। সারারাত জপধ্যানে কাটাবেন তিনি। না, সুন্দরী কি সুশ্রীও তেমন নয়—তবে মুখখানি বড় সুকুমার, কচি। বয়সের তুলনাতেও ছোট দেখায়—পরে শুনেছিলাম—সে-ই বলেছিল, তার বয়স তখন ষোল চলছে। সে সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে।

নিঃস্ব উদাসীন লোকের সংসার, ঘরে প্রায় কিছুই ছিল না। তবু মেয়েটি অসাধ্য সাধনই করেছিল। আহার্যের দৈন্য তার যত্নে তার কর্ম-নিপুণতায়, অস্খলিত অতন্দ্র সতর্কতায় ঢেকে দিয়েছিল। বস্তুত জীবনে এমন নৈপুণ্য এবং আন্তরিক যত্ন তার আগে বা পরে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

নিজের বিছানাই একটা ফরসা শাড়ি পেতে ভদ্রস্থ করে দিয়েছিল—বাইরের ছোট ঘরটাতেই 'তার হয়ে যাবে' খুব সহজভাবে এই আশ্বাস দিয়ে। সেই ঘরেই জগদীশবাবু থাকেন, তাঁর শয়নও ঐখানে। একটি মাদুর পাতাই থাকে ঐ ঘরে, বাইরের লোক এলে বসে, ছেলেদেরও পড়ানো চলে, নিজে শয়নও করেন। পৃথক কোন শয্যা নেই।

যাই হোক, সে ঘরও বিশেষ প্রয়োজনে লাগে নি। মেয়েটি আমার কাছে গল্প শুনতে চেয়েছিল, রাত বিশেষ হয় নি এই অজুহাতে। ভাল বিলিতী বইয়ের গল্প। আমার নাকি অনেক বই পড়া আছে। বাবার মুখে শুনেছ সে।

বলেছিলাম গল্প। অনেক-কটা গল্পই বলেছিলাম। প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত, ভাল ভাল নাম করা বইয়ের গল্প-সারাংশ।

. কারণ আমাকেও ক্রমশ নেশায় পেয়ে গিয়েছিল। গল্প বলার এমন পুরস্কার আর কখনও পাই নি। বিস্ময় তার যত, আমার তার চেয়ে বেশী। এমন ভাবে কেউ গল্প শুনতে পারে, তা জানতুম না। দুটি স্থিরনিবদ্ধ চোখে একই সঙ্গে একাগ্রতা, তন্ময়তা, বিপুল বিস্ময়, আর—সর্বোপরি শ্রদ্ধা।

সে শ্রদ্ধা আমাকে না ঐ গল্প-লেখকদের—না দুই-ই—তা জানি না।

সেই এক রাত্রিই। সকাল ছটায় বাস ধরতে হয়েছিল। ততক্ষণে জগদীশবাবুও এসে গিছলেন। তখনও তিনি পরম নিশ্চিন্ত। আতিথেয়তার কল্পনা যতদূর যায়—যথাসাধ্য, ঐ মেয়েটিই করেছে। কোন প্রেমের সুর বাজে নি—পাঠকরা যা আশা করছেন—তবে সেই শ্রদ্ধার ভাবটি ছিল শেষ অবধি।

আর দেখা হয় নি তার সঙ্গে। অবশ্য খবর দু-একবার পেয়েছি।

জগদীশবাবু হঠাৎ মারা যান বলে বি. এ. পাসও করতে পারে নি বেচারী। ভাগ্যস্রোতে ভাসতে ভাসতে এক আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামসেবিকা হয়ে ছিল। তারপর কোথায় গেছে কি হয়েছে তা জানি না।

শুনেছি সে বিয়ে করে নি। আরও জেনেছি—জগদীশবাবুর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হয়ে যেতে,—তাঁর কথার ভাবে চোখের ইঙ্গিতে যতটা যা বুঝেছি—সে আমার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল।

তা হোক। আমি ব্যস্ত হই নি তার জন্যে। তাকে পাবার কোন চেষ্টাও করি নি।

তখনও আমি অবিবাহিত, চেষ্টা করলে পেতে পারতুম। মনে হয়েছিল, থাক না। স্বপ্নই থাক। স্বপ্নটা দিনে দিনে যে রূপ নিয়েছে বাস্তবের সঙ্গে তা মিলত না। মেলে না। 'প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ' লেগে স্বপ্ন ভেঙে যায়, তিক্ততায় ভরে যায় জীবন। 'ঘরেতে এল না যে, মনে তার নিত্য যাওয়া আসা', এই তো ভাল।

সে রাত্রিটি ভুলি নি। সেইটেই সত্য।

তবে তা স্বপ্নে ও কল্পনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কল্পনাই বুঝি বেশী।

তাকে নায়িকাদের মধ্যে ধরে রাখতেও চেষ্টা করেছি। পেরেছি কিনা কে জানে।

না, মন ভরে নি।

যেদিন থেকে লিখছি, নায়িকার স্বপ্নই তো দেখছি। অমুক সাহিত্য-সম্রাটের সব নায়িকাই মূলত এক, নায়কের জঠরের পথে মন কেড়ে নেয়;

অমুক বিখ্যাত লেখকের নায়করা শুধু নায়িকার সঙ্গে কাটা কাটা কথা বলে, দৈহিক প্রেম পর্যন্ত এগোয় না—এসব বিচার করেছি, আর এক আশ্চর্য অতুলনীয়া নায়িকার স্বপ্ন দেখেছি। ডোরা, না অ্যাগ্‌নিস্? নাতাশা, না লেডী ডেডলক? আয়েষা? ললিতা? সুচরিতা? বন্যা? কেটি?

না, আমার স্বপ্নের দেখা নায়িকা হবে অনন্যা।

চেষ্টা করছি সেই আঠারো বছর বয়স থেকে।

খ্যাতি যশ অর্থ একেবারে যে কিছু পাই নি তা নয় কিন্তু এ ছাড়াও কিছু চেয়েছি—এক মানসীকে, বহু বিচিত্র-স্বপ্নে গঠিত নায়িকাকে—জগতের সাহিত্যে যে অতুলনীয়া।

এখনও স্বপ্ন দেখি বৈকি! এখনও মনে হয় সেই শ্রেষ্ঠ চরিত্রটিকে রূপ দিয়ে এ জগৎ থেকে বিদায় নেব।*

গুণিন

বাড়ি থেকে বেরোবার পর চিত্তবাবুর চোখে পড়ল ব্যাপারটা। মেয়ের গলায় সদ্য গড়ানো সোনার হার। আর হাতে ওঁর নিজের অতি শখের জিনিস—অতি কষ্টের জিনিসও বলতে পারেন—হীরের আংটি।

'ও কি রে! এ কী করেছিস? এই দিন-কাল, সন্ধ্যে হয়ে এল—ফেরার পথে রাত হয়ে যাবে—তুই এই পথে ছ হাজার টাকার গয়না পরে বেরিয়েছিস? দেখছিস তোর মা ছ'গাছা গিল্‌টির চুড়ি পরে বে-বাড়ি যাচ্ছে! সর্বনাশ! টাকা তো যাবেই—প্রাণ নিয়ে টানাটানি যে। বে-বাড়িতে এমনিই তো আজকাল হামেশা ডাকাত পড়ে!···না না, খুলে রেখে আয়।'

বলতে বলতেই আরও চোখে পড়ল, ভাইপো নাহুর হাতেও-পৈতের দরুণ তিনটি আংটি, জামায় লাগানো বোতাম। তাকেও একটা ধমক দিলেন। অবশ্য যতটা সম্ভব মৃদু ভাবে—কেন না নাহু দীর্ঘকাল, ওর মার মৃত্যুর পর থেকেই মামার বাড়ি আছে। কদাচ কালেভদ্রে বাড়ি আসে—এবার এই

* বলা বাহুল্য এসব নামই কাল্পনিক।

হায়ার-সেকেণ্ডারী দিয়ে পৈতৃক বাড়িতে এসেছে। সম্ভবত রেজাল্ট না বেরনো পর্যন্ত থাকবে। অন্তত ওর বাবার তাই ইচ্ছে। এতদিন পরে এসেছে মা-মরা ছেলে। ওকে কিছু বললে অভিমান বোধ করা স্বাভাবিক। ওর ওপর আত্মীয়তার জোর চালাতে যাওয়া উচিত নয়।

দশ বছরের মেয়ে টুলটুল ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'কম্ম-বাড়িতেই যদি একটু সেজেগুজে না গেলুম—এসব গয়নাপত্তরের দরকার কি ?'

চিন্তবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বললেন, 'অত কথা তোমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বোঝাতে পারব না—ঘটে একটু বুদ্ধি থাকলে নিজেই বুঝতে পারতে—পাকামো করে তো রোজ খবরের কাগজ নিয়ে বসো সকালে—যা বলছি তাই শোন। ওগুলো খুলে রেখে এসো। নান্টু, তুমিও বাবা অন্তত দুটো আংটি রেখে এসো গে, খুব যদি হয় একটা রাখো।'

চিন্তবাবুর এতটা সতর্কতার কারণও আছে বৈকি। জায়গাটা কলকাতা থেকে বেশ একটু দূরে। তবে বড় কারখানা থাকাতে অনেকটা শহরের মতো জমজমাট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে যে-কোনো দিকে মাইল খানেক গেলেই আবার পল্লীর বাঁক চোখে পড়বে।

কারখানা থাকায় বাজার যেমন জমে, বহু লোকের বসতি গড়ে ওঠে, তেমনি চোর ডাকাত এসে জড়ো হবে—এও স্বাভাবিক। আর তাদের উৎপাত এই শহরতলীর দিকেই বেশী হবে—এও সবাই জানেন।

চিন্তবাবুর বাড়ি এমনই একটা পাড়ায়—যাকে শহরতলী বলাই উচিত। হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করেন। আবার পাড়ার ডাক্তার সরলবাবুর কোন পেসেন্টকে বাড়ি গিয়ে ইঞ্জেকশান দিতে হ'লে তিনি চিন্তবাবুকেই বলে দেন। ওঁর হাত ভাল, রোগীরা পছন্দ করে। দুটো মিলিয়ে সংসারটা এক রকম চলে যায়। তবে সচ্ছলে চলে এমন বলা যায় না কিছুতেই। সংসার তো খুব ছোট নয়। দাদা আছেন—তিনি রেলে কাজ করেন, এক বাড়িতেই থাকেন। তিনিও কিছু কিছু দেন আর স্টেশনে কাজ করেন বলে কলাটা মুলোটা কিছু আসে মধ্যে মধ্যে। বৌদি নেই, বছর আষ্টেক আগে মারা গেছেন। দাদা আর বিবাহ করেন নি। একটি ছেলে নান্টু কলকাতা মামার বাড়ি থেকে পড়াশুনো করে। তার খরচ পাঠাতে হয়, কাজেই দাদা

বেশী ভার বইতে পারেন না।

এ ছাড়াও পোষ্য আছে বাড়িতে। মা একেবারেই অথর্ব। হাঁটুর বাতে প্রায় শয্যাগত। একটি বোন আছে। সে জন্মাবধি বিকলাঙ্গ। তাকে এখনও ধরে চান করাতে হয়, কাপড় ছাড়াতে হয়। চিত্তবাবুর অবশ্য এই একটিই সন্তান—মেয়ে। তবু এই বাজারে এতগুলি প্রাণীর খরচ চালিয়ে শখ-শৌখীনতা করার অবস্থা নয় ওঁর। এবার হঠাৎ কিছু বেশী ধান হওয়ায় —সাধারণত যা হয় তাতে সম্বছরের খোরাকীই চলে না—কিছু টাকা পেয়েছিলেন। দাদাও সেদিকে হাত বাড়ান নি। তাই, ঐটুকু সোনা কেনা সম্ভব হয়েছিল। কোন এক সুদূরকালে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে মনে করেই এই হারটা গড়ানো—পরে বাহার দেবার জন্যে নয়।

'যাও, যাও,' অসহিষ্ণু চিত্তবাবু তাড়া দিলেন আবারও।

অগত্যা মেয়ে মুখ গোঁজ করে গিয়ে দোতলায় শোবার ঘরে রেখে এল। নিজের দুটো গয়না এবং নাতুদার আংটি দুটোও। শোবার ঘরের একদিকে কাঠের একটা মাচা মতো করা আছে। তাতে শীতের লেপ কাঁথা—বাড়তি বালিশ তোশক জমা থাকে, দামী জিনিস সব সময়ে আলমারীতে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না—সেই সব সময়ে এরই মধ্যে একটা ওষুধের টিনের বাক্সয় সাময়িক ভাবে রেখে দেওয়া হয়। টুলটুল সে জায়গা ও বাক্স জানে। সেইখানেই তখনকার মতো রেখে চলে এল।

বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরতে রাত হয়ে গেল অনেক।

সেই অনুপাতেই উঠতেও দেরি হল যমুনার। এমন কিছু বেশী নয়, অন্য দিন ভোর পাঁচটায় ওঠে, আজ সেটা সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেল। কিন্তু চিত্তবাবুর ঘড়ি-ধরা কাজ করা। ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্যর সঙ্গেই স্নান সেরে—পূজা আহ্নিক। তারপর জলযোগ শেষ ক'রে সাতটার মধ্যে বেরোতে হয়। সকালে কিছু কিছু ইঞ্জেকশান থাকেই। সেগুলো সেরে এসে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে চেম্বারে বসেন। রোগীরা সারারাত কষ্ট পেয়েছে হয়ত। তারাও সকালেই ডাক্তারকে সেটা জানাতে চায়।

তার পরও গয়নার কথাটা মনে পড়ে নি যমুনার। পড়ার কথাও নয়।

সারা সকালটা—দুপুর পর্যন্ত তার কাটে নিরন্ধ্র নিরবসরে। দাদা বেরোন সাড়ে নটায়। তাঁর নটার মধ্যে ভাত চাই। সেই সঙ্গে জলখাবারের জন্যে খান পাঁচেক রুটি, একটু ভাজাভুজি। এর মধ্যে মা চেঁচাতে শুরু করেন। তাঁকে মুখ হাত ধুইয়ে চান করিয়ে পুজোর যোগাড় দিয়ে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি জলখাবার দিতে হয়। তবু সাধারণত মার সেবা এঁরা দু ভাই-ই প্রাত্যহিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা এগিয়ে দেন কিন্তু প্রাকৃতিক সব কাজ যমুনাকেই করাতে হয়।

তবু তো এক দিকে ভাল। বামুনের ঘর হ'লেও এঁদের অতটা পিটপিটিং নেই। একশোবার চান করতে বলেন না···

কাজেই একেবারে মনে পড়ল দুপুরে খেতে এসে যখন চিত্তবাবুই কথাটা তুললেন।

'সেগুলো আলমারিতে তুলেছ?'

'ও মা! না তো, যা তোমাদের তাড়া সেই ভোর থেকে—একেবারে ভুলেই গেছি।'

'যাও আগে তুলে রেখে এসো।' চিত্তবাবু তাড়া লাগান।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি। তোমার খাওয়াটা হোক আগে। আর তারই বা দরকার কি। তুমি তো খেয়ে ওপরেই যাবে। তুমিই গিয়ে তুলে রাখো না বাপু। আমি সেই ভোরবেলায় এক কাপ চা খেয়ে আছি। বেলা দুটো বাজে। ভাতগুলো চাল হয়ে গেল। কোন্ সকালের ভাত—'

চিত্তবাবু আর কথা বাড়ালেন না। খেয়ে উঠে স্ত্রীর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা খুলে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

কিন্তু নেমে এলেন এক মিনিটের মধ্যেই।

'কই, ওখানে তো নেই। সে বাক্সটার মধ্যে—'

ভাত বাড়তে যাচ্ছিল যমুনা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সে কি! কি বলছ!'

'দেখবে চলো।'

যমুনাও দ্রুত উঠে গেল। একটা চেয়ারে উঠলে তবে সে মাচায় হাত পায়। এখন চেয়ারের ওপর ছোট টুলটা বসিয়ে ভাল ক'রে দেখল। না, সে

হার বা তিনটে আংটির চিহ্নমাত্র নেই।

'খুকী অন্য জায়গায় রাখে নি তো?' চিত্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

'তা কেন রাখবে। বরাবরই তো এতে রাখা হয়, সে জানে। বরং নিজেই বুদ্ধি ক'রে বাক্সটা নতুন জায়গায় সরিয়ে রাখে।'

তবু ওঁরা সে লেপ তোশক কাঁথার বাক্স নামিয়ে, একটা একটা ক'রে ঝেড়ে দেখলেন। মাচার ওপর হাত বুলিয়েও দেখলেন। কোথাও সে গহনার চিহ্ন নেই।

যমুনার সেদিন আর খাওয়াই হ'ল না। হাঁড়ির ভাত হাঁড়িতে শুকোতে লাগল—সে মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল যতক্ষণ না টুলটুল স্কুল থেকে ফেরে।

টুলটুলকেও ধমক-ধামক কম করা হ'ল না। সে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, 'আমি ঠিক হাতড়ে হাতড়ে ঐ বাক্স টেনে বার ক'রে তিনটে আংটি—দাদা আমার হাতেই আংটি দুটো দেছল—আর হার রেখে, বাক্সটা আবার তোশকের নিচে ঢুকিয়ে দে গেছি, আমার পষ্ট মনে আছে।'

'তা'হলে গেল কোথায়? তাদের কি হাত পা গজাল না পাখা উঠল যে উড়ে যাবে?' যমুনা রাগ করে।

টুলটুলও এবার ঝেঁঝে ওঠে,—'তার আমি কি জানি! তোমরা রাখতে বললে রেখেছি। তাতেই কি আমার যত অপরাধ হয়ে গেল! নিজের জিনিস চুরি করবই বা কেন?'

অর্থাৎ কিছুই হয় না।

কেবলই নানা জল্পনা কল্পনা অনুমান।

মা আর বোন দুজনেই পঙ্গু। তাদের বাদ দিলে থাকেন দাদা আর ভাইপো নান্তু। দাদা এতকাল আছেন, তিনি ঐ সামান্য টাকা চুরি করবেন তা সম্ভব নয়। ঝি আছে একটা ঠিকে। ওঁরা যখন বিয়েবাড়ি যান তার অনেক আগেই সে বাসন মেজে দিয়ে গেছে। আজ সকালে এসে কাজ করেছে সর্বক্ষণ যমুনার চোখের সামনে—তাকেই বা চোর ধরা যায় কেমন ক'রে?

এক একজন এক একটা উপদেশ দেন—মানে অন্তরঙ্গ যারা। যাদের একথা বলা যায়।

কেউ বললেন, থানায় যাও। পুলিসের মারের চোটে সব বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু মারটা দেবে কাকে এ প্রশ্ন তোলা হলে কেউ সদুত্তর দিতে পারেন না।

নলচালা, কড়িচালা—এসব কথাও উঠল। 'বৌমা ভুলে তুলে রাখেন নি তো আলমারিতে?' একজন বললেন।

চিত্তবাবু ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'সে কি আমরা দেখি নি ভাবছেন?'

মনটা ঘুরে ফিরে—স্বামী স্ত্রী দুজনেরই—নাতুর কাছেই যায়। বস্তুত বাইরের লোক বলতে ঐ একটিই বাড়িতে।

এতদিন মামার বাড়িতে ছিল, তারা লোক কেমন কে জানে—কিভাবে তৈরী করেছে। কি শিক্ষা দিয়েছে।

সরলবাবু ডাক্তার দিন দুই পরে খবরটা শুনলেন।

তিনি একটু ভেবে বললেন, 'এক কাজ করো চিত্ত, এখান থেকে মাইল দুই দূরে সরবোলাতে এক পাকা গুণিন আছে আমি শুনেছি, আমার দুই পেশেন্টের বাড়ি চোর ধরে দিয়ে মোটা টাকা নিয়ে গেছে। পাথরের থালায় জল রেখে মন্তর পড়ে দেয়—যে চুরি করেছে তারই মুখ ফুটে ওঠে। তুমি তাকে আনাও। এমনি দশ টাকা ক'রে নেয়—মাল উদ্ধার হ'লে শতকরা দশ টাকা ক'রে বকশিশ। আর হাতে হাতে ধরা পড়লেই সকলে নার্ভাস হয়ে মালের সন্ধান বলে ফেলে—তা পাওয়াও যায় বেশির ভাগ সময়।'

লোভও হয় আবার কেমন যেন ভয় ভয়ও করে চিত্তবাবুর।

যদি সত্যি হয়, যদি সত্যিই লোকটার ক্ষমতা থাকে—কার মুখ ফুটে উঠবে কে জানে!

সকলেই আপন, এক পরিবারভুক্ত। তাদের কাউকে চোর বলে জানলে সারা জীবনটা কি বিষাক্ত হয়ে যাবে না?

নাতু জেদ করে, 'না কাকা, আর ইতস্তত করবেন না। তাকেই আনান। এস্পার-ওস্পার হয়ে যাক। এ আপনার সকলের উপরই সন্দেহটা ঘুরে ঘুরে গিয়ে পড়ছে—আমরা সকলেই অস্বস্তি বোধ করছি।'

ন্যায্য কথা। তবু ঘুরে ফিরে সেই নাতুর ওপরেই সন্দেহটা গিয়ে পড়ে। চোরের মার বড় গলা—এও তাই নয়তো?

যদি তাই হয়, দাদাসুদ্ধ পর হয়ে যাবেন। একমাত্র ছেলে—মাওড়া—দাদা কি ত্যাগ করতে পারবেন?

চিত্তবাবু হয়ত কোনদিনই এতদূর যেতে পারতেন না, কিন্তু জিনিসটা সরল করে দিতেন সরলবাবুই। লোক পাঠিয়ে তিনিই একদিন সে পদ্মনাভ গুণিনকে ডেকে আনলেন। চিত্তবাবুকে শুধু বলে পাঠালেন—সবাইকে একত্র থাকতে বলে যেন একটা কালো পাথরের খোরায় জল রেখে দেন চিত্তবাবু।

আর 'না' বলা যায় না। এক রকমের মনিব, শুভানুধ্যায়ী। তিনি প্রস্তুত হয়েই রইলেন।

পদ্মনাভ গুণিন গুণ গুণ করে কি একটা গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ঢুকল। চারিদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে দাওয়ার ওপর এসে উঠল। কিন্তু আসন পাতা জায়গা, খোরার জল, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না, শুধু লোকগুলোর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

তারপর—এক পাশে মাদুরের ওপর পড়ে থাকা চিত্তবাবুর চিরবিকলাঙ্গ অর্ধবুদ্ধি বোন অনুর সামনে ঝুঁকে পড়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'এই, গয়না-গুলো কোথায় রেখেছিস ?'

চিত্তবাবু, তাঁর মা—হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'আরে ও নড়ে বসতে পারে না।'

'থামুন আপনারা। চুপ করুন। আমি দেখছি।'

প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল আগন্তুক।

তারপর মুঠো করা ডান হাতটা মুখের কাছে ধরে বলল, 'সোজায় বলবি, না এই পিশেচের চালপড়া ছড়াব ? সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরাব ? তাতেও না হয় চিমটে পুড়িয়ে একটু একটু ক'রে চামড়া টেনে ছিঁড়ব। বল্ শীগগির।'

এবার অনু হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠে গুণিনের পা জড়িয়ে ধরল।

গুণিন এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিত্তবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখলেন ?'

এবার সবই জানা গেল।

বহুদিনের তীব্র ইচ্ছা বোধহয় জমা ছিল মনে, আর বিধাতার এই অবিচারের ওপর তীব্র ক্ষোভ। সেদিন আর থাকতে পারে নি। টুলটুলের হাতে হীরের দ্যুতি ছুরির মতোই কেটে কেটে বসেছে ওর সর্বাঙ্গে। এই দাওয়াতেই ও পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়। সেদিনও ছিল। মেয়ের সাভরণে আসা আর নিরাভরণে বেরিয়ে যাওয়া কোনটাই চোখ এড়ায় নি।

দৈবক্রমে এরা বেরিয়ে যাবার পর ওঁদের ঠিকে ঝিয়ের ছেলে তার ফেলে

যাওয়া লাটাইটা নিতে এসেছিল, ততক্ষণ চিত্তবাবুর মা ঘুমিয়ে পড়েছেন একটু, সেই ছেলেটাকে ডেকে বলেছে। ওপরের ঘরে কোথায় কি আছে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'বাক্সগুলো বার ক'রে এনে চুপিচুপি আমাকে যদি দিতে পারিস, আমি কাল তোকে পাঁচটা টাকা দেব। কিন্তু সাবধান, কাউকে বললে আমি না বলব, তোকেই চোর বলে ধরবে।'

ছেলেটা জীবনে কখনও পাঁচ টাকা হাতে পায় নি। এমনি সে চালাক-চতুরও—সে ঠিক ঠিক এনে দিয়েছিল। তাকে টাকার জন্যে পরের দিন আসতে বলে বুকে হেঁটে হেঁটে পা ছুটো টেনে নিয়ে কুয়াতলায় গিয়ে কুয়ায় ফেলে দিয়েছিল অনু। সর্ববঞ্চিত বোন বলেই মধ্যে মধ্যে ছু-এক টাকা ওকে দিতেন চিত্তবাবু—আইসক্রীমওলা কি কোন ফিরিওয়ালা ডেকে যদি কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তো খাবে। কাজেই পাঁচটা টাকার কোন অভাব হয় নি—শুধু তো গোপন স্থান থেকে বার করবার ওয়াস্তা।

গুণিন বললে, 'জল পড়াও আছে, সে মিথ্যে নয় বাবু, তবু একমনে কাজটা করতে হয়—বড্ড চাপ লাগে শরীরে। আর এখন দরকারও হয় না। একটু নামটাম হয়েছ তো—আমি বাড়ি ঢুকলে চোর যে—সে ভয় পাবেই। আমরা মুখ দেখেই বুঝতে প্যারি কে চোর।'

বিতর্কের শেষে

ঘুরতে ঘুরতে সেদিন বাংলাদেশের এক গণ্ডগ্রামে গিয়ে পড়েছিলাম। বেশ বড় জায়গা, গণ্ডগ্রাম না বলে ছোট শহর বলাই উচিত। কাজে গিয়েছিলাম ওখানকার হাইস্কুলে, সেখানকারই বোর্ডিংএ আশ্রয় নিয়েছিলাম।

পরের দিনটা কী একটা উপলক্ষে আধাছুটির দিন ছিল। ঠিক হয়েছে ছুটির শেষে ডিবেটিং হবে, ছেলে ও মাস্টারমশাইরা সকলে বড় হলটাতে জড়ো হয়েছেন, আমার বন্ধু ফাইন আর্টস্-এর মাস্টারমশাই আমাকেও ডেকে নিয়ে গেলেন।

বিতর্কের বিষয়টি ছিল বড় বিচিত্র। শুনলাম শিক্ষাবিভাগ থেকে বিষয়টি ঠিক ক'রে দেওয়া হয়েছে—"আধুনিক যুগে কি শিক্ষকরা কোন সত্যকার শিক্ষা

দিতে পারেন?”

বিষয়টা শুনেই মন খিঁচড়ে গিয়েছিল, বসে ছেলেদের ভাষণ শুনতে শুনতে আরও বিরক্ত হয়ে উঠলাম। ষোল সতেরো আঠারো বছর বয়সের ছেলে সব, অভিজ্ঞতা কম, পড়াশুনো আরও কম। কিছু থিতিয়ে ভাববারও ক্ষমতা নেই। খবরের কাগজে পড়া ও বাইরে পথেঘাটে শোনা বামপন্থী নেতাদের স্লোগান বা ধুয়া পর্যন্ত তাদের দৌড়। তাছাড়া দাদা-কাকাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন আলোচনাও অনেকে শুনে থাকবে। তার অধিকাংশই দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—এখনকার শিক্ষকরা অপদার্থ, ফাঁকিবাজ, অর্থলোভী, —ইস্কুলের চাকরি রাখেন তাঁরা শুধু টিউশ্যনীর লোভে; অসংখ্য টিউশ্যনী, নোটবই সাজেস্‌শান্‌স্ বই লেখা, কোচিং-ক্লাস নেওয়া প্রভৃতিতেই তাঁদের সময় চলে যায়—তাঁরা ক্লান্ত হয়ে ইস্কুলে আসেন। তখন আর ভাল ক'রে পড়ানোর শক্তি থাকে না তাঁদের। ছেলেদের ভালমন্দে তাঁদের মন নেই, নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন নন। দু-একজন পুরাতন-পন্থী শিক্ষক আছেন, যাঁরা এখনও বিশ্বাস করেন যে মারের চোটে গাধা পিটিয়ে মানুষ করা যায়, তার ফলে ছেলেদের মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়; ইত্যাদি, ইত্যাদি—

কয়েকটি ছেলে অবশ্যই শিক্ষকদের দিক টেনে বলল, দু-একজন তার মধ্যে পৌরাণিক যুগের উপনিষদের যুগের কাহিনীও শোনাল কিছু কিছু। শিক্ষকদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা রাখা প্রয়োজন একথাও বলল। কিন্তু তাদের দিকটা তেমন জমল না। যে সব যুক্তি দেওয়া চলতে পারত তা তাদের মনে পড়ল না, যা মনে পড়ল তাও তেমন গুছিয়ে বলতে পারল না। এক কথায় তাদের দিকটা বড়ই ক্ষীণ এবং দুর্বল মনে হ'ল। অপর দিকে বিরোধীদের যুক্তি বেশ প্রবল এবং গরম। ওদের দিকে যারা বলল তাদের অনেকেরই বাচনভঙ্গিও ভাল, সেদিক দিয়েও ওরা শিক্ষক-সমর্থক দলের ওপর এক হাত নিয়ে নিতে পারল। বিশেষ ক'রে দেবব্রত বলে একটি ছেলে—চমৎকার বলল, যেমন সুন্দর তার গলা, তেমনিই বক্তৃতার ভঙ্গী, আর তেমনিই ক্ষুরধার যুক্তি। সে যুক্তিগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে প্রয়োগ করতেও জানে তার জন্য যেখানে যেখানে গলা ওঠাতে নামাতে হবে সে বিদ্যাও তার বেশ আয়ত্ত

দেখলাম। পড়াশুনোও কম নয়—হয়ত কোন অভিভাবকের কাছ থেকে শুনে এসেছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তার স্মৃতিশক্তিরও প্রশংসা করতে হয়—সে অনর্গল প্লেটো য়্যারিস্টটল থেকে শুরু ক'রে স্মাইল্‌স্‌ এমার্সন পর্যন্ত বিভিন্ন চিন্তাবীরদের বাণী উদ্ধার করল। রুসো এবং ভল্‌টেয়ারের নামও করল এক-আধবার। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট এবং সরকারী শিক্ষাবিভাগের মতিগতিরও তীব্র সমালোচনা করল।

এরা যত বলে—শিক্ষকমশাইদের মুখ তত লাল হয়। তাঁদের অনেকেই বিরক্ত রুষ্ট হয়ে অধোবদনে বসে রইলেন কোনমতে। দু-একজন তো পিছন থেকে হল ছেড়ে চলে গেলেন। আমার পাশে যে দুজন মাস্টার মশাই বসে-ছিলেন তাঁরা দুঃখ ক'রে বললেন, 'দেখুন দিকি কর্তাদের কী বুদ্ধি! আমাদের এই সব গালাগাল বসে বসে শুনতে হ'ল। কাল তো আবার ওদেরই পড়াতে যেতে হবে! ভাল ক'রে পড়াতে ইচ্ছে করবে ওদের?...' আমারও খুব খারাপ লাগছিল ব্যাপারটা, তা বলাই বাহুল্য। এমন বাঁদরামিকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই ঠিক হয় নি—এই কথাই মনে হচ্ছিল বারবার।

সেদিনের বিতর্কের সভাপতি ছিলেন খোদ সেক্রেটারী মশাই। তিনিও দেখলাম ব্যাপারটা তত পছন্দ করেন নি। তিনি সুকৌশলে বিরোধীদের একটু ভৎ'সনা করলেন—এসব যুক্তি তারা নিজে ভাবে নি, অপরের কাছ থেকে শুনে আওড়াচ্ছে, স্পষ্টই এ অভিযোগ করলেন এবং বললেন এসব বিতর্কে কোন্‌ পক্ষ জিতল তা বলা উচিত নয়—তিনি বলবেনও না। এই বলে আর কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই বিতর্ক শেষ ক'রে দিলেন।

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার গোড়াগুড়িই একটু অবাক লাগছিল। হেডমাস্টার উপেনবাবু বসেছিলেন আমার সামনেই, লক্ষ্য করছিলাম যে দেবব্রত যত নিষ্ঠুরভাবে শিক্ষকদের আঘাত করছে উপেনবাবুর মুখ তত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। শেষের দিকে মনে হ'ল তিনি ওর কথাগুলো যেন হাঁ ক'রে গিলছেন। অথচ শেষবারে—তার মানে দেবব্রতকে দুবার বলতে দেওয়া হয়ে-ছিল, বিরোধীপক্ষ থেকে ওকেই শুধু সমর্থকদলের জবাব দেবার জন্যে ডাকা হয়েছিল—দেবব্রত আরও কঠিন কঠিন অভিযোগ করল, আরও মর্মান্তিক

অপমান করল শিক্ষকদের।

ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি বলেই, বিতর্কের শেষে যখন ছেলেরা ও মাস্টার-মশাইরা সকলেই হুড় হুড় ক'রে বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন আমি হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গ ধরে রইলুম। ইচ্ছে ছিল একটু নিরিবিলি পেলে তাঁকে কয়েকটা প্রশ্ন ক'রে এই রহস্যটা কিছু পরিষ্কার করব।

কিন্তু প্রশ্ন আর কিছু করতে হ'ল না—উপেনবাবু নিজে থেকেই রহস্যটা পরিষ্কার করে দিলেন।...

হলের শেষপ্রান্তে একটা করিডর বা ঘেরা বারান্দা, উপেনবাবু হন্ হন্ ক'রে সেদিকে খানিকটা এগিয়ে যেতেই ওদিক দিয়ে দেবব্রত উজ্জ্বল মুখে ছুটে এল।

'কেমন হ'ল স্যার?'

উপেনবাবু কোন কথা না বলেই একেবারে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'চমৎকার! অপূর্ব! আমার মুখ রেখেছিস বাবা! তোকে শিক্ষা দেওয়া আমার সার্থক হয়েছে। তবে কয়েকটা কথা এইবেলা শুনে রাখ্—শুনতে শুনতেই নোট করেছি আমি—এখন না বলে নিলে এরপর হয়ত ভুলে যাব।'

এই বলে তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই, স্থান কাল পাত্র সব ভুলে, কোথায় কোথায় দেবব্রতর বক্তব্যে কী কী ত্রুটি হয়েছিল—বোঝাতে শুরু করলেন। আমি যে পিছনে দাঁড়িয়ে আছি তা দেখলুম যেমন তাঁরও খেয়াল নেই তেমনি দেবব্রতরও না। তিনি যেমন গভীর উৎসাহের সঙ্গে বলে যাচ্ছেন তেমনি দেবব্রতও অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শুনে যাচ্ছে।

আঙুলের কর গুণে গুণে যেন তালিকা মিলিয়ে বলতে লাগলেন উপেন-বাবু:

প্রথমত ভাষার ভুল। কোন্ কোন্ শব্দের অপপ্রয়োগ হয়েছে, কোন্ শব্দ প্রয়োগ ব্যাকরণ-সম্মত হয় নি, কোন্ শব্দ ব্যবহার করার ফলে বক্তব্যের জোর কমে গেছে—তার বদলে অপর কোন্ শব্দ ব্যবহার করলে আরও ঢের জোর পাওয়া যেত—ইত্যাদি। তারপর কোটেশানের ভুল। রবীন্দ্রনাথের কোন্ স্ট্যাঞ্জা বলতে গিয়ে একটা লাইন ছাড় পড়েছে, স্বামী বিবেকানন্দর

বাণী বলে যেটা উদ্ধার করেছে আসলে সেটা অশ্বিনী দত্তের বাণী, এমার্সনের কথার সঙ্গে স্মাইল্‌স্‌-এর কথা গুলিয়ে গেছে ; য়্যারিস্টটলের ও কথাটা এ প্রসঙ্গে আসেই না—ইত্যাদি। এরপর তিনি পড়লেন বাচনভঙ্গী নিয়ে। বিলেতে পার্লামেন্টারী রীতি কি, কেমন ভাবে তীব্র গালিগালাজও ভদ্রতার আবরণে বলতে হয়, কেমন ভাবে আঘাতকারীর বিনয়ও আঘাতের দুঃসহতা বাড়ায়—এইসব।

শুনতে শুনতে দেবব্রতর মুখের অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। আগেকার বিজয়-গৌরবের দীপ্তির বদলে ফুটে উঠল অনুশোচনার বিষণ্ণতা। সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'ইস্‌—এখন বুঝছি স্যার, আমার বলা কিছুই হয় নি। তাড়াতাড়িতে দেখছি সব গুলিয়ে ফেলেছি।...আপনি অত পরিশ্রম করলেন—। ..এবারের মতো মাপ করুন, আর কখনও এমন গাফিলতি হবে না। এবার থেকে আপনার পয়েন্টগুলো নোট্‌ ক'রে নিয়ে মুখস্থ করব। আসলে আমার একটু স্মৃতিশক্তির অহঙ্কার হয়েছিল—তাইতেই এত গোল-মাল—'

'ওরে না না,' আর একবার বুকে চেপে ধরলেন তাকে উপেনবাবু, 'এমনি তোর খুব ভাল বলা হয়েছে। এসব তো মাইনর ত্রুটি, এ কে-ই বা ধরতে পারছে! ভাল বলেছিস বলেই তো এইসবগুলো তোকে বুঝিয়ে দিলুম—সোনায় এটুকু কলঙ্কই বা থাকবে কেন!'

দেবব্রত হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল।

বলল, 'আশীর্বাদ করুন স্যার—সত্যিই না আমার বুদ্ধিতে কোন কলঙ্ক থাকে, আমি যেন আপনার স্নেহ ও বিশ্বাসের উপযুক্ত হ'তে পারি!'

উপেনবাবু স্নেহ-ছলছল চোখে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

দেবব্রত চলে যেতে আমি তাঁকে নিয়ে পড়লাম।

'আপনিই এইসব ওকে শিখিয়েছিলেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই! নইলে এতসব ওরা জানবে কি ক'রে! দেখলেন কেমন তৈরী করেছি!' উজ্জ্বলমুখে, রীতিমতো গর্বের সঙ্গে বললেন উপেনবাবু।

আমি আর থাকতে পারলাম না, তিরস্কারের সুরে বললাম, 'বেশ করেছেন! মাস্টারমশাইদের কষে গালাগাল দিল—আর আপনি তার অস্ত্র যুগিয়ে দিলেন ওর হাতে।...মাস্টারমশাইদের কী অবস্থা বলুন তো! কাল তাঁরা ওদের কাছে মুখ দেখাবেন কী ক'রে? ক্লাসে গিয়ে ওদেরই পড়াতে হবে তো! এ তো কোন অপরিচিত সভায় বক্তৃতা দেওয়া নয়—'

উপেনবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি আন্তরিক অনুশোচনার সুরে বললেন, 'ইস্, সত্যিই তো! বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে তো! আমি এ দিকটা মোটে ভেবেই দেখি নি। আসলে ছেলেটা ভাল বক্তৃতা দিতে পারে—তাই ও কোন্ পক্ষ নিয়েছে জিজ্ঞাসা ক'রে ওকে সেই ভাবেই তৈরী ক'রে দিয়েছি। ও যে-দিক নিয়ে বলবে, তাতে যেন সাক্সেস্ফুল হয়, অপর পক্ষ না মাথা তুলতে পারে—এই কথাটাই মনে ছিল, প্রাণপণে সেই ভাবেই ওকে শিখিয়েছি। তাতে যে আমাদেরই গালাগাল দেওয়া হচ্ছে অতটা ভেবে দেখি নি তো! মাস্টার মশাইরা—তাই তো! ইস্! আমার কিন্তু এদিকটা ভাবা উচিত ছিল!'

তারপর খানিকটা অসহায় ভাবে এদিক ওদিক চেয়ে চোখ পিট পিট ক'রে উপেনবাবু কোথা থেকে যেন কী আশ্বাস খুঁজে পেলেন আবার, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'কিন্তু, আমি যতদূর জানি দেবব্রতকে, সেও অতটা ভেবে দেখে নি, মানে জেনে-শুনে মাস্টারমশাইদের অপমান করে নি। আসলে ওরও ও সব ডিবেটিংএর খাতিরে বলা—বুঝলেন না? তর্কের খাতিরে—!'

মহাখুশী হয়ে উপেনবাবু বার বার মাথা চালতে লাগলেন। যেন মস্ত একটা ফাঁকি কোথাও ধরে ফেলেছেন আমার। খুব তৃপ্তির হাসি হাসতে লাগলেন তিনি।

অসমাপ্ত

প্রায় তিন ক্রোশ পথ হেঁটে বিভূতি যখন বাড়িতে পৌঁছল তখন রাত ন'টা বাজে। এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে এই দীর্ঘ পথ একটা ব্যাগ হাতে ক'রে আনা—

যে এতকাল কলকাতায় বাস ক'রে এসেছে, তার পক্ষে কষ্টকর বৈ কি। শ্রান্তিতে ওর হাঁটু যেন দুমড়ে আসছে—ঘুমে আসছে চোখের পাতা বুজে, এখন লোকের সঙ্গে কথা কওয়াও পরিশ্রম বলে মনে হয়। তবু ওকে আগে জ্ঞাতি-খুড়ো কেদার মুখুজ্জের বাড়িই ঢুকতে হ'ল, কারণ তাঁর কাছেই থাকে চাবি।

এত রাত্রে অকস্মাৎ ওকে আসতে দেখে তাঁরা সবাই প্রথমটা চমকে গেলেন, তারপর খুড়িমা উঠলেন চিৎকার ক'রে কেঁদে। কান্নাটা হঠাৎ থামানো সম্ভব নয় ব'লে, বিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিভূতিকে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। কেদারবাবু অবশ্য একেবারেই কাজের কথাটা পাড়লেন, বললেন, 'তা এখন এখানেই হাত-পা ধুয়ে বিশ্রাম করো বাবাজী, একেবারে খেয়েদেয়ে বাড়ি যেও।'

বিভূতি কিছুই খেয়ে আসে নি, তবু এখানে এখন বিশ্রাম করা এবং এদের সঙ্গে অনর্গল কথা কওয়া ও অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা মনে হ'তেই ওর অন্তরাত্মা শিউরে উঠল, তাড়াতাড়ি জবাব দিলে, 'আজ্ঞে আমি রাণাঘাট থেকে খেয়েই আসছি, তা ছাড়া অম্বল-মতোও হয়েছে একটু—এখন জল ছাড়া আর কিছুই খাওয়া চলবে না।'

কেদারবাবুও আর পীড়াপীড়ি করলেন না। পল্লীগ্রামে রাত্রিবেলা ন'টার মধ্যেই সকলের খাওয়াদাওয়া চুকে যায় সাধারণত—তাঁদের বাড়িতেও সে-ই নিয়ম। এখন খাওয়াতে গেলে আবার গোড়া থেকে সব শুরু করতে হবে। ওর খুড়ীমার কান্নাও স্বাভাবিক নিয়মে থেমে এল, তখন তিনি চাবি আর আলো নিয়ে বিভূতির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন, সঙ্গে চলল তাঁর এক নাতনী, একটা বড় ঘটিতে এক ঘটি খাবার জল নিয়ে।

খুড়ীমা দোর খুলে, বিছানাটা পেতে, ঘর ঝাঁট দিয়ে ব্যাপারটাকে চলন-সই ক'রে দিলেন। মাত্র দিন-কতক আগেই তিনি ঘরদোর ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার ক'রে রেখে গেছেন—একথাও বার বার শোনালেন। বিভূতি ইত্যবসরে পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেছিল, সুতরাং আর অপেক্ষা করবার কোনই কারণ ছিল না, তবুও খুড়ীমা দুই-একটি প্রশ্ন ক'রে তবে বিদায় নিলেন, যাবার সময় আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে তাঁর একটি সুশ্রী বোন্‌ঝি আছে, কালকেই তাকে

এখানে আনিয়ে বিভূতিকে দেখিয়ে দেবেন।

ওঁরা চলে যেতে বিভূতি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দক্ষিণের জানলার ধারে চৌকীর ওপরে টাট্‌কা বিছানা পাতা, বিভূতির সমস্ত সত্তা যেন সেদিকে চেয়ে লোভাতুর হয়ে উঠেছে। শ্রান্তিতে তন্দ্রায় সমস্ত স্নায়ু অবশ।···খুড়ীমা উঠোন পেরোবার আগেই ও দোর বন্ধ ক'রে আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।··· আঃ! ভাগ্যিস খুড়ীমা নিজেই বিবেচনা ক'রে আলোটা রেখে গেছেন, আজ এ ঘরে অন্ধকারে ওর ঘুমোনোও মুশকিল হ'ত। ওর সঙ্গে তো একটা দিয়াশলাই পর্যন্ত নেই।

দেহ মন ক্লান্ত, এতটা পরিশ্রমের পর নরম বিছানা পাওয়া গেছে, পুবের জানলা দিয়ে মিষ্টি ঝির্‌ঝিরে হাওয়া বইছে, সমস্ত অবস্থাটাই ঘুমোনোর পক্ষে অনুকূল—তবুও ওর চোখে কিন্তু তখনই ঘুম এল না। দূরে, বহুদূরে কোথায় মেঘ ডাকছে, জাঁতা ঘড়-ঘড় করার মতো শব্দ, একঘেয়ে ব্যাঙের ডাক—ছেলেবেলায় এমন দিনে এই সব আওয়াজগুলো ঘুমপাড়ানি ছড়ার মতোই কাজ করত। কলকাতায় মেসের বদ্ধ ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সে বহুদিন কল্পনা করেছে এমনি ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ডাকের দিকে কান পেতে থাকতে থাকতে আবার ও কবে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে, সেই ছেলে-বেলার মতো।

তবু ঘুম আসে না—

প্রথম আরামের একটা শিথিল অনুভূতিও ক্রমে কেটে আসে, হঠাৎ এক সময় অনুভব করে যে ও মোটেই ঘুমোচ্ছে না—কথাটা ভাবছে। এই বাড়ি-ফেরার অনেক স্বপ্ন ছিল, অনেক কল্পনা। বাল্যকালে বাবা মারা গিয়েছিলেন, কৈশোরে মা—সেই থেকেই একরকম দেশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। মামাদের চেষ্টায় পরের বাড়িতে থেকে রাণাঘাটে লেখাপড়া শেখে—ম্যাট্রিক পাস করার পরই কলকাতায় গিয়ে চাকরির চেষ্টা করতে হয়। সেই যে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের অন্ধকারময় সস্তাদরের মেসে বাসা নিয়েছিল, আজও সেখানেই আছে সে; দেশে আসবার প্রয়োজনও হয় নি, উপায়ও ছিল না। পঁচিশ টাকা মাইনেতে চাকরিতে ঢুকেছিল—আজ সে মাইনে তেতাল্লিশে

পৌঁচেছে, তাই থেকেই সব খরচা চালিয়ে একটা লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে হয়, বাজে খরচের মতো কিছুই বাঁচে না।···তবু সে স্বপ্ন দেখেছে, তবু ভেবেছে এই দেশের কথা—একদিন তার হাতে পয়সা জমবে, একদিন সে তার ভাঙা পৈতৃক ভিটেতে ঘর তুলবে, সে ঘর সাজাবে আরামের নানা বিচিত্র উপকরণ দিয়ে। ওর অফিসের সবাই ছুটিতে যখন দেশে যাবার হিসেব করত পুজো-বড়দিনের আগে—ওর তখন বিশ্রী লাগত। দেশ একটা থাকা চাই বৈকি! প্রকৃতির উদার-বিস্তৃতি, মাঠ-বাগান্‌-গাছপালা—নিজের বাড়ি। পরের বাড়ির দেওয়াল যেখানে আকাশ আড়াল ক'রে দাঁড়াবে না, পরের উনুনের ধোঁওয়া যেখানে নিঃশ্বাস রোধ করবে না।

কিন্তু স্বপ্ন বোধ হয় স্বপ্নই থাকত—যদি না দৈবাৎ তার বিয়েটা হয়ে যেত। সে যেন সবটাই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অকস্মাৎ ওর মামা একখানা চিঠি দিলেন, 'বিশেষ দরকার—তিন-চার দিনের ছুটি নিয়ে এস।' কী এমন দরকার থাকতে পারে তাঁর, কিছুতেই ভেবে পেলে না বিভূতি। দিদিমা মারা যাওয়ার পর থেকে মামার বাড়ির বন্ধন ক্রমে শিথিল হয়েই এসেছে, যাওয়া-আসা চলে ক্বচিৎ-কখনও। তবু বড়মামার জরুরী চিঠির ডাক উপেক্ষা করা গেল না, উপকার যে তাঁরা অনেক করেছেন তাতে তো ভুল নেই।···মামার বাড়ি পৌঁছে শুনলে পরের দিন তার বিয়ে। পাত্রী মামীর সম্পর্কে ভাই-ঝি, সুতরাং তার মত নেবার প্রয়োজন নেই। বড় মামা রাগ ক'রে বললেন, 'তোর আবার মত কি? আমি তোর অভিভাবক, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার হুকুমই যথেষ্ট।'

আকুল কণ্ঠে বিভূতি বলেছিল, 'কিন্তু মামা, খাওয়াবো কি?'

'পুরুষ মানুষ রোজগার করবি, নয় তো মোট বয়ে খাওয়াবি। তাই বলে, বিয়ে করবি নি? কই আমরা তো বিয়ের আগে অতশত ভাবি নি···আপিস ক'রে সকাল বিকেল টাইম থাকে ঢের, টিউশ্যনী করতে পারিস না—কিংবা ইন্‌সিওরেন্সের দালালী? তা ছাড়া মাইনেও তো বাড়বে।'

মামীমা আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'জীব যিনি দিয়েছেন তিনিই আহার দেবেন —তুই কিছু ভাবিস নি। বড় লক্ষ্মী মেয়ে রে, আমি বলছি তোর ভালই হ'ল। মা-বাপ নেই, চিরদিন কি এমনি বাউণ্ডুলে হয়ে বেড়াবি, বাসা বাঁধতে হবে না?'

কথাগুলি সেদিন খুব খারাপ লাগে নি। আরও ভাল লেগেছিল বিবাহের রাত্রে, মেয়েটিকে দেখে। শ্যামবর্ণ—কিন্তু বড় লাবণ্যবতী মেয়ে, বড় ঠাণ্ডা, বড় মিষ্টি। ষোল বছরের মেয়ে, অর্ধ-বিকশিত শতদলের মতোই বিপুল সম্ভাবনা ছিল সেদিন তার মধ্যে। নামটিও বড় ভাল, কোন্ আধুনিক কবি এই পাড়াগাঁয়ে বসে এমন নাম রেখেছিল কে জানে—সুপ্রিয়া। তারপর ফুল-শয্যার রাত্রে সুপ্রিয়ার অন্তর-মাধুর্যের সঙ্গে যখন ওর পরিচয় ঘটল তখন সত্যিই নিজেকে কৃতার্থ মনে করল বিভূতি। ভবিষ্যতের চিন্তা, অর্থের অসচ্ছলতা, সামান্য চাকরি—এ সমস্তই সেদিন অনাস্বাদিতপূর্ব সেই আনন্দের স্রোতে কোথায় ভেসে চলে গেল ; সাতদিনের দিন সে যখন কলকাতায় ফিরল তখন ওর মনের মধ্যে বড় হয়ে রয়েছে শুধু অতি মিষ্টি একখানি মুখ, আর তার কৌতুকভরা ডাগর দুটি চোখের মায়া—

কিন্তু এইবার টাকা রোজগারের সমস্যাটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। শ্বশুর গরীব মানুষ—তাঁর ঘরে বৌকে ফেলে রাখা বড় লজ্জার কথা। অথচ কলকাতায় বাসা করাও এই আয়ে অসম্ভব। মামা মাস-দুই এনে রাখলেন তাঁদের বাড়ি—তাতে খরচা ঢের বেশী। মামা খোরাকি নেন না—সেই জন্য শনিবার মামার বাড়ি যাবার সময় এটা-ওটা বাজার করে নিয়ে যেতে হয়, গাড়ি ভাড়া সুদ্ধ তাতে অনেক পড়ে। সুপ্রিয়া বাপের বাড়ি থাকলে আরও অসুবিধা, শ্বশুর প্রত্যেক শনিবার নিমন্ত্রণ করতে পারেন না, তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ—নিমন্ত্রণ না করলেও যেতে সাহসে কুলায় না, কী জানি যদি বিব্রত করা হয়।

এইভাবে সমস্যার সমুদ্রে যখন সে দিশা খুঁজে পাচ্ছে না, তখন হঠাৎ এক-দিন সুপ্রিয়াই পথ দেখালে—বললে, 'আচ্ছা—দেশে তো শুনেছি তোমাদের ভিটে এখনও আছে, সেইখানেই একখানা মাটির ঘর তুলে নাও না। শ' দেড়েক টাকা হ'লে একটা ঘর উঠবে না ? আমার বালাটা বাঁধা দিয়ে—'

বিদ্রূপের স্বরে বিভূতি প্রশ্ন করল, 'তারপর ? বালা ছাড়াবে কিসে ?'

'না হয় বিক্রী ক'রে দাও। তোমাকেই যদি কাছে না পেলুম, গয়না নিয়ে কি করব ?'

'কিন্তু মাটির ঘরে থাকতে পারবে ?'

'এখানেই কোন্ পাকা ঘরে আছি ?'

'তা বটে—'তবু বিভূতির মন খুঁতখুঁত করে, 'একা পাড়াগাঁয়ে থাকা—তুমি ছেলেমানুষ, সে কি সম্ভব হবে ?

সুপ্রিয়া চটে গেল, 'সবতাইতে তোমার খুঁত-কাটা স্বভাব। আমি যখন বলছি থাকতে পারব তখন তোমার কি ? ওখানে তো অনেক কৈবর্তর মেয়ে আছে, কাউকে খেতে দিলেই সে এসে দাওয়ায় শুয়ে থাকবে'খন।...তোমাদের তো শুনেছি বিঘে দু-তিন ধান-জমিও আছে, পাঁচভূতে লুটে খাচ্ছে—বাগানের ফসলও কিছু কিছু হবে, আমি গিয়ে থাকলে একটা লোককে খেতে দিতে কি লাগবে ? তোমাকে টাকা পাঠাতেও হবে না, আমি এমনি সংসার চালিয়ে নেব, দেখো।'

পাকা গিন্নীর মতোই কথাগুলো বলে সুপ্রিয়া বিজয়-গর্বে স্বামীর দিকে তাকায়।...এক্ষেত্রে বিভূতির আত্মসমর্পণ ছাড়া কীই বা করবার আছে ? সে কলকাতায় ফিরে অনেক তদ্বির-তদারকের পর অফিস থেকেই তিনশো টাকা ধার পেলে। তারপর ছুটি নিয়ে খুড়োর বাড়ি গিয়ে বসে সত্যি-সত্যিই এক-দিন এই ঘরখানা তুলে ফেললে। পুরোনো ভিটের কিছু ইঁট কাজে লেগেছিল—সিমেন্টের মেজে, কাঁচা-গাঁথুনী ইঁটের দেওয়াল আর খড়ের চাল—আধ-পাকা এই ঘরখানি ও বাইরের দাওয়া সেই টাকার মধ্যেই উঠে গেল। খুড়ো মশাই শুভ দিন দেখে পুত্রবধূকে নিয়ে এলেন—স্থির হ'ল বিভূতি যখন থাকবে না, তখন খুড়ো মশাইয়ের বিধবা মেয়ে টুনী থাকবে সুপ্রিয়ার কাছে ; আর ওঁদের বুড়ো চাকর হারাণ শোবে বাইরে। সেদিন বিভূতির মনে হয়েছিল দুঃখের খোলস চিরকালের মতোই তার গা থেকে খসে পড়ল এবার। তাদের সংসারের নৌকো স্রোতের ধারা খুঁজে পেয়েছে, তার পালে লাগবে এবার আনন্দের বাতাস—তর্ তর্ ক'রে কালের ধারা বেয়ে চলে যাবে। কোথাও কোন বাধা, কোন বেদনা আর রইল না।

সে তো এইমাত্র বছরখানেক আগের কথা। কিন্তু ওর মনে হচ্ছে যেন সে কত কাল, কত যুগ, কত জন্মান্তর আগের কথা। সে যেন স্বপ্ন, তার এ জীবনের সঙ্গেই যেন কোন যোগ নেই।

সাংসার পাতবার পর যখন সে কলকাতায় ফিরে গেল তখন সুপ্রিয়াকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হ'লেও একটা নতুন উৎসাহ নিয়ে সে গিয়েছিল। সত্যি-সত্যিই সে ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সি নিলে এবার—টাকা চাই, দেনা শোধ করতে হবে। আসবাব চাই—নতুন ঘর সাজাতে হবে। সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে ঘোরে সে, যেন লাট্টুর মতোই। বন্ধুরা বলে—'এত খাটলে মরে যাবে যে বিভূতি!' কিন্তু সে এই ঘোরার জন্যে কোন ক্লান্তি বোধ করে না। বেশী রাত হলে অন্য লোক ঘুমিয়ে পড়ে এইতেই তার অসুবিধা, নইলে সে সারা রাতই বোধ হয় কাজ করতে পারত।

ফলে মাস-তিনেকের মধ্যেই অর্ধেক দেনা শোধ হয়েও একটা ছোট আলমারি, একটা বড় আয়না, আলো—এমনি সব সুপ্রিয়ার পছন্দ-ও ফরমাশ-মতো নানারকমের শৌখীন জিনিস কেনা হ'ল। এ ছাড়া ওর জন্যে ঢাকাই শাড়ি—কানের একজোড়া দুলও। এক কথায় সুখ ও সৌভাগ্য ওর জীবনের পাত্রে যেন উপছে পড়তে লাগল। বিভূতি মনে করল বাল্যকাল থেকে দুঃখ দিয়ে দিয়ে এত দিন পরে বিধাতা সদয় হয়েছেন।

তারপরই হঠাৎ বাজ পড়ল—শুধু যে বিনামেঘে তাই নয়, নিঃশব্দেও বটে। একটা মোটা রকমের ইন্‌সিওরেন্সের কেসের আশায় সে মালদা গিয়েছিল তিন দিনের ছুটি নিয়ে। ভরসা ছিল—এই কেসটা গেঁথে তুলতে পারলে চাকরি ছেড়ে দিলেও চলবে, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী থেকেই একটা মাসিক মাইনের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। হ'লও তাই শেষ পর্যন্ত,—শুধু, মালদা থেকে কলকাতায় ফিরে শুনলে যার জন্য এত অর্থের প্রয়োজন, সে-ই আর নেই। পা পিছলে দাওয়ায় পড়ে গিয়ে চোট লাগে—ব্যাপারটা সামান্যই মনে হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু তাইতেই অভ্যন্তরীণ রক্তস্রাব হয়ে সুপ্রিয়া মারা গেছে। ওকে খবর দেবার জন্য লোক এসেছিল কলকাতায়—কিন্তু সেই দিনই বিভূতি মালদা চলে গেছে—অর্থাৎ মৃতদেহটাও দেখতে পাবার আর কোন আশা নেই। তার নতুন বৌয়ের, তার সুপ্রিয়ার, তার প্রিয়তমার—আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই, শ্মশান খুঁজলে এক মুষ্টি ছাই মিলবে কি না সন্দেহ!

বিভূতি আর শুয়ে থাকতে পারল না। কি একটা যেন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে উঠে পড়ল, আলোটা বাড়িয়ে তাকের কাছে এসে হাতঘড়িটা দেখল, রাত বারোটা বাজে। তার মানে ছ'ঘণ্টার ওপর সে শুয়ে আছে বিছানায়, তবু ওর চোখে ঘুমের আভাস পর্যন্ত নামে নি এখনও।

ঘড়িটা রেখে দিয়ে তাকের সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ও খবরের পর সে আর এখানে ফেরে নি, ফিরতে ইচ্ছা হয় নি। খুড়ো মশাই অনেকগুলো চিঠি দিয়েছিলেন, লোকও পাঠিয়েছিলেন তবু বিভূতিকে আনতে পারা যায় নি। অনেক সাধ ক'রে এ স্বর্গ যে সাজিয়েছিল সে-ই যখন নেই, কার জন্যে বিভূতি এখানে আসবে? শূন্য ঘরে কাঁদতে আসবে? তার আর প্রয়োজন নেই। কান্নাও তার আর ছিল না—বাজের আগুনে ওর ভেতরটা পুড়ে গেছে, চেষ্টা করলেও বোধ হয় চোখে জল বেরোবে না।

তাকের শেল্‌ফগুলোর দিকে ভাল ক'রে তাকাতেই ওর যেন অনেকক্ষণের একটা আচ্ছন্ন ভাব চমকে ভেঙে গেল। আশ্চর্য, সুপ্রিয়ার নিত্য ব্যবহারের জিনিসগুলো এখনও তেমনি ছড়ানো আছে, যেমন থাকত সে থাকলে। কেউ সরায় নি, গুছিয়েও রাখে নি। ওর চুলের দড়ি, কাঁটা, পাউডারের কৌটো, সিঁদুর-কৌটো—সব, মায় গন্ধ তেলের শিশিতে আধশিশি তেল পর্যন্ত। হাত দিয়ে নেড়ে দেখল এখনও ঘন বা চট্‌চটে হয়ে যায় নি—ঠিকই আছে।... বিহ্বল, মূঢ় দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকতে থ.কতে হঠাৎ যেন মনে হ'ল সুপ্রিয়া মরে নি, কোথাও যায় নি,—এখানেই আছে—হয়ত ঘাটে কিংবা রান্নাঘরে গেছে কী কাজে!

কিন্তু—

চুলের দড়িটায় হাত দিতে গিয়েও কেমন যেন শিউরে উঠে বিভূতি হাত সরিয়ে নিলে। ওর মধ্যে স্পর্শ আছে, তার দেহের স্পর্শ, তার সেই নিবিড় চুলের স্পর্শ। তাদের কত প্রণয়-বিহ্বল রজনীর সাক্ষী আছে ঐগুলো—না, ওগুলোতে সে হাত দিতে পারবে না! তার দেহের খানিকটা আভাস পেয়ে বাকীটা না পেলে—না না, সে অসম্ভব।

আলোটা তুলে এনে দেরাজটার ওপর রাখলে সে। এইবার বেশ আলো হয়েছে, সব কটা শেল্‌ফ্‌ই ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে। কী একটা লেস বুনতে

আরম্ভ করেছিল, তার খানিকটা সুতোর গুলি এবং ক্রুশ-কাটি সুদ্ধ ধুলোয় পড়ে রয়েছে। ওপরের তাকে কতকগুলো ভাঁড়ারের জিনিস। তার মধ্যে চা আর চিনির কৌটোটা বিভূতির পরিচিত। আরও কত কি খুঁটিনাটি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ, অথচ অতিপরিচিত বস্তু। প্রত্যেকটিতেই তার হাতের ছোঁয়া লেগে আছে এখনও—সে শেষ হাত দেওয়ার পর এখনও পর্যন্ত হয়ত অন্য কোন হাত ঠেকে নি তাদের গায়ে।···আশ্চর্য, সব আছে, শুধু সে-ই নেই!

ক্লান্ত-ঔৎসুক্যে ঘুরতে ঘুরতে সহসা চাবির গোছাতে এসে চোখ থামল। চাবির রিংটা ছিল ওর বড় প্রিয়, ওর নাকি ছেলেবেলা থেকে শখ আঁচলে চাবি বাঁধা থাকবে, কাজে-অকাজে ঘুরতে ফিরতে আঁচলটা ঘুরিয়ে পিঠে ফেলবে—সেই ঝম্‌ঝম্‌ শব্দটাতে ওর লোভ।···চাবিটার দিকে চোখ পড়তেই দেরাজটার কথা মনে হ'ল। তার নিজের হাতে সাজানো সব, দেরাজ, আলমারি যা কিছু। এ দেখা যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ নেই,—তবু বিভূতির কী একটা কৌতূহল অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছে। দেখতেই হবে ওকে, ঠিক তার যাবার আগে কি ভাবে সাজানো ছিল; শুধু তার হাতের নয়—মনের স্পর্শও রয়েছে ওদের মধ্যে, এতদিন পরে সে যেন নিবিড়ভাবে সেই পরশটুকুই অনুভব করতে চায়। শেষ দেখা ওদের হ'ল না, কথা রয়ে গেল অসমাপ্ত—সেই অসম্পূর্ণ, হঠাৎ থেমে যাওয়া প্রাণের বাণীটিই সে আহরণ করতে চায় এর মধ্যে থেকে।

ওর পকেটেও একটা চাবির রিং আছে, এইগুলোরই ডুপ্লিকেট চাবি সে নিজের কাছে রেখে ছিল। বরাবরই বিভূতির ভয়, কোন্‌ দিন নাইতে গিয়ে পুকুরে রিংসুদ্ধ হারিয়ে আসবে সুপ্রিয়া। সে পকেট হাতড়ে নিজের সেই চাবির গোছাটাই বার ক'রে দেরাজ খুলে ফেললে। সুপ্রিয়ার চাবিতে হাত দিতে পারলে না—তার ছোঁয়াটুকু সে চায় বটে, কিন্তু অন্তরের স্পর্শতেই ওর আগ্রহ বেশী, ঠিক মৃত্যুর আগে তার দেহের স্পর্শ যেগুলোতে লেগে আছে, সেগুলো ছোঁবার সাহস যেন নেই—ছুঁতে গেলে ভয়ে নয়, আবেগে ওর বুক কেঁপে ওঠে।

দেরাজের ওপরের টানাটাতে সুপ্রিয়ার টাকাকড়ি থাকত। এখন তার বিশেষ কিছুই নেই—কারণ নগদ টাকা ওর শেষকৃত্যে খরচা হয়েছে; গহনা সামান্য যা-কিছু ছিল, খুড়ো মশায় নিয়ে গিয়ে রেখেছেন তাঁর কাছে। এখন

পড়ে আছে কতকগুলো খুচ্‌রো রেজকি আর—টাকাখানেকের ওপর হবে বোধ হয়—আধলা। আধলা জমানো ছিল ওর একটা নেশা। বিড়ি কেনার কিংবা বাজার করার ফেরত আধলা দেখলেই সে কেড়ে নিত। নিতান্ত দরকার পড়লে দু-একটা খরচ করত, বড় জোর ভিক্ষে দিতে—নইলে সবই জমত।… ওপাশে একটা সিল্কের রুমাল, এখনও তাতে এসেন্সের আভাস লেগে আছে, একটা রূপোর সিঁদুর কৌটো, তার ব্যবহারের নয়—বিয়ের সময় পাওয়া। দুটো ভাল কাপ-ডিস্‌, খানিকটা ফরসা ন্যাকড়া, লাল ফিতে, এক তাড়া পুরোনো চিঠি, একজোড়া তাস—আর একটা চিঠির কাগজের প্যাড্‌।

প্যাড্‌টা দেখে ওর বুকটা যেন ধড়াস ক'রে উঠল। যদি দু'লাইনও ওতে লেখা থাকত, এমন একখানা চিঠি যা ডাকে দেওয়া হয় নি, যা বিভূতি পড়ে নি! তা হ'লে ওর মনে হ'ত মৃত্যুর পরপার থেকেও তার চিঠি এসে পৌঁচেছে। সত্যি-সত্যিই তা হ'লে তার সঙ্গে আজ, এতদিন পরেও, যোগসূত্র স্থাপিত হ'ত।

খুলে দেখবে সে? যদি সত্যি-সত্যিই লেখা থাকে? কিন্তু সাহসে যেন কুলোয় না—যে তীব্র আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ওর বুক কাঁপছে, তা যদি ব্যর্থ হয়? সে আশাভঙ্গের বেদনা সুপ্রিয়াকে হারাবার ব্যথাকেই নতুন ক'রে জাগিয়ে তুলবে ওর মনে।

অনেকক্ষণ সে প্যাড্‌টার দিকে চেয়ে বসে রইল। মনকে বোঝাল বার-বার—যে চিঠি না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী। তা ছাড়া চিঠি লিখলে সে ডাকে দেবে না কেন? তা যদি না-ই ডাকে দিতে পেরে থাকে সে, খুড়ো মশাইরা তো ছিলেন, তাঁরাও পাঠিয়ে দিতেন তা হ'লে। অতএব কোন চিঠি পাবার আশা না করাই উচিত। প্যাডের মলাট উলটে দেখবারও প্রয়োজন নেই।

তবু শেষ পর্যন্ত সে প্যাডখানা হাতে তুলে নিলে—এবং মলাটটা সরাতেই ওর বুকটা ধ্বক্‌ ক'রে উঠল। লেখা আছে, সত্যিই লেখা আছে। এ তারই হাতের লেখা, সব কটা অক্ষর কাঁচা, লাইন বাঁকা—যেমন চিঠি সে অসংখ্য পেয়েছে কলকাতার বাসায়, যে চিঠির বাণ্ডিল সে স্যুটকেসে ক'রে ভরে এনেছে—এ তেমনিই আর একটি চিঠি।

প্যাড্‌টা আর আলোটা হাতে ক'রে নিয়ে টলতে টলতে এসে বিভূতি বিছানায় বসে পড়ল। না জানি কি লেখা আছে ওতে, কী না জানি সে বলতে চেয়েছিল, বলা হয় নি। মরবার আগেই লেখা নিশ্চয়, তবু এটা তো ঠিক, ও পাচ্ছে সেটা আজ—এ যেন স্বর্গ থেকেই তাকে পাঠানো চিঠি।

হঠাৎ ওর মনে হ'ল যদি চিঠিটা আর কাউকে লেখা হয়? সুপ্রিয়ার বাবাকে কিংবা মাকে? খুলে দেখবারও সাহস হচ্ছে না যেন—কতরকমের আবেগ আর আশঙ্কা ওকে যেন জড় ক'রে দিয়েছে।

অবশ্য এক সময় খুলতেই হ'ল প্যাড্‌টা। অসম্পূর্ণ চিঠি, সেই জন্যই ডাকে দেওয়া হয় নি। লিখতে লিখতে বোধ হয় কী কাজে চলে গিয়েছিল—বাকীটুকু শেষ করা হয় নি। না, চিঠিটা ওকেই লেখা বটে। লিখছে—
শ্রীচরণকমলেষু—

ওগো স্বামী মশাই, মনে হচ্ছে কতকাল তোমাকে দেখি নি। মোটে তো এক হপ্তা, আমার মনে হচ্ছে এক যুগ। কাল থেকে বড্ড তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। চলে এসো না বাপু, কী করো কলকাতায়? কাল রাত্রে তোমার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়েছি কিনা, স্বপ্ন দেখেছি যেন তোমার পাশেই শুয়ে আছি, তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরতে গিয়ে ঘুম ভেঙে গেল, দেখি ওমা, ঠাকুরঝি! মেজ ঠাকুরঝি কি মনে করলে কে জানে!

তুমি কবে আসবে, শনিবার আসছ তো? বেনের দোকান থেকে এবার আমার জন্যে একতাড়া পাতা-আলতা এনো তো, শিশির আলতা রোজ পরতে ভাল লাগে না। ছেলেবেলায় ঠাকুমা কুমারী-পূজো করতেন, পাতা-আলতা টিপে টিপে কেমন চমৎকার পরাতেন কুমারীকে, সেই থেকে আমার ঐ আলতায় লোভ।

হ্যাঁ, ছাখো, তোমাকে একটা কথা বলব আজ। কথাটা সেই বিয়ের সময় থেকেই জানাবো জানাবো মনে করি, সাহসে আর কুলোয় না কিছুতে, মনে হয় যদি রাগ করো, যদি আমার ওপর ভালবাসা আর না থাকে! অথচ তোমার কাছে কোন কথা লুকিয়ে রাখতে আমার একদম ইচ্ছে করে না। বলো রাগ করবে না? লক্ষ্মীটি! আজ তোমাকে কথাটা লিখব বলে সকাল থেকে প্রতিজ্ঞা ক'রে রেখেছি, কিন্তু এখন লিখতে ব'সে কেমন যেন ভয় করছে, তুমি কি মনে

করবে কে জানে।

তবু বলেই ফেলি। তোমার কাছে না বললেও আমার শান্তি নেই। কথাটা আর কিছু নয়—

এই পর্যন্ত চিঠি। বোধ হয় তখনও সঙ্কোচে বেধেছিল বলেই আসল কথাটা লেখবার আগে প্যাড্‌টা দেরাজে তুলে রেখে দিয়েছিল পরে লিখবে বলে—আর লেখার সময় হয় নি। তারিখ নেই চিঠিতে, হয়ত সেইদিনই সে পড়ে গিয়েছিল, প্যাড্‌টা রেখে বাইরে যেতে গিয়েই পড়ে গিয়েছিল, শেষটুকু লেখা আর সম্ভব হয় নি।

কিন্তু কী এমন কথা? যা লিখতে সুপ্রিয়ার এত সঙ্কোচ, এত ভয়? আকাশ-পাতাল ভেবেও বিভূতি বুঝতে পারল না যে এমন কি কথা তার থাকতে পারে, যাতে ওর ভালবাসা হারাবার পর্যন্ত ভয় হয়!

তবে কি সে কিছু হারিয়ে ফেলেছিল, গয়না বা ঐ-রকম দামী কিছু? না কি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেছিল?...তাই বা কেমন ক'রে হবে, সে যে লিখছে 'কথাটা বিয়ের সময় থেকেই জানাবো জানাবো মনে করি!'

বিভূতি অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। জীবনের অপর পার থেকে চিঠি পাবার কথা ভাবছিল সে, তাই বুঝি ভগবান তাকে এমন বিদ্রূপ করলেন! কোন উপায় নেই, আজ আর কোন প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কী যে সে বলতে চেয়েছিল, কী কথা ছিল তার মনে এতকাল ধরে লুকোনো, কী রহস্য রইল চির-অবগুণ্ঠিত হয়ে—তা এ জন্মে জানবার আর কোন উপায় রইল না। মাথা খুঁড়লেও না।...জন্মান্তরেও জানা যাবে কিনা সন্দেহ।

একবার সে জোর ক'রে মনকে প্রবোধ দিলে, যা বলা হ'ল না, যা জানা গেল না তা নিয়ে আর এখন মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? যার কথা সে-ই যখন নেই, কী হবে তা জেনে? আর তো কোন কাজেই আসবে না। তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ, সমস্ত সম্পর্কই যখন ঘুচে গেছে, তখন এটুকুর জন্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। যে রহস্যই থাক—সে তারই জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল, আজ আর সে না-বলা কথা, সে রহস্যের মূল্য কি?

আলোটা আবার কমিয়ে দরজার কাছে রেখে বিভূতি শুয়ে পড়ল। এবার

একটু ঘুমোবার চেষ্টা করতে হবে, শুধু শুধু রাত জেগে লাভ নেই—

কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। কী এমন কথা ছিল? কিছুতেই কি জানা যায় না? ওগো, অন্তত একটুখানি আরম্ভ ক'রে রেখে গেল না কেন, কথাটা কোন্ বিষয়ে জানলেও যে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত! তবে কি ওর কিছু কেনবার ইচ্ছে ছিল? কোন গয়নাগাঁটি? কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হবে—কোন গয়না চাই কিনা, কিছু পরতে ইচ্ছে করে কিনা, বিভূতি তো কতদিন জিজ্ঞাসা করেছে। কানের পাশার কথা তো সে ই বলেছিল, কোন রকম ভয় বা সঙ্কোচ তো করে নি!

আচ্ছা, কথাটা কী বিষয়-ঘেঁষা হ'তে পারে?

অত্যন্ত গোপনে, নিজের মনের অবচেতন অবস্থায় একটা কুটিল সংশয় বার বার মাথা তোলবার চেষ্টা করছিল, প্রত্যেকবারই সে জোর ক'রে পিছন ফিরছিল তার দিকে।···কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সময় প্রশ্নটাকে মেনে নিতেই হ'ল। সেই একটি মুহূর্তের যন্ত্রণা অবর্ণনীয়। সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত প্রেম, দাম্পত্য-জীবনের সমস্ত মাধুর্যরস—এমন কি চিরবিচ্ছেদের সমস্ত হাহাকারের মূলে যেন প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেল সেই প্রশ্ন—সেই মর্মান্তিক সংশয়।···অকস্মাৎ বিভূতির মনে হ'ল ওর যেন কণ্ঠ রোধ ক'রে ধরেছে কে, নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে—ডোববার সময় মানুষ যেমন প্রাণপণে ওপর ভেসে ওঠবার চেষ্টা করে, ঠিক তেমনি ভাবেই ছটফট ক'রে উঠে বসল ও। আশ্চর্য, বোধ হয় এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছে বিভূতি।

তবে কি ওদের বিবাহের পূর্বেকার কোন ইতিহাস ছিল সুপ্রিয়ার? ষোল বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল, এখনকার হিসেবে বালিকাই—কিন্তু তবু ইতিহাস থাকা যে অসম্ভব নয় তা বিভূতি জানে। এমন বহু কাহিনীই জানে সে বহু বালিকার।

ওদের দাম্পত্য-জীবনের অসংখ্য মধুর স্মৃতি, প্রণয়বিহ্বল মুহূর্তগুলির অগণিত চিত্র ওর চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল—সুপ্রিয়ার প্রতিটি কথা, প্রতিটি চাহনি যেন একসঙ্গে প্রতিবাদ ক'রে উঠল—না, না, এ অসম্ভব!

অথচ, তা নইলে ঐ চিঠির কথাগুলোর আর কি অর্থ হ'তে পারে! বিয়ের

সময় থেকেই যা বলতে চেয়েছিল সে, স্বামীর ভালবাসা হারাবার ভয়ে সাহস ক'রে বলতে পারে নি—সে কথা এ ছাড়া আর কী-ই বা হ'তে পারে? কী এমন অপরাধ তার পক্ষে আর করা সম্ভব?

হয়ত—এই দু'বৎসরের ঘনিষ্ঠতার ফলে সুপ্রিয়া তাকে সত্যিই ভালবেসে-ছিল, আর তা বেসেছিল ব'লেই অপরাধটা স্বীকার ক'রে নিজেদের সম্পর্ককে নির্মল করতে চেয়েছিল; কিন্তু সে অপরাধ কতখানি তা কে বলে দেবে? কে জানে ওব পূর্ব-প্রণয়ের সুর ওর মনে বিবাহের পরেও ছিল কিনা!

এক কি একাধিক তাও তো জানা নেই। ধরে নেওয়া গেল একই। কিন্তু প্রথম কৈশোরের আবেগ-বিহ্বল হৃদয়ে প্রথম যে ছাপ পড়েছিল, সে ছাপ কি সহজে যাওয়া সম্ভব? তবে,—তবে কি সুপ্রিয়া প্রথম কয়েক মাস ওর সঙ্গে ভালবাসার অভিনয়ই করেছে?

বিভূতি চিৎকার ক'রে উঠতে চাইল কিন্তু স্বর ফুটল না। শুধু ওর মনে হ'তে লাগল ঘরটা বড় ছোট, হাওয়া নেই কোথাও ঘরের ভেতর। দেওয়াল গুলো যেন চেপে ধরতে চাইছে ওকে চারিদিক থেকে।

ওর মনে পড়ল, বিয়ের পর কলকাতা থেকে প্রথম যেবার ও শ্বশুরবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে যায়, শেষ রাত্রে ওর হাতে মাথা রেখে ওরই বুকের মধ্যে লুকিয়ে সুপ্রিয়া বলেছিল, 'ওগো ছাখো, বিয়ের আগে মনে হ'ত আমি আমার মাকে যেমন ভালবাসি এমন আর কাউকে কোনদিন বাসি নি। আজ তোমাকে ভালবেসে বুঝতে পেরেছি যে ভালবাসা কাকে বলে। এতদিন কাউকেই ভালবাসি নি!'

এ সব কি তবে আগাগোড়া মিথ্যা? সব অভিনয়!…কী প্রয়োজন ছিল তার এত কথা বানিয়ে বলার, সে তো শুনতে চায় নি!

বিভূতি পাগলের মতো আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর দুই চোখ এরই মধ্যে জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, দৃষ্টি হয়েছে উদ্‌ভ্রান্ত। আপন মনেই ও বলে উঠল, 'ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি—ব'লে দাও এ কথা সত্যি কি না।'

সুপ্রিয়ার একটা ছবি পর্যন্ত ঘরে নেই। তোলাবার খুব ইচ্ছা ছিল তার কিন্তু এই পাড়াগাঁয়ে যোগাযোগ হয়ে ওঠে নি। তবু, ওর সেই নিত্য

ব্যবহারের জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়েই বিভূতি বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, চুপিচুপি, 'ওগো, তুমি কি আমাকে এতকাল ঠকিয়েছ তাহ'লে? তুমি?··· এ কি সত্যি! বলো মিছে কথা, বলো লক্ষ্মীটি! বলো আর কি বলতে চেয়েছিলে?—'

চুলের দড়ি আর কাঁটা যেন ওর আকুলতাকে নিঃশব্দে বিদ্রূপ করতে থাকে। হাতঘড়িটার আওয়াজ হয় টিক্ টিক্, টিক্ টিক্।

কিন্তু মিছে কেমন ক'রে হবে? ওর উত্তেজিত, উত্তপ্ত, সন্দিগ্ধ মস্তিষ্কে আর কোন সম্ভাবনাই ঢোকে না। বিহ্বল মনে সেই একটা কথাই বার-বার জাগে—সুপ্রিয়া আমার সঙ্গে অভিনয় করেছে! সুপ্রিয়া,—যাকে সত্যকারের অপরাধ বলে, তা করেছে কিনা, সে কথাটা যেন বিভূতির কাছে বড় কথা নয় —যে প্রেম-নিবেদন, যে চুম্বন, যে আকুলতাকে ও নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিল শুদ্ধমাত্র ওরই প্রাপ্য জেনে, তার মধ্যে বিরাট একটা ফাঁকির সম্ভাবনাতেই যেন ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

অকস্মাৎ—এমনি—একটা উন্মত্ত মুহূর্তে ও তাকের ওপর থেকে সুপ্রিয়ার প্রসাধনের সেই সমস্ত জিনিসগুলো জড়ো ক'রে হাতে তুলে নিলে, তারপর দোর খুলে অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ে ছুঁড়ে সেগুলো ফেলে দিলে পুকুরের জলে। যাক্—যাক্, অবিশ্বাসিনীর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যাক্—

পুকুরের জলে পড়ে একটি মাত্র শব্দ হ'ল—ঝপ্ ক'রে, নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃশব্দ সমুদ্রে একটি মাত্র শব্দের ঢেউ উঠল। আর তাইতেই যেন চমক ভাঙল বিভূতির। সঙ্গে সঙ্গে ওর দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল সুশ্রী একটি মুখের উদ্বিগ্ন চাহনি। এর ঠিক আগে যেবার বাড়ি আসে সে, সুপ্রিয়া ওর বুকে মাথা গুঁজে বার বার বলেছিল, 'সত্যি বলছি তোমার চেহারা এবার বড্ড খারাপ দেখাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই অতিরিক্ত পরিশ্রম করছ।···ঠিক ক'রে বলো, মাইরি, আমার মাথা খাও—অসুখবিসুখ করে নি তো? শরীর খারাপ বোধ হয় না? ··কি হবে বাপু এত এত খেটে—বেশী টাকায় আমার দরকার নেই। শোন, জমি যা আছে আমাদের দুজনের মতো ধান তো হয়, আমার এই যা ক্ষুদ-কুঁড়ো আছে বেচে দিয়ে আর বিঘে-পাঁচেক জমি কিনে নাও—তাইতেই আমাদের

বেশ চলে যাবে। তাই করো লক্ষ্মীটি!'

এ কি সব অভিনয়? ঐটুকু মেয়ে, এত অভিনয় করা কি সম্ভব তার পক্ষে? কতদিন কত রাত্রির অসংখ্য আকুলতার স্মৃতি যেন একসঙ্গে ওর মনের মধ্যে জেগে উঠল। ও বলে উঠল, 'না, না, তা সম্ভব নয়। তা হ'তে পারে না! সুপ্রিয়া, আমি জানি তা হ'তে পারে না।'

ঘরের বাইরে সেই নিবিড় অন্ধকারে ঝকৃঝকে তারাগুলো যেন বিদ্রূপ ক'রে হেসে উঠল। বিভূতি সেদিকে মূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল আচ্ছা, কথায় কথায় নানারকম কৌতুক করা ছিল তার স্বভাব, এও তেমনি একটা কৌতুকের ভূমিকা নয় তো? নানারকম ভূমিকা ক'রে হয়ত একটা তুচ্ছ কথা বলত—কিংবা হয়ত এ চিঠিটা এমনি ছেড়ে দিত, পরে বিভূতির অসংখ্য অনুরোধে হয়ত জানাত যে কথাটা একেবারেই ফাঁকা, কোথাও কোন ভিত্তি নেই ওর।···এমন বহুবার করেছে, ওকে ভয় দেখিয়েছে যে 'বিষম একটা অন্যায় ক'রে ফেলেছি, তুমি কিন্তু বকতে পাবে না'—ইত্যাদি—তারপর দেখা গেছে যে সে অন্যায়টা আর কিছু নয়, গোটা-কতক কাঁচা আম খেয়েছে নুন দিয়ে!

হাস্যে-পরিহাসে-সেবায়-প্রেমে উজ্জ্বল সেই কিশোরীর মূর্তি সেই মুহূর্তে যেন অপূর্ব এক দ্যুতিতে ওর চিত্তে প্রকাশ পেল। তার মধ্যে তো কোন মালিন্য, কোন ছলনার স্থান নেই। তবে? এই কুৎসিত সংশয় সামান্য সময়-টুকুর জন্য প্রকাশ ক'রেও বিভূতি অপরাধী হ'ল না তো?

ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে স্যুটকেসটাকে টেনে বার করলে চৌকীর নিচে থেকে। ওর ভেতরে আছে একতাড়া চিঠি, সব কটাই সুপ্রিয়ার। এই চিঠিগুলোই এখন তার সম্বল, সর্বদাই সেগুলোকে কাছে কাছে রাখে। হয়ত এ আকুলতা থাকবে না বেশী দিন, এ বেদনাও আসবে কমে—এমন কি হয়ত কোন সুদূর ভবিষ্যতে আবার বিবাহ করাও অসম্ভব নয়, তবু এখন এইগুলোই তার নিত্যসঙ্গী, প্রতিরাত্রে অন্তত সে পাঁচ ছ'খানা করে চিঠি পড়ে। মনে হয় সেই সময়ে সুপ্রিয়া তার সঙ্গে কথা কইছে—

আজও সে চিঠিগুলো একটার পর একটা পড়ে যেতে লাগল। সরল, সহজ ভাষা, ভালবাসারও সহজ অভিব্যক্তি। অফুরন্ত প্রাণরসের চিহ্ন শুধু

তার ছত্রে ছত্রে—জগৎ সম্বন্ধে কৌতুক ও কৌতূহলের অবধি নেই। নিতান্তই ছেলেমানুষ, এর মধ্যে অভিনয় সন্দেহ করেছিল সে? ছিঃ!

কিন্তু চিঠিগুলো যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন সেগুলোকে আবার বাণ্ডিল বেঁধে তুলে রাখবার কথা মনে রইল না। খাম আর কাগজগুলো তেমনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রইল, তারই মধ্যে আলোটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে সেই কথাটাই ভাবতে লাগল বিভূতি—সত্যি, কী বলবার ছিল ওর, এমন কি কথা? যদি এটা ওর ঠাট্টা না হয়, যদি সত্যিসত্যিই কোন অন্যায় ক'রে থাকে ও—কি সে অন্যায়, কী রহস্য ছিল ওর মনে এতদিন? স্বামীর আলিঙ্গনের মধ্যে শুয়ে থেকে, তার ভালবাসার সহস্র নিদর্শন পেয়েও যা সাহস ক'রে বলতে পারে নি সুপ্রিয়া!

কে এ কথার উত্তর দেবে? কোন উপায় নেই জানবার। চিরদিনের মতোই থাকবে শুধু প্রশ্ন।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার পাণ্ডুর হয়ে এল—ধীরে ধীরে ফরসা হয়ে এল পুবের আকাশ, হ্যারিকেনের আলো ম্লান হয়ে গেল, তবু বিভূতির চোখে তন্দ্রা নামল না। তেমনই স্থির হয়ে বসে রইল সে, চারিদিকে ছড়ানো রইল চিঠিগুলো, আলোটা তেমনি জ্বলতে লাগল।

কে জানে হয়ত সারাজীবনেও এ সমস্যার মীমাংসা হবে না—হয়ত বা জন্মান্তরেও না।

লণ্ঠনের ঐ বিবর্ণ শিখাটা আবার রাত্রির অন্ধকারে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—কিন্তু তার জীবনের সমস্ত আলো হয়ত চিরদিনের জন্যই বর্ণহীন হয়ে গেল। জীবনের যে ক'টি ফলবান মুহূর্তকে ও অবলম্বন ব'লে আঁকড়ে ধরে ছিল, আজ তারা ভোরের আকাশের ঐ তারাগুলোর মতোই মিলিয়ে গেল, আর কোনদিন বোধ হয় তাদের দেখা পাওয়া যাবে না।

পঞ্জর

অতীশ সাধারণভাবে সমস্ত ধনীলোকের ওপরই চটা ছিল। এটা ওর সাম্যবাদীদের বক্তৃতা শোনার ফল নয়—নিজের স্বভাবজাত বিদ্বেষ। বোধ হয়

ছেলেবেলায় ও নিজে ধনী হবার যে স্বপ্ন দেখেছিল, ভবিষ্যতের যে ছবি মনে মনে এঁকেছিল, তার শোচনীয় ব্যর্থতাই এই মনোভাবের জন্য দায়ী।

ছেলেবেলায় ও লেখাপড়া শেখে নি কিন্তু সেটাকেই ও নিজের দুর্দশার কারণ বলে মেনে নিতে চায় না কিছুতে। লেখাপড়া তো বেশির ভাগ মাড়োয়ারীর ছেলেই শেখে না, তার জন্যে তাদের বড় ব্যবসায়ী হওয়া আটকায় কি? তার নিজের দেশেও তো দেখেছে, একেবারে অক্ষরপরিচয়হীন 'সাহা'রা—টাকার স্তূপের ওপর বসে আছে। তবে? সে কেন ট্রামের কনডাক্টর হয়েই জীবন অতিবাহিত করবে? ··সে যে ব্যবসায়ী হ'তে পারে নি সেটাকে তার নিজের অক্ষমতা ব'লে মনে করে না—ধনীলোকদের ষড়যন্ত্রের ফল ব'লে মনে করে। ঠিক স্পষ্টত কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করার ওর কিছু নেই, তবে একটা আব্ছা ধারণা ওর মনে আছে যে, মূলধন ও ব্যবসা করার সুযোগ আর কারুর দেওয়া উচিত ছিল ওকে।

দোষ যারই হোক—সুযোগ-সুবিধা ওর মেলে নি, এইটাই সত্যকথা। তাই লক্ষপতি হয়ে মোটরে ও এরোপ্লেনে চড়ে ঘুরে বেড়ানো ওর সম্ভব হয় নি; এমন কি, একটা ভাল অফিসে চাকরি পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে নি। লেখাপড়া সে কম শিখেছে বটে তবু ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত তো পৌঁছেছিল! আরও কম লেখাপড়ায় বহু লোক অফিসে চাকরি করছে—বড়বাবু পর্যন্ত হয়েছে। তার পরিচিতই কত লোক এমন আছে। অথচ সে—এই মাইনেতেই একটা ভাল কাজ কি সে পেতে পারে না? চেষ্টা সে কম করে নি, ঘুরেছেও বিস্তর। কিন্তু শুধু মুরুব্বির অভাবে কোথাও কিছু পায় নি। আজ সে ট্রামের কন্ডাক্টর। এই চাকরি নেওয়ার মধ্যেই তার অবস্থাপন্ন লোকদের বিরুদ্ধে যেন একটা মস্ত বড় অভিমান ছিল, যদিও সে অভিমানের মূল্য সে কোথাও পায় নি—অতীশ নামক একটি দরিদ্র ভদ্র সন্তানের জীবনে কী সূক্ষ্ম আশাভঙ্গ ঘটল তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা ওর ওপর হয়েছিল খুব জোর। এই কাজটাকে যেদিন সে পুরোপুরি মেনে নিলে সেদিন থেকেই সে যেন বড়লোকদের, পুঁজিবাদীদের, ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একটা জেহাদ্ ঘোষণা করল। এখন শ্রমিকদের সমস্ত সভায় অতীশ গরম গরম বক্তৃতা দেয়, ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে তো সে রীতিমত

পাণ্ডাই হয়ে উঠেছে। ওপরওলাদের গালাগাল তো দেয়ই—তার সহ-কর্মীদেরও রেহাই দেয় না, তারা বিনা প্রতিবাদে নাকি ওপরওলাদের জুলুম মেনে নেয়—আর তার ফলেই তাদের এই দুর্দশা। এখন আর ধনী হবার স্বপ্ন সে দেখে না, এখন তার শুধু আশা—সে এই সব শ্রমিকদের নেতা হবে, তার মুখের কথায় বড় বড় ধর্মঘট শুরু হবে আবার ভাঙবে, সবাই তাকে সমীহ ক'রে চলবে, সরকার করবে ভয়। দুনিয়ার আর পাঁচটা দেশের মতো শ্রমিক-দের জন্যে সমস্ত সুখ-সুবিধা সে আদায় ক'রে নেবে।

কিন্তু এই সমস্তর মধ্যেও কোথায় ওর একটি বিলাসী মন ছিল। মধ্যে মধ্যে একটু নির্জনে থাকতে ওর ভাল লাগে, আর ভাল লাগে খবরের কাগজ পড়তে। সেইজন্য ও আর পাঁচজন কন্‌ডাক্‌টরের সঙ্গে মিলে একটা পাকা ঘরে না থেকে, ছ'টাকা দিয়ে একটা খোলার ঘর ভাড়া ক'রে থাকে, আর সময় পেলেই লাইব্রেরী থেকে খবরের কাগজ পড়ে আসে। মেস ক'রে থাকে না ব'লে খাওয়ার অসুবিধা হয়, খুচরো হোটেলে ভাত-ডাল কিনে খায়—তাতে পয়সা বেশী লাগে, খাওয়াও ভাল হয় না। তবু এই নিজস্ব ঘরের বিলাস ও ত্যাগ করতে পারে না।

মাইনে সামান্যই—তার সঙ্গে ওভার টাইম প্রভৃতি মিলিয়ে যা পায় তাতে এখানের খরচা চালিয়ে কোনমতেই দশ টাকার বেশি দেশে পাঠাতে পারে না। ঢাকা জেলার এক গ্রামে ওদের বাড়ি—সেখানে বাপ-মা আছেন, স্ত্রী-পুত্রও আছে। বয়স ওর বেশি নয়, বোধ হয় ছাব্বিশ-সাতাশ হবে কিন্তু অল্প বয়সে বিয়ে করেছিল বলে ইতিমধ্যেই দুটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। টাকার দরকার তাতে সন্দেহ নেই, তবু সেটা উপার্জনের আর কোন চেষ্টাই তার দ্বারা সম্ভব হয় নি—কোন উপায় সে খুঁজে পায় নি। যে উদ্যমহীনতা ওকে ব্যবসায়ী হ'তে দেয় নি—পঁচিশ টাকা মাইনেয় ট্রাম কন্‌ডাক্‌টর ক'রে রেখেছে সেই অক্ষমতাই ওর সামনে উন্নতির সব পথ আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে চিরকাল। সব চেয়ে মজার কথা এই যে, এখানে চাকরি নিয়ে ও নিজের যে জন্মগত ভদ্র-সংস্কারকে একেবারে বিদায় দিয়েছে ব'লে মনে করে, তার সেই সংস্কারই যে ওকে আর কোন কোন কন্‌ডাক্‌টরের মতো টিকিট না দিয়ে ভাড়ার পয়সাটা নিজস্ব পকেটে তুলতে বাধা দেয়—সেটা বুঝতে পারে না। একটু চেষ্টা করলেই

এ থেকে দৈনিক আট-দশ আনা পয়সা স্বচ্ছন্দে কামানো যায়, এমন কি সে কৌশলটা ইচ্ছে করলে ও অন্য লোককে শিখিয়ে পর্যন্ত দিতে পারে—তবু নিজে কিছুতেই সেটা করতে পারে না, কোথায় যেন বাধে।

বড়লোকদের ওপর অতীশের রাগটা আরও বেড়েছে ওর এই নতুন ঘরে এসে। তার খোলার চালের ঘরের ঠিক গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে সরকারী উকিল অরবিন্দ সরকারের বিরাট চারতলা বাড়ি। তা থাক—তারা যদি একটু ভদ্র হ'ত কিংবা একটুখানিও সহানুভূতিসম্পন্ন হ'ত, তাহ'লে ওর অনুযোগ করার কিছু থাকত না ; কিন্তু তারা যে ওদের, অর্থাৎ যারা তাদের প্রাসাদের পাশেই প্রাসাদের কলঙ্কস্বরূপ খোলার ঘরে বাস করছে, তাদের মোটে মানুষের হিসেবেই ধরে না, সেইখানেই যত আপত্তি ওর। মানুষ তো নয়ই—কুকুর-বেড়ালেরও অধম ভাবে বোধ হয়। ওদিকে অন্য পাকাবাড়ি ঢের আছে, বাড়ির জঞ্জালগুলো সেদিকে ফেলতে বোধ হয় সাহসে কুলোয় না—যত আবর্জনা সব ফেলে অতীশের ঘরের সামনে—ওর সেই অর্ধবর্গ-হাত পরিমাণ জানলার ঠিক নিচেই। একে তো ঐটুকু জানলা, তা-ও এই গরমে বেচারার খুলে রাখবার উপায় নেই, খুললেই চিংড়িমাছের খোলা, ইলিশমাছের আঁশ, কাঁঠালের ভুতুড়ি প্রভৃতি পচার মিলিত সৌরভ (!) নাকে এসে ওকে পাগল ক'রে দেয়।

দু'একদিন বাড়ির চাকরদের ডেকে বলতে গিয়েছিল কিন্তু তাদের দাসত্ব-গৌরব এত বেশী যে তারা কথার উত্তর পর্যন্ত দেয় নি। বাবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা ক'রেও ব্যর্থ হয়েছে। যখনই দারোয়ানকে বলতে গেছে তখনই শুনেছে হয় বাবু শুয়ে আছেন, নয়ত তাঁর মাথা ধরেছে কিংবা মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এ সব কৈফিয়ৎগুলো দারোয়ানকে ভেতরে গিয়ে জেনে আসতে হয় না। বোধ হয় বেশভূষা দেখলেই সে বুঝতে পারে যে কী-রকম লোককে বাবুর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া ঠিক হবে। অতীশেরও 'ডিউটি'র ঠিক থাকে না—বাবু যখন আদালতে যান কিংবা সেখান থেকে ফেরেন তখন গিয়ে ধরবে, সে উপায় থাকে না।

অগত্যা সে ওদের ক্যাশবাবুকে ধরে তাঁকে দিয়ে একখানা দরখাস্ত লিখিয়ে

পাঠিয়েছিল কর্পোরেশন অফিসে কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হয় নি। স্যানিটারী ইন্‌স্‌পেক্টর এসে বাবুর ঘরে বসে এক কাপ চা খেয়ে গেছেন—তারপর দু'দিন জঞ্জালগুলো মোড়ের ডাস্ট্‌বিনের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, তারপরই আবার এসে কায়েমি হয়ে বসেছে ওর জানলার নিচে। উপরন্তু ওর ওপর অত্যাচার উপদ্রব যেন আরও বেড়েছে। অর্ধেক রাত্রে ঠক্ ক'রে পাঁঠাব হাড় এসে পড়ে ওর চালের ওপর, কোন-কোন দিন কাজ থেকে ফিরে দোর খুলে দেখে বাইরে থেকে কে বালতি ক'রে এমন জল ঢেলেছে যে বন্ধদোরের ফাঁক দিয়ে জল ঢুকে সারা মেঝেতে জমে আছে—বিছানাপত্র সব গেছে ভিজে! ফলে তার পরের দিনই সে তিন টাকা দিয়ে একটা পুরোনো তক্তপোশ কিনতে বাধ্য হয়েছে। সামান্য খোলার ঘরের লোক তাঁর মতো একজন উকিলের নামে কর্পোরেশেনে নালিশ করবে, এ স্পর্ধা মিঃ সরকারের কাছে অসহ্য। তিনি অরবিন্দ সরকার—দুদিন পরে স্যার অরবিন্দ হবারও আশা রাখেন, তাঁর কাছে এ দুঃসাহস ক্ষমার অযোগ্য। ইতিমধ্যে একদিন চারতলার ছাদের ওপরে ঘোলাজলের ট্যাঙ্ক খারাপ হ'ল—সেখান থেকে সেই জলের ধারা দিনরাত পড়তে শুরু হ'ল ওরই খোলার চালের ওপর, সে শব্দে রাত্রে ঘুম হয় না, দিনের বেলা ঘরে থাকতে পারে না। বাড়িওলাকে ডেকে বলতে গেল, সে বললে, 'কী করবে বলো ভাই—ওরা বড়লোক, ওদের সঙ্গে কি আর দাঙ্গা বাধাবো?'

অসহিষ্ণু অতীশ বলে, 'কিন্তু তাই ব'লে এই অত্যাচার সহ্য করবে! তোমার খোলার চাল এই জলের তোড় কতক্ষণ সইতে পারবে? ও তো ভেঙে গেল ব'লে। তখন কি হবে?'

শুকনো মুখে বাড়িওলা বলে, 'তাই তো ভাই—কী বলব বলো দেখি! আচ্ছা, দেখি, যাই একবার কর্তার কাছে।'

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল। কর্তা ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, 'তা আমি কি করব? আমি কি নিজে গিয়ে সারাবো? মিস্ত্রীকে খবর দিয়েছি সে যদি না আসে!...পারো সারিয়ে দাও—পয়সা দেবো।'

তবু বাড়িওলা ভয়ে ভয়ে বলে, 'বাবু, আমার খোলাগুলো জখম হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্যই বলা—'

'জখম হয়ে যায় দাম দেবো। যুদ্ধের বাজার, মিস্ত্রী পাওয়া যায় না তা

তো বোঝো!'

জখম হয়েছিল ঠিকই, যখন মিস্ত্রী এল সারাতে তখন ঘরের মধ্যে রীতিমতো জল পড়তে শুরু হয়েছে কিন্তু তার খেসারৎ দাবী করার সাহস বাড়িওলার নেই—সারিয়ে দেবারও সঙ্গতি নেই, ফলে বর্ষায় কষ্ট পেতে হয় অতীশকেই। এ ঘর ছাড়তে পারে না—ঘর পাওয়া যায় না ব'লে। বেশী ভাড়া দেওয়া অসম্ভব, দেশেতে সবাই একবেলা খেয়ে আছে, এ সংবাদ নিত্যই আসছে। ধান যা হয় তাতে ছ'মাসের খোরাক চলে—বাকী সব ভরসা ওর ঐ দশ টাকার ওপর: তা থেকে কমানো যায় না এক পয়সাও! বরং বাড়ানোই উচিত। আজ এক বছর বাড়ি যেতে পারে নি, ছুটি পায় নি ব'লে নয়,—ঐ খরচটা বাজে খরচা ব'লে মনে হয়েছে। এক মাসের বোনাস হাতে পেয়েও যেতে মন ওঠে নি—মনে হয়েছে যে তারা সেখানে খেতে পায় না, পরনে কাপড় নেই—ছেলেমেয়েগুলোর চিকিৎসা পর্যন্ত হচ্ছে না, গাড়ি ভাড়ার টাকাটা তাদের পাঠালে কাজ দেবে। স্ত্রী কান্নাকাটি ক'রে চিঠি দিয়েছিল—ভাল ক'রে বুঝিয়ে উত্তর দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছে। আর কিছু আয় না বাড়লে কিংবা খাওয়া-পরার খরচা কিছু না কমলে সাহস হয় না চোদ্দ-পনেরো টাকা খরচ করতে!

অথচ উপায়ও কিছু খুঁজে পায় না অতীশ—এমন চাকরি যে অবসর সময়ে অন্য কোথাও কিছু করবারও উপায় নেই। সময়ের ঠিক নেই—কোনদিন সকালে, কোনদিন দুপুরে, কোনদিন সন্ধ্যায়। বাড়তি উপার্জনের কোথাও কোন পথ খোলা নেই, চুরি ডাকাতি করলে কিছু হ'তে পারে কিন্তু সে ক্ষমতাও তার নেই। সুতরাং দিনরাত ভাবে নিজের অবস্থার কথা, স্ত্রীপুত্রের কথা—ভবিষ্যতের কথা, আর সমস্ত রাগগুলো গিয়ে পড়ে তাদের ওপর, যাদের খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, ইচ্ছে করলেই যারা ট্রেনে চাপতে পারে, বিলাসের উপকরণ যাদের কাছে সহজলভ্য। আর সেই বড়লোকদের একমাত্র প্রতিনিধি হলেন ওর কাছে উকীল অরবিন্দ সরকার।... এক এক সময় বর্ষামুখর রাতে বিছানা গুটিয়ে বসে থাকতে থাকতে অন্ধকারে ঘুষি পাকিয়ে নিষ্ফল রোষে সে ফুলতে থাকে, মনে হয় কোন রকম ক'রে সে যদি ভগবানের রচিত এই অসমান ব্যবস্থা ভাঙতে পারত—তাহ'লে, তারপর মরে গেলেও তার দুঃখ

থাকত না। শুধু যদি ঐ অরবিন্দ সরকারটাকে কোনমতে জব্দ করতে পারত, কিংবা—কিংবা অন্য কোন রকম ভাবে শোধ তুলতে পারত।

এই যখন ওর অরবিন্দ সরকার সম্বন্ধে মনোভাব, তখন হঠাৎ একদিন মিঃ সরকারের একমাত্র এবং আদরিণী কন্যার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়ে গেল!

অতীশ থাকে অনেকটা আপন মনেই। ওর গলির কাউকেই প্রায় ও চেনে না—সরকারদের বাড়ির দিকে তো চায়ই না ভাল ক'রে। তাই বিপাশাকে দেখতে পেলেও এর আগে লক্ষ্য করে নি। সেদিনও টিকিট দিতে দিতে সে এগিয়েই যাচ্ছিল, তার দিকে ভাল ক'রে চেয়েও দেখত না বোধ হয়—যদি না বিপাশাই ব'লে উঠত হঠাৎ, 'ও, আপনি ট্রামে কাজ করেন? কী মজা!'

অবাক হয়ে ফিরে তাকাল অতীশ। বছর চোদ্দ-পনেরোর একটি মেয়ে—হয়ত আরও ছোটই হবে, পরনে ফ্রক, চুল বব্ করা, হাতে বই খাতা, বোধ হয় ইস্কুলে যাচ্ছে। সমস্ত ধরনটা মেম-সাহেবদের মতো, যা অতীশ দুচক্ষে দেখতে পারে না। সে কড়া কথাই ব'লে ফেলত হয়ত কিন্তু বিপাশার মুখের দিকে চেয়ে ওর মনটা নরম হয়ে এল। সুন্দর নয় তবে সুশ্রী বলা চলে, উজ্জ্বল দুটি চোখ, মুক্তোর মতো দাঁত—সব চেয়ে যেটা আকর্ষণের সেটা হচ্ছে ওর আশ্চর্য রকমের সরলতা মাখানো মুখভাব এবং সহাস্য দৃষ্টি।

তবু ও ভ্রূকুটি ক'রেই জবাব দিলে, 'মজাটা কি?'

'এই কেমন ট্রামে ট্রামে ঘুরে বেড়াতে পান—যখন-তখন!'

এই এক রকমের বড়মান্ষী ন্যাকামি আছে—অতীশের হাড় জ্বালা করে শুনলে। যে পরিশ্রমটা করে ওরা প্রাণের দায়ে—সেটাকে যে এরা খুব সহনীয় এমন কি কাম্য ব'লে মনে করে, এইটে দেখাতে চায় এরা। সে কঠিন এবং শুষ্ক কণ্ঠে বললে, 'কাজটা তোমাকে করতে হয় না তাই, নইলে বুঝতে পারতে ব্যাপারটা এমন কিছু মজার নয়—বরং কষ্টকর!…আপনার টিকিট?'

পাশের বেঞ্চিতে হাত বাড়িয়ে দিলে অতীশ। ইচ্ছে ক'রেই সে মেয়েটিকে 'তুমি' বললে। বয়সে ছোট তাতে তো সন্দেহ নেই, তবে কিসের খাতির অত!…এতই উষ্ণতা ওর মনে জমা হয়েছিল যে মেয়েটি ওকে কবে দেখলে, কোথায় দেখলে এর আগে, সেটা খোঁজ করবার কথাও মনে হ'ল না।

মেয়েটি ওর অকারণ রূঢ়তায় একটু ম্লান হয়ে গিয়েছিল, সে-ও আর আলাপ জমাবার চেষ্টা করল না। পাশের যাত্রীগুলি কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে, সেজন্যও কতকটা যেন ওর লজ্জাবোধ হচ্ছিল। স্কুলের কাছাকাছি গাড়ি এসে দাঁড়াতেই সে নেমে পড়ল সবার আগে।

আসলে কথাটা হচ্ছে এই যে, সে ইস্কুলের গাড়িতে এসে চাপে বাড়ির সামনেই, সেজন্য অতীশের দেখার সুযোগ হয় না বিশেষ। কিন্তু সে গাড়ি ক'রে যেতে যেতে প্রায়ই অতীশকে দেখে যায়। অতীশ যে ওকে চেনে না, সে সম্ভাবনাটা একবারও বিপাশার মাথায় ঢোকে নি, তাহ'লে সে হয়ত আলাপ করার চেষ্টাই করত না। অতীশকে সে দেখেছে, কিন্তু সে ট্রামে কাজ করে তা জানত না। ট্রামে চড়ার কারণ তার ঘটে কদাচিৎ, নিতান্ত ইস্কুলের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে ব'লেই আজ চাকরের সঙ্গে সে ট্রামে চড়েছে। ট্রামে সে চড়ে না ব'লেই ট্রামে চড়াটা তার কাছে অত্যন্ত সুখকর এবং কৌতুকাবহ ব্যাপার ব'লে মনে হয়—আর সেইজন্য তারই গলির অধিবাসী অতীশকে ট্রামে কাজ করতে দেখে হঠাৎ অত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক—ব্যাপারটা কিন্তু ঐখানেই মিটল না। সেইদিনই বিকেলে অতীশ ওর ঘরের বাইরের সংকীর্ণ রকে চুপ ক'রে বসে আছে এমন সময়ে বিপাশা ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে ওর সামনাসামনি এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চাকরকে বললে, 'তুই বইগুলো নিয়ে এগিয়ে যা, আমি যাচ্ছি।'

তারপর অতীশের দিকে ফিরে বললে, 'কি করছেন? আজ বিকেলে আর বেরোবেন না বুঝি?'

এতক্ষণে সকালের আলাপের যোগাযোগটা অতীশের মাথায় ঢুকল। সে বসে বসে এখন সেই কথাটাই ভাবছিল—সকালের অকারণ রূঢ়তাটা বুঝি এখনও মনের মধ্যে খচখচ করছে—মেয়েটিকে এই গলির অধিবাসীরূপে কিন্তু একবারও ভাবতে পারে নি। একটু বিস্মিত হয়েই সে প্রশ্ন করল, 'আপ—তুমি এই গলিতেই থাকো বুঝি খুকী?'

'আমি আর খুকী নই—এখন বিপাশা!...আপনি কি দেখেন নি আমাকে একদিনও? আমি তো পাশের বাড়িতেই থাকি, বা রে!'

ট্রামের সব আরোহীই যে কন্‌ডাক্টরদের 'তুমি' বলে এটা অতীশের

বরাবরই অসহ্য লাগে। এই মেয়েটিকে বার বার 'তুমি' বলা সত্ত্বেও সে যে 'আপনি' বলছে তাতে অতীশের মন একটু কোমল হয়ে এসেছিল কিন্তু এখন আবার পাশের বাড়ির পরিচয়ে সে কঠিন হয়ে উঠল। উদাসীন ভাবে জবাব দিলে, 'ও, তাই নাকি? তা হবে!'

বিপাশার চোখ দুটি বিস্ময় ও কৌতুকে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বললে, 'আপনি আমাকে মোটে চিনতে পারেন নি, না? তাই সকালে অমন কড়া কড়া কথা কইছিলেন। আমি আবার তা ভাবি নি—বরং দুঃখ হচ্ছিল মনে। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলুম।'

তবু অতীশ নরম হ'ল না। তেমনি নিরাসক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'সেটা আমার ডিউটির সময়—দাঁড়িয়ে আলাপ করবার তো নয়!'

কিন্তু বিপাশা এ উত্তরেও দমল না। বরং অনুতপ্ত ভাবেই বললে, 'তা বটে —আমারই অন্যায় হয়েছিল।'

এর পর আর কঠিন হয়ে থাকা সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবেই অতীশ প্রশ্ন করল, 'তুমি বুঝি ওবেলা ইস্কুল যাচ্ছিলে? তোমার ইস্কুলের গাড়ি নেই?...'

এবার ওকে চেষ্টা ক'রেই 'তুমি' বলতে হ'ল। 'আপনি'টাই বেরোতে চায় গলা দিয়ে। এর আগে 'তুমি' বলেছে ব'লে জোর ক'রে এবারও সেই সম্বোধন করল—অন্য রকম করতে লজ্জা বোধ হ'ল।

কিন্তু এসব গ্রাহ্যই করে না বিপাশা। সে বলে, 'গাড়ি আমাদের খারাপ হয়ে গেছে—দু-তিনদিন আরও লাগবে সেরে আসতে। আমি তো সেই গাড়িতেই যেতুম—আপনি তাই আমাকে লক্ষ্য করেন নি।...আমার কিন্তু ট্রামে চড়তে ভারি ভাল লাগে। ..কাল আপনার কখন ডিউটি, সকালে?... বেশ হয় যদি কালও আপনার ট্রাম ধরতে পারি।'

এবারে অতীশ হেসে ফেললে, 'তা কি আর সম্ভব! কোন্ লাইনে কোন্ সময়ে থাকব তা কে জানে। ও লাইনে থাকলেও দেখা হবে না। পাঁচ মিনিট অন্তর গাড়ি যায়—আমি কোন্‌টাতে থাকব তা তুমি কেমন ক'রে জানবে বল!'

'তাই তো—কিন্তু হঠাৎ যদি আবার দেখা হয়ে যায়? সে বেশ মজা হবে,

না? আচ্ছা, যাই এখন, মা আবার ভাববে—কেমন?'

বিপাশা ওর কাঁধের উপর এলিয়ে-পড়া চুলগুলোয় একটা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল।

সামান্য পরিচয়, অল্পক্ষণের দেখাশুনো, তবু হঠাৎ যেন অতীশের মনে হ'ল ওর সামনে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল, সেটা কে সরিয়ে নিয়ে গেল। তরুণ মনের একটা উত্তাপ যেন এতক্ষণ কাছে ছিল—সেটা কমে গিয়ে স্যাঁৎসেঁতে পুরাতন এই গলিটা যেন আরও বেশী ঠাণ্ডা বোধ হতে লাগল। সে জোর করে মিইয়ে পড়া মনটাকে নাড়া দিয়ে নিয়ে একটা বিড়ি ধরালে।

অতীশই আগের দিন বলেছে যে ট্রামে ওদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়, তবু সাড়ে দশটা নাগাদ ওর মন বার বার চমকে ওঠে দ্বারপ্রান্তে কোন ফ্রকের আভাস দেখে, মন উৎসুক হয়ে থাকে সেই ছোট মুখখানি আর উজ্জ্বল দুটি চোখের জন্যে। সে বুঝতেও পারে না যে কি আশায় সে বার বার চাইছে ওদিকে—শুধু সময় এবং স্থানটি পেরিয়ে গেলে কেমন যেন একটু হতাশা বোধ করে।

বিকেলে ওর কোথায় যাবার কথা ছিল, ইউনিয়নেরই কী একটা সভায়। কিন্তু মনে মনেই শরীর খারাপ হবার অজুহাত দিয়ে ও চারটে অবধি পড়ে রইল বিছানায়, তারপর বিড়ি দেশলাই হাতে করে আগের দিনের মতোই র'কে এসে বসল। ও যে ঐ ফিরিঙ্গী ঢংয়ের মেয়েটাকে দেখবার জন্যই অপেক্ষা করছে, একথা তখন ওকে কেউ বললে অতীশ রীতিমতো চটে যেত। ওর বিশ্বাস ও স্বাভাবিক ভাবেই বাইরে বসে বিশ্রাম করছে, ঐ এক ফোঁটা বড়লোকের আদুরে মেয়ের কথা ওরা মনেও নেই। কিন্তু মনকে ও যাই বোঝাক—সাড়ে চারটে নাগাদ গলির মোড় থেকেই চোখোচোখি হতে বিপাশার মুখ যখন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন অতীশও নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, ও এতক্ষণ বোধ হয় এই হাসিটিরই পথ চেয়ে ছিল।

বিপাশা কাছে এসে বললে, 'জানি দেখা হবে না, তবু ট্রামে ওঠবার সময় আজও মনে হচ্ছিল যদি দৈবাৎ আপনার ট্রামটাই কাছে এসে যায় তো কী মজা হয়!'

তারপর অতীশের উত্তর দেবার অপেক্ষা না রেখেই সে এক লাফে রকের ওপর উঠে পড়ে বললে, 'দেখি, আপনার ঘরকন্না দেখে যাই—'

এ সম্ভাবনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না অতীশ। ওর দারিদ্র্যের জন্য ও লজ্জিত নয়, একথা ও বন্ধুমহলে বারবারই গলাবাজি ক'রে জানিয়েছে—তবু কে জানে কেন কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিপাশা দোরের কাছে থেকেই একবার সবটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'ওমা, আপনি খান কোথায়? কোন মেসে বুঝি?'

'না। হোটেলে খাই।'

'তাহলে তো বড় কষ্ট! হোটেলের খাওয়ায় অসুখ করে, আমাদের রমাদি বলেন।' চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে বলে বিপাশা।

'কি করি বলো—কে আর রেঁধে দেবে আমাকে।'

'তা বটে।' কণ্ঠস্বর সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ হয়ে আসে বিপাশার, 'এই বিদেশে কি কষ্ট ক'রেই পড়ে থাকতে হয় আপনাকে।...আপনার দেশ কোথায়?'

'ঢাকা।'

'ঢাকা? সে তো শুনেছি বাঙাল দেশ। কই, আপনার কথাতে তো বাঙালে টান নেই তেমন?'

'আছে, তবে অনেক কমিয়ে ফেলেছি ইচ্ছে করে।...তুমি এতক্ষণ এখানে আছ, মা ভাববেন না?'

'মার কথা ছেড়ে দিন—আমি বাড়ি থেকে বেরোলেই উনি ভাবতে বসেন। আজ অবিশ্যি এতক্ষণ রামভরোসা গেছে—বলবে এখন আমি এখানে আছি।'

'তুমি—তুমি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছ—ওঁরা বকবেন না?'

'কেন, বকবেন কেন?...তাছাড়া আমাকে বকতে কেউ সাহস করে না। বাবা পর্যন্ত ভয় ক'রে চলে আমাকে, তা জানেন? একবার রাগ ক'রে দুদিন খাই নি, সেই থেকে সবাই ঠাণ্ডা।'

কিন্তু সে নেমেই পড়ল। শুধু যাবার সময় বলে গেল, 'আপনার বিছানা ভারি ময়লা হয়েছে—কাচতে দিন।'

তার পরের দিন ফেরবার পথে বিপাশা হঠাৎ ওর পাশেই রকের ওপর বসে পড়ল। অতীশ ওকে যত দেখছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে—মেয়েটা পাগল নাকি ? সে বললে, 'হাঁ-হাঁ করো কি, এই ধুলোর ওপর বসতে আছে, ছিঃ!'

বিপাশা বিস্মিত হয়ে বললে, 'কেন, আপনি তো বসেছেন!'

তারপরই হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা আপনি বিড়ি খান কেন ? বাবা বলে যে ওতে শরীর খারাপ করে। বাবা খেত, বুকের অসুখ হ'তে ছেড়ে দিয়েছে একেবারে।'

অতীশ হেসে বললে, 'তোমার বাবা বড়লোক—ওঁর যত সহজে শরীর খারাপ করে, আমাদের তত সহজে করে না।'

এমনি ক'রে চলল ওদের খুচরো আলাপ। অধিকাংশই বাজে কথা। কী খেলেন—কবে বাড়ি যাবেন—এই সব প্রশ্ন বিপাশার। তবু অতীশের মনে হয় তার এই নিঃসঙ্গ প্রবাসী জীবনে যেন নতুন একটা আলোকের সন্ধান দিয়েছে এই মেয়েটি। কোন দ্বিধা নেই, কোন অভিমান-বোধ নেই—সরল নিষ্পাপ এই মেয়েটির অন্তরের উত্তাপে ওর অনেক দিনের শৈত্য যেন গলে আসে।

কিন্তু পরের দিনই বিপাশাদের গাড়ি সেরে আসে, অতীশেরও ডিউটি পড়ে বিকেলের দিকে—তিন-চারদিন দেখা হয় না। তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, আগেও ওর সঙ্গে পরিচয় ছিল না—পরেও থাকবে না, তবু অতীশের মনে হয় দিনটা যেন দীর্ঘতর ঠেকছে—নিঃসঙ্গতা যেন আরও কষ্টদায়ক।

তার এই 'কিছুই ভাল লাগে না' ভাবের কারণ প্রথমটা নিজেও বুঝতে পারে নি অতীশ, দিন-দুই পরে হঠাৎ যোগাযোগ খুঁজে পেয়ে নিজের ওপরই অত্যন্ত চটে গেল। বড়লোকের মেয়ের ওপর এত মায়া পড়ার কোন ন্যায়-সঙ্গত কারণ নেই—এ সব ওদেরই শয়তানী। ওঁরা দয়া ক'রে গরীবদের সঙ্গে কথা কইতে এসে, অমায়িকতা দেখান। এত আত্মীয়তার দরকার কি ?··· এরপর কোন দিন আবার গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলে অতীশ কিছুতে আর আমল দেবে না।

অতীশ পড়াশুনো বেশী করে নি—নাটক নভেল পড়েছে আরও কম।

মেয়েদের প্রতি পুরুষের সহজাত আকর্ষণের মূলটা কোথায় তা জানে না। এটা-ওটা গল্প লোকের মুখে শুনে, খবরের কাগজে দু-একটা বীভৎস কাহিনী পড়ে, কিংবা কদাচিৎ সিনেমা দেখে এই সম্পর্কটার মোটামুটি খবর সে রাখে বটে কিন্তু নিজের এই মন-খারাপ হওয়ার সঙ্গে যে এ রকম কোন আকর্ষণের সম্বন্ধ আছে, সে-কথা সে একবারও ভাবতে পারে না। ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছে ওর—স্ত্রী একটা অভ্যাস, জীবনের অঙ্গ-স্বরূপ হয়ে গেছে ওর কাছে। অন্য মেয়ের সঙ্গে মেশবার সুযোগও হয় নি—মা এবং বোন কিংবা কন্যা ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে অন্য সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। মন স্বাভাবিক নিয়মে যে আকর্ষণ, যে বেদনা বোধ করে, ওর শিক্ষা বা সংস্কার তার অর্থ খুঁজে পায় না। বিস্মিত হয়—মনোবৈকল্যের জন্য কিছু ক্রুদ্ধও হয়।

সেই রাগটাই গিয়ে পড়ল দিন-তিনেক পরে একদিন বিপাশার ওপর। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ও একটু ঘুমোবার অয়োজন করছে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এসে পড়ল বিপাশা। একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওর চৌকিটারই এক কোণে বসে পড়ে পা নাচাতে নাচাতে বললে, 'আজ আমাদের ইস্কুলের ছুটি, জানেন? দুপুরবেলা সবাই ঘুমোচ্ছে, একা একা আমার ভাল লাগল না—আপনার খবর নিতে এলুম। কেমন আছেন?'

বহুক্ষণের গুমোটের পর এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস পেলে মনের যে রকম ভাব হয়, তিনদিন পরে বিপাশাকে দেখে অতীশেরও সেই রকম একটা আনন্দ হল। কিন্তু সেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ও আরও চটে গেল। এই রকম মায়ায় জড়ানো বড়লোকদেরই একটা চালাকি। সে একটুখানি চুপ ক'রে থেকে কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'গ্যাখো, আমি একটু নিরিবিলি থাকার জন্যেই এখানে ঘরভাড়া ক'রে একা বাস করি, তোমার বাবার অনেক অত্যাচারেও এ ঘর ছাড়ি নি। আমি লোকের সঙ্গে মেলামেশা মোটেই পছন্দ করি না। তুমি যখন-তখন এমন ক'রে বিরক্ত করতে এসো না।'

প্রস্ফুট শতদল যেন নিমেষে শুকিয়ে গেল—ওর মুখের অবস্থা দেখে অন্তত তাই মনে হ'ল অতীশের। বিপাশা এই রূঢ়তায় এতই অবাক হয়ে গিয়েছিল, যে প্রথমটা কোন জবাবই দিতে পারলে না, তারপর একটু যেন করুণ কণ্ঠেই বললে, 'আপনি রাগ করেন আমার ওপর? অতটা বুঝতে পারি নি।...আমি

চলে যাচ্ছি, আপনি কিছু মনে করবেন না—'

বিপাশা আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু অতীশেরও আর ঘুমোনো হ'ল না। মানুষকে আঘাত করায় যে এতটা কষ্ট—যে আঘাত করে সে-ও যে এতটা দুঃখ পায় তা অতীশের জানা ছিল না। এমন তো আর কখনও অনুভব করে নি!

সেদিন সারা সন্ধ্যা সে অন্যমনস্ক হয়েই রইল। কাজে ভুল করার জন্য দুবার ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছ থেকে ধমক খেলে। রাত্রে বাড়ি ফিরে আর হোটেলে খেতে যাবারও ইচ্ছা রইল না। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিবর্ণ ঠেকতে লাগল। বিপাশাকে অকারণে আঘাত করার জন্য সে অনুতাপ বোধ করছিল, শুধু এই কথাটা বললে অতীশের অবস্থাটা কিছুই বলা হয় না—কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন বুকের কাছটায় একটা দৈহিক ব্যথা অনুভব করছিল। এ এক বিচিত্র অনুভূতি—এ রকম এর আগে সে ভাবতেও পারে নি কখনও।

ওর মনে পড়ে গেল ওদের এক ইন্‌স্‌পেক্টর কয়েকদিন আগেই রসিকতা ক'রে বলেছিল, 'ওরে, বাইবেলে নাকি লেখা আছে পুরুষের বুকের পাঁজর ভেঙে ভগবান মেয়েছেলে সৃষ্টি করেছেন। নিজের বুকের জিনিস ব'লে ওদের ওপর বোধ হয় অত টান! আসলে ওরা অত কিছু নয়—বরং অপদার্থ।'

মনে হয় বাইবেলের কথাই ঠিক, সেইজন্যেই মেয়েছেলের জন্যে দুনিয়ার লোক পাগল—ভাবে অতীশ। ওদের জন্যে কিছু একটা স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে পুরুষ কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না। নিজের অস্থি থেকে তৈরী বলে অত প্রিয় সে পুরুষের!···

কিন্তু তবু, এসব কথা ভেবেও কোন সান্ত্বনা পায় না। প্রতি দিন-রাত্রি বিস্বাদ বিবর্ণ ঠেকে—প্রতি মুহূর্তে কথাটা কাঁটার মতো বুকের মধ্যে খচখচ করে। অকারণে একটা ফুলের মতো নিষ্পাপ, মধুর মেয়েকে আঘাত করেছে সে, কোন প্রয়োজন ছিল না তার অত রূঢ় হবার।

দিন পাঁচ-ছয় এমনি করে কাটাবার পর হঠাৎ অতীশ মরীয়া হয়ে উঠে একখানা ছুটির দরখাস্ত করে দিলে। দেশেই সে যাবে একবার। হিন্দুস্থানী

কনভাক্টর গঙ্গারামের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। সে এখন পনেরোটি টাকা ধার দেবে—মাসে দেড় টাকা হিসাবে শোধ দিতে হবে এক বছর ধরে। অর্থাৎ পনেরো টাকায় তিন টাকা সুদ। কিন্তু তাতেই রাজী হয়েছে অতীশ। স্ত্রী মঙ্গলা চিঠি লিখছে আজ তিন মাস ধরে, শরীর তার অত্যন্ত খারাপ, একটি বার যেন অতীশ দেখা দিয়ে যায়। যদি মঙ্গলা মরেই যায় তো আর দেখা হবে না। তাছাড়া একবার এই আবহাওয়া থেকে বাইরে যাওয়া অতীশেরও প্রয়োজন। নতুন ক'রে ওকে আবার কাজ আরম্ভ করতে হবে, পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে না গেলে সে আর নিজের পরিচিত সত্তাকে খুঁজে পাবে না।

ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, টাকা হস্তগত—তবু কে জানে কেন অতীশ একটা দিন নষ্ট করে। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে, বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কোন অর্থ হয় না। তার চেয়ে এ ভালই হ'ল, জিনিসটা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল। ওরা তো দেখলে যে বড়লোকেরা অন্তরঙ্গতা করতে এলেই যে গরিবরা কৃতার্থ হবে তার কোন মানেই নেই—এমনি নানা রকম ক'রে অতীশ মনকে বোঝালেও ওর মনের কোণে একটা আশা ছিল যে যদি দৈবাৎ দেশে যাবার আগে বিপাশার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তো অন্তত মাপ চেয়ে নেবার একটা অবসর মিলবে।

কিন্তু সে সুযোগ মিলল না, শুধু শুধু একটা দিনই নষ্ট হ'ল। সেদিন স্কুলের গাড়ি পর্যন্ত এল না বিপাশাকে নিতে। নিজের ওপর আরও বিরক্ত হয়ে অতীশ বেরিয়ে গিয়ে দু-একটা খুচরো জিনিস কিনে নিয়ে এল, তারপর নিজের ভাঙা টিনের স্যুটকেশটাতে মালপত্র গুছোতে বসল। আজই রাত্রের ঢাকা মেলে চলে যাবে সে—আর একদিনও নষ্ট করবে না। মোটে বারো-দিনের ছুটি—যেতে আসতেই তো চারদিন নষ্ট হবে, থাকবে ক'দিন?

পেছন ফিরে বাক্স সাজাচ্ছে, হঠাৎ দোরের দিক থেকে একটা ছায়া পড়তে দেখে চমকে চেয়ে দেখল বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বিপাশা। সে মুখে অভিমান বা দুঃখের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—আগের মতোই উজ্জ্বল সে মুখ, তেমনি দীপ্তিময়ী তার দৃষ্টি।

ওর সঙ্গে চোখোচোখি হতে একটু যেন ভয়ে ভয়ে বিপাশা প্রশ্ন করল, 'ভেতরে আসব?'

—'এসো এসো'

অকারণে খুশী হয়ে ওঠে অতীশ। জোর ক'রে সেদিনের স্মৃতিটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করে, 'কেমন আছ? আজ ইস্কুলের গাড়ি আসে নি?'

'না। আজ ইস্কুলে যাই নি।' ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে বিপাশা বলে, 'আপনাকে কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে। বলুন রাখবেন?'

'কি কথা? সম্ভব হলে নিশ্চয় রাখব।'

'ওসব বুঝি না—বলুন রাখবেন? না হ'লে ভারী দুঃখিত হব কিন্তু। বলুন না—রাখবেন কথা!'

সেই ছোট্ট সুন্দর মুখটির দিকে চেয়ে মনে হয় অতীশের যে, বিপাশার অনুরোধ রক্ষা না করাই বোধ হয় অসম্ভব। সে কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। বলো এখন—কী কথা?'

বিপাশা খুশিতে যেন জ্বলে ওঠে। বলে, 'আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্মদিনে বাবা প্রত্যেক বারই অনেক লোক খাওয়ান, আজও খাবে। আপনার নিমন্ত্রণ আজ আমাদের ওখানে—মা ব'লে দিয়েছেন। যেতেই হবে কিন্তু—আপনি কথা দিয়েছেন।'

আর যাই হোক—অতীশ এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে ট্রাম কন্‌ডাক্‌টর অতীশ, যাবে অরবিন্দ সরকারের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে! এ যে অসম্ভব! সে আকুল কণ্ঠে বলে উঠল, 'সে কি? কিন্তু সে যে হয় না ভাই, লক্ষ্মীটি, এ অনুরোধ ক'রো না।'

নিমেষে ম্লান হয়ে গল বিপাশা, বললে, 'কিন্তু আপনি যে কথা দিয়েছেন!'

'তা দিয়েছি, কিন্তু এ কি সম্ভব? তোমার বাবা শুনলে কি মনে করবেন বলো দেখি? নিশ্চয় তোমার বাবা এখনও জানেন না।'

'তা না-ই জানলেন। মা জানেন। তিনিই বাবাকে বলবেন। সেসব কিছু ভাববেন না।...আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে। নইলে আমি ভারী দুঃখিত হব, ভাববো আপনি এখনও আমার ওপর চটে আছেন।'

ওর মুখের দিকে চেয়ে 'না' বলতে অতীশের কষ্ট হ'ল তবু সে দৃঢ়কণ্ঠেই বললে, 'তুমি জানো না, ছেলেমানুষ—একদিন বড় হ'লে হয়ত বুঝবে যে

তোমার বাবার মতো বড়লোকদের সঙ্গে আমার মতো লোকের মিশতে যাওয়া কত অপমানের। তোমার ওখানে আজ কত লোক আসবেন, তাঁরা আমার সঙ্গে একসঙ্গে বসতেই সঙ্কোচ বোধ করবেন। মিছিমিছি আমাকে একটা লজ্জা, একটা অপমানের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে তোমার ?'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বিপাশা বললে, 'বেশ, আপনি সন্ধ্যার আগে আসুন, আপনাকে আমি মায়ের ঘরে বসিয়ে আলাদা খাইয়ে দেব। একটু জলখাবার আর চা না হয় খেয়ে আসবেন। এতে আর না বলবেন না—দোহাই আপনার। নইলে আমার মনে ভারী কষ্ট হবে। আপনার যেতে লজ্জা হয় আমি নিজে এসে ডেকে নিয়ে যাব। বলুন, যাবেন ?'

অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে অতীশ বললে, 'আচ্ছা তাই হবে। আমিই যাব, ঠিক সাতটা।'

বিপাশা চলে গেলে অতীশ অনেকক্ষণ পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে রইল। তার ঠিক জানা নেই, তবে বড়লোকদের এই সব ব্যাপারে উপহার দেওয়ার একটা রেওয়াজ আছে—এটুকু সে জানে। কী দেবে—কী দেওয়া সম্ভব তা ভেবে না দেখলেও তার পুঁজি যে মোট ঐ পনেরো টাকা! তা থেকে যা-ই খরচ করুক না কেন—দেশে যাওয়ার আশা তাকে ছাড়তেই হবে।

চুপ ক'রে বসে ভাবতে ভাবতে ওর মানসচক্ষে ভেসে উঠল মঙ্গলার শীর্ণ শ্রীহীন মুখ। এতদিনের অনাহার ও দুঃখের ফলে নিশ্চয়ই আরও শীর্ণ হয়ে গেছে। বেচারা! একবার স্বামীর দেখা পেলেই সে খুশী। তা-ও তার পাবার উপায় নেই।...এরা বড়লোক, কত অর্থ শুধু আজকের এই সামান্য উৎসবে ওদের ব্যয় হবে—কত উপহার আসবে। কত দামীদামী উপহার। তার মধ্যে যা-ই দিক না কেন অতীশ, তার কোন মূল্য থাকবে না ওদের কাছে। অথচ সেই টাকাতে তার দেশে ঘুরে আসা হবে। সেখানে তার বাবা মা, তার স্ত্রী, তার ছেলে-মেয়ে অপেক্ষা ক'রে আছে।

কথাটা মনে হ'তেই বিপাশাকে কথা দিয়ে ফেলার জন্য অনুশোচনার সীমা রইল না ওর। আচ্ছা, সে যদি কিছু না-ই দেয় ? সে তো একাই যাবে,

আলাদা খেয়ে চলে আসবে। কেউ জানতেও পারবে না, তার কাছ থেকে কেউ আশাও করে না কিছু। হয়তো কিছু দিতে গেলেই বরং উপহাসের চোখে দেখবে। শুধু-হাতেই যাবে নাকি সে ?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিপাশার মুখটা মনে পড়ে গেল। সেই উজ্জ্বল মুখ ওর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত উপহার পেলে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। তাছাড়া…তাছাড়া, বিপাশা জেদ ক'রে তার মতো একটা সামান্য লোককে নিমন্ত্রণ করেছে, নিশ্চয় বাড়ির লোকের অমতেই—তাদের কাছে বিপাশার মাথা হেঁট না হয়। তারা যেন দেখে যে সামান্য লোক হ'লেও বিপাশার নিমন্ত্রণের মর্যাদা সে বোঝে। তাদের কাছে বিপাশা যেন সগর্বে দেখাতে পারে যে, অতীশ ছোট কাজ করলেও সে ভদ্রসন্তান, ভদ্রসমাজের আইন-কানুন তার জানা আছে।

কিন্তু তবু অতীশ বসেই থাকে। এ যেন সে অতীশ নয়, যে ইউনিয়নের সভায় বড়লোকদের, পুঁজিবাদীদের গালাগাল দেয়—যে অতীশ মনেপ্রাণে এই সব বড়মানুষী আদিখ্যেতাকে ঘৃণা করে। এ যেন তার জন্মান্তর!

সে বারবার তার মনকে সেই শ্যামাঙ্গী পল্লীবধূ মঙ্গলার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেটা তার কর্তব্য—সেইটেই তার পক্ষে স্বাভাবিক। তার শান্তি, তার জীবনের সার্থকতা ঢাকা জেলার সেই নিভৃত পল্লীগ্রামেই আছে—এ উপদ্রব দু'দিনের খেয়ালমাত্র। এর জন্যে তার কর্তব্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়—এ কথা-দেওয়ারও কোন মূল্য নেই, দেশে ফিরে যাওয়াই উচিত তার। কিন্তু তবু—মঙ্গলা যেন বড় সুদূর, তার ছবি মনের মধ্যে বড় ম্লান। সুন্দর, উজ্জ্বল দুটি চোখে মিনতি উপছে পড়ছিল বিপাশার—বিপাশার অনুরোধ উপেক্ষা করার কথা কল্পনা করা যায় না। একটি মেয়ে আপনা থেকে শুধু তার খবর নিতে এসেছিল, তার নিঃসঙ্গ প্রবাসী জীবন সহানুভূতির ছোঁয়াচে আলোকিত করতে চেয়েছিল, সে অকারণে অপমান ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাতেও যে আহত হয় না, অভিমান পুষে রাখে না—আবার জন্মদিনে মিনতি ক'রে নিমন্ত্রণ করতে আসে, তাকে হতাশ করবে অতীশ কোন্ প্রাণে!

বিপাশাকে বোঝে না অতীশ—তার প্রতি অতীশেরও এ কিসের আকর্ষণ

বুঝতে পারে না, তবু যেন মনে মনে ভয় পায়। মনে হয় ঐ উজ্জ্বল ছুটি চোখকে ম্লান ক'রে দেবার ক্ষমতা আজ তার আর নেই—

আরও বহুক্ষণ সে বসে থাকে, অভিভূতের মতো—অচৈতন্যের মতো। সহসা একসময় যখন সম্বিৎ ফিরে আসে তখন ঘড়ি দেখে—সাড়ে ছটা!

সে পাগলের মতো দ্রুত হস্তে বাক্স গুছিয়ে নেয়। এখান থেকে তাকে পালাতে হবে—আর এখনই। বিপাশা তার কেউ নয়, বিপাশা শুধু মায়া—অতীশ তার খেয়ালের খেলনা মাত্র। মঙ্গলা তার আত্মার আত্মীয়, মঙ্গলার মলিন মুখ, উৎসুক ছুটি চোখকে নিরাশ করার কোন অধিকার অতীশের নেই। বুকের অস্থিতে একটি স্ত্রীলোকই একটি পুরুষের জন্য তৈরী হয়—মঙ্গলা তার সেই স্ত্রী।

কোনমতে ঘরে তালা লাগিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল অতীশ—এখনও সময় আছে বটে, তবে সে সময় শিয়ালদা স্টেশনে কাটানোই ভাল। আর নিজের ওপর ভরসা নেই ওর। ওকে এ বাসা বদলাতেই হবে—এই কথা মনে মনে জপ করে অতীশ। দেশ থেকে ফিরে এসে একশো সতেরো নম্বরের সঙ্গে ওদের বাসাতেই থাকবে। এক ঘরে ওরা পাঁচজন থাকে, তা থাক—ছু' টাকার বেশী ওর থাকার খরচ লাগবে না।

এই প্রতিজ্ঞাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকে ও, মনে মনে জপ করতে থাকে—তবু শেষ পর্যন্ত ট্রেন যখন হু-হু করে ছুটতে থাকে সত্যি-সত্যি, তখন অরবিন্দ সরকারের প্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষমানা একজোড়া ম্লান চোখের কথা মনে পড়ে ওর পাঁজরের মধ্যে কেমন একটা খচখচ করতে থাকে।

অমাবস্যার রাত

যে ট্রেন ছুইটা পঞ্চাশে পৌছিবার কথা, সে ট্রেন পৌছিল প্রায় পাঁচটায়। তারপর মেঠো পথ অন্তত প্রায় ক্রোশখানেক হাঁটিয়া স্কুলে পৌছিতেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। আমাকে যে আবার সেইদিনই ফিরিতে হইবে। হেড মাস্টার মহাশয় বলিলেন, ট্রেনের সময় হয়ে এল—এখন হেঁটে গিয়ে কি গাড়ি ধ'রতে পারবেন? তার চেয়ে বরং বোর্ডিংয়েই আজকের রাতটা কাটান, কাল

ভোরের ট্রেনে ফিরে যাবেন এখন।'

হিসাব করিয়া দেখিলাম যে কাল ভোরের ট্রেনে ফিরিয়া গেলে কালকের দিনটিই মাটি হয়। অথচ এ অবস্থায় আর ঘোরাও যায় না। একবস্ত্রে বাহির হইয়াছি—কোথায় স্নান করি, কোথায় কাপড় পাই, সে এক সমস্যা হইবে ; কাপড়-জামা তো সবই জিয়াগঞ্জের ডাকবাংলোয় পড়িয়া আছে।

বিনতভাবে কহিলাম, 'না, আমায় আজ ফিরতে হবেই, নইলে বড় ক্ষতি হবে! বুঝতে পারছেন তো, এই ক-টা দিন মোটে সময়, এরই মধ্যে আমায় সব জেলাটা সারতে হবে। আমি ঠিক গাড়ি ধ'রে নেব।'

তবুও তিনি সংশয়ের সুরে কহিলেন, 'পাবেন কি? সঙ্গে আবার ব্যাগটা রয়েছে—বরং আমাদের হোস্টেলের চাকর কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসুক। আলো আছে তো?'

পকেট হইতে টর্চটি বাহির করিয়া কহিলাম, 'এটা সর্বদাই সঙ্গে থাকে। চাকর যাবারও বিশেষ দরকার নেই, তবে বলছেন যখন—'

তিনি কহিলেন, 'না না, যাক। সমস্ত পথটা ব্যাগ ব'য়ে নিয়ে যেতে হ'লে ট্রেন আর পাবেন না।'

তাঁহাকে মুখে এবং মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ দিয়া তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম। চাকরটি আমার ব্যাগ লইয়া আগে আগে চলিল, আমি আলো হাতে পিছনে। ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, তখনও পুরা আধ ঘন্টা সময় আছে, আধ ঘন্টায় আর দুই মাইল রাস্তা যাইতে পারিব না? খুব পারিব!

কিন্তু একটুখানি চলিয়াই বুঝিলাম যে আসিবার সময় যতটা সময় লাগিয়াছিল, যাইবার সময়ও তাহার চেয়ে কম সময় লাগিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। হিতাকাঙ্ক্ষী এবং প্রবীণ হেড্ মাস্টার মহাশয়ের কথাটা শুনিলেই হইত। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কাঁচা রাস্তাটাকে সম্প্রতি মাটি চাপাইয়া উঁচু করিয়াছে। এঁটেল মাটির ছোট-বড় ডেলাগুলি পাথরের মতোই কঠিন, তাহাদের উপর কিছুতেই ঠিক করিয়া পা ফেলা যায় না—জোরে চলিব কি করিয়া? তাহার উপর আরও বিপদ হইল যখন সাঁকোটা পার হইয়া, অর্থাৎ ঠিক অর্ধেক রাস্তা গিয়া ভৃত্যটি বলিল, 'তাহ'লে বাবু যাই আমি, আমার বেস্তর কাজ আছে!'

পরের চাকর, বিশেষতঃ হোস্টেলের, এক্ষেত্রে তাহাকে আর অধিকদূর লইয়া যাওয়া অভদ্রতা ; সুতরাং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে একটা দু'-আনি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া ব্যাগটা নিজেই তুলিয়া লইলাম। তাহার পর এক হাতে টর্চ ও অপর হাতে ভারী ব্যাগটা লইয়া যতটা সম্ভব দ্রুত সেই রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। তাহাতে শীতের রাতে ঘামিয়া উঠিলেও গাড়ি ধরিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

রাস্তা অজ্ঞাত এবং নির্জন, কতটা আসিলাম এবং কতটা বাকী রহিল, এ-কথা বুঝিবার বা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। দুধারে ধূ-ধূ করিতেছে মাঠ, কখনও বা পাতলা রকমের বনও পাইলাম, কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায়, নিকটে কোথাও লোকালয়ের চিহ্নটি পর্যন্ত নাই। তখন আমার ট্রেন ছাড়া অন্য কোনও কথা ভাবিবার অবকাশ ছিল না, নচেৎ গা ছমছম করিবার কথা।

কিন্তু যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। স্টেশনের বাহিরে খাবারের দোকানগুলির কাছাকাছি পৌঁছিতেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল, অর্থাৎ একূল এবং ওকূল দুই-ই আমার গেল।

ঘর্মাক্ত-কলেবরে ধূলি-ধূসর অবস্থায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্টেশন-ঘরে যখন ঢুকিলাম, তখন ছোটবাবু ট্রেন পাস করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বড় হিসাবের খাতাখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। স্টেশনের খালাসীরা বোধ হয় বাবুদের বাসায় কাজে গিয়াছে। স্টেশন-ঘরে আর একটিমাত্র বৃদ্ধ ভদ্র-লোক একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছেন। স্টেশনের ভিতরে বা বাহিরে আর কোনও লোক নাই।

ঘরে ঢুকিয়া অনাবশ্যক প্রশ্নই করিলাম, 'মাস্টার মশায়, এটা কি আজিমগঞ্জের ট্রেন বেরিয়ে গেল ?'

তিনি ঘাড় তুলিয়া মিনিটখানেক আমার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া কহিলেন- 'আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাশয়ের নিবাস ?'

নিবাস এবং আগমনের কারণ সবই বলিলাম, কারণ এই প্রকার দুটি তিনটি কৈফিয়ৎ না দিয়া এদেশের লোকের কাছে কোনও প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন। পরে যতটা সম্ভব করুণ ভাবে নিজের দুরবস্থার কথা

তাঁহার কাছে নিবেদন করিলাম।

ছোটবাবু বিশেষ দুঃখিতই হইলেন, কহিলেন, 'তাই তো। এর পরের গাড়ি যে সেই কালকে সকালে। সারারাত থাকবেন কোথায়? ওয়েটিংরুমের তো কোন বালাই নেই; স্টেশনরুমেরও আজকাল বড় কড়াকড়ি নিয়ম করেছে, কাউকে থাকতে দেওয়া নিষেধ।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, 'প্ল্যাটফর্মেই সারারাত বসে কাটাতে হবে; কী আর করব।'

তিনি প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, 'রামোঃ, সে কি একটা কথা হ'ল! এই শীতে সারারাত প্ল্যাটফর্মে ব'সে থাকবেন?…ব্যবস্থা একটা ক'রে দিতে হবে বৈকি—'

তারপর সহসা সেই বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'ঘোষালমশায় একটা ব্যবস্থা করতে পারেন না? বিদেশী লোক এসে এ-গ্রামে সারারাত অভুক্ত নিরাশ্রয় হয়ে থাকবেন?'

লোকটি যেন এতক্ষণ ঘুমাইতেছিলেন, সহসা জাগ্রত হইয়া বলিলেন, 'উনি যদি দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেন তাহ'লে আমি কৃতার্থ হবো। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া হাত জোড় করিয়া কহিলেন, 'বড় দরিদ্র, ভরসা ক'রে অতিথি-সজ্জনকে বাড়িতে ডাকতে পারি নে, নীরবে দাঁড়িয়ে ঘোষাল-বংশের অপমান দেখতে হয়।…কর্তারা বলতেন—চিলগাঁয়ে কোনও লোক যদি অভুক্ত কিংবা নিরাশ্রয় থাকে, তাহ'লে পূর্বপুরুষদের অধোগতি হবে যে। প্রথম যখন ইস্টিশান হয় তখনও ঠাকুর বেঁচে; কিছু নেই, নিজেরাই শেষ দশায় এসে ঠেকেছি, কিন্তু তবুও তিনি একজন ক'রে পাইক বসিয়ে রাখতেন ইস্টিশানে, যদি কেউ বিদেশী আসে তো তাকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে। বলতেন, ঘটি বাটিগুলো তো এখনও আছে? সেগুলো থাকতে, যাঁরা ও-সব ক'রে রেখে গেছেন, তাঁদের তো অসম্মান করতে পারি না।'

ছোটবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, 'ঐ জন্যেই তো আজ এই অবস্থা। শাস্ত্রেই আছে ধরুন না, অতিদানে বলির্বদ্ধ। যাক—এখন তাহ'লে ভদ্রলোককে নিয়ে যান।'

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'আপনি ঘোষাল মশায়ের

সঙ্গে যান। এঁরাই এ গাঁয়ের রাজা ছিলেন, আজও প্রজারা পুরোনো জমিদারকেই রাজামশাই ব'লে ডাকে, এঁদের বাড়ি 'রাজবাড়ি' ব'লেই সকলে চেনে।'

আশ্রয় তখন আমার বিশেষ দরকার, ঘুমে সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেছে, সুতরাং আর প্রতিবাদমাত্র না করিয়া ব্যাগটা তুলিয়া লইলাম এবং টর্চটা জ্বালিয়া পুনরায় রাস্তায় নামিয়া আসিলাম। ঘোষাল মহাশয়ও পোড়া বিড়িটার আগুনে আর একটা বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে আমার আগে আগে চলিলেন। সোজা যে রাস্তাটা ধরিয়া এতক্ষণ আসিলাম, এবার আর সে রাস্তা নহে ; বিরাট একটা আমবাগানকে ডান পাশে ফেলিয়া সরু একটা কাঁচা পথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া যাইতে হইবে।

মিনিট দুই নিঃশব্দে চলিবার পর ঘোষালমহাশয় সহসা বলিলেন, 'আপনার সেবায় কিছু বিলম্ব হবে কিন্তু।'

সংবাদটায় ঠিক পুলকিত হইলাম না, তবুও সৌজন্যের খাতিরে কহিলাম, 'বেশ তো, তাতে আর কি হয়েছে ?'

তিনি কহিলেন, 'প্রতি অমাবস্যাতে বাড়িতে শ্যামা-পূজা হয় কি না। আগে ঠাকুর ক'রতেন, এখন আমি করি—তবে মহানিশা-পূজা শেষ হ'তে রাত ঢের হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ না হ'লে প্রসাদের ব্যবস্থা করা কঠিন।'

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, সেদিন শনিবার। একে অমাবস্যা তায় শনিবার, তায় নির্জন পল্লীগ্রাম। ব্যাপারটা মনে হইতেই গা-টা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল। এ শিহরণ আমাদের রক্তের সহিত জড়ানো আছে। দেবতার মঙ্গলেচ্ছাকে আমরা হয়ত বিশ্বাস করি না, কিন্তু অপদেবতার অমঙ্গলেচ্ছাকে বিশ্বাস করা আমাদের আজন্ম সংস্কার।

অন্ধকারের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড জলা দেখাইয়া ঘোষাল মহাশয় কহিলেন, 'ঐ হ'ল ঘোষালদীঘি ; আমার প্রপিতামহের পিতা জয়নারায়ণ ঐ দীঘি কাটিয়েছিলেন। তাঁদের আমলে ঐ দীঘিতেই দুষ্টু বজ্জাত প্রজাদের ডুবিয়ে মারা হ'ত। এখনও খুঁজলে ওর পাঁকের মধ্যে থেকে অনেক নরকঙ্কাল পাওয়া যাবে।'

তারপর একটা বড়রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'সে সব কথা

এখন স্বপ্ন ব'লেই মনে হয়। এখন ঐ দীঘির মাঝখানে বোধ হয় ডু-মানুষ-ভোর জলও আর নেই, পাঁক আর শ্যাওলায় বোঝাই।'

আমার কিন্তু ততক্ষণে বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিয়াছে। একবার মনে হইল যে, এখনও সময় আছে, এই সুপ্রাচীন ঘোষাল বংশের সংসর্গ এড়াইয়া পলায়নের ব্যবস্থা দেখি, কিন্তু কেমন চক্ষুলজ্জায় বাধিল, পারিলাম না। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারই পিছু পিছু চলিয়া প্রকাণ্ড একটা ভাঙা বাড়ির সামনে পৌঁছিলাম।

এককালে বোধহয় ইহা সাত-আট মহল বাড়িই ছিল; তাহা ছাড়া অতিথিশালা, ঘোড়াশালা, হাতীশালা, পাইক মহল, নহবৎখানা, দেউড়ী, সমস্তই ছিল, কিন্তু এখন আর সে সব পৃথক ভাবে কিছু খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। বিরাট ফটকটির একদিকের থাম একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়াছে কিন্তু আর একদিকের থাম এখনও কোন রকমে মাথা তুলিয়া ঘোষাল-বংশের মহিমা কীর্তন করিতেছে। যাহাই হউক, সেই ফটক পার হইয়া যে ইষ্টকস্তূপ ও তাহার উপরে আগাছার জঙ্গল শুরু হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া কি করিয়া অন্তঃপুরে পৌঁছিব, এবং সম্মুখের অন্ধকারময় বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোন অন্তপুর কোথাও আছে কি না, না স্টেশনের ছোটবাবু নিরীহ বিদেশীকে এক উন্মাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া মর্মান্তিক পরিহাস করিলেন, এই সমস্ত ভাবিয়া সেই শীতের রাতেও ঘামিয়া উঠিলাম!

ঘোষালমহাশয় বোধ হয় আমার মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, আর একটি বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে কহিলেন, 'কিছু ভয় নেই আপনার, সোজা চলে আসুন। এখন শীতকাল, সাপ-খোপ বিশেষ বেরোয় না। তা ছাড়া ঘোষাল বাড়ির মধ্যে কাউকে সাপে খেয়েছে একথা আমরা আজ পর্যন্ত শুনি নি।'

কি আর করিব! ইষ্টদেবতার নাম জপিতে জপিতে অতি সন্তর্পণে টর্চের আলোতে সেই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ দেখিয়া দেখিয়া পা ফেলিতে লাগিলাম। তাই কি পথেরই শেষ আছে! কত ইষ্টকস্তূপ যে পার হইলাম, কত রকমের কত মহলের কথা ঘোষালমহাশয় বলিয়া চলিলেন তাহা আজ আর ঠিক স্মরণ নাই; সত্য কথা বলিতে কি, তখন মনোযোগও দিই নাই। কিন্তু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম শুধু এই কথা ভাবিয়া যে, মানুষের ঐশ্বর্যপ্রকাশের দম্ভটা

পয়সা খরচের কত অনাবশ্যক উপায়ই না খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে!

সহসা একবার ঘোষালমহাশয় থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমার বাবার বিয়ের সময়ও চল্লিশজন চাকর-পাইক ছিল। মাইনে পায় নি কেউ দশ বছর, কেউ বা বারো বছর, কিন্তু তবুও ছাড়ে নি। আমার মা এসেই তো সব তাড়ালেন! তাও বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, দশজন চাকর রাখতেই হয়েছিল, নইলে, বাবা বলেছিলেন আত্মহত্যা ক'রব!...ঐতেই তো সব গেল!'

বিনীতভাবে জবাব দিলাম, 'তা তো বটেই, এ বাড়িটা গোটা ঝাঁট দিতেই তো দশজন লোক চাই।...কিন্তু এ জায়গাটায় দাঁড়ানো কি উচিত হবে!'

ঘোষালমহাশয় খুশী হইয়া হাত পা নাড়িয়া বলিলেন, 'যতদিন বাস্তু আছেন, ততদিন ঘোষাল বংশের অতিথিকে কেউ কামড়াবে না।...কিন্তু বুঝেছেন তো? দশটা চাকর নইলে যেখানে চলা সম্ভব নয়, সেখানে একটা চাকরও নেই! কী করব বলুন, বাবা তিনটে মর্টগেজ রেখে মারা গেলেন, সুদও ঢের জমে ছিল, পাওনাদাররা ছাড়লে না! যথাসর্বস্ব গেল! থাকবার মধ্যে এই বাস্তু ভিটে আর স্ত্রীর যৌতুকের দরুন পনেরো বিঘে জমি, কিন্তু তাতে আর চলে না।'

আমি কিন্তু অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু তাঁহার বাস্তুর ভরসায় পূর্ব-ইতিহাস শুনিতে একেবারেই রাজী ছিলাম না, সে কথা আমার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়া তিনি পুনশ্চ চলিতে শুরু করিলেন। এইবারে মিনিট পাঁচেক চলিবার পর একটু আলোর আভাস পাইলাম, আর একটু কাছে আসিয়া দেখিলাম অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটা উঠোনের মাঝখানে শুধু একটা ল্যাম্প বসানো; জনবসতির আর কোন চিহ্ন চোখে পড়িল না।

ঘোষালমহাশয় আর একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে কহিলেন, 'এই মহলটায় থাকি আমরা; এইটেই এখনও দাঁড়িয়ে আছে।...চলুন আগে মাকে দর্শন ক'রে আসি।

ভাঙা জীর্ণ সিঁড়ির ধাপগুলি সন্তর্পণে লঙ্ঘন করিয়া রকের উপর উঠিয়া দেখিলাম সামনেই একটা ঠাকুরদালান, এবং তাহার মাঝখানে ছোট একটা পিঁড়ির উপর আরও ছোট একটি শ্যামামূর্তি। একটি মধ্যবয়সী মহিলা

বসিয়া পূজার আয়োজন করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় তুলিয়া দিয়া ঘোষালমহাশয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। প্রদীপের আলোতে তাঁহার চেহারা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, তবে তিনি যে সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র রহিল না। বুঝিলাম ইনিই ঘোষাল-গৃহিণী।

ঘোষালমহাশয় সহসা যেন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন, 'ওগো দেখ, ইনি বিদেশী ভদ্রলোক, কলকাতার লোক, এখানে এসেছিলেন ইস্কুলে কি কাজে; ফেরবার সময় গাড়ি ফেল করলেন। সারারাত ব'সে থাকবেন ইস্টিশনে, তার চেয়ে এখানে তবু একটু আশ্রয় পাবেন ব'লে নিয়ে এলুম।··· কাল সকালেই চ'লে যাবেন, ওঁদের কত কাজ, ওঁদের কি আর থাকবার যো আছে।'

ঘোষাল-গৃহিণীর দৃষ্টির ভাবে বুঝিলাম যে, এ অপরাধ ঘোষালমহাশয়ের নূতন নয়, তিনি বহুদিন বৃথা তিরস্কার করিয়া করিয়া আজকাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইতে লাগিল, এই অর্ধোন্মাদ বৃদ্ধের সঙ্গে আসিয়া কি অন্যায়ই না করিয়াছি। গৃহিণী বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াই তাড়াতাড়ি মৃদুস্বরে তাঁহার স্বামীকে কহিলেন, 'ঐ লম্পটা ধ'রে ওঁকে ছোট ঘরে নিয়ে যাও; আমি মুখ-হাত ধোবার জল দিচ্ছি।'

ঘোষালমহাশয় খুব খুশী, 'আসুন দাদা আসুন, এই যে এই পথ—'

একটা দালান পার হইয়া তথাকথিত ছোট ঘরে পৌঁছিলাম। ঘরটিকে এখনকার দিনে আর ছোট বলা যায় না। মজবুত দেওয়াল হইতে চুনবালি প্রায় সবই খসিয়া পড়িয়াছে। খালি ইঁটের দেওয়ালের উপর আধখানা পর্যন্ত কলি ফিরানো, বোধ হয় ঘোষালমহাশয় নিজেই লাগাইয়াছেন। মেঝের কঙ্কালের উপর সোজাসুজি মাটি লেপা এবং পরিপাটি করিয়াই নিকানো। কিন্তু তা হউক—সমস্ত ঘরটির মধ্যে এমন একটা পরিচ্ছন্ন ভাব ছিল, যাহা দেখিলেই তৃপ্তিতে মন ভরিয়া ওঠে। ঘরের একপাশে একটা চৌকী, তাহার উপরে ঘোষালমহাশয় তাড়াতাড়ি একটা কম্বল বিছাইয়া দিলেন, তারপর হাত মুখ ধুইবার জল আনিতে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই গাড়ুতে জল, একটা গামছা আনিয়া বাহিরের রকে সাজাইয়া

দিলেন। তাহার পর, মুখ-হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিতেই, ঘোষালমহাশয় সহসা প্রশ্ন করিলেন, 'আপনার পরিচয় তো পেলাম না, আপনারা?'

'আমরা আপনাদেরই সজাতি, ব্রাহ্মণ। আমার নাম শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।'

'বেশ, বেশ, নমস্কার। মশায় বিবাহ করেছেন কোথায়?'

সবিনয়ে জানাইলাম, 'আজ্ঞে বিবাহ এখনও করি নি।'

অকস্মাৎ যেন ঘোষালের চক্ষু দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, দুই-পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, 'বিবাহ করেন নি? বলেন কি? কুমার?'

বিস্ময়ের কারণটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কহিলাম, 'আমার দাদারই এখনো বিয়ে হয় নি, আমি করব কি!'

কিন্তু সেদিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দিলেন না, বার-কতক আপন মনেই কহিলেন, 'কুমার, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ! তাই তো! ··বলেন কি? এখনো বিবাহ করেন নি?'

তারপর যেন অন্যমনস্ক ভাবেই বাহির হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার আকস্মিক ভাবান্তরের কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে আবার চৌকীর উপর মুড়ি-সুড়ি দিয়া বসিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না, একটু পরেই একটা আসন ও এক গ্লাস জল লইয়া ঘোষালমহাশয় ঘরে ঢুকিলেন, পিছনে গৃহিণীর হাতে এক থালা জলখাবার।

—একটু জল খেয়ে নিন, পুজো না হ'লে আজকের দিনে প্রসাদ দিতে পারব না তো! জল খেয়ে একটু ঘুমোন, পুজোর পর আপনাকে ডেকে নেব এখন।

আমাকে দুইবার বলিতে হইল না, কারণ আভ্যন্তরিক তাগিদই ছিল যথেষ্ট। ঝকঝকে একটি কাঁসার রেকাবীতে মুড়কী, গোটা দুই কলা এবং একজোড়া মোণ্ডা—জলখাবারের আয়োজনে আড়ম্বর না থাকিলেও মালে প্রচুর ছিল, আমিও যথেষ্ট তৃপ্তির সহিতই সেগুলি গ্রহণ করিলাম।

আমি খাইতে লাগিলাম, ঘোষালমহাশয় একটা হুঁকা হাতে করিয়া সামনে আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কহিলেন, 'এখনও কি ঘোষালদের দিন ফিরিয়ে আনতে পারা যায় না? খুব যায়! স্বর্গীয় রমাকান্ত

ঘোষালমহাশয় আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন ; তাঁর এক দল লেঠেল ছিল এ অঞ্চলে নামকরা ; তাদের নিয়েই তিনি মাঝে মাঝে নিশীথরাত্রে বেরোতেন ডাকাতি করতে। তবে সাধারণ ডাকাতি তিনি করতেন না— নাম-করা কৃপণ যে সব, কিংবা নাম-করা ডাকাত তাদেরই যথাসর্বস্ব এক এক রাতে লুঠ ক'রে এনে প্রজাদের বিলিয়ে দিতেন। একবার এক পর্তুগীজ ডাকাতদের জাহাজ আটকে ক্রোর-ক্রোর টাকার হীরে-মুক্তো নিয়ে আসেন। সেদিন ছিল অমাবস্যা ; নিজে শ্যামাপুজো করতে গেলেন, বাড়িসুদ্ধ লোককে হুকুম করলেন ঘুমোতে। এমনি তাঁর কড়া হুকুম ছিল যে লুকিয়ে জেগে থাকবারও কারুর সাহস হ'ল না। তিনি পুজো শেষ ক'রে কোথায় যে মাটির নীচের ঘরে সেই সব মণিরত্ন নিজে হাতে পুঁতে রাখলেন তা আর কেউ জানতে পারলে না।...সে সব আজও আছে, এই ভিটেরই কোনখানে।'

আমি কহিলাম, 'আপনার পূর্বপুরুষরা কেউ আর তার খোঁজ করলেন না?'

'করবার যো কি? তাঁর আদেশ ছিল যে, বংশে যখন খুব দুরবস্থা হবে তখনই শুধু ঐ টাকার খোঁজ করতে পাবে। অমাবস্যার রাত্রে নিজে হাতে শ্যামাপূজা ক'রে একটি ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে মায়ের কাছে বলি দিলে তবে তিনি প্রসন্ন হয়ে সে ধনরত্নের সন্ধান দেবেন—এই ছিল তাঁর নির্দেশ। বাবা প্রতি অমাবস্যাতেই শ্যামাপূজা ক'রে গেছেন, আমিও করি, কিন্তু ভরসা ক'রে নরবলি আমরা কেউই দিতে পারি নি, তাই মা আজও প্রসন্ন হ'চ্ছেন না।'

অকস্মাৎ একটা হিম শৈত্য যেন আমার সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া নামিয়া গেল। মোণ্ডাটা ভাঙ্গিয়া খানিকটা মুখে দিয়াছিলাম তাহা গলায় বাধিয়া গেল, তাড়াতাড়ি খানিকটা জল খাইয়া লইলাম।

ঘোষালমহাশয় কিন্তু বলিয়াই চলিয়াছেন, 'আহাম্মুখ আমরা, মায়ের দয়া পাবো কি ক'রে? নইলে ফাঁসির ভয় করি? মা যার ওপর সদয় থাকেন, কেউ তাকে ফাঁসি দিতে পারে? আর তা ছাড়া শুনেছি যে, টাকার জোরে সব-কিছুই করা যায় ; ক্রোর-ক্রোর টাকা যখন পাবো তখন আর ভয়টা কি?'

আমি কোন কথারই জবাব দিতে পারিলাম না ; বিস্তর টাকা থাকা সত্ত্বেও

ফাঁসি-কাঠে উঠিতে হইয়াছে, এমনি একটা নাম প্রাণপণে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই মনে পড়িল না ; কেমন যেন সমস্ত চিন্তার মধ্যে মা ও ছোট বোনের মুখ মনে আসিয়া সব গোলমাল বাধাইয়া দিল।

আমি যে একেবারেই চুপ করিয়া আছি, তাহা এতক্ষণ পরে ঘোষাল-মহাশয়ের নজরে পড়িল, তিনি ছোটখাট রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 'তাহ'লে আপনি জলযোগ করুন, আমি উঠি, আমায় আবার স্নান করতে হবে। দ্বিতীয় প্রহরের আর দেরি নেই বেশী—'

তিনি উঠিয়া গেলেন, কিন্তু বাকি জলখাবার আর কিছুতেই উদরস্থ করিতে পারিলাম না। অপরিচিত স্থান, চারিদিকে বহুদূরব্যাপী জনমানবহীন ভগ্নস্তূপের রাশি, অন্ধকার রাত্রি আর সম্মুখে এই রক্তলোলুপ উন্মাদ। অবস্থাটা একবার মনের মধ্যে আগাগোড়া ভাবিয়া লইতেই সমস্ত গেঞ্জিটা ঘামে ভিজিয়া গেল।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহুক্ষণ কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না, কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া চুপ করিয়া চৌকিটার উপর বসিয়া রহিলাম। কিন্তু সহসা পাথরের উপর একটা কি ঘর্ষণের শব্দ কানে আসিতেই চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া দেখিলাম ঘোষালমহাশয় স্নান সারিয়া রক্ত-বর্ণের চেলী পরিয়াছেন, সর্বাঙ্গে রক্তচন্দন মাখিয়া প্রকাণ্ড একটা খড়্গ পাথরের উপর ফেলিয়া মাজিয়া লইতেছেন! ল্যাম্পের ম্লান আলোতেই তাহা চকচক করিয়া উঠিল। বিরাট খাঁড়া! অতি বড় মহিষও যে তাহার এক-ঘায়ে দ্বিখণ্ডিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পলায়ন করিতে হইবে—এবং এখনই, যেমন করিয়া হউক! মনের মধ্যে তীব্র অনুশোচনা হইতে লাগিল, কেন সত্য পরিচয়টা দিয়াছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, অনুশোচনার সময় ইহা নহে। তাড়াতাড়ি জুতা জোড়া হাতে তুলিয়া লইয়া এক ফুঁয়ে ভিতরের আলোটা নিভাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলাম ; তারপর কোনও রকমে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া সে মহল হইতেও বাহির হইলাম। কিন্তু বিপদ বাধিল তাহার পর।

অমবস্যার রাত্রি, তাহাতে পাতলা মেঘে নক্ষত্রের আলোও ম্লান করিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় ইষ্টকস্তূপের মধ্যে, কোথায় পায়ে-চলার শীর্ণ পথরেখা

আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, তাহার উপর ভয় এবং উত্তেজনায় দৃষ্টিও যেন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।···

জুতাজোড়াটা তাড়াতাড়ি পায়ে দিয়া লইলাম। সাপের ভয় আছে বটে, কিন্তু সেটা সম্ভাবনা মাত্র, এটা যে নিশ্চিত মৃত্যু! জুতা পরা হইলে যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে শুরু করিলাম। বার-বার ছোট-বড় হুঁচোট খাইতে খাইতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম জানি না, সহসা পিছন দিকে একটা আলোর আভাস পাইতে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার আর চলিবার ক্ষমতাও বিশেষ রহিল না। ঘোষালমহাশয় একটা আলো হাতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং বোধ হয় আমাকেই খুঁজিতেছেন। আলোও ক্ষীণ এবং দূর হইতে ভাল নজর চলিবার কথা নয়, কিন্তু তবুও তাঁহার সর্বাঙ্গে রক্তচন্দনের অনুলেপন এবং চোখে মুখে একটা অধীর আগ্রহ দেখিয়া হাত পায়ে কম্পন শুরু হইল। কোনরকমে জোর করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মাত্র দুই-এক পা যাওয়ার পরই প্রকাণ্ড একটা ইটে হুঁচোট খাইয়া পড়িলাম, একটা ইষ্টক-স্তূপের উপর।

আঘাতের জন্যই হউক আর ভয়ের জন্যই হউক, আমার সমস্ত চৈতন্য যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ জড়ের মতো পড়িয়া থাকিবার পর একসময়ে একবার চোখ মেলিয়া দেখিলাম, আলো হাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, নিষ্ঠুর লোলুপ দৃষ্টিতে ঘোষালমহাশয় আমার দিকে চাহিয়া আছেন; তাহার পরই চোখের সম্মুখে সব যেন লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল।

জ্ঞান যখন হইল, তখন পূর্বাকাশ ফরসা হইয়া গিয়াছে; চাহিয়া দেখিলাম যে ঠাকুরদালানেরই একপ্রান্তে আমি পড়িয়া আছি, পায়ে আমার একটা কম্বল চাপা, নীচেও কম্বল পাতা রহিয়াছে। পাশে রক্তলোলুপা কালীমূর্তি এবং সম্মুখে রক্তাম্বর ঘোষালমহাশয় দাঁড়াইয়া তামাক খাইতেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা চোখের নিমেষে মনে পড়িয়া গেল, শিহরিয়া উঠিয়া বসিলাম।

ঘোষালমহাশয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'উঁহু, উঠবেন না, উঠবেন না বাবু, আর কোনও ভয় নেই, পুজো হয়ে গিয়েছে!'

আমি কোন জবাব দিতে পারিলাম না, কেবল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে

চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

হুঁকাটা নামাইয়া রাখিয়া তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, 'বড়ই ভয় পেয়েছিলেন, না বাবু? তা ভয় পাবারই কথা বটে! তবে সত্যি কথা বলতে কি, বলি দেবার ইচ্ছে আমার সত্যিই হয়েছিল, কিন্তু মা প্রসন্ন ছিলেন, তাই ঘোষালবংশের এত বড় কলঙ্ক আর ঘটতে দিলেন না, নইলে পিতৃপুরুষের কোপে নষ্ট হয়ে যেতাম।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, 'খাঁড়াটা সাফ করছি, গিন্নী এসে বললেন—ও কি করছ?—জবাব দিলুম—আজ শনিবার, অমাবস্যা, ব্রাহ্মণকুমারও উপস্থিত; এ সুযোগ কি ছাড়তে আছে?—তিনি শিউরে উঠে বললেন—বাপ্‌ রে ওকথা ব'ল না, ঘোষালবংশের অতিথি তিনি, একথা ভুলে যাচ্ছ!—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল বাবার শেষ কথা, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে বলেছিলেন, 'বাবা, অতিথিই নারায়ণ—ওর চেয়ে বড় আর কেউ নেই।' সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল—একি কাজ করতে যাচ্ছি আমি!…ঘোষালবংশের এত বড় কলঙ্ক হবে আমার দ্বারা?…তখনই ছুটলুম আপনার কাছে মাপ চাইব ব'লে; গিয়ে দেখি আপনি নেই।…বেরিয়ে গিয়ে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় কুড়িয়ে নিয়ে এলুম। মাকে বললুম—মা, ধন দৌলত দেবার ইচ্ছে না থাকে, রেখে দে, কিন্তু এতবড় পাপ করতে পারব না!'

তখনও যেন সব কথা বুঝিতে না পারিয়া, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। তিনি কহিলেন, 'উঠে, একটু মুখে হাতে জল দিয়ে নিন বাবু, মায়ের প্রসাদ একটু মুখে দিতে হবে।'

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, 'আমার ব্যাগটা বার করে দিন, আমাকে এখনই স্টেশনে যেতে হবে।'

তিনি ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, 'সে হয় না, ঘোষালবাড়ি থেকে অভুক্ত অতিথি চলে গেলে মুখে আর অন্নজল দিতে পারব না। যাই হোক, মুখে কিছু আপনাকে দিতেই হবে।'

অনিয়ম

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, ব্যানার্জি সাহেবের সেদিন অফিস পৌঁছিতে মোটে সতেরটি মিনিট দেরি হইয়া গিয়াছিল। অথচ এই তুচ্ছ কারণেই সেদিন অত-বড় অফিসে কী একটা ভীষণ আন্দোলনই না শুরু হইয়া গেল। কোথায়ই বা রহিল হিটলার-মুসোলিনী-স্ট্যালিন-মাৎসুয়োকার গরম গরম বিচিত্র সংবাদ (অবশ্য অপ্রকাশিত) আর কোথায়ই বা রহিল প্রতিবেশীদের দুশ্চরিত্রতার ইতিহাস। অনাথবাবু রামেশ্বরবাবুর টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, 'ব্যাপার কি মশাই, আজ সত্যি-সত্যিই আটাশ তারিখ তো, না জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছি ?'

রামেশ্বরবাবু দেশলাইশের কাঠির সাহায্যে দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন, 'ম'লো না তো ?···চাকরীটার ভয় হচ্ছে যে !'

বিকাশ ওপাশ হইতে হাঁকিয়া কহিল, 'উঁহু, ম'লে পরে মড়াটাও অন্তত এসে নটা পঞ্চান্ন মিনিটে হাজরে দিত। এ তার চেয়েও বেশী কিছু।'

হরিদাস ফোঁস করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'এমন জানলে একটা লটারীর টিকিট কিনে ফেলতুম। আজ যা অঘটন ঘটছে, আমার অদৃষ্টেও লটারীর প্রাইজ উঠত নিশ্চয়।'

সত্যই ইহাতে বিস্ময়ের কারণ আছে। এই বিপুল বীমা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট স্যর যতীন ছত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল বোধ হয় ইহার সহিত জড়িত আছেন কিন্তু ইহার মধ্যে মোট তিনদিনও তিনি লেট করিয়া-ছেন কিনা সন্দেহ। দশটায় হাজিরা, তিনি ঠিক ন'টা পঞ্চান্ন মিনিটে অফিসে পৌঁছিবেনই—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, বারো মাস। কোন দিন কোন কারণেই ইহার অন্যথা হয় নাই, আজ যখন স্যর যতীন হইয়াছেন তখন তো নয়ই, সেদিন যখন সাধারণ যতীন বাঁড়ুয্যে ছিলেন তখনও নয়। কিম্বদন্তী, লোকে তোপের সঙ্গে মিলানো ঘড়িও তাঁহার অফিসে আসার সময়ের সহিত মিলাইয়া লইত।

অথচ জীবনের অন্য দিকে বৈচিত্র্যের কোন অভাব ছিল না লোকটির। ছত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি ছিলেন নিতান্তই সাধারণ একজন অল্প বেতনের

কেরানী। কিন্তু বছর চার-পাঁচ চাকরী করার পর প্রথম যৌবনেই যখন তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন স্ত্রী এবং পুত্র মারা গেল তখন তিনি সেই আঘাত সামলাইবার জন্য সহসা এই কর্মস্থলটিকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। তাহার ফলও ফলিল খুব শীঘ্র। তাঁহার অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা, অদ্ভুত সততা এবং সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মস্থলেও দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে, বছর দশেক পূর্বে, কোম্পানীর একটা দুর্বল মুহূর্তে তিনি তাঁহার সযত্ন সঞ্চিত এই দীর্ঘদিনের সমস্ত উপার্জন দিয়া ম্যানেজিং এজেন্টের পদটি কিনিয়া লইলেন।

কিন্তু এইখানেই তাঁহার জয়যাত্রা ব্যাহত হইল না। তিনি যেদিন এ প্রতিষ্ঠানটির মালিক হইলেন সেদিন ছিল ইহার মুমূর্ষু অবস্থা কিন্তু আজ তাঁহারই তপস্যার ফলে উহা সর্বপ্রধান বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে; সে-দিনের মিঃ ব্যানার্জিও হইয়াছেন স্যর যতীন। যদিচ তপস্যার এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধিতেও তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, আজও চলিয়াছে তাঁহার প্রাণপণ পরিশ্রম, এখনও তাঁহাকে প্রত্যহ ঐ ন'টা পঞ্চান্নতে হাজিরা দিতে হয়।

অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাকে লাঞ্ছনাও কম সহিতে হয় না, কর্মচারীরা আড়ালে বলে, 'বুড়ো যখ্ হ'রে যাবে। মুখে আগুন! কেউ নেই তবু ভূতের মতো খাটছে! কোম্পানীর একটি পয়সা লোকসান হ'ল তো যেন বুকের একখানা হাড় খসে পড়ল।'

বন্ধু-বান্ধবরা বলে 'যন্ত্রমানব'। অন্য বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্তারা বলেন, 'ওকে কাজের ভূতে পেয়েছে। যেদিন মরবে সেইদিন যদি ভূত ছাড়ে!'

কিন্তু ব্যানার্জি সাহেব এ সবে ভ্রূক্ষেপও করেন না। প্রত্যহ দশটা হইতে পাচটা পর্যন্ত এখনও ভূতের মতো খাটেন এবং কর্মচারীদের খাটান। কোথাও সামান্য মাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি-অনিয়ম তাঁহার সহ্য হয় না।

এ-হেন ব্যানার্জি সাহেবের সতেরো মিনিট লেট—একটা বিস্ময়কর ঘটনা বৈকি! বিশেষ করিয়া কাল ঐ কাণ্ডের পর! আজ সকলেই আশা করিয়াছিল যে তিনি হয়ত নটার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইবেন। তাঁহার অফিসে এই অনাচার—এ অপমান যে তাঁহাকে কী দারুণ আঘাত করিয়াছে

তাহা তাঁহার মুখ দেখিয়াই কাল বুঝা গিয়াছিল। হয়ত সারারাত ঘুমাইতেই পারেন নাই।

হরিশবাবু প্রবীণ লোক, 'কহিলেন, ছোকরার চাকরীটা তো গেলই, জেলও খাটতে হবে।'

অনাথবাবু আধখানা বিড়ি ধরাইবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে করিতে জবাব দিলেন, 'কিন্তু জেল খাটাতে গেলে একটা জানাজানি হবে না? ফার্মের বদনাম তো বটে! জেলে বোধ হয় দেবে না।'

হরিশবাবু বলিলেন, তবেই ওঁকে তোমরা চিনেছ!...সাহেবও যতদিন অফিসে আছেন, আমিও ততদিন, এক টেবিলে কাজ করেছি আগে।...ফার্মের বদনামের ভয়ে একটা অন্যায় চেপে যাবে, সে বান্দাই নয়। পুলিস কেস অব্যর্থ!...নেহাৎ কাল ছুটির আগে ধরা পড়ল তাই: নিজে না দেখে হঠাৎ কোন কাজ করবার লোক নয় তো—নইলে কালই পুলিস ডাকত। ছাখো না এই রামেশ্বরবাবুর ডাক পড়ল ব'লে—'

রামেশ্বরবাবু শেষ সুপারীর কুঁচিটাকে দাঁতের ফাঁক হইতে বাহির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, 'কিন্তু হরিশদা, আজকেই লেট্ হবার কারণ কি! এমন ব্যাপার একটা—'

অনাথবাবু কহিলেন, 'ঐ ব্যাপার ব'লেই বোধ হয়। কাল সারারাত ঘুমোতে পারে নি, আজ সকালে একটু বেশী ঘুমিয়ে পড়েছিল—'

সকলে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বারান্দায় সাহেবের পদশব্দ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অফিস নিস্তব্ধ। সকলেরই কাজে অখণ্ড মনোযোগ। সাহেবের খাস চাপরাশী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কামরার জানলা খুলিতে শুরু করিয়া দিল, আর একজন টেবিল ল্যাম্পের শেড্‌টা ঠিক করিয়া দিয়া পাখা খুলিয়া দিল। এক কথায় অফিসের কাজ সেদিনের মতো শুরু হইয়া গেল।

তখন দশটা বাজিয়া সতেরো মিনিট। এই সতেরো মিনিট লেটের ইতিহাসটাই এবার বলি—

সত্যই কাল ব্যানার্জি সাহেব রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই। এই প্রতিষ্ঠান-

টির সহিত তিনি নিজেকে এমনভাবেই জড়াইয়া ফেলিয়াছেন যে ইহার বিপুল অঙ্গের কোথাও কোন অনাচার ঘটিলে তাহা নিজেরই ব্যাধির মতো তাঁহাকে যন্ত্রণা দেয়। সমস্ত রকমে ইহাকে গ্লানি হইতে রক্ষা করিতে কত যত্নই না তিনি করেন! অথচ সেইখানেই এই ব্যাপার!

তবু ভাগ্যে তিনি অডিটারদের প্রতি মধ্যে মধ্যে এইরূপ অপ্রত্যাশিত পরীক্ষার নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। নহিলে হয়ত ব্যাপারটা ধরাই পড়িত না। নলিনীকে তিনি ভালো লোক বলিয়াই জানিতেন, কাজও করিয়াছে সে এ অফিসে বৎসর-দশেক। সেই বিশ্বাসেই তিনি তাহাকে বিনা জামিনে ক্যাশে কাজ করিতে দিয়াছিলেন।···তিনি যে মানুষ চেনেন, এ অহঙ্কার আজ স্যর যতীনের ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

ব্যানার্জি সাহেব সারারাত ঘরের মেঝেতে পায়চারী করিয়াছেন। ক্ষতি কিছুই নয়, মাত্র সাত শো টাকা। এই টাকাটা যে-কোন সময়ে পথের লোককে তিনি দান করিয়া পরমুহূর্তে ভুলিয়া যাইতে পারেন। অফিস হইতে প্রত্যহ সাতশো টাকা করিয়া চুরি হইতে থাকিলেও বহুদিন পরে হয়ত ব্যাপারটায় তাঁহার সন্দেহ হইতে পারিত—তাঁহার ব্যবসা এতই বড়। টাকাটা নয়—অনাচারটাই তাঁহাকে আঘাত করিয়াছে বেশী।

অডিটারদের লোক কাল যখন আসিয়া তাঁহাকে সংবাদটা দিল যে নলিনী-বাবুর ক্যাশে সাতশো টাকার গোলমাল আছে এবং ক্যাশ বুঝাইতে বুঝাইতে তিনি বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন, তখন যে নিদারুণ অপমানের আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি জীবনে মুছিবার নয়। সে কথা মনে হইলে এখনও সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ইহার পর তিনি মুখ দেখাইবেন কি করিয়া!

প্রথমটা বিশ্বাসও হয় নাই ঠিক। কিন্তু যখন কথাটা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হইয়া গেল, তখন তিনি আর এক মিনিটও অফিসে অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিদারুণ লজ্জার তাড়নায় এত বড় ব্যাপারটাও অমীমাংসিত রাখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। শুধু বলিয়া গেলেন, 'যা হয় কাল এসে ঠিক করব। এখন কিছু করবার দরকার নেই।' এবং এই কর্তব্যটা সারারাত ধরিয়াই ভাবিয়াছেন। শাস্তি দিতেই হইবে, তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের যশ কিছু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তার জন্য তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয়

দিবেন না কিছুতেই। শাস্তি তাহার প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা কাটিয়াও দেওয়া যাইতে পারে, পুলিস পর্যন্ত গিয়া কেলেঙ্কারী প্রচার করার দরকার হয় না— কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে একটা গুরুতর পাপের সম্ভাবনাকে সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অপরাধীকে মার্কা দিয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে অপরে না ঠকে। মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার্জি সাহেব সকালের দিকে অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, কিছুক্ষণের জন্য অপমানটা ভুলিয়া অন্য কথাও চিন্তা করিতে শুরু করিয়াছিলেন কিন্তু সব গোলমাল হইয়া গেল নলিনীর নাটকীয় আক্রমণে।

ব্যানার্জি সাহেব ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবেই আসিয়া অফিসের সামনে মোটর হইতে নামিয়াছিলেন, কিন্তু সহসা কোথা হইতে নলিনী আসিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, 'একেবারে মারা যাবো স্যার, সপরিবারে শুকিয়ে মরব—শুধু দয়া ক'রে দুটো কথা শুনুন!'

সে এক মহা হৈ-চৈ কাণ্ড। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ভীড় জমিয়া গেল। চাকর দারোয়ানরা ছুটিয়া আসিল কিন্তু কি জানি কেন, সাহেব তাহাকে বাধা দিলেন না। বরং লিফ্‌টম্যান রামমনোহর রূঢ়ভাবে নলিনীকে সরাইয়া দিতে যাইতেছিল তাহাকে বাধা দিয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন, 'কী বলবে বলো, উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বলো, অমন চেঁচামেচি ক'রো না।'

নলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল বটে তবে শান্ত হইল না। কহিল, 'কোন বদ-খেয়ালীতে ওড়াই নি স্যার, ঈশ্বর জানেন। গত মার্চ মাসে স্ত্রীর ব্যাসিলারী ডিসেনট্রি, ছেলেটা গেল পুড়ে, মেয়েটার হাম 'লাট' খেয়ে গেল। বড় ডাক্তার না ডাকলে তিনটেই মরে যেত। তাই আর পারলুম না। এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, গত বছর ছোট ছেলেটা মরবার সময় যদি ওর গয়নাগুলো সব না যেত তাহ'লে কিছুতেই এমন কাজ করতুম না!'

স্যর যতীন কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, 'তাই ব'লে মনিবের টাকা চুরি করবে? না হয় মরেই যেত—'

নলিনী যেন শিহরিয়া উঠিল। আবারও কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, 'চোখের সামনে সব ক'টা একসঙ্গে মরবে, এ কিছুতেই সইতে পারলুম না। আগে অতটা বুঝতে পারি নি, অল্প টাকা নিয়ে আস্তে আস্তে শোধ ক'রে দেব ভেবে-

ছিলুম। কিন্তু শেষে আর সামলাতে পারলুম না। অনেকগুলো কাচ্ছাবাচ্ছা, দাঁড়িয়ে মরে যেতো— !'

আর একবার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'যখন মনে হ'ল আমিই ওদের পৃথিবীতে এনেছি, চিকিৎসার অভাবে মরে গেলে কী জবাব দেব ভগবানের কাছে, তখন সব ভুলে গেলুম। এইবারটি মাপ করুন, আমি যেমন ক'রে হোক—ভিক্ষে ক'রেও—ও টাকাটা শোধ ক'রে দেবো। নইলে সবাই মারা যাবো স্যার—'

চাকর-দারোয়ানরা পর্যন্ত সাহেবের ধৈর্যে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া সবটা শুনিলেন। বাধা দিলেন না, চলিয়া যাইবারও চেষ্টা করিলেন না। শুধু নলিনীর বক্তব্য শেষ হইলে শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, 'আচ্ছা এখন তুমি বাড়ি যাও।'

তাহার পর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া, কোনদিকে না চাহিয়া লিফ্‌টে গিয়া উঠিলেন। লিফ্‌ট ছাড়িয়া দিল।

নিজের কামরাতে ঢুকিয়া ব্যানার্জি সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বিপুল কাজ জমিয়া রহিয়াছে। সামনেই চার-পাঁচটি জরুরী ফাইল পড়িয়া রহিয়াছে, একটা বাজিবার আগে তাহাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়া অবশ্যক। চিঠিরও স্তূপ জমিয়াছে, কতকগুলি তাঁহার ব্যক্তিগত, সেগুলি এখনও খোলা হয় নাই। কতকগুলি অফিসেরই—বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীরা নির্দেশের অপেক্ষায় পাঠাইয়া দিয়াছে। এখনই এগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হইবে। কিন্তু তবু সাহেব চুপ করিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিলেন। প্রায় পনেরো মিনিট এমনি ভাবে কাটিবার পর তিনি রামেশ্বরবাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রামেরশ্বরবাবুই ক্যাশের বড় বাবু। তিনি আসিতেই স্যর যতীন প্রশ্ন করিলেন, 'নলিনী এখানে কতদিন কাজ করছে?'

একটু ভাবিয়া লইয়া রামেশ্বরবাবু জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে, তা প্রায় বছর আষ্টেক হ'লো।'

'হুঁ। কাজকর্ম করে কেমন?'

রামেশ্বরবাবু যেন একটু ইতস্তত: করিয়া কহিলেন, 'খাটে খুবই, তবে এদানীং যেন ওর কামাইটা কিছু বেড়েছে—'

মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া ব্যানার্জি কহিলেন, 'ওর বাড়ির খবর কিছু জানেন ? সংসারের অবস্থা ?'

'আজ্ঞে না।'

'আমাদের অফিসের আর কেউ জানে ?'

'বোধ হয় বিকাশ কিছু বলতে পারে, সে ঐ পাড়াতে থাকে।'

'আচ্ছা আপনি যান। বিকাশকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।'

একটু পরেই বিকাশ আসিল। ব্যানার্জি সাহেব ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি নলিনীর পাড়াতে থাকো ?'

বিকাশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। সাম্‌নাসামনি বাড়ি—'

ব্যানার্জি কহিলেন, 'ওদের সংসারে আছে কে ?'

বিকাশ কহিল, 'ওর স্ত্রী আর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে। আর এক পিসিমা আছে তার আবার পক্ষাঘাত।'

'অবস্থা কেমন ওদের ?'

বিকাশ একটু যেন লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, 'অবস্থা আর কেমন হবে বলুন। পঞ্চান্ন টাকা মাইনে পায় বটে, তেমনি আঠারো টাকা বাড়ি-ভাড়া দিতে হয়। তবু নিচের তলার অন্ধকার দুটো ঘর।'

ব্যানার্জি সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। খানিক পরে কহিলেন, 'কিন্তু আজ-কাল অত কামাই করছে কেন ? রেস-টেস খেলে নাকি ?'

জিভ কাটিয়া বিকাশ কহিল, 'ওর তেমন প্রকৃতিই নয়। কিছুদিন ধ'রেই ওদের বাড়িসুদ্ধ বড্ড ভুগছে। কেউ তো নেই—তাই এমন অবস্থা গেছে যে তিনটি সাংঘাতিক রুগী, মুখে জল দেবার লোক নেই তবু অফিসে এসেছে। ওর ছ' বছরের মেয়ে সকলের মুখে জল দিয়েছে—'

'হুঁ, আচ্ছা তুমি যাও।'

বিকাশ চলিয়া গেল কিন্তু ব্যানার্জি সাহেব তখনও কোন কাজে মন দিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ পেপার-ওয়েটটা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া সহসা উঠিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। নিচে কর্মব্যস্ত শহরের দৃশ্য চোখে পড়িল

কিন্তু মনে গেল না। বর্তমান নয়, ভবিষ্যৎ নয়, কোন্ এক বিচিত্র কারণের সূত্র ধরিয়া মন তাঁহার চলিয়া গিয়াছিল সুদূর অতীতে, নিজের প্রথম যৌবনে—

আশ্চর্য! আজ নলিনী যে কাজ করে একদিন তিনি নিজে ঠিক ঐ কাজই করিয়াছেন, সম্ভবত ঐ একই চেয়ারে। সে আজ অনেকদিনের কথা, তখনও তাঁহার সংসার আছে, তখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন, কল্পনার জাল বোনেন। মাহিনা ছিল তাঁর আরও কম, মাত্র পঞ্চাশ। পনেরোটি টাকা দিয়া বৌ-বাজারের একটা সরু গলির মধ্যে ঘর ভাড়া করিয়া বাস করেন। তখন তিনি সাহেব নন, নিতান্তই যতীন।···

তাঁহারও একদিন ঐ অগ্নিপরীক্ষা আসিয়াছিল। তবে সেদিন তিনি নলিনীর মতো পরাজিত হন নাই, প্রলোভনকে জয়ই করিয়াছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে মূল্যও বড় কম দিতে হয় নাই। স্ত্রী এবং শিশুপুত্র একই সঙ্গে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছিল, দীর্ঘদিন ভুগিয়া চোখের সামনে প্রায় বিনা চিকিৎসাতে মারা গেল, তিনি তাহার কোন প্রতিকারই করিতে পারেন নাই।

উঃ, সেদিনের কথা মনে হইলে আজও তাঁহার সারা বুক যেন ভাঙ্গিয়া পিষিয়া যায়! মায়ের অসুখে ও শ্রাদ্ধে স্ত্রীর গায়ের শেষ অলঙ্কারটিও বিক্রি হইয়া গিয়াছে, তখন হাতে একটিও পয়সা নাই। একটা সাধারণ ডাক্তার পর্যন্ত ডাকা হয় নাই প্রথমে, পাড়ার খানিকটা-হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চারু-বাবু বই দেখিয়া ঔষধ দিয়াছিলেন। তারপর রোগ যখন বাড়িয়া উঠিল তখন চারুবাবুর নিকট হইতেই কুড়িটি টাকা ধার করিয়া চার টাকা ভিজিটের এম-বি ডাক্তার একজনকে ডাকিয়াছিলেন কিন্তু তখন আর তাহাদের বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না।

অথচ, স্যর যতীনের মনে পড়িল, তখন তাঁহার হাতেও অফিসের প্রচুর টাকা থাকিত। তখন এত হিসাব-নিকাশের বা পরীক্ষারও কড়াকড়ি ছিল না, ইচ্ছা করিলেই তিনি অনেক টাকা খরচ করিতে পারিতেন, পরে সুবিধামতো ধীরে ধীরে শোধ করা চলিত—কেহ জানিতেও পারিত না। শুধু ধর্ম ও সত্যের মুখ চাহিয়া কিছুতেই তিনি সেদিন সে কাজ করিতে পারেন নাই।···

কিন্তু হয়ত তখনও আশা ছিল! বড় ডাক্তার ডাকা তো দূরের কথা, ভাল

ইন্‌জেকশানগুলা কিনিয়া দিতে পারিলে হয়ত সেদিন তাহাদের বাঁচানো চলিত। এমন করিয়া জীবনের যাহা কিছু প্রেয়, যাহা কিছু অবলম্বন, তাহাদের অকালে হারাইয়া এই মরুভূমির মধ্যে দিন কাটাইতে হইত না।

স্যর যতীন অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন। মূল্যবান কার্পেট, জুতাসুদ্ধ বসিয়া যায় তাহার মধ্যে, দামী চেয়ার, দামী আসবাবপত্র। আজ তাঁহার কর্মস্থলে বিলাসের কত উপকরণই না সজ্জিত রহিয়াছে—কিন্তু আজ আর ইহার মূল্য কি? ঐ একখানা চেয়ারের দামে হয়ত সেদিন দু-দুইটা প্রাণ বাঁচানো যাইত। তাহারা থাকিলে সামান্য খোলার ঘরেও তিনি ইহার চেয়ে অনেক বেশী সুখে থাকিতে পারিতেন। তবু, সেদিন কিছুতেই তাঁহার সাহসে কুলায় নাই, পঞ্চাশটা টাকাও ঘরে লইয়া যাইতে পারেন নাই।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা বার বার বিবাহের কথা পাড়িয়াছে কিন্তু সে কথা মনে হইলেই ধিক্কারে মন ভরিয়া উঠিয়াছে। ছিঃ। একবার তাহাদের সমস্ত ভার লইয়াও অক্ষমতার জন্য বেঘোরে মারিয়া ফেলিয়াছেন, আবার!··· তাহার চেয়ে সারাজীবন নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব কাটাইয়া দেওয়াই ভালো—

নাঃ, তাঁহার চেয়ে নলিনীর অনেক বেশী সাহস আছে, মানিতেই হইবে। স্ত্রী-পুত্রকে তো সে বাঁচাইতে পারিয়াছে! কী ক্ষতি হইবে তাহার, যদি চাকরীটাই যায়? না হয় বড় জোর দু মাস জেলই খাটিবে—এই তো! তবু মুটেগিরি করিয়াও বাঁচিতে পারিবে! বর্তমান না হোক, অন্তত ভবিষ্যতের আশাতে থাকিবে, একদিন তো আবার সোনার সংসার গড়িয়া তোলার স্বপ্ন দেখা তাঁহার মতো উপহাসের বস্তু হইয়া উঠিবে না!···

স্যর যতীন যেন খানিকটা ছটফট করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। দু-একটা ফাইল খুলিলেন, কিন্তু কাজে মন বসিল না। খানকতক চিঠি পড়িবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। আবার উঠিয়া আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলেন। নিচে অসংখ্য লোক কোলাহল করিতে করিতে চলিয়াছে, চারিদিকে কত মানুষ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে তাঁহার আপন বলিতে একটি লোকও নাই। এ জীবন যাপনের চেয়ে জেলখাটা, এমন কি ফাঁসিকাঠে ওঠাও শ্রেয়!

কিন্তু, স্যর যতীনের মনে পড়িল, নলিনীকে যদি মাপ করেন তাহা হইলে

সেই মুহূর্তে অফিসর সমস্ত 'ডিসিপ্লিন্' ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর কোন লোক-কেই হয়ত তিনি ভবিষ্যতে শাসন করিতে পারিবেন না। সকলেই ঐ নজীর পাড়িবে—

অথচ, তাহাকে শাস্তি দিবার যত কল্পনা সকালে ছিল এখন আর তাহার কোনটিতেই তাঁহার মন যেন সায় দিতেছে না। নলিনীর বর্ণিত পাশাপাশি রোগশয্যার সঙ্গে আর দুটি রোগশয্যা তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া সব যেন গোলমাল করিয়া দিতেছে—

চোখ বুজিয়া ব্যানার্জি সাহেব অনেকদিন পরে স্ত্রীকে ভাবিবার চেষ্টা করিলেন। পাত্‌লা ছিপছিপে দেহ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখে সুন্দর একটি মিষ্ট হাসি। একটি দিনের জন্যও সে কোন অনুযোগ করে নাই, কোন অভাব-অভিযোগই সে তাঁহাকে শোনায় নাই। মুখ বুজিয়া তিলে-তিলে মরিয়াছে তবু একটা তিরস্কারের ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। শুধু মরিবার সময়ে, কথা বন্ধ হইয়া যাইবার পূর্ব মুহূর্তে, চুপিচুপি বলিয়াছিল, 'যদি পয়সা-কড়ি যোগাড় করতে পারো তো ভালো ক'রে আমার শ্রাদ্ধটা ক'রো। আর তুমি নিজেই ক'রো—'

উঃ—

স্যর যতীন শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া অনেকদিন পরে জল গড়াইয়া পড়িল। মনে মনে বলিলেন, এতদিন বুঝি নি মিনু, তোমার আসল শ্রাদ্ধটাই এখনও বাকী রয়েছে। তোমার জন্যে আমি সবচেয়ে বড় স্বার্থত্যাগই করব—। ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা যায় যাক—

টেবিলের বোতাম টিপতেই চাপরাশী আসিল। কিন্তু সাহেবের মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার ঘরে আসিতে ভরসা হইল না, সে দ্বারপথেই দাঁড়াইয়া গেল। সাহেব শুধু বলিলেন, 'রামেশ্বরবাবু!'

রামেশ্বরবাবু যখন ঘরে ঢুকিলেন সাহেব তখন কী-একটা চিঠির জবাব লিখিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, 'দেখুন কাল একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। নলিনী বেচারার বেশী দোষ নেই। আমি সেদিন একটা বিশেষ দরকারে ওর কাছ থেকে সাতশো টাকা চেয়ে নিয়েছিলুম, 'ভাউচার' দিই নি। আমারও মনে নেই, বিপদে-আপদে ও নিজেও ভুলে গেছে—। ওটা আমার

নামেই খরচা লিখে নেবেন।'

রামেশ্বরবাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু পরে সাহেব কহিলেন, 'আচ্ছা, আপনি যান তাহ'লে। আর হ্যাঁ, ওকেও না হয় একটা লোক পাঠিয়ে খবরটা দিয়ে দিন—'

ভজনানন্দ চরিত

ভজু আমার দূর সম্পর্কের ভাগ্নে হ'ত। সম্পর্কটা অত দূরের বলেই বোধ হয় আমি কখনও মাতুলজনোচিত সম্মান দাবি করি নি তার কাছে; আর সেই জন্যেই সে-ও, বয়সের বেশ খানিকটা ব্যবধান সত্ত্বেও, নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে মিশত এবং মনের কথা বলত।

না, আমি কোন মহাপুরুষচরিত লিখতে বসি নি। কোন 'হিরো'র কথাও বলছি না। ভজু হ'ল নিতান্তই একটি সাধারণ, যাকে আজকাল বলে রকবাজ ছোকরা—তাই। ছোট বেলায় ওর বাবা মারা গিয়েছিলেন, কাকাদের সঙ্গে মা'র বনে নি—পৃথক হয়ে বেরিয়ে এসে ওদের বাড়ির অংশ এবং গয়না-বেচা টাকায় ভাড়াটে-ঘরে মাথা গুঁজে থেকে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে-ছিলেন। অথবা বলা যায় অমানুষ তৈরী করেছিলেন। কারণ ভদ্রমহিলার কোন ছেলেই লেখাপড়া শেখে নি। আমারই দূর সম্পর্কের বোন—তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি—দোষটা ভজুর মায়েরই পনেরো আনা।

ভজু লেখাপড়া শেখে নি বটে, কিন্তু আসর মাৎ করতে তার জুড়ি ছিল না। সব প্রসঙ্গেই সে যোগ দিতে পারত এবং খুব একটা নির্বোধের মতোও কথা বলত না—মানে হাস্যাস্পদ হ'ত না। নিজের অজ্ঞতা ঢেকে নিতে পারত চমৎকার।

কতকটা সেই জন্যেই—সে অনায়াসে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে মিশে যেত—বহু ধনীর গৃহেই তার অবাধ যাতায়াত ছিল।

চব্বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত বেশ বেকার ছিল ভজু, হঠাৎ তার একটা চাকরি জুটে গেল।

সংবাদটা এতই বিস্ময়কর যে, শোনবার পর বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বাস হয় নি।

তাও সাধারণ চাকরি হ'লেও কথা ছিল—তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজার, কোন অফিসে বেয়ারার কাজ কিংবা এ. আর. পি.-তে ত্রিশ টাকা মাইনের পার্টটাইম চাকরি খুব দুর্লভ নয়—আর তার যেসব প্রভাবশালী লোকের বাড়ি যাতায়াত, তাঁদের কৃপায় আরও ঢের বেশী মূর্খ, এমন কি নিরক্ষর লোকও তরে গেছে—কিন্তু ভজুর চাকরিটাতেও একটু বিশেষত্ব ছিল।

শুনলাম সে মিলিটারীতেই—আর্মি মেডিক্যাল কোরে কম্পাউণ্ডারের চাকরি পেয়েছে।

যতদূর জানা আছে, সে কস্মিন্‌কালে কম্পাউণ্ডারী পড়ে নি। পাড়ার বিভিন্ন রকের সঙ্গে ডাক্তার সুবোধ পালের রকেও বসত—এই পর্যন্ত—তাঁর কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে বিড়ি-টিড়ি খেত, কিন্তু তাই বলে কম্পাউণ্ডারের চাকরি, তা আবার আর্মিতে! তারা তো অন্ততঃ সার্টিফিকেটটা দেখতে চাইবে।

বিশ্বাস যে করি নি—তা আগেই বলেছি। কিন্তু একদিন যখন পুরো মিলিটারী পেশাকে বুট-জুতো পরে মশ্‌মশ্‌ করতে করতে এসে ঘরে ঢুকল ভজু—তখন আর অবিশ্বাস করবার কোন উপায় রইল না।

'কী ব্যাপার রে! সত্যিই তুই তাহ'লে মিলিটারিতে চাকরি করছিস! তা আবার মেডিক্যাল কোরে! এ যে দিনে-ডাকাতি! ঢুকলি কি ক'রে—কারুর সার্টিফিকেট জাল করলি নাকি? দেখিস, জেলে-টেলে না যেতে হয় শেষ পর্যন্ত!'

'না মামা, সে ভয় নেই। আমার পে-বুক দেখলেই বুঝবেন আমি নিজের নামেই কাজ করি। প্রমোশ্যনও একটা পেয়েছি এর মধ্যে!'

'কিন্তু ঢুকলি কী ক'রে! বিদ্যে যা তোর তা তো প্রথম দিনেই ধরা পড়বার কথা! তুই করিস কম্পাউণ্ডারী, সে যে মানুষ মারা কল!'

'একটু ভুল করছেন মামা। কম্পাউণ্ডার হিসেবে ঢুকি নি আমি। আমি আমাদের ইউনিটে স্টোরের বড়বাবু—মানে, ইন্‌-চার্জ।'

তবু তখনও ভেবেছি 'ইন্‌-চার্জটা বাড়িয়ে বলছে—গৌরবে বহুবচনের মতো, স্টোরেই হয়ত সামান্য কোন কাজ করে, বেয়ারা-জাতীয় কিছু। কিন্তু কিছু দিন পরেই দেখলুম নামে ইন্‌-চার্জ না হোক—কাজে তাই বটে। কারণ শীগগিরই শ্রীমান মুঠো মুঠো ওষুধ ইন্‌জেকশ্যন প্রভৃতি সরিয়ে এনে আমাদের

পাড়ার ডাক্তারখানাগুলোয় 'সাপ্লাই' দিতে লাগল, আর তার বদলে মুঠো মুঠো টাকা তুলতে লাগল নিজের পকেটে।

প্রায় প্রকাশ্যেই ঘটতে লাগল ঘটনাটা। নিজের চোখেও প্রত্যক্ষ করলুম দু-এক দিন। অর্থাৎ কোন একটা বড় স্টোরে যে তার অবারিত প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

মনে মনে বাহবা দিতে বাধ্য হলুম। ছোকরা বাহাদুর বটে।

শ্রীমান ভজু যে বাহাদুর সে সম্বন্ধে অন্য দু-একটা তথ্যও কানে গেল।

টাকা কিছু সে মা-ভাইদের দেয়, কিন্তু সে নাকি খুব বেশী নয়। মাইনের টাকা থেকেও সামান্য কিছু হাতে রেখে বাকীটা দেয়। টাকা সে জমাচ্ছে—যুদ্ধ মিটে গেলে ওষুধের ব্যবসা করবে, এই নাকি তার মতলব।

কথাটা লোকমুখে শুনেছিলুম। একদিন হাতের কাছে পেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলুম—কথাটা ঠিক কিনা।

তৎক্ষণাৎ অকপটে স্বীকার করল ভজু, 'হ্যাঁ মামা, ঠিকই। দেখুন টাকা কি আর মা-ভাইদের দিতে ইচ্ছে করে না. খুবই করে। এখনও তো নিজের সংসার হয় নি, পেছটান নেই। কিন্তু তাতে লাভ কি হবে? ওরা দু'হাতে ওড়াবে, বড়মানুষীতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। অথচ এ রামরাজত্ব—বুঝতেই তো পারছেন—এ আর ক'দিনের! যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এ কি আর থাকবে? তখন চলবে কিসে? একবার খরচার হাত হয়ে গেলে আর কমানো যায় না। ভাই দুটো তো আমারই মতো, মুখ্যু হ'লেও অত দোষের ছিল না, যদি এধারে অন্ততঃ একটু চৌকস হ'ত তো কিছু-না-কিছু ক'রে খেতে পারত। দেখছেন তো এমন লড়াইয়ের বাজারেও কোথাও ঢুকে পড়তে পারল না। এর পর কি কিছু করতে পারবে? মাঝখান থেকে অভ্যেসটা খারাপ হয়ে গেলে চুরি-ডাকাতি ছাড়া পথ থাকবে না। না মামা, তার চেয়ে এই-ই বেশ আছে। চাকরি গেলে যদি হাতে টাকা থাকে—এ লাইনে জানাশুনো হয়ে গেল তো বিস্তর—অনায়াসে একটা ডিস্‌পেন্‌সারী খুলে বসতে পারব। এ লাইনে মামা, কত পারসেন্ট লাভ সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

বলতে বলতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ভজুর মুখ।

আবারও বাহাদুরি দিতে বাধ্য হলুম। প্রকাশ্যেই তার বুদ্ধির তারিফ করলুম, প্রাণভরে আশীর্বাদ করলুম। দিদি একদিন অনুযোগ করতে এলে বললুম, 'এখনও ছেলেকে কিছুই চেন নি তুমি, অমন ছেলে আমার হ'লে মাথায় ক'রে রাখতুম। যদি কোনদিন তোমাদের দুঃখ ঘোচে তো ঐ ছেলে থেকেই ঘুচবে। তুমি ওর নিন্দে অন্ততঃ আমার কাছে করতে এসো না।'

বলা বাহুল্য, দিদি খুব খুশী হলেন না এ কথায়—মুখ হাঁড়ি ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু আমার সমস্ত আশাভরসা ধুলিসাৎ ক'রে দিয়ে, সব ভবিষ্যৎ-বাণী নিষ্ফল ক'রে শ্রীমান ভজু এক কাণ্ড ক'রে বসল।

অবশ্য ইতিপূর্বে যুগ যুগ ধরেই এ কাণ্ড ঘটে এসেছে। ভজুর চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান, ঢের বেশী বাহাদুর ব্যক্তিও এ কাণ্ড ক'রে বসেছেন। বরং বলা উচিত এর চেয়ে ঢের বেশী গর্হিত কাজ করেছেন। সে-তুলনায় এমন কিছু করে নি ভজু।

সে একটি বিবাহ করেছে—এই মাত্র।

যে সমস্ত চলতি নাটুকে-দল সেই সময়টা মিলিটারী ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অভিনয় দেখিয়ে বেড়াত, তাদেরই একটা দলের একটি তরুণী অভিনেত্রীকে বিয়ে ক'রে বসেছে সে; এদের কাউকে না জানিবে—বা মত না নিয়েই।

ওর মা একদিন আমার কাছে এসে খুব কান্নাকাটি ক'রে গেলেন, অনেক বাঁকা কথাও শুনিয়ে গেলেন কান্নার ফাঁকে ফাঁকে। তাঁর দুঃখ ঘোচা নিয়ে আমি যে ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলুম—খোঁচাটা সেই উপলক্ষেই। অর্থাৎ এত দুঃখের মধ্যেও আমি যে অপ্রস্তুত হয়েছি, সেই তাঁর যা একটু সান্ত্বনা।

কিন্তু তবু আমি ভজুর খুব বেশী দোষ দিতে পারলুম না। যা স্বাভাবিক, যা বয়সের ধর্ম—তাই সে করেছে। এমন আর নিন্দনীয় কি? বরং দিদিকে পরামর্শ দিলুম প্রসন্নমনেই এটা মেনে নিয়ে বৌকে ঘরে তুলতে।

দিদির হয়ত সে সৎপরামর্শে কান দিতে খুব আপত্তি ছিল না, ব্যবহারিক দিকটা ভেবেই তিনি সব অভিমান হয়ত গলাধঃকরণ করতেন শেষ পর্যন্ত—কারণ কলসীর জল গড়িয়ে খেতে খেতে প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন এতদিনে,

রোজগেরে বড়ছেলের ওপর তাঁর এখন অনেকখানিই নির্ভর করতে হয়—কিন্তু আপত্তিটা বোধ হয় ও-তরফ থেকেই বেশী উঠেছিল; ভজু তাই বৌকে বাড়িতে আনবার কিছুমাত্র চেষ্টা না ক'রে চেৎলার দিকে কোথায় একখানা ঘর ভাড়া ক'রে নতুন সংসার পেতে বসল।

একটু অস্বস্তি বোধ করলুম দিদির কথা ভেবে—কিন্তু উপায় কি? আমরা আর কি করতে পারি! ভজুর অন্ততঃ আটাশ বছর বয়স হয়েছে—সে আর নাবালক নেই যে তাকে বোঝাতে যাব।

তবে ভজুর হিসেবে একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। যেমন অনেক বুদ্ধিমানেরই মধ্যে মধ্যে এই ধরনের ভুল হয়ে যায়। সে বিয়েটা করল যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর। তাও তখনই যদি সে তার পূর্বকল্পিত ব্যবসায় নেমে পড়ত তো ভাল হ'ত, কিন্তু বোধহয় বিয়ে করার ফলেই তার আগের সেই বেপরোয়া দুঃসাহস—যাকে ইংরেজীতে বলে 'ড্যাশ', সেটা একেবারে চলে গিয়েছিল। সে তদ্বির-তদারক ক'রে মিলিটারী চাকরীর জোরে বাংলা সরকারের পাবলিক হেল্‌থ্‌ বিভাগে একটা চাকরি যোগাড় ক'রে নিল।

তাতে মাইনেটা হয়ত কমল না, কিন্তু উপরিটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আর, অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবার যে আশঙ্কাটা মা-ভাইয়ের সম্বন্ধে সে করেছিল, সে অনিষ্টটা তার এবং তার স্ত্রীর হয়ে বসেছিল ইতিমধ্যেই। প্রচুর উপরি আয়ের টাকা দীর্ঘকাল ধরে আসতে আসতে মন কখন সেটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তার ওপর অনেকখানি ভরসা ক'রে বসে আছে, তা ভজু নিজেও টের পায় নি। জীবনযাত্রার একটা পথ বা পদ্ধতি সে তৈরী ক'রে নিয়েছিল—সেই পথ ছাড়া অন্য পথ ধরতে পারল না আর। তার ফলে প্রতি মাসেই আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হ'তে লাগল। ভজু অসহায়ভাবে বসে বসে সেটা দেখতে লাগল এবং শঙ্কিত হ'তে লাগল, কিন্তু প্রতিকার কিছুই করতে পারল না।

এর ভেতরই পর পর ভজুর দুটি সন্তান হ'ল; আর সম্ভবত বিধাতার পরিহাসেই, ছেলে দুটি জন্মাবধি ভুগে ও ভুগিয়ে বিস্তর খরচা করিয়ে দিল। তাও শেষ পর্যন্ত বাঁচল না। দুটিই বছরখানেক ক'রে টিকে থেকে মারা গেল।

ওদিকেও কলসীর জল গড়াতে গড়াতে তলা ছুঁয়ে এসেছিল। অভাব-

অনটন তার বাস্তব চেহারাটা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। ফলে ভজুরও মেজাজ হয়ে উঠল খিটখিটে—প্রতিদিনই ঝগড়া-বিবাদ বাধতে লাগল—প্রতিদিনই লেগে রইল অশান্তি। শেষে একদিন ভজু প্রস্তাব করল—বাসা উঠিয়ে সে মার বাসাতেই গিয়ে উঠবে। ছোট ছুটো ভাই কী একটা কারখানায় ঢুকে পড়েছে, তাতে খুব সচ্ছলে না হোক. একরকম ক'রে চলে যাচ্ছে তাদের। তার ওপর ওর মাইনেটা যুক্ত হ'লে মিলেমিশে চলে যেতে পারে—এভাবে পৃথক থেকে চালাবার আর সামর্থ্য নেই তার।

ভজুর বৌ চন্দনা এ প্রস্তাবে যেন ক্ষেপে উঠল। ঝগড়াঝাঁটি চরমে উঠল সেদিন। সে রাগ ক'রে রাঁধল না—রান্নার লোক ছাড়িয়ে দিতে হয়েছিল অনেকদিনই—ভজুকেও খেতে দিল না। পরের দিনও ভজু না খেয়ে অফিস গেল। ফিরে যখন এল তখন দেখল যে বাড়ি খালি—খোলা হাঁ-হাঁ করছে। চন্দনা নেই, তার সঙ্গে তার গয়নার বাক্স ও দামী শাড়ির স্যুটকেসও অন্তর্হিত।

এবং—আর একটি জিনিস তার মনে পড়ল—তার উপরি আয়ের সঞ্চিত টাকা সে স্ত্রীর নামেই ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিল—সে হিসেবে এখনও শ' আষ্টেক টাকা থাকবার কথা। খুঁজে দেখল চন্দনা সে পাস-বই আর চেক-বইও নিয়ে যেতে ভুল করে নি।

এর পর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যা করে, ভজুও তাই করল। ও-বাসার মালপত্র সব বেচে দিয়ে, মার কাছে এসেই উঠল।

এর পর ভজুর সঙ্গে দেখা হয় নি দীর্ঘকাল।

হঠাৎ একদিন ওর মেজ ভাই বঙ্কুর সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। তার মুখেই শুনলুম ভজু দীক্ষা নিয়েছে, বহুক্ষণ ধরে সাধনভজন করে, মাছ মাংস খায় না—ইত্যাদি। অর্থাৎ ওদিকে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে এখন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, 'চাকরি?'

'সেটা এখনও করছে, তবে কদিন করবে তা জানি না। রোজই তো জপ-আহ্নিক ক'রে উঠতে বারোটা বেজে যায়—নেহাৎ সরকারি চাকরির মা-বাপ নেই বলেই এখনও টিকে আছে, নইলে কবে চলে যেত!'

একটু হাসে বন্ধু। তবে তাতে কৌতুকের চেয়ে দুশ্চিন্তাই বেশী প্রকাশ পায়।

'একবার আমার কাছে তাকে যেতে ব'লো তো।'—একটু আশ্বাস দিয়ে বলি, 'দেখি, কী আবার পাগলামি মাথায় চাপল!'

ভজু এল পরের দিনই। অফিসেরই ফেরত—কিন্তু এ কী বেশভূষা! সর্বনাশ, এই বেশে ও অফিসে যায় নাকি? তাহ'লে যেমন সরকারী অফিসই হোক—চাকরি ক'দিন থাকবে?

ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড গোঁফ-দাড়ি গজিয়ে ফেলেছে ছোকরা, চুলও রেখেছে বেশ বড় বড়—সে চুল ঘাড় পেরিয়ে কাঁধ পর্যন্ত লতিয়ে পড়েছে। গেরুয়া নেয় নি বটে, কিন্তু সাদা কাপড় পাট ক'রে বহির্বাসের মতোই পরেছে, গায়ে একটা উড়ুনি, তার ওপর দিয়ে বেরিয়ে আছে মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, দৃষ্টিও বেশ অর্ধনিমীলিত, সাধকদের যেমন হওয়া উচিত, তেমনই।

কী বলছি তা বোঝবার আগেই—মনের আশঙ্কাটা মুখে প্রকাশ পেয়ে গেল, 'এ কী, এই বেশে অফিস গিয়েছিলে নাকি? এসব কী পাগলামি! এমন করলে চাকরি থাকবে কেন—হাজার হোক অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আছে তো!'

একটু হাসল ভজু। বেশ উচ্চাঙ্গের হাসি। তেমনি অর্ধনিমীলিত নেত্রে পাশের দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসির সঙ্গে বলল, 'আমি তো কম্‌লিকে ছাড়তেই চাই, কম্‌লিই যে ছাড়ে না, মামা!'

'তার মানে?'

'চাকরি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে দু'বেলা তো ঝুলোঝুলি করছি, কান্নাকাটি করছি বলতে গেলে, কিন্তু ডিপার্টমেন্টের কেউ যে ছাড়তে চায় না।

'চাকরি ছাড়ার জন্যে ঝুলোঝুলি করছ! তার মানে? চাকরি গেলে খাবে কি?'

'জীবকে যিনি এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন মামা—খাওয়াবার দায়িত্ব তাঁর। আমি পরের দায়িত্বের কথা ভেবে নিজের ক্ষতি করি কেন? তবে এটা ঠিক, ভাইদের গলগ্রহ হয়ে থাকব না। ওরা সুখে থাক, বিয়ে-থা ক'রে সংসারী

হোক, আমি বাড়ি থেকেও ছুটি চাইছি।'

বুঝলুম যে মাথাটা একেবারেই বিগড়ে গেছে ছোকরার।

তবু বোঝাবার চেষ্টা করলুম খানিকটা, এ পাগলামি ছেড়ে একটি গরীব-গেরস্ত ঘরের মেয়ে দেখে আর-একটা বিয়ে করবার কথাও বলতে গেলুম, কিন্তু প্রত্যেকটি কথাই সে সবিনয় মধুর হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দিল। এমন একটা উচ্চ স্তর থেকে কথা বলতে লাগল যে, তাকে কথা না বলে, বাণী বলাই উচিত। শেষে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলুম।

কেবল একবার একটা অসতর্ক মুহূর্তে সন্ন্যাসী ভজুর আড়াল থেকে সংসারী মানুষটা বেরিয়ে পড়ল—যখন কেবলমাত্র মজা দেখবার জন্যে প্রশ্ন ক'রে বসলুম, 'চন্দনার কোন খবর রাখ নাকি?'

সে হঠাৎ স্বাভাবিক স্বরে জবাব দিয়ে ফেলল, 'সে তার পূর্বজীবনে ফিরে গেছে। আজকাল য়্যামেচার থিয়েটারে মেয়েদের নেওয়া হয়—তাতেই সে কাজ করছে। শুনেছি তার খুব কল্—রেটও নাকি বেশী।...মোট কথা, ভালই আছে সে।'

কথাটা বলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করি নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছিল। খুব জোরে জোরে বার-দুই 'শিব' 'শিব' উচ্চারণ ক'রে হঠাৎ উঠে পড়ল এবং কোনপ্রকার বিদায়-সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে একটু দ্রুতই বেরিয়ে গেল।

অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে বুঝে আমিও আর ডাকলুম না।

এর মাসখানেক পরে হঠাৎ একদিন দিদি এসে হাজির—কাঁদতে কাঁদতে।

তিনি কিছু বলার আগেই অনুমান করলুম কথাটা। সেদিন যা বলে গেল ভজু তা সত্যি হ'লে চাকরি বেশীদিন থাকার নয়। নিশ্চয় চাকরিটা গেছে ছোকরার। 'কম্‌লি'কে বেশীদিন আর খোশামুদি করতে হয় নি, সে সহজেই ছেড়েছে।

কিন্তু দিদির মুখে শুনলুম শ্রীমান শুধু চাকরিই ছাড়ে নি, বাড়িও ছেড়েছে। গত পয়লা তারিখেই অফিসের পাট চুকিয়ে এসেছে—সে কথা বলে নি কাউকে। যেমন কুড়ি-তিরিশ টাকা নিজে রেখে, বাকীটা মার হাতে

দেয়, তেমনিই দিয়েছে। পরের দিন সকাল থেকেই উধাও—আর কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না! বন্ধু অফিসে খোঁজ করতে গিয়ে জেনেছে যে, অফিসের ব্যাপারটা ঘুচে গেছে ভজুর।

খুব খানিকটা কান্নাকাটি করলেন দিদি।

তাঁর আরও বিপদ এই যে, বড় ছেলের আয়ের ওপর নির্ভর ক'রে তিনি মেজ ছেলের বিবাহ ঠিক করেছেন—কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে, এমন সময় এই অঘটন। এখন বঙ্কু পিছিয়ে যাচ্ছে, ওদের দু ভাইয়ের যা আয়, তাতে আর বৌ আনতে ভরসা হচ্ছে না ওদের।

এখন তিনি কী করেন! দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত হ'তে হবে যে ভদ্রলোকদের কাছে।

কীই-বা বলব! বললাম, 'বড়ছেলে নিরুদ্দেশ হয়েছে, মন খারাপ, এই বলে বিয়েটা আপাতত পিছিয়ে দাও, আর কী করবে!'

'অগত্যা!' দিদি চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন, 'ওঃ, কী কুক্ষণেই যে ওকে পেটে ধরেছিলুম। একদিনও শান্তি পেলুম না। লোকে বড় ছেলের ওপরই আশা-ভরসা করে—আমার সেই বড় ছেলেই বাদে-ছরাদে গেল। কী কষ্টে মানুষ করলুম ওদের—যাকে বলে একপিঠ ভুঁইকে দিয়ে একপিঠ উইকে দিয়ে মানুষ করা, তাই—তা কোন কাজেই লাগল না।'

এর জবাবে অনেক কথাই বলা চলত, বলা যেত যে—মানুষ তুমি করতে পারো নি, তাহ'লে আর এমন বাজে-খরচে যেত না। কিন্তু কিছু বলতে পারলুম না। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে ইচ্ছে হ'ল না। তা ছাড়া দিদি তা বিশ্বাসও করবে না, বুঝতেও পারবে না নিজের দোষ।

এর মাস ছয়েক পরেই দিদি আবার একদিন এলেন এবার কিন্তু প্রায় লাফাতে লাফাতে। চোখ-মুখ উদ্ভাসিত—হাতে এক হাঁড়ি সন্দেশ।

'শুনেছিস কানু—ভজু আমার বাড়ি ফিরেছে!'

'তাই নাকি? কী রকম? কই শুনি নি তো, কে আমাকে খবর দেবে বলো? তা কবে ফিরল?'

'পরশু দুপুরবেলা হঠাৎ এসে হাজির। পেল্লায় এক মোটরগাড়ি থেকে

এসে নামল—আমি তো ভয়েই অস্থির! চিনতে পারি নি তো, বলি কে-না-কে মহাপুরুষ এসেছেন; নিশ্চয় বাড়ি ভুল ক'রে। হাসছিস কি, সে ভজু আর নেই, দেখলে চিনতে পারবি না। আমিই পারি নি, তা তুই। ইয়া লাশ হয়েছে,—বলতে নেই—তেমনি টকটক করছে রঙ। গোঁফ-দাড়িতে বড় বড় রুক্ষু চুলে—কী সুন্দর মানিয়েছে কী বলব। দেখলে ভক্তি হয়। আমারই পেন্নাম করতে ইচ্ছে করছিল!'

'ভাল! ভাল! থাকবে তো এখন কদিন? একদিন গিয়ে দেখে আসব বরং···তা এটা কি?'

'বলিস কেন! ও তো এল দুপুরবেলা, বিকেল থেকে কী মোটরগাড়ির আমদানি! সব নাকি ভক্ত আর শিষ্য। আমার তো ঐ দুখানি ঘর, লজ্জায় মরে যাই। কোথায় কাকে বসতে দিই—কী পেতে, তাই ভেবে পাই না। সব এসেছে বড় বড় সন্দেশের বাক্স আর ফলের ঝুড়ি নিয়ে। তেমনি পেন্নামীও পড়ছে—একশো দুশো, গিনি! আজ ভজু বললে, অত সন্দেশ কী করবে, এক হাঁড়ি বরং কানুমামাকে দিয়ে এস। তাই আমি ছুটে এলুম। কালই চলে যাবে ও। দুদিনে যত পেন্নামী উঠেছিল সব আমাকে দিয়েছে। আরও দু হাজার টাকা দিয়েছে। বলেছে ভাল বাড়ি দেখে উঠে যেতে আর এবার নিভ্‌ভরসায় বক্কুর বিয়ে দিতে। আসুক-না-আসুক, মাসে মাসে টাকা পাঠাবে।'

এই পর্যন্ত বলে পুত্রগর্বে যেন হাঁসফাঁস করতে লাগলেন দিদি।

আমি বললাম, 'তা আমার কাছে একবার আসবে না, দেখা করবে না? আজ তো আমার যাবার সময় হবে না। নইলে আমিই যেতুম।'

'সে-কথাও বলে দিয়েছে। বুদ্ধি তো খুব, সব দিক ভেবে তবে কথা বলে। বলে, আমি যেখানে যাব সেখানেই এই পঙ্গপাল আমার সঙ্গে যাবে। কানুমামা নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ, শুধু শুধু তাঁকে উত্যক্ত করা। তাঁকে ব'লো এর পর যখন আসব, একদিন লুকিয়ে রাত ক'রে দেখা করতে যাব।'

এরপর দিদিদের অবস্থার দ্রুত উন্নতি হ'ল। ভাল ফ্ল্যাট দেখে আমাদের পাড়াতেই উঠে এলেন। শুনলুম তিন হাজার টাকা সেলামী দিয়ে ঐ ফ্ল্যাট নিয়েছেন। আরও কদিন পরে শুনলুম চেৎলায় জমি কিনেছেন, শীগগিরই

বাড়ি উঠবে। বন্ধুর বিয়েও হয়ে গেল খুব জাঁকজমক ক'রে।

কিন্তু এ সৌভাগ্যের মূল যে—সেই ভজু আর আসে নি এর মধ্যে একদিনও। দিদির দেখলাম সে-ই একটু অস্বস্তি। মাঝে মাঝে মোটা মোটা টাকা পাঠায়—কিন্তু কোন ঠিকানার ঠিক নেই। এবারের টাকা এল হয়ত মালদা থেকে, পরের বার তেজপুর, তার পরের বার আবার হয়ত ডাইজাগ থেকে।

টাকাই পাঠায় যা। চিঠি আসে না তার সঙ্গে একখানাও। খবর দেয়ও না, চায়ও না। কে জানে কী মতিগতি! ওঁরা কোন তল পান না—তার মতলবের।

দেখা হয়ে গেল বছর-দুই পরে আমার সঙ্গেই।

বাঁকুড়ায় গিয়েছিলাম এক দেশবরেণ্য নেতার বিশ্রাম-কুঞ্জে, সেখান থেকে তাঁর গাড়িতেই ফিরছি—হঠাৎ দেখি সামনে এক জায়গায় সার বেঁধে দশ-বারোখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

কী ব্যাপার? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি ড্রাইভারকে—এমন জন-বিরল জায়গায় এত গাড়ি!

ড্রাইভার স্টীয়ারিং ছেড়ে দু হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে বললে, 'ও, তাহ'লে স্বামীজি এসেছেন। এখানের জমিদার অমরবাবুর বাড়ি এসেছেন। আসেন মধ্যে মধ্যে! ভারতের পূর্বাঞ্চলে এলে একবার ওঁর এখানে আসবেনই। অমরবাবুর ওপর খুব করুণা!'

স্বামীজীতে দেশ তো ছেয়ে গেছে। কী আর করব নাম জেনে। তবু অলস কৌতূহলেই একবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে স্বামীজি, কী নাম ওঁর?'

'জানেন না? শ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দ। খুব বড় সাধু। যথার্থ যাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলে!'

আবারও দু হাত কপালে ঠেকাল ড্রাইভার।

কিন্তু ততক্ষণে আমার একটা বড় রকমের সংশয় জেগেছে মনে।

ভজনানন্দ! আমাদের ভজু নয় তো?

'দেখি দেখি! সন্তোষ, একবার গাড়িটা থামাও তো?'

'থামাব—মানে এইখানে ?…একবার দর্শন করতে চান? তাহ'লে তো ভালই হয়। আমারও একবার—যাকে বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস!—দর্শন হয়ে যায়!'

গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ঠেলে যখন বাইরের হলঘরে পৌছলুম স্বামীজি তখন গীতার ব্যাখ্যা করছেন।

চেহারায় হয়ত চিনতে পারতুম না—অত গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলে, তা ছাড়া সত্যিই, রঙটা অসম্ভব ফরসা হয়ে উঠেছে, মোটাও হয়েছে খুব—কিন্তু গলার আওয়াজ ভুল হবার নয়।

স্থানকালপাত্র সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ভজু!'

স্বামীজি চোখ তুললেন, শান্ত অনাসক্ত ছুটি চোখ। অদ্ভুত দৃষ্টি সে-চোখে। কিন্তু তাই বলে চিনতে না পারবারও ভান করলেন না। শান্তভাবেই বললেন, 'এই যে, আসুন কানুমামা। এদিকে—মানে অতুলবাবুর ওখানে এসেছিলেন বুঝি! ভালই হ'ল, দেখা হয়ে গেল।'

স্বামীজি যে ত্রিকালজ্ঞ—তাতে আর সন্দেহ কি?

স্বামীজির মামা, সুতরাং ভক্ত শিষ্যরা তাড়াতাড়ি ছুদিকে সরে পথ ক'রে দিলেন, একেবারে কাছে গিয়ে তাঁর বাঘছালের আসনের পাশেই বসলাম। গৃহস্বামী ছুটোছুটি শুরু করলেন—গুরুর মামা, কেওকেটা কেউ নয়—একান্ত মান্যগণ্য ব্যক্তি। চা-জলখাবার, মায়—একগাছা মালাও এসে গলায় পড়ল।

তারই ফাঁকে ভজু চুপিচুপি আমাকে বলল, 'মামা, আপনার বাড়ি গিয়ে ছু-তিন দিন থাকা যাবে?'

'খুব, খুব!'

'না, ভেবেচিন্তে বলবেন। আমি যাওয়া মানে প্রত্যহ ছু তিনশো লোক যাওয়া। এই তো দেখছেনই, এই বনগাঁয়েও কত লোক জড়ো হয়েছে। এইজন্যে আমি মার কাছেও উঠি না। কলকাতায় গেছি—বড়লোকদের বাড়ি উঠেছি—তারা অত টের পায় নি। তাদের বরং পয়সার সদ্ব্যবহার হয়েছে, খাতিরও বেড়েছে পাড়া-ঘরে। আপনি পারবেন ঠেলা সামলাতে?'

'তা না হয় মরি-বাঁচি ক'রে সামলাব কটা দিন। কিন্তু তোমার মতলবটা

কি বল দিকি?'

'মতলব?' আর একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল সে। হাঁ—মনে মনে মানতে বাধ্য হলুম,—হাসিটা আয়ত্ত করেছে বটে ছোকরা! ভজু হেসে বলল, 'মতলব একটা আছে বৈকি। আসল কথা কি জানেন, আমার যেসব মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ ভক্ত আছে তারা ভরসা ক'রে খুব বড়লোকের বাড়ি ঢুকতে পারে না। আমার মাকেই আমি খবর দিতে পারি না সেই জন্যে।'

'বেশ তো, যেয়ো। কবে যাবে বলো?'

'যাব?' মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে ভজু বলল, 'যাব কালই। আপনি এগিয়ে যান, আমি কাল সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছব।'

যথাপ্রতিশ্রুত, পরের দিনই শ্রীমৎস্বামী শ্রীশ্রী১০৮ ভজনানন্দ মহাসমারোহে আমার গৃহে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বলা বাহুল্য, ভক্তদের ভিড় শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তবে একটা সুবিধা এই যে—আমি ভেবেছিলাম গৃহিণী এই হাঙ্গামায় চটে যাবেন—অসহযোগ করবেন—কিন্তু সেদিক থেকে কোন অসুবিধাই হ'ল না। তিনি যেন বরং উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'কী বলছ, এতগুলো ভদ্দরলোকের পায়ের ধুলো পড়ছে বাড়িতে, এ কি কম ভাগ্যের কথা? ভাগ্নে যে সাধু হয়েছে তার তো এই একটা প্রত্যক্ষ লাভ!'

দুদিন বেশ কাটল। ভজু দেখলাম বেশ নৈপুণ্যের সঙ্গেই উপদেশাদি দিয়ে যাচ্ছে। ছোকরা এসব রপ্ত করলে কোথা থেকে—ভেবে একটু অবাকই হলাম। লেখাপড়ার দৌড় তো আমার অজানা নেই, অথচ কথাগুলো তো বলছে বেশ ভাল-ভালই।

কিন্তু এই দুদিনেই যে পরিমাণ ধকল সইতে হ'ল, যে পরিমাণ কথা বলতে আর চা যোগাতে হ'ল—তাতে গৃহিণী না হোন, আমি বেশ একটু কাতর হয়ে পড়লুম। চাকরও বিদ্রোহ করত—কেবল সাধুবাবা গোসা করলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে এই ভয় দেখিয়ে তাকে নিরস্ত করেছি। খরচও বড় কম হচ্ছে না। বাবাজী আর দুদিন থাকলে ফতুর হয়ে যেতে হবে!

তৃতীয় দিন সকালে মুখ ধুতে ধুতে এই কথাই চিন্তা করছি, শ্রীমান ভজু যেন অন্তর্যামীর মতোই অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে উঠল, 'মামা ভাবেন

না, আর একটা দিন। কাল ভোরেই আমি চলে যাব। পরশু বিষ্ণুপুরে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা আছে এক শিষ্যের, যেতেই হবে। তা ছাড়া—অপরাধ নেবেন না, ভাববেন না আমি আপনার কাছে বড়মানুষী দেখাচ্ছি, আমি কিছু খরচা দিয়ে যাব। দেখছেন তো আমার সবই পড়ে-পাওয়া, মিছিমিছি আমার জন্যে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন কেন? ওদিকেও ভয় নেই—আপনার চাকরকে আজ ভোররাত্রে ডেকে দশটাকা বকশিশ করেছি, ওর আওরতের শূলব্যথার দাওয়াই দিয়েছি—ও আর কোন উচ্চবাচ্য করবে না, দেখছেন না ব্যাটা এর মধ্যেই বাড়িঘর ধুয়ে, বাসনটাসন মেজে, চা পর্যন্ত তৈরী ক'রে ফেলেছে।'

মনের নগ্ন চেহারাটা এইভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ায় একটু অপ্রস্তুত হলুম বৈকি।

সেই সঙ্গে বেশ খানিকটা সসম্ভ্রম বিস্ময়ও বোধ করলুম। তাহলে কি সত্যিই ও খানিকটা আত্মিক শক্তি লাভ করেছে? নইলে এমনভাবে বইয়ের পাতার মতো আমার মনের কথা পড়তে পারল কী ক'রে?

এ প্রশ্নের জবাবও এল সঙ্গে সঙ্গেই। মুচকি হেসে ভজু বলল, 'মামা, মানুষের মনটা না বুঝতে শিখলে, নেতা হওয়া যায় না। গুরুগিরিও একরকমের নেতাগিরি, সেটা মনে রাখবেন। খুব সন্তর্পণে আমাদের থাকতে হয়—মানুষের মনে সন্দেহ আর অশ্রদ্ধাটাই বেশী প্রবল আর স্বাভাবিক।'

যাই হোক—তবু সেদিন যেন শ্রীমৎ স্বামী ভজনানন্দকেও কেমন একটু উন্মনা অস্থির দেখলুম। কিসের চাঞ্চল্য তা বুঝলুম না। মনে হ'ল একটু যেন হতাশও হয়ে পড়েছেন, কিছুই যেন ভাল লাগছে না।

সাধারণত বেলা তিনটে থেকেই ভক্তসমাগম শুরু হয়, চলে রাত বারোটা পর্যন্ত। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি কিন্তু ভজু ঠিক চালিয়ে যায়—কথাবার্তা, পাঠ, উপদেশ—সব মিলিয়ে অবিশ্রাম বকুনি কিন্তু ভজুর কিছু মাত্র ক্লান্তি বা বিরক্তি লক্ষ্য করি নি এই দুদিন। আজ দেখলাম সন্ধ্যার পরই হঠাৎ সে যেন কেমন চুপ ক'রে গেল। ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষিপ্ত দু-একটা 'হুঁ' 'হ্যাঁ' দিয়ে যেতে লাগল—কিন্তু কিছু পাঠ করতে বা ব্যাখ্যা করতে আদৌ রাজী হ'ল না।

ভক্তরা অবশ্য তাতে খুব নিরুৎসাহিত হ'ল না, কে যেন কথাটা ছড়িয়ে দিল একবার—'বাবা আজ একটু কূটস্থ হতে চাইছেন; সমাধির মুড্-এ আছেন!' সেই কথাটাই মুখে মুখে ছড়াতে লাগল।

তবু একতরফা ভক্তি বোধ হয় বেশীক্ষণ জমে না। সেদিন রাত দশটা বাজতে না বাজতেই ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। সাড়ে দশটা যখন, দু-একটি সাধারণ বৃদ্ধা বিধবা ছাড়া কেউ রইল না। আরও মিনিট পাঁচেক পরে 'বাবা' ঘড়ির দিকে চেয়ে একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন—অর্থাৎ এদেরও বিদায়-সঙ্কেত পড়ল সেটা। এবার তারাও বাবাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো মাথায়, বুকে ও জিভে ঠেকিয়ে বিদায় নিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই—যেন বাইরে কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন এই নির্জন অবসরটুকুর—অর্ধ-অবগুণ্ঠিতা এক ভদ্রমহিলা দ্রুত ঘরে ঢুকে একেবারে ভজুর পায়ের উপর আছড়ে পড়লেন।

আমরা দুজনেই অবাক, রীতিমতো চমকেই উঠলুম—কিন্তু ভজুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল সে একটুও বিস্মিত হয় নি, বরং হয়ত মনে মনে এই ভক্তিমতী মহিলারই প্রতীক্ষা করছিল। সেই প্রত্যাশাই সফল হয়েছে মাত্র, আর কিছু নয়। আর সেই সাফল্যের বিজয়-গৌরবে, নির্ভুল হিসাব মিলে যাওয়ার সার্থকতায়—তার মুখ থেকে এতক্ষণের ক্লান্তি ও বিরক্তির কালিমাও কেটে গেছে, সে জায়গায় অস্বাভাবিক একটা দীপ্তি, একটা ঔজ্জ্বল্য ফুটে উঠেছে তার চোখ-মুখে।

যেন মনে হ'ল, যে ভদ্রমহিলা এসে ওর পায়ে পড়েছেন, তিনি কিছু বলছেন। কী বলছেন তা অনেকক্ষণ চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারলুম না—কারণ একে তাঁর মুখটা ওর পায়ের খাঁজে গোঁজা, তায় কান্নায় তাঁর গলা বুজে এসেছে, উচ্চারণ হয়ে উঠেছে বিকৃত।

পরিষ্কার শুনতে এবং বুঝতে পারলুম ভজুর উত্তর। সে বেশ অবিচলিত প্রশান্তির সঙ্গেই বলল, 'তুমি স্থির হয়ে বসো, চন্দনা—যা বলবার সুস্থ হয়েই বলো। আমি তো পালিয়ে যাচ্ছি না। এঁরাও কেউ বাইরের লোক নন, তোমারই মামাশ্বশুর আর মামী-শাশুড়ী। সম্পর্কটা আগের ধরেই বললাম—তার কারণ তুমি তো বিবাহ-বিচ্ছেদের চেষ্টা করো নি এখনও। আগের

সম্পর্কটা বজায় আছে।'

আবারও একবার প্রবল একটা ধাক্কা খেলাম।

চন্দনা! ভজুর স্ত্রী!

তাহ'লে কি এরই অপেক্ষা করছিল সে! এতক্ষণ না আসাতেই অস্থির আর অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল?

চন্দনা এবার মুখ তুলল বটে, কিন্তু ওর পা ছাড়ল না। বরং নিবিড়ভাবে ওর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে তেমনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমি অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি। কিন্তু তুমি কেন আমার ভুল ভেঙে দিলে না, তোমার শুনেছি এত দয়া—তুমি কেন আমাকে জোর ক'রে কাছে টেনে নিলে না!'

আবারও হাসল ভজু। ভারী মিষ্টি হাসি। বলল, 'বড্ড নাটকীয় হয়ে যাচ্ছে না চন্দনা? পা ছাড়। স্থির হয়ে বসো। চা খাবে? এঁরা তো তোমার গুরুজন, এঁদের কাছে তো তোমার আতিথেয়তা পাওনাই আছে!'

তবু চন্দনা ওকে ছাড়ল না। বলল, 'আমি যা-ই হই, যত অন্যায়ই ক'রে থাকি, আজও তোমার স্ত্রী। বলো, আমাকে ত্যাগ করবে না, বলো—একটু সেবার অধিকার দেবে?'

ভজু এবার হেঁট হয়ে আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো থেকে পা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসল। তারপর বলল, 'আমি সন্ন্যাসী, চন্দনা—আমার স্ত্রী থাকতে নেই, স্ত্রীর সেবাও নিতে নেই। সে কথা থাক। কিন্তু —আমি তোমার কোন অপরাধই নিই নি। বরং তোমার কাছে আমি কিছু কৃতজ্ঞই। তোমার কাছ থেকে ঐ আঘাত না পেলে হয়ত এই সার্থকতার পথটা দেখতে পেতুম না কোনদিনই। আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার সম্ভব হয় তুমি নিঃসঙ্কোচে জানিও—আমি যথাসাধ্য করব। টাকার দরকার থাকলে বলতে পারো—মার দয়ায় ও বস্তুটার অভাব নেই আপাতত। যে লক্ষ্মীকে ত্যাগ করতে চায়, লক্ষ্মী তার পিছু পিছু সেধে বেড়ান—এ সংসারের বুঝি এই নিয়ম!' এই বলে সে আবারও একটু হেসে উঠল।

চন্দনা বোধহয় ঠিক এ উত্তর আশা করে নি। সে খানিকটা নিস্তব্ধভাবে বসে রইল—পাথরের মতো। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমি কিন্তু

সত্যিই টাকার লোভে কি সুবিধার লোভে আসি নি। আমি তোমার পায়ে একটু আশ্রয় নিতেই এসেছিলুম।'

ভজুও চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বলল, 'তোমার বড্ড ভুল হয়ে গেছে, চন্দনা—বিবাহটা নাকচ হয় নি বটে, কিন্তু স্বামী আর তোমার নেই। এখন তোমার স্বামী সেই জগৎস্বামী। তাঁকেই ডাকো, শান্তি পাবে। তিনিই মানুষের সবচেয়ে বড় আর সর্বশেষ আশ্রয়। আমার আর তোমাকে কোনো আশ্রয় দেওয়ার সাধ্য নেই।'

চন্দনার মুখ যে এই উত্তরে ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে উঠল—তা সেই দুশো বাতির উজ্জ্বল আলোতে বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। সে যেন ব্যাকুল হয়ে আরও কী বলতে গেল একটা—কিন্তু তার আগেই আমাদের আর এই দাম্পত্য মান-অভিমানের মধ্যে থাকা উচিত নয় বুঝে—গৃহিণীকে একরকম টেনে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। হয়ত আরও আগেই চলে আসা উচিত ছিল—কিন্তু বিস্ময়-বিহ্বলতার মধ্যে এতক্ষণ সেটা খেয়াল ছিল না।

গৃহিণীর ততক্ষণে মনে পড়েছে যে, কিছু কুটুম্বিতা করা দরকার। তিনি ব্যস্ত হয়ে চা-জলখাবার সাজাতে বসলেন। খুব বেশী দেরিও হয় নি—সব জড়িয়ে হয়ত মিনিট-দশেক, চাকর জলখাবার ও চা ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে ফিরে এল ; বললে, 'ও মাইজী তো চলা গিয়া। সির্ফ মহাত্মা বাবা হ্যায়।'

চলা গিয়া ? সে কি !

ঘরে গিয়ে দেখি সত্যিই ঘর খালি, শুধু ভজু তার বাঘছালের আসনে মোটা তাকিয়াটায় ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে। মুখে তার একটু সূক্ষ্ম-রকমের একটা ক্ষীণ দুর্বোধ্য হাসি।

'বৌমা চলে গেলেন ?'

'হ্যাঁ মামা। আপনার ভাগ্নে-বৌ চলেই গেলেন—।

'একটু চা জলখাবার খেয়ে গেলেন না ?'

'ন্-না। আমি বলেছিলুম—তা তিনি রাজী হলেন না। মনে খুব আঘাত পেয়েছেন বোধ হয়, এ সময় পরিচিত লোকের সঙ্গ ভাল লাগে না। বোধ হয় একটু লজ্জাও করল।'

এই বলে সে হাসল একটু—কিন্তু এ হাসি উচ্চাঙ্গের, সাধকজনোচিত হাসি নয়। সাধারণ মানুষের করুণ হাসি।

'কিন্তু—আঘাত, মানে, কোন একটা ভাল বোঝাপড়া কিছু করা গেল না?' একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই প্রশ্ন করি।

'না!'

একটু অকারণ জোরের সঙ্গেই কথাটা বলে হঠাৎ উঠে পড়ল ভজু; ঈষৎ অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিকটা, তারপর আমার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'মামা, আপনাকে আজ একটা সত্যকথা বলি। আমার পয়সা কমতেই ও আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল, সে কথাটা সেদিন বড় বেশী রকম বিঁধেছিল মনে। অনেক চেষ্টা ক'রেও সেটা ভুলতে পারি নি। যে পয়সার লোভে ও গেছে, সেই পয়সার লোভ দেখিয়েই ওকে আবার টেনে আনব, সেদিন এই প্রতিজ্ঞাই করেছিলুম। কিন্তু সহজে আমার মতো মুখ্যু লোকের পয়সা উপায়ের কোন পথ নেই—গেরুয়া ছাড়া। সেইজন্যেই সেদিন এই সন্ন্যাসের ভেখ্ ধরেছিলুম। প্রাণপণ চেষ্টায় কিছু পড়াশুনাও করেছি—আসর জমাবার জন্যে যেটুকু দরকার। আর আসর যে জমেওছে তা তো আপনি দেখছেনই। এ সবই ওর জন্যে। চন্দনা আমাকে ভালবেসেছিল কিনা জানি না, আমি ওকে ভালবেসেছিলুম। একদিন ওর আয় কমবে, রূপ-যৌবন কমবে, সেদিন অসহায়ভাবে চেয়ে দেখবে যে, আমার অনেক টাকা—অনেক প্রতিপত্তি—জ্বলে-পুড়ে মরবে দেখে দেখে—এবং শেষ অবধি ছুটে এসে পড়বে আমার পায়ে, এই আশাতেই এত কাণ্ড—এত অসাধ্য-সাধন করেছিলুম। আমি বরাবরই ওর খোঁজ রেখেছি। কোন বড়লোকের বাড়ি, বহু লোকের মধ্যে যেতে সাহস করবে না, সঙ্কোচ বোধ করবে জেনেই এবার আপনাকে এই কষ্ট দিলুম। অভিনয়ের পঞ্চম অঙ্কের আয়োজন শেষ ক'রে স্টেজ সাজিয়ে আজ ওরই অপেক্ষা করছিলুম!'

এই পর্যন্ত বলে একবার থামল ভজু। আবারও বার-দুই পাক দিয়ে নিল ঘরের মধ্যে—তারপর আবার একবার এসে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

'তারপর?' প্রায় রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করি আমি, 'তাহ'লে অমন নিষ্করুণভাবে বিদায় দিলে কেন?'

হাসল ভজু। বিচিত্র দুর্জ্ঞেয় একধরনের হাসি। বলল, 'ছেলেবেলায় পড়েছিলুম—কী একটা বইতে মনে নেই—এক মেথরের একবার তার দেশের রাণীকে দেখবার শখ হয়েছিল। অনেক রকম চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই দেখা সম্ভব হ'ল না। শেষ পর্যন্ত মেথরাণী পরামর্শ দিল যে, রাণী গ্রহণের দিন গঙ্গা স্নানে যাবেন যখন, তখন পথের ধারে সন্ন্যাসী সেজে বসে থাকতে। সেই-মতোই বসল সে। রাণী গঙ্গা স্নানে যাবার পথে ভিক্ষা দিতে দিতে যাচ্ছিলেন, সামনে ছাইমাখা সন্ন্যাসীকে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখে পাল্‌কী থামিয়ে, নেমে ফল মিষ্টি পয়সা সামনে রেখে সাধুকে প্রণাম করলেন। পিছন থেকে মেথরাণী মেথরের কানে কানে বললে, চোখ খোল, দেখে নাও, মহারাণী তোমাকে প্রণাম করছেন। তার জবাবে মেথর বলল, মহারাণীই হোক আর মেথরাণীই হোক, এ চোখ আর আমি খুলছি না। যে সন্ন্যাসের ভান করলেই মহারাণী এসে পায়ে পড়েন, সত্যিসত্যিই সেই সন্ন্যাস নিলে আরও না জানি কি হবে। আমি আর ঘরে ফিরব না—তুমি যাও।...গল্পটা পড়ে সে সময় খুব হেসেছিলুম, আজগুবি বলে মনে হয়েছিল। আজ আমার জীবনেই কিন্তু হুবহু তাই ঘটে গেল মামা!'

এই বলে আর একবার থামল ভজু। বোধহয় দম নিতেই। তারপর আবার বলল, খুব চুপি চুপি—প্রায় ফিসফিস ক'রে, 'মিথ্যেই হোক আর যাই হোক—আজ এমন একটা প্রতিষ্ঠা এসে গেছে যে, এখন আর এতগুলো লোকের শ্রদ্ধার আসন থেকে নেমে যাবার সাহস নেই। তা ছাড়া কী জানেন, ঐ প্রশ্নটা ইদানীং আমার মনেও জেগেছে যে, অভিনয়েই যদি এই প্রতিষ্ঠা এই সম্মান এই অর্থ—তো সত্যিসত্যি ভগবানকে ডাকলে তাঁর সাধনা করলে না জানি আরও কী অকল্পিত ঐশ্বর্য পাব। আমি, আমি—শুনলে হাসবেন হয়ত—এবার সত্যিকারের সাধনার পথেই যাত্রা করব।'

এই বলে সে নিজেই হাসল একটু।

তারপর কেমন যেন অপ্রতিভ ভাবে বলল, 'আমার কিছু গোপন সঞ্চয় আছে মামা, সেটা আপনাকেই দিয়ে যাব। ওকে একটু দেখবেন, নিয়মিত মাসিক সাহায্য করবেন। তবে একসঙ্গে টাকাটা ওর হাতে দেবেন না, পাঁচজনে হয়ত ভোগা দিয়ে নিয়ে নেবে।'

'তা তোমার কাছেই রাখো না ভজু, তুমিই দিও মাসে মাসে, যেমন দরকার। আমাকে আর এর মধ্যে খামকা জড়াচ্ছ কেন?' একটু ব্যাকুল ভাবেই বলে উঠি, 'টাকা-পয়সা—বিশেষতঃ পরের টাকা—ওর মধ্যে জড়ানোর বহু ঝামেলা।'

'আপনাকেই এটুকু করতে হবে, মামা।' একটু যেন অনুনয়ের সুরেই বলে ভজু, 'আমার মা-ভাইদের তো জানেন, তারা ওকে দু চোখে দেখতে পারে না। পারা হয়ত স্বাভাবিকও নয়, কিন্তু সে যাই হোক, ওকে মাসে মাসে অতগুলো টাকা দিতে দেখলে দম ফেটে মরবে—শেষ পর্যন্ত লোভের জন্যে যত না হোক, বিদ্বেষেই টাকাটা দেওয়া বন্ধ করবে। এক আমিই দিতে পারি—কিন্তু আমার কাছ থেকে সোজাসুজি নিতে ওর অভিমানে লাগবে। আজই তো দিতে চেয়েছিলুম, রাগ ক'রে কেঁদে চলে গেল। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া—?'

একটু সলজ্জ হাসি হেসে ভজু বলল, 'তা ছাড়া আমি আর এদিকে থাকব না। দীর্ঘকাল—হয়তো আর কখনই আমার দেখা পাবেন না। এবার মনে করছি সত্যিকার সন্ন্যাস নেবারই চেষ্টা করব। ছোটখাটো জিনিস তো অনেক পেলাম দু হাত ভরে—এবার একটু বড় জিনিস পাবার ইচ্ছে হয়েছে।'

চাঁদমালা

মণিবাবুর মৃত্যুতে তাঁর ছাত্রের দল এবং সহকর্মী অধ্যাপকরা, সকলেই একটু বিশেষ শোকাভিভূত হলেন। তার কারণও ছিল। কারণ—মণিবাবু ঠিক সাধারণ অধ্যক্ষ ছিলেন না—আরও পাঁচটা কলেজে যেমন অধ্যক্ষরা হন, কারুর কাছে প্রিয়, কারুর কাছে অবজ্ঞেয়—তা-ও ছিলেন না। তাঁর ছাত্র এবং সহকর্মীরা তাঁকে একটা বিশেষ সম্ভ্রম ও প্রীতির চোখে দেখতেন। আর তার যথেষ্ট কারণও ছিল।

শুধু জীবিত কালেই যে তিনি অসাধারণ ছিলেন, তাই নয়—মৃত্যুটাও তাঁর যেন জীবনের মতোই একটু বিশিষ্ট, একটু পৃথক। সেটা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে

বেশ যেন মানানসই। কলেজ আর কাজ—এ ছাড়া জীবনে তিনি কোন দিকে তাকান নি কোন দিন। সেই কলেজেই কাজ করতে করতে অকস্মাৎ নিজের টেবিলের উপর এলিয়ে পড়লেন, একটা অস্ফুট শব্দ মাত্র উঠল, 'উঃ'—তার পরই স্থির হয়ে গেলেন। তাঁর দক্ষিণ হাতটি প্রসারিত হয়ে ছিল একটা কাগজ-চাপা কাচের দিকে, মধ্যপথে সেটি থেমে পড়ে গেল—পড়ে গেল রামকৃষ্ণের একখানা বাঁধানো ছবির নিচেই। যেন ছবিতে ঠেকেই থামল সেটা।

তাঁর সঙ্গে সহকারী-অধ্যক্ষ পুলিনবাবু বসে কথা কইছিলেন—তিনি ব্যস্ত হয়ে মাথায় জল দিতে লাগলেন, চেঁচামেচিতে অপর লোকজন ছুটে এল—ডাক্তারও একজন হাজির ছিলেন কলেজেই—কিন্তু দেখা গেল যে এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই! মণিবাবু বহু পূর্বেই এখানকার কাজ মিটিয়ে বিদায় নিয়েছেন। যে ধরনের মৃত্যু তাঁর মতো মানুষ মাত্রেরই কাম্য—বীরের মৃত্যু—সেই মৃত্যুই তাঁর ঠাকুর তাঁকে দিয়েছেন।

কথাটা ছাত্রদের কাছে তিনি বারবারই বলতেন, 'সেকালটা ছিল বীরত্বের যুগ, সিভ্যালরির যুগ। সেকালে সবাই চাইত রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু—যেন যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ যায়। একালে সে সব কিছুই নেই। লড়াই হয়, তাও নিরস্ত্র অসহায় লোক মেরে। সুতরাং একালে বীরের মৃত্যু হ'ল কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে করতে মৃত্যু। ঠাকুরের কাছে কোন দিনই কিছু চাই নি, কিন্তু যদি চাইতে হয় তো এইটিই চাইব—যেন ভুগে আর ভুগিয়ে না মরি।'

তাঁর এই একটি অপ্রার্থিত প্রার্থনা বোধ করি তাঁর ঠাকুরের কাছে যথাসময়েই পৌঁছেছিল। নইলে যাঁর ষাট বছর বয়সে রিটায়ার করবার কথা—কলেজের গভার্নিং বডি বলতে গেলে হাতে-পায়ে ধরে দু বছরের জন্যে একসটেনশ্যান নিতে তাঁকে রাজী করবেন কেন?···সে সময়ও তো আর মাত্র তিন মাস পরে শেষ হয়ে যেত! বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীর দল বিপুল চাঁদা তুলে তো তৈরীই হচ্ছিল তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে, সে সুযোগও তাদের দিলেন না তিনি।

অবশ্য—এই মৃত্যু না হলে তিনি বিপন্নও হতেন বৈকি!

মণিবাবু অকৃতদার ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে একটা বাড়িতে একা বাস

করেছেন। কেন তিনি বিবাহ করেন নি, তা কেউ জানেন না। তাঁর মার মৃত্যু হয় শৈশবে, বাবাই তাঁকে মানুষ করেছিলেন—একাধারে মা ও বাবা ছিলেন তিনিই। ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলতেন যে ওঁর বাবা বৃদ্ধ বয়সে বড় বেশী খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছিলেন—পাছে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর বনিবনা না হয় এবং শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বাপকে ছেড়ে চলে যেতে হয়—এই ভয়েই মণিবাবু প্রথমটা বিবাহ করেন নি। ভেবেছিলেন বাবা মারা গেলেই তিনি বিবাহ করবেন। সে ঘটনাটা ঘটতে এত দীর্ঘ কাল সময় নেবে, হয়ত তা তিনি ভাবেন নি। সে ভদ্রলোক ছিয়াশি বছর পর্যন্ত বেঁচে ওঁর সব পরিকল্পনা গোলমাল করে দিয়ে গেলেন। কেন না, তখন মণিবাবুরও চল্লিশ পেরিয়েছে। বেলুড় মঠে দীক্ষা নিয়েছেন তিনি—পূজা-পাঠে মন দিয়েছেন। আর তখন নতুন ক'রে গহনা-শাড়ি-সর্বস্ব একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরিচয় করবার কথা ভাবতে পারলেন না। বাবা মরবার পর ঠাকুরঘরে রামকৃষ্ণের ছবির পাশে বাবারও একটি ছবি বসিয়ে প্রত্যহ পূজা এবং আরতি করতে শুরু করলেন। বিবাহ করা আর হয়ে উঠল না।

শুধু তাই নয়। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অবস্থাপন্ন অকৃতদার আত্মীয়ের ভার নেবার মতো বহু স্ত্রালোক ছিল, তাঁরা আত্মীয়তা করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বৃদ্ধের ক্ষুরধার রসনার ভয়ে এত কাল এ দিকে তাঁরা ঘেঁযেন নি! কিন্তু মণিবাবু বেশ একটু রূঢ় ভাবেই তাদের অযাচিত আত্মীয়তা প্রত্যাখ্যান করলেন। বাবাকে যারা ভাল চোখে দেখে নি—তাদের তিনিও ভাল চোখে দেখতে রাজী নন। একটি ঠিকে বুড়ী ঝি এসে দু'বেলা কাজকর্ম ক'রে দিয়ে যেত। অত বড় বাড়িটায় তিনি সম্পূর্ণ একাই বাস করতেন। নিজে রেঁধে খেতেন—অর্ধেক দিন ওটা যে হয়ে উঠত না, তা বলাই বাহুল্য—ফল আর সন্দেশের ওপর দিয়ে সে ব্যাপারটা সারতে হত। রান্না করলেও এক বেলার বেশী নয়—এবং সেটাতে এক ঘণ্টার বেশী সময় দিতেন না। বাকী সময়টা কাটত শুধু পড়াশুনো করে। বই আর বই—বাবার রেখে-যাওয়া টাকা এবং নিজের আয়—ক্রমশঃ ক্রমশঃ সবই প্রায় বইতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল—খালি বাড়ির ফাঁকা ঘরগুলি ভরে গিয়েছিল। বই, কলেজের কাজ এবং ছাত্র, এই নিয়েই তাঁর দিন-রাতের ফাঁকগুলি নিরন্ধ্র নিরবসরে পরিণত হয়েছিল।

আত্মীয়দের তিনি বাড়িতে ঢুকতে দিতেন না, কিন্তু ভাল—অর্থাৎ জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রদের প্রায়ই বাড়িতে নিয়ে যেতেন। কোন দিন তিনি তাদের চা-কফি ক'রে খাওয়াতেন, কোন দিন তারাই তৈরী করত। সন্দেশ এবং ফল তাদের জন্যেও সাজানো থাকত—তাদের পড়িয়ে, তাদের সঙ্গে গল্প করে নিঃসঙ্গতা দূর করতেন খানিকটা। ছোটখাটো অসুখে-বিসুখে তারাই এসে দেখাশুনো করত। এত কালের মধ্যে একবারই মাত্র বড় অসুখ করেছিল, টেলিফোন ক'রে নার্স আনিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সের কথা কেউ কেউ স্মরণ করিয়ে যে দিত না, তা নয়—তিনি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে জবাব দিতেন, 'ঠাকুর আছেন, সে ভাবনা তিনিই ভাববেন।'

সে বিশ্বাস তাঁর বৃথা হয় নি—ঠাকুরই ভাবলেন শেষ পর্যন্ত।

মণিবাবু এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। এম. এ. পাস ক'রে নিজের কলেজেই এলেন লেকচারার হয়ে। প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পাস করে-ছিলেন। অন্য অনেক ভাল কাজ পেতে পারতেন—কিন্তু তিনি গেলেন না। পরে যখন অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট নাম হ'ল, তখনও অন্যান্য কলেজ থেকে বিস্তর লোভনীয় প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হন নি। নিজের এই কলেজটির ওপর অদ্ভুত মায়া ছিল তাঁর। অবশ্য কলেজও তাঁর এই স্বার্থত্যাগ ভোলে নি—শেষ পর্যন্ত তাঁকে অধ্যক্ষ ক'রে দিয়ে কথঞ্চিৎ ঋণ শোধ করেছিল।

মণিবাবুর ব্যক্তিগত জীবন যতই বিচিত্র হোক—বাইরের ব্যবহারিক জীবন খুব সাধারণ ছিল। গম্ভীর হ'লেও মিষ্টভাষী লোক ছিলেন। ছাত্রদের, বিশেষতঃ যারা সত্যিই লেখাপড়া শিখতে চায়—তাদের তিনি ছিলেন একাধারে বন্ধু, আত্মীয় শিক্ষক। তাদের যত কিছু অভাব-অভিযোগের তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল শ্রোতা। কর্মচারী ও সহকর্মীদের সম্বন্ধেও তাঁর বিবেচনার অন্ত ছিল না।

কেবল একটি বিষয়ে তিনি সত্যিই একটু অসাধারণ ছিলেন। মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি বড় বেশী হুঁশিয়ার ছিলেন। প্রাণপণে চিরকাল তাদের এড়িয়ে চলতেন। কখনও কোন দিন কেউ তাঁকে মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে দেখে নি।

তিনি যখন ক্লাস নিতেন, তখনও ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে পড়াতেন না কোন সময়। কোন দিন কোন মেয়েকে তিনি পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি, অথচ ছাত্রদের হামেশাই করতেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে বা কলেজের লন-এ কোন ছাত্রী নমস্কার করলে, হাতটা কপালে ঠেকিয়ে প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গী মাত্র ক'রেই দ্রুত চলে যেতেন সেখান থেকে। তবু সেই অত্যল্পকালের মধ্যেই তাঁর সুগৌর ললাটে যেন কে আবির মাখিয়ে দিত—এত লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করতেন তিনি।

অধ্যক্ষ হবার সময়ও এই জন্যেই তাঁর আপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর এক প্রবীণ অধ্যাপক এক রকম 'আদেশ' না করলে তিনি এ পদ হয়ত কিছুতেই নিতেন না। তাও যতটা সম্ভব ছাত্রীদের 'স্লিপ' তিনি সহকারী অধ্যক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। দৈবাৎ কোন ছাত্রী তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে কোন আবেদন জানালে কথার উত্তর দিতেন ঠিকই, কিন্তু তার মুখের দিকে তাকাতেন না। ··তাঁর সহকর্মীরা আড়ালে বলত, 'প্রতিক্রিয়া'। অপেক্ষাকৃত প্রবীণরা বলতেন, 'অভ্যাস। আত্মরক্ষার জন্যেই একদা ওটা প্রয়োজন হয়েছিল, এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।···নইলে যে রূপ ওঁর ছিল, প্রথম বয়সে মেয়েদের হাত থেকে বাঁচা কঠিন হ'ত!'

এ-হেন মণিবাবুর মৃত্যুর পর এ কী দেখা গেল!

তখন অবশ্য মাসখানেক কেটে গেছে। কর্তৃপক্ষ নূতন অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছেন। তিনি এসে কাজে যোগও দিয়েছেন, কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই—তাঁকে কার্যভার বুঝিয়ে দেবে কে? অগত্যা তিনি নিজেই বুঝে নেবার চেষ্টা করলেন। সহকারী-অধ্যক্ষ এবং কেরাণী একজনকে ডেকে একে একে অধ্যক্ষের ডেস্কের টানাগুলো, আলমারী ও লোহার সিন্দুকের কাগজপত্র, টাকাকড়ি দেখে-শুনে তালিকা ক'রে নিলেন। মণিবাবু খুব নিয়মানুগ মানুষ ছিলেন, কাগজপত্র সব ঠিকঠাকই ছিল, কিছুই বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। কিন্তু দেখা গেল, আলমারী ও সিন্দুকে বহু দিনের এমন বহু জিনিস জমে আছে, যা আর তুলে রাখবার কোন দরকার নেই। মণিবাবুর আগে যাঁরা অধ্যক্ষ ছিলেন—তাঁদের আমল থেকে জমে আছে কিছু কিছু—মণিবাবুর নিজের

আমলেও জমেছে। তিনদিন ধরে ওঁরা বসে বসে সেগুলো দেখে দেখে কতক বাতিল করলেন, কতক গুছিয়ে আবার তুলে রাখলেন।

পরে আলমারী শেষ ক'রে সিন্দুকে হাত দিলেন ওঁরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই। কারণ টাকাকড়ি, কোম্পানীর কাগজ, দলিল, ন্যাশানাল সেভিংস সার্টিফিকেট, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র—এ ছাড়া সেখানে কিছু থাকবার কথা নয়। কিছু ছিলও না—যদি না কাগজপত্রের অন্তরালে একেবারে এক কোণে রুমাল-মোড়া ঐ পদার্থটিকে 'বিশেষ কিছু' বলে আপনারা স্বীকার করেন।

সাংঘাতিক জিনিস যে!

একটি নকল ভেলভেটে মোড়া কেস-এ একজোড়া চকচকে নতুন সোনারদুল।

অব্যবহৃত—আনকোরা নতুন।

কী সর্বনাশ!

ঘরে তখন যে তিনজন উপস্থিত ছিলেন তাঁরা পাথরের মতো স্থির হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। নতুন অধ্যক্ষ যিনি এসেছেন তিনি বাইরের লোক—তবু এই ক'দিনে প্রাক্তন-অধ্যক্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন। সুতরাং তাঁরও কিছু বিস্ময়বোধ হতে পারে বৈকি!

তবু তিনিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, 'হয়ত মণিবাবুর আগে থাকতেই আছে এখানে। রাখালবাবু কিংবা বিজয়বাবুর আমলের জিনিস হয়ত—'

পুলিনবাবু অভিভূতের মতো ঘাড় নাড়লেন, 'উঁহু! এই রুমাল আমি চিনি! একেবারে ডজন দরে কিনতেন মণিবাবু, তা ছাড়া ধোপার এই মার্কাটাও আমার পরিচিত!'

আবারও কিছুক্ষণ সেই অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর অধ্যক্ষ বললেন, 'থাক ওটা এখানেই। পরে যদি কিছু হয় তো—নইলে না হয় ওঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

পুলিনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না। সে মিছিমিছি একটা স্ক্যাণ্ডাল। বরং কোন চ্যারিটিতে দিলেই চলবে।'

কথাটা চাপা রইল না। কলেজে আলোচনার ঝড় বয়ে গেল, একটা হাসাহাসি ঠাট্টা-বিদ্রূপ—নানা জল্পনা-কল্পনা। কী ক'রে ব্যাপারটি ছাত্র-ছাত্রী

মহলে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। মণিবাবুকে যাঁরা ভাল ক'রে চিনতেন তাঁরা একটু ব্যথিত হলেন। দেবতা সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এলে ভক্তের যেমন ব্যথা লাগে—তেমনিই। তাঁরা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন। ক্রমে ক্রমে চাপা পড়ে গেলও। দুল-জোড়াটা আবার তেমনি ভেলভেটের কেসে রুমাল-জড়ানো অবস্থায় কাগজপত্রের আড়ালে একটি বিস্মৃত কোণে পড়ে রইল। তার কথা নূতন অধ্যক্ষ বা পুলিনবাবু কারুরই মনে রইল না। শুধু দেখা গেল, ওর কথাটা ভোলেন নি কেরানী বাবুটি। বছরখানেক পরে তাঁর মেয়ের বিবাহের সময় অনেক আমতা আমতা করে কথাটা পেড়েই ফেললেন। তাঁরা তো চ্যারিটিতেই দিতে চেয়েছিলেন—কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে উপযুক্ত চ্যারিটির ক্ষেত্র আর কী হতে পারে?

অধ্যক্ষও কথাটার যাথার্থ্য বুঝে দুল-জোড়াটা বার ক'রে দিলেন। ভাগ্যিস, এর পরের অধ্যক্ষ এলে হয়ত বা তাঁকেই—ভাবতেও গায়ে ঘাম দেখা দেয়!

অর্থাৎ রহস্যটা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল।

এ রহস্য পরিষ্কার করতে পারত জগতে একটি মাত্র মানুষ। কিন্তু তার কথা কারুর মনে আসে নি, আসা সম্ভব নয়। তার কাছেও এ কাহিনী পৌঁছয় নি নিশ্চয়। এমন কি সুদূর এলাহাবাদে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে, তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছ' পয়েন্ট টাইপে ছাপা মণিবাবুর মৃত্যুর সংবাদটাও তার চোখে পড়েছিল কি না সন্দেহ!

সে মানুষটি হল নন্দিতা।

অনেক দিন আগে এই কলেজেরই ছাত্রী ছিল সে। মণিবাবু অধ্যক্ষ হওয়ার সামান্য কিছু দিন পরেই সে ভর্তি হয় এখানে।

তখন মণিবাবুই ছিলেন এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সবচেয়ে আলোচনার বস্তু, বিশেষ ক'রে ছাত্রীদের কাছে। কারণ তাঁর অনন্যসাধারণ রূপে তখনও পুরোপুরি বার্ধক্যের কালিমা লাগে নি, তখনও তাঁর সে কান্তির কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে। এমন রূপবান, এমন বিদ্বান (অবস্থাপন্নও বটে) লোক বিবাহ করল না—এটা মেয়েদের অনেকের কাছেই অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হত। তাই জল্পনা-কল্পনা আলোচনার অন্ত ছিল না ওঁকে কেন্দ্র করে।

নন্দিতা ছিল ধনীকন্যা। আদরে আবদারে প্রতিপালিত, তাইতেই অভ্যস্ত। পরের ওপর খানিকটা জুলুম চালানো সে জন্মগত অধিকার বলেই মনে করে। স্বাস্থ্যবতী, প্রাণচঞ্চল মেয়ে, দুষ্টুমীতে ভরা চোখ দু'টি—সে চোখকে ম্লান হ'তে দিতে কারুরই ইচ্ছা করে না। সুতরাং কলেজে আসার কিছু দিন পরেই সে সমস্ত অধ্যাপকের স্নেহের এবং সহপাঠিনীদের ঈর্ষার পাত্রী হয়ে উঠল। কিছুটা নেতৃস্থানীয়াও।

মণিবাবুর কথা তো ওঠেই মধ্যে মধ্যে। হঠাৎ সেদিন নন্দিতা বলে বসল, 'ও, অমন সাধু পুরুষ আমি ঢের দেখেছি। এক দিনে জব্দ করে দিতে পারি ওঁকে। ফু!'

একমাত্র ওঁরই প্রশ্রয় সে পায় নি এখানে এসে। কিছু ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল বৈকি নন্দিতার।

মণিকা বিদ্রূপের সুরে বলল, 'সারা জীবন ধরে বড়লোক বাবার বাড়িতে মোসাহেবই দেখেছিস নন্দিতা, মানুষ বুঝি তোর চোখে পড়ে নি?'

রীতা বললে, 'এ বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।'

শোভা বললে, 'সবাইকে তোমাদের প্রজা বলে ভাব কেন নন্দিতা?'

আগুন হয়ে উঠল নন্দিতা। বললে, 'অত কারুর চ্যাটাং-চ্যাটাং কথার ধার ধারি না। কাজ ক'রে দেখিয়ে দেব। বাজী রাখছি।'

'কি বাজী রাখবি? আর কি-ই বা করবি?'

নন্দিতা চিরদিনই ঝোঁকের মাথায় কাজ ক'রে এসেছে। আজও সে বিশেষ কিছু না ভেবেই বললে, 'ঐ মণিবাবুর কাছ থেকে আমি একজোড়া কানের দুল আদায় করব—আজ থেকে এক মাসের মধ্যে। যদি না পারি তো তোদের সকলের সামনে নাকে খৎ দেব। যদি পারি তো তোরা দিবি। ছাখ্—রাজী?'

সকলেই তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। প্রথমত এত বড় একটা কৌতুক ও কৌতূহলের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ—মণিবাবুকে কে না চেনে। নন্দিতাটাই মরবে নাকে খৎ দিয়ে।

মণিকা বললে, 'আমি কিন্তু ছাড়ব না ভাই নন্দিতা। তখন যে ওজর করবে তা হবে না—'

'তেমন বাপের মেয়ে আমি নই। হারলে সে পরাজয় স্বীকার করবার মতো মরাল কারেজ আমার আছে!'

এরপর দিন-দুই নন্দিতা কিছুই করল না। বোধ হয় মতলবই আঁটল শুধু মনে মনে। অথবা এদের দৃষ্টিটা এড়াতে চাইল।

তারপর একদিন হঠাৎ দুপুর বেলা অধ্যক্ষের ঘরে ঢুকে পড়ল সে। ওর ঘরের বাইরে যে বেয়ারা থাকে সে একটা জরুরী কাজ নিয়ে গেছে কোথায়—সেই অবসরে পর্দা সরিয়ে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়ে নন্দিতা প্রশ্ন করল, 'আসব স্যার?'

কণ্ঠস্বরেই মণিবাবু লাল হয়ে উঠেছিলেন। সেদিকে না তাকিয়ে বেশ কঠিন কণ্ঠেই উত্তর দিলেন, 'কী চাই?'

'একটা প্রশ্ন করতে এসেছি স্যার—'

'আমি একটু ব্যস্ত আছি এখন।'

'বেশ, কখন আসব বলুন?'

'ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাও না—'

'না স্যার। আপনার কাছে ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে একটা।'

অগত্যা মুখ তুলতে হল। বিরক্তিতে মণিবাবুর ললাটে বিরাট একটি ভ্রূকুটি ঘনীভূত হয়েছে। তিনি ওপাশের দেওয়ালটার দিকে ফিরে বললেন, 'বেশ এখনই বলো কী বক্তব্য। কিন্তু খুব সংক্ষেপে।'

'আপনি তো বেলুড় মঠের শিষ্য। আচ্ছা ওঁদের আশ্রমে সন্ন্যাসিনী রাখার নিয়ম নেই কেন?'

আর যাই হোক্—এ প্রশ্নের জন্য ঠিক মণিবাবু প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি এবার ওর দিকে তাকালেন।

বিরক্ত কণ্ঠেই বললেন, 'এসব অবান্তর প্রশ্নের কী দরকার তা তো বুঝি না?'

'আপনি আমার বিদ্যায়তনের আচার্য। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্ত সংশয় নিরাকরণ করতে আপনি বাধ্য।...আমি যদি সন্ন্যাস নিতে চাই তো ওঁরা দেবেন না কেন?'

'কিন্তু তার জন্য তো অন্য ব্যবস্থা আছে—'

'অন্য ব্যবস্থায় যেতে যদি আমি না চাই? আমি যদি সেবার মধ্যে দিয়েই উপাসনা করতে চাই? সন্ন্যাসকে যদি আমি ওঁদের আদর্শেই কাজে লাগাতে চাই? ওঁদের আপত্তি কি?'

'সে ওঁরাই ভাল বলতে পারবেন। এ প্রশ্ন তো কখনও করি নি। তবে আমার মনে হয় সন্ন্যাসের এবং ওঁদের ব্রতের বিঘ্ন হবে বলেই ওঁরা এর ভেতর মহিলাদের আসতে দিতে চান না।'

"কিসের বিঘ্ন বলুন তো? সন্ন্যাসিনী মহিলারা থাকলেই যদি ওঁদের ব্রতের বিঘ্ন হয় তো বুঝতে হবে ওঁদের চরিত্র এবং মন দুই-ই ঠুনকো। ওঁরা তো গৃহী মেয়েছেলের সঙ্গে খুব স্বচ্ছন্দে মেশেন, তাতে যদি বিঘ্ন না হয় তো সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে মিশলে হবে?'

মণিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ-সব আলোচনার জায়গা কলেজ নয়। আমি এখানে এখানের কাজ করব বলেই বেতন পাই। তোমরাও বেতন দাও এখানের কাজ অর্থাৎ পড়াশুনোর জন্যে। তুমি এখন এসো।'

তিনি কলিংবেল টিপলেন।

এ অপমানের জন্যে নন্দিতা যেন প্রস্তুতই ছিল। সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না। বললে, 'বেশ, কলেজের বাইরেই হবে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা করাই রইল স্যার—'

এর দিন দুই পরেই কী কারণে একদিন কলেজ বন্ধ ছিল। বেলা তিনটের সময় বই রেখে উঠে মণিবাবু চায়ের জল চাপাবেন ভাবছেন, এমন সময় কড়া নড়ে উঠল। ছাত্ররা তাঁর বাড়ি আসে মধ্যে মধ্যে, তাদেরই কেউ এসেছে ভেবে মণিবাবু নিচে নেমে গিয়ে ছিটকিনিটা খুলে অভ্যাস-বশতঃ পিছিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু দেখা গেল, যে এসেছে সে সেদিনকার সেই 'জ্যাঠা-মেয়ে'টি—সে একেবারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে কপাট বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘাম মুছতে লাগল।

ততক্ষণে মণিবাবুও ঘেমে উঠেছেন। বিস্ময়ে তাঁর বাক্‌রোধ হবার উপক্রম।

'এ সব কী ব্যাপার? মানে এখানে তো আমি।—'

'সেদিনও কথাটা শেষ হয় নি তাই। তা ছাড়া আমার কিছু অন্য জিজ্ঞাস্যও আছে।'

সর্বনাশ! এ পাপ এখনই বিদায় করা প্রয়োজন। ভদ্রতার অবসর নেই। তিনি একটু রূঢ় ভাবেই বলে উঠলেন, 'কিন্তু এখানে কেন?'

'কলেজে বলবেন সেখানে নয়, বাড়িতে বলবেন এখানে নয়—তা হ'লে কোথায় যাবো বলুন? আমার নৈতিক জ্ঞান বিকাশের দায়িত্বও কি কতক আপনার নেই?'

'আমি—কিন্তু আমি বাড়িতে কোন মহিলাকে ঢুকতে দিই না। আমার নিকট-আত্মীয়াকেও না।' মরীয়া হয়েই বলে ওঠেন মণিবাবু।

'কেন, চরিত্র নষ্ট হবে বলে? আপনার তো ঢের বয়স হয়েছে। তা ছাড়া এতকাল কঠিন ব্রহ্মচর্য পালন করছেন, ঠাকুরকে ডাকছেন—এতটুকু মনের জোর হয়নি? মোদ্দা, আমার যা বক্তব্য তা আপনাকে শুনতেই হবে। পুলিস না ডেকে আমাকে তাড়াতে পারবেন না।'

রাগে মণিবাবুর মুখ-চোখ অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি কিছুটা হত-ভম্বও হয়ে পড়েছিলেন। কী করবেন, কী বলবেন—ভেবে পেলেন না।

তখন নন্দিতাই একটু মিষ্টি হেসে বললে, 'ভয় নেই, বেশীক্ষণ বসব না। সত্যিই মনটা আমার কিছু দিন থেকে বড় অশান্ত হয়েছে। সন্ন্যাস যদি নিতে না-ই পারি, কী ভাবে ঘরে থেকেই মনে জোর আনা যায়, নিজেকে বাঁচিয়ে সেবাব্রতে মন দেওয়া যায়, সেই সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা ক'রে চলে যাবো। চলুন, ওপরে চলুন।'

স্তম্ভিত হতবাক মণিবাবু সত্যিই সরে ওকে পথ দিলেন—এবং ওরই পিছু-পিছু ওপরের ঘরে এসে পৌছলেন।

ঘরে ঢুকে কিন্তু নন্দিতা বসল না। হাতের ছোট্ট ঘড়িটার দিকে চেয়ে বলল, 'সাড়ে তিনটে বাজে। এই তো আপনার চা খাবার সময়, না? আমি ছেলেদের মুখে সব শুনেছি। ঐ বারান্দার কোণে আপনার হিটার আর চায়ের সরঞ্জাম থাকে। আপনি বসুন, আমি চা ক'রে এনে দিচ্ছি। ভয় নেই, আমি ভাল ক'রে হাত-পা ধুয়ে পরিষ্কার করেই ক'রে আনব।'

এই বলে—আর উত্তরের অবকাশ মাত্র না দিয়ে নন্দিতা ওধারে চলে গেল।

মণিবাবু আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, উপযুক্ত ভাষার অভাবে চুপ ক'রে গেলেন। অগত্যা তিনি পাখাটা খুলে দিয়ে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। এমন বিপদে জীবনে পড়েন নি। রাগে বিরক্তিতে—একটা কেমন যেন যন্ত্রণাই অনুভব করছিলেন তিনি। মনে মনে ইতিমধ্যেই বহুবার প্রতিজ্ঞা করলেন, চাকরি ছেড়ে দেবেন এবং বাড়িতে দারোয়ান বসাবেন।

কিন্তু সে তো পরের কথা। মেয়েটা এতক্ষণ কী করছে? কই কাপটাপ নাড়ারও তো শব্দ পাচ্ছেন না। মীটসেফের মধ্যে দুধ আছে, খুঁজে পাচ্ছে না হয়ত।

খানিক পরে মণিবাবু আর বসে থাকতে পারলেন না। উঠে বারান্দা দিয়ে এধারে এলেন।

জলটা হিটারে ফুটছে, কিন্তু নন্দিতা সেখানে নেই···সামনেই ঠাকুর ঘর, কেমন ক'রে সে যেন তা অনুমান ক'রে দরজা খুলে কখন ভেতরে ঢুকেছে। মণিবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, রামকৃষ্ণের ছবির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করছে সে।

অনেকক্ষণ মণিবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। নন্দিতা কিন্তু উঠল না, নড়লও না। তার সেই ভক্তিতদ্‌গত একান্ত আত্মনিবেদনের ভঙ্গীটি ভারী ভাল লাগল মণিবাবুর। তিনি নিঃশব্দে সরে আবার নিজের জায়গায় এসে বসলেন। এই ধরনের অল্পবয়সী মেয়ের ঠিক এতটা ভক্তি আশা করেন নি তিনি। নিজের অজ্ঞাতেই যেন অনেকখানি কোমল হয়ে পড়লেন।

আরও অনেকটা পরে কাপডিসের শব্দ হ'ল। তার খানিক পরে দু পেয়ালা চা এবং ওঁর জন্যে দুখানি পাৎলা টোস্ট তৈরী ক'রে এনে সামনে রাখল সে। তখনও তার চোখের পাতা দুটি যেন ভিজে-ভিজে। মুখের ভাবে তখনও সেই তন্ময়তার রেশ।

মণিবাবু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'তুমি টোস্ট নিলে না?'

ঈষৎ লজ্জিত ভাবে হেসে নন্দিতা বললে, 'অনেক বেলায় খেয়েছি, এখন আর কিছু খাবো না।'

সে টোস্টের ডিশটা ওঁর দিকে ঠেলে দিয়ে অনিমন্ত্রিত ভাবেই একটা চায়ের কাপ নিজের দিকে টেনে নিলে। ওর এই সহজ ব্যবহারটুকুও মণিবাবুর

খুব ভাল লাগল।

চা খাওয়া শেষ হলে নন্দিতা খালি কাপ-ডিশগুলো জড় ক'রে উঠে দাঁড়াল। এবার মণিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওগুলো ঐখানে নামিয়ে রাখো। একটু পরেই ঝি আসবে।'

'না না। ছেলেরা রেখে দেয় সে আলাদা কথা। আমি রেখে দেব ঝিয়ের জন্যে? এগুলো ধুয়ে রাখতে কি-ই বা সময় লাগবে?'

সে আর প্রত্যুত্তরের অবকাশ না দিয়েই সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল—এবং মণিবাবু ঘরের মধ্যে বসেই লক্ষ্য করলেন,—সযত্নে ধুয়ে-মুছে কাবার্ডে সাজিয়ে রাখল।

তারপর ফিরে এসে ওঁর সামনাসামনি একখানা বেতের চেয়ারে শান্তভাবে বসে পড়ে বললে, 'আপনি ঠাকুরের কথা কিছু বলুন। আমার মনটা যাতে একটু শান্ত হয়।'

মণিবাবু কোমল কণ্ঠেই বললেন, 'কিন্তু তুমি সন্ন্যাস নেবার জন্যেই বা এত ব্যস্ত কেন?'

'ওটা আর কিছু নয়। অনেক সময় গেরুয়াটা বর্মের কাজ করে। আত্মরক্ষার জন্যই ওটা প্রয়োজন। আসলে আমি সেবাই করতে চাই মানুষের।'

এরপর আলাপ জমে উঠতে বিলম্ব হল না।

মণিবাবুর প্রিয় বিষয়বস্তু রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দর বাণী, তাঁদের মিশন, মানুষের নানা দুর্বলতা—কেমন ক'রে সে তার নিজের সর্বনাশ ডেকে আনচে—ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা সরে প্রায় ছটার কাছে এসে পৌছল।

হঠাৎ খেয়াল হ'ল ঝি আসতে। নন্দিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ইস্, আপনার অনেক সময় নষ্ট করলুম। আমাকে ক্ষমা করুন। যদি অভয় দেন তো আর একদিন এসে দু'-একটা প্রশ্নের উত্তর জেনে নেব।'

বলতে বলতে যতই মেতে উঠে থাকুন মণিবাবু—এটা তাঁর চোখ এড়ায় নি যে নন্দিতা সত্যিই সমস্ত কথা একান্ত মনোযোগে শুনে যাচ্ছে এবং মাঝেমাঝে দু-একটি যা প্রশ্ন করছে তাতে বোঝা যায় যে সে ওঁর কথাগুলো বুঝছেও খানিকটা।

সুতরাং ওর ওপর প্রসন্ন হবারই কথা। মণিবাবুও খুশি হলেন। ওর সঙ্গে সঙ্গে নিচে অবধি নেমে এসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তোমাকে আমি বরং দু-তিনটি বই দেব, সেগুলো পড়ে দেখো, অনেকটা বুঝতে পারবে।'

'কবে দেবেন?' সাগ্রহে প্রশ্ন করে নন্দিতা।

'কাল বরং কলেজে দেখা করো। ওখানেই নিয়ে গিয়ে রাখব।'

নন্দিতা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে তার অভিনয়ে কোথাও কোন খুঁত রাখবে না। তাই বইগুলো পাবার তিনদিন পরে আবার যখন সে মণিবাবুর বাড়ি গেল; তখন শুধু যে তার সেই বইগুলো আদ্যোপান্ত পড়া হয়েছে তাই নয় সে সম্বন্ধে যা-যা প্রশ্ন উঠতে পারে, তাও তৈরী হয়ে গেছে।

এতখানি আন্তরিকতা ও মনোযোগ মণিবাবু ঐটুকু মেয়ের কাছে আশা করেন নি। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। সেদিনও চা ক'রে খাওয়াল নন্দিতা। শুধু তাই নয়, ওঁর আসবার আগে এক রকম জোর ক'রেই, ওঁর রাত্রের খাবার তৈরী ক'রে রেখে এল। দীর্ঘকাল পরে মণিবাবু রাত্রে টাটকা খাবার খেলেন।

আরও কিছু কিছু বই তিনি দিলেন। আরও কিছু আলোচনা চলল। চলল কয়েকদিন আসা-যাওয়া। তারপর একদিন নন্দিতা ওঁকে প্রণাম ক'রে বলল, 'আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি স্যার! কলেজ ছেড়ে দেব। আর বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

চমকে উঠলেন মণিবাবু। কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন একটা অহেতুক বেদনাবোধও করলেন।

'সে কি! কেন?' আড়ষ্ট ভাবে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'এসব ভাল লাগছে না তা তো আপনি জানেন-ই। আমি কাজে মন দেব। তার আগে কিছুদিন সাধনা করব, মন যাতে তৈরী হয়।'

মণিবাবু চুপ ক'রেই রইলেন। কি-ই বা বলবেন!

অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'সংসার বড় কঠিন জায়গা নন্দিতা, আত্মরক্ষা করতে পারবে তো?'

'চেষ্টা করব।' তারপর একটু থেমে, একটু অপ্রতিভের হাসি হেসে

বললে, 'একটা কথা ছিল স্যার!'

'বলো বলো। নিঃসঙ্কোচে বলো।'

'আমাকে একটা কিছু উপহার দেবেন আপনি? যা আমি দিন রাত কাছে রাখতে পারব। যা বিপদে আমাকে দৈব-কবচের মতোই রক্ষা করবে। সেটা দেখলেই মনে পড়বে আপনার কথা—আর তাহ'লেই সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে পারব।'

ওর কেমন একটা করুণ বলবার ভঙ্গীতে মণিবাবুর চোখে জল এসে গেল। তিনি যেন একটু ব্যাকুল ভাবেই বললেন, 'কিন্তু সে-রকম কী জিনিস? পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ-ট্যাগ—? বা ঐরকম কিছু?'

'ওসব আর কী হবে স্যার! যা সর্বদা সঙ্গে থাকবে, গায়ে লেগে থাকবে এমন কোন জিনিস—'

'কী বলো, আংটি?'

'না আংটি পরতে আমার ভাল লাগে না। আপনি আমাকে একজোড়া কানের দুল দিন।'

'দুল! কিন্তু সে তো আমি—। তুমি বরং একটা কিনে নিও, আমি দাম দিচ্ছি।'

'না, না। সে আমার চাই না! আপনি নিজে হাতে ক'রে দেবেন।'

'তাই তো!' মণিবাবু বিপন্ন মুখে ওপাশের বুদ্ধদেবের মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'বেশ. চলো তুমি পছন্দ ক'রে কিনে নেবে। আমি তো ওর কিছুই জানি না।'

'পছন্দ টছন্দ আমি কিছু করব না। আপনার যেটা মনে হয় আমাকে মানাবে, আপনি সেইটেই কিনবেন। তবে কম দামের অতি সাধারণ একটা কিছু—। আপনি যা দেবেন তাই আমার ভাল লাগবে। আমার জীবনের চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে তা।'

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ভাবলেন মণিবাবু। তারপর বললেন, 'বেশ, আমি কাল এনে রাখব। তুমি কলেজ থেকে নিয়ে নিও। কেমন?'

নন্দিতা আবারও একটা প্রণাম করে বেরিয়ে এল।

মণিবাবু পরের দিনই ফুল কিনলেন। কলেজে নিয়েও এলেন রুমালে মুড়ে সযত্নে। কিন্তু নন্দিতা সেদিন এল না। তার পরের দিনও না। মণিবাবু চিন্তিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। খবর একটা নেওয়া দরকার কিন্তু তিনি সঙ্কোচে কিছুতেই সে কথাটা কাউকে বলতে পারলেন না। ঠিকানাটা জানতে গেলেও কেরানীকে জিজ্ঞাসা করতে হয়।

বাড়ি ফিরে দেখলেন একখানি খামের চিঠি পড়ে আছে তাঁর নামে। মেয়েলি হাতের লেখা। সেখানা দেখে, কে জানে কেন, হঠাৎ ওঁর একটা দুর্বলতা-বোধ হ'ল। সেই সঙ্গে একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা।...বক্ষস্পন্দন অকারণেই যেন বেড়ে গেল একটু। নিজের মনোভাবে নিজেই চমকে উঠলেন —প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। চিঠিখানা তখনই খুললেন না। মুখ হাত ধুয়ে চা তৈরী ক'রে এনে ধীরে-সুস্থে খামখানা খুললেন—

তাঁর অনুমানই ঠিক। নন্দিতারই চিঠি। দীর্ঘ চিঠি।

সমস্ত ইতিহাসটাই দিয়েছে সে। বাজী রাখা, তার অভিনয়,—সব কথাই খুলে লিখেছে। তারপর লিখেছে, 'বাজী জিতেছি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে হেরেও বসে আছি। এত দিনের নিভৃত সাহচর্যে আপনার যে পরিচয়টি আমি পেয়েছি, তারপর আর কোনমতে আপনাকে ছোট দেখতে পারব না। বরং আমি সকলের কাছে নাকেখৎই দেব—তবু আপনাকে নিয়ে সকলে হাসাহাসি করবে, এ আমি সইতে পারব না। একটা কথা ঠিকই বলে এসেছি সেদিন, ও কলেজে আর আমি যাবো না। আর হয়ত পড়বও না। পারি তো আপনার কাছ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছি, সাংসারিক জীবনে সেই শিক্ষাই কাজে লাগাব। অন্ততঃ এখন থেকে তারই সাধনা করব। যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার পক্ষে সবই সম্ভব—তাই ভরসা করছি, এর পরেও হয়ত আপনার ক্ষমা পাবো। আমার শত কোটি প্রণাম নেবেন।'

সেদিন সে চিঠি পড়তে পড়তে বহু কাল পরে মণিবাবুর দুই চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে জল ভরে এসেছিল। এত ব্যথা, নাম না জানা অকারণ এতখানি বেদনা আর বোধ হয় জীবনে তিনি কোন দিন পান নি।

কিন্তু সে-ও বহুকালের কথা। সে বেদনা বোধ করি ভুলেই গিয়েছিলেন মণিবাবু, সেই সঙ্গে লোহার সিন্দুকে রাখা তুল জোড়াটার অস্তিত্বও—

হঠাৎ আর একটা রূঢ় আঘাতে সেদিন আবার সব কথাগুলোই মনে পড়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর দিন, মৃত্যুর অল্প কিছুক্ষণ আগেই।

উত্তর প্রদেশের একখানা কি কাগজ এসেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে ওলটাতে-ওলটাতে চোখে পড়েছিল একটা খবর,—'শ্রীমতী নন্দিতা মজুমদার তাঁর এক মাত্র পুত্র মণিভূষণের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে (যার শোচনীয় অকালমৃত্যুর সংবাদ আমরা গত সপ্তাহেই দিয়েছি) এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মণিভূষণ স্মৃতি-বক্তৃতা-মালা'র ব্যবস্থা করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হবে—যিনি দেবেন, তিনি পাঁচ শত টাকা ক'রে সম্মান অর্থ পাবেন। শ্রীমতী মজুমদার এই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে এককালীন—' ইত্যাদি।

সে দিনও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন মণিবাবু। খবরটা পড়বার পর আজও অনেক দিন পরে তাঁর চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছিল।

পুলিনবাবু এসে যখন কথা কইছেন তখনও তাঁর মন করছিল স্মৃতির রোমন্থন। তুলটার কথাও মনে পড়েছিল তাঁর সেই সময়ে। ওটা সরাতে হবে। যদি আর কারুর হাতে পড়ে?···পাঠিয়ে দেবেন নাকি নন্দিতাকেই? ··ঠিকানা?···সেটা যোগাড় করা এমন আর কঠিন কি?

বুকটায় যেন কেমন ব্যথা করছে। বড় গরমও পড়েছে আজ।

এমনি ব্যথা, এমনি নাম-না-জানা একটা বেদনা সেদিনও যেন তিনি অনুভব করেছিলেন, সেই চিঠিখানা পাবার দিনও। কিন্তু ··সে তো—সে তো বহু দিনের কথা। সে সব কেমন যেন ঝাপ্‌সা একাকার হয়ে যাচ্ছে। শুধু এই ব্যাথাটা। কে জানে কেন আজও—। উঃ—

তার পরের কথা মণিবাবু আর জানেন না।

ব্রহ্মচর্য

উনিশ বছর বয়সের অনিন্দ্যকান্তি কর্পূর-গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী সর্বানন্দ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর গুরুদেবের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তাঁর গুরুদেব স্বামী কৈলাসানন্দ একটু আগে কথা বলেছেন, শিষ্যকে সম্বোধন ক'রেই বলেছেন, কিন্তু সেটা ঠিক প্রশ্ন নয়, সত্যটা অনুমান ক'রে নিয়ে অনুযোগ-তিরস্কারে মেশা ধিক্কার একটা। তবে সে বাক্য উচ্চারণের সময় কণ্ঠে প্রকাশ পেয়েছিল তিক্ততার সঙ্গে গভীর হতাশার একটা মর্মান্তিক বেদনা।

প্রশ্ন নয়, তবু মনে হ'ল কৈলাসানন্দ উত্তরেরই প্রতীক্ষা করছেন তাঁর প্রিয়তম সন্ন্যাসী শিষ্যর কাছ থেকে। সেই ভাবেই চেয়ে আছেন।

অনেকক্ষণ পরে সর্বানন্দ ঠিক উত্তর বা অনুযোগের কোন কৈফিয়ত না দিয়ে একটি প্রশ্নই করলেন, 'বাবা, অপরাধ ক্ষমা করবেন—আপনি কি আপনার এই সাধক জীবনে ব্রহ্মচর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন?'

আচম্বিতে কোন দৈহিক আঘাত লাগলে যেমন মুখে ও চোখে একটা প্রতিক্রিয়া হয়, তেমনিই হল কৈলাসানন্দর।

আর যাই হোক, এ প্রশ্নর জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এ প্রশ্ন যে উঠতে পারে, কেউ করতে পারে—বিশেষ তাঁর মানসপুত্র সর্বানন্দ—তা তিনি কল্পনাও করেন নি কখনও।

এ কি হ'ল—উনি যে আঘাত করতে চেয়েছিলেন, সে আঘাত কি তাঁর কাছেই ফিরে এল?

তিনি কিছুক্ষণ চতুর্দিকে—সর্বানন্দর মুখ ছাড়া—চেয়ে নিয়ে জড়িত কণ্ঠে থেমে থেমে প্রশ্ন করলেন, 'কেন—একথা কেন বলছ সর্বানন্দ? এই দেহটার প্রায় সত্তর বছর বয়স হ'তে চলল, এখন কি এ প্রশ্নের প্রয়োজন বা যৌক্তিকতা আছে?'

সর্বানন্দ তেমনিই স্থির ভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আবারও বলছি, আপনি আমার বহু ঔদ্ধত্য বাচালতা চিরদিন ক্ষমা ক'রে এসেছেন—সেই সাহসে বলছি, আমার কথার উত্তর এখনও পাই নি। কেন প্রশ্ন করছি

আপনার উত্তর পেলে বলব। আপনি মিথ্যা বলেন না শুনেছি, অন্তত আমার কাছে বলবেন না, এ ভরসা আমার আছে।'

চকিতে বহু কথা খেলে গেল মনে; ছায়াছবির মতো সরে সরে গেল নিমেষে। যুধিষ্ঠির বলেছেন মন বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী—আধুনিক বিজ্ঞান তিনি জানতেন না—মন বুঝি আলোকের চেয়েও দ্রুতগামী। গত দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস—ওঠা পড়া, সাধনা, সিদ্ধির জন্য জীবনপণ যুদ্ধ—এবং হৃদয় দৌর্বল্যের কাছে আত্মসমর্পণ—সবই যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খেলে গেল মনে।

কৈলাসানন্দ অবসন্ন দেহে সেইখানেই বসে পড়লেন, মন্দিরের মধ্যেই, বলতে গেলে সর্বানন্দর পদপ্রান্তে। সুবর্ণময় ব্রহ্মাণীমূর্তি তাঁর বামে, দক্ষিণে মুক্ত প্রশস্ত দ্বার—তার মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে—দূরের নাটমন্দিরে অপেক্ষমান বহু ভক্ত, কৌতূহলী হয়ে চেয়ে আছে। গুরুদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য—যাকে তিনি ভাবী গুরু এবং মঠাধীশ রূপে তৈরী করেছেন—সর্বানন্দর সঙ্গে কি জরুরী কথা বলবেন, সেই জন্য মন্দিরের অলিন্দেও কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন, কিছু-ক্ষণের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে ওখানে ওঠা।

এ মন্দির যখন হয় তখন একদা কথা-কীর্তন-পাঠ বা যজ্ঞাদির জন্য বৃহৎ মুক্ত নাটমন্দিরের প্রয়োজন হবে তা তো মনে হয় নি। তাই মন্দিরের চতুর্দিকে প্রশস্ত বারান্দার পর সিঁড়ি—সিঁড়িও চারিদিকে—এইভাবে তৈরী হয়েছিল। তাই এ নাটমন্দির এত দূরে করতে হয়েছে।

ওঁকে ঐভাবে বসে পড়তে দেখে সর্বানন্দর মুখ নিমেষে বেদনার্দ্র হ'ল, সেই সঙ্গে ঈষৎ অনুতাপের ছায়াও ফুটে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে। তিনিও বসে পড়ে গুরুর পায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'আমার খুব অপরাধ হয়ে গেল বাবা, আপনি এত আঘাত পাবেন তা বুঝতে পারি নি। আমার প্রশ্ন থাক, আপনি বিশ্রাম করুন।'

'না,' সবলে উনি শিষ্যের হাত ধরে ফেললেন, 'তোমাকে আমি পুত্রের মতোই দেখি, আত্মজ বা তার চেয়েও বেশী, আমার আত্মাকেই তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছি—এই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মাণী ও তোমার সামনে

আমি সত্য কথাই বলে যাবো। দেহও প্রায় তার শক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে—আরও, তোমার এই প্রশ্নের উত্তরটাই বোঝার মতো চেপে আছে কিছুদিন ধরেই, ভারী হয়ে উঠছে—এবার সে বোঝা নামাবারই সময় হয়েছে।'

এই বলে, যেন নিঃশ্বাস নেবার জন্যই কিছুক্ষণের জন্য নীরব হলেন, বললেন, 'আসলে নিদারুণ আশাভঙ্গেই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিলুম, আমি যা পারি নি তুমি তা পারবে—এই আশা করেছিলুম। দীর্ঘ বিশ বছর ধরেই তোমাকে লক্ষ্য ক'রে আসছি, প্রতি প্রভাতে—অন্তত গত পাঁচ বছর ধরে আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে তোমার চোখের দিকে চেয়েছি, দেখে নিশ্চিন্ত হই নি, ক্ষণেকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি মাত্র। এই মাত্র কিছুদিন আগে সে আশঙ্কা দূর হয়েছে, নিশ্চিন্ত, হ্যাঁ নিশ্চিন্তই হয়েছিলাম। সেই জন্যেই আঘাতটা এত তীব্র হয়েছিল···বলব, আজ সবই বলে যাবো, আমাকে একটু শুধু সময় দাও।'

'কিন্তু ওঁরা যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।'

'উঠুন, চিরদিনই ওদের কথা ভেবে চলতে হবে তা কে বলেছে। আমি চিরদিন আমার পথে চলেছি, নিন্দা স্তুতি অগ্রাহ্য ক'রে, তাতেই তো এত ভক্ত ও শিষ্য এখানে এসেছেন। আজ ওদের কথা শুনব কেন? তেমন বোঝ দ্বার বন্ধ ক'রে দাও সামনের।'

এই বলে তিনি নীরব হলেন। যোগাসনে বসার মতো ক'রেই বসে দুই চোখ নিমীলিত করলেন।

সর্বানন্দও নিঃশব্দে উঠে মন্দিরের দ্বারে বিলম্বিত পর্দাটা টেনে দর্শন বন্ধ করে দিলেন।

ওরা নানা অনুমানে পীড়িত হবে, তা হোক। এখন না শান্তিভঙ্গ করে গুরুদেবের।

সর্বানন্দর মনের মধ্যেও ঘটনাগুলো ছায়াছবির মতো সরে সরে যাচ্ছিল বইকি।

তিনিও পীড়িত বোধ করছেন।

অপরাধী? না, তিনি এই সত্যটাই জানতে চান। এটা কি অপরাধ?

ক্ষণেকের স্খলনে কি আজীবন সাধনা নষ্ট হয়? তবে পুরাণে ঋষিদের ব্রহ্মচর্য হানির এত কাহিনী লেখা হয়েছে কেন?

হ্যাঁ, গুরুদেব বার বার বলেছেন ঠিকই, অস্খলিত ব্রহ্মচর্য ছাড়া ব্রহ্ম-সামীপ্য সাযুজ্য লাভ হয় না।

তাঁর মত হ'ল একমাত্র যোগের দ্বারাই ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে মানুষ। আর সে যোগ, সে কঠোর একাগ্র তপস্যা ব্রহ্মচর্য ছাড়া সম্ভব হয় না। চৈতন্যদেব রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বরকে ভজনা করার সহজ পথ দেখিয়েছেন অনেকে বলে—কিন্তু সে সাধারণ লোকের জন্যে। তাঁরা নিজেরা সুকঠোর 'তপস্যা' করেছেন, তাঁদের ব্রহ্মচর্য কখনও নষ্ট হয় নি। গৃহীদের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করতে নিত্যানন্দ সংসার করেছিলেন—কিন্তু সে আদর্শ গৃহীদের জন্যেই, শোনা যায় নিত্যানন্দও সিদ্ধসাধক ছিলেন, মহাপ্রভু তাঁকে অগ্রজের মতো দেখতেন।

শুধু উপদেশ নয়—নিজে যোগসাধনার শিক্ষা দিয়েছেন গুরুদেব, প্রায় আবাল্য। শাস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন, তাও নিজেই। কোন শিক্ষকের ওপর ভরসা ছিল না তাঁর। এইসব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তপস্যার প্রথম পাঠও দিয়েছেন, একটু একটু ক'রে, সইয়ে সইয়ে। যে বয়সে যে শিক্ষার যতটুকু সম্ভব তা বুঝে, হিসেব ক'রে।

সর্বানন্দকে তিনি বলতেন মানসপুত্র। ওর গর্ভধারিণী যোগিন্দর কাউর তাঁর শিষ্যা, তারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই গুরু কৈলাসানন্দ। ওঁর পাঞ্জাবী ও রাজস্থানী শিষ্য অগণিত। তাদেরই প্রণামীতে এমন রাজসিক মন্দির বা আশ্রম নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। যোগিন্দরের সন্তান হয় নি সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত। তিনি এসে গুরুদেবের পায়ে মাথা কোটেন। গুরুদেব দয়া করলে অবশ্যই হবে। গুরুদেবের তপস্যা প্রভাবে কি না হতে পারে।

গুরুদেব কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে বসে থেকে বোধ করি, ইষ্ট চিন্তা ক'রে নিয়েই বলেছিলেন, তিনি চেষ্টা করবেন তাঁর যোগ প্রভাবে শিষ্যার গর্ভধারণের শক্তি আনার জন্য। তখনই কিন্তু শর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন, সন্তান হ'লে প্রথম সন্তানটি ওঁকে দিতে হবে।

'তাহলে আমার কি থাকবে?' প্রায় আর্তস্বরে বলে উঠেছিলেন

যোগিন্দর।

গুরুদেব বলেছিলেন, 'হ'তে আরম্ভ করলে, দেহ-যন্ত্রের দোষ অপসারিত হ'লে আরও হবে। না হয় আমি তোমার ছেলে প্রত্যর্পণ করব। পুত্র সন্তান হয়ে এক বৎসর তোমার কাছে থাকবে, তার পরই আমি নিয়ে আসব।'

'সে তো তখন—আপনি সে ঝামেলা সইতে পারবেন?'

'সে ব্যবস্থা করব। কিন্তু বেশী দিন থাকলে তোমার আরও কষ্ট হবে বেটি।'

যোগিন্দর বোধ হয় প্রাণপণে প্রার্থনা করেছিলেন যাতে প্রথম সন্তান কন্যা হয় সেই জন্যে, কিন্তু সে প্রার্থনার চেয়ে সাধুর ইচ্ছাশক্তি অনেক বেশী প্রবল, প্রথমেই সর্বানন্দ জন্মগ্রহণ করলেন। তারপর আরও একটি সন্তান হয়েছে। সেও পুত্র। সে বড় হয়ে এখন কলেজে পড়ছে—তাও শুনেছেন।

সর্বানন্দ যেন সকলের আনন্দ বিধানের জন্যই অসাধারণ কান্তি নিয়ে জন্মেছিলেন। সে রূপ দুর্লভ। দিনে দিনে সে কান্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। বালক থেকে কিশোর হয়েছেন। তা থেকে যুবা। ঈষৎ পিঙ্গল কেশ তাঁর এখন জটাবদ্ধ, অল্প অল্প গুম্ফ শ্মশ্রু দেখা দিয়েছে তাও পিঙ্গলাভ—কিন্তু তাতে রূপ আরও কাম্য হয়েই উঠেছে। ইদানীং তিনি যখন কৌপীন-বস্ত্র হয়ে দেবীর আরতি করেন—অনেক শিষ্য-শিষ্যাকেই বলতে শুনেছেন, এই তো সাক্ষাৎ মহাদেব, শিব।

এসব বলতে শুনেছেন, নারীদের চোখে লুব্ধতা ফুটেছে তাও একেবারে লক্ষ্য করেন নি তা নয়—তবে তার কোন প্রতিক্রিয়া জাগে নি সর্বানন্দর মনে। সাহিত্য পড়েছেন কিছু কিছু, অর্থও জেনেছেন। তা ছাড়াও এত লোক যেখানে আসে সেখানে এই ধরনের কথা কানে আসবে না, তা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, দর্পণেও মুখ দেখেছেন, তাতেও তিনি যে এত রূপবান সে সম্বন্ধে কোন সচেতনতা দেখা দেয় নি।

এখনও যে খুব সচেতনতা এসেছে তাও না। তিনি যে কামার্ত বা নারী-লোলুপ হয়ে উঠেছেন তাও একেবারে সত্য নয়। নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন আজকের সমস্ত প্রভাত কাল—নিত্যকার পূজার মধ্যেই—কোথাও তেমন কোন চিহ্ন নেই। গুরুর এই বিশ বৎসরের শিক্ষা ব্যর্থ হয় নি। মন

যথেষ্ট উধ্ব´মুখী হয়েছে—এখনও তার অবনতির বা অধোগমনের কোন লক্ষণ দেখতে পান নি।

এটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা।

বাবার এক সন্ত বিধবা শিষ্যা (বাবা বলে ডাকতে গুরুদেবই শিখিয়েছেন, আশ্রমের বাঙালী শিষ্য-শিষ্যারা বাবা বলেন সামনে, উল্লেখ করার সময় গুরুজী বা গুরু মহারাজ বলেন, অন্য প্রদেশবাসীরা পিতাজী মহারাজ বা শুধুই মহা-রাজজী কি পিতাজী বলেন, অন্য সন্ন্যাসী শিষ্যরা বলেন প্রভুজী, কে জানে, বোধ হয় এই ডাকটা ওঁর প্রিয়, মানস সন্তানের মুখে পিতৃ সম্বোধনই শুনতে চান)—শোকার্ত হয়ে গুরুর কাছে এসে পড়েছেন, এই মাত্র মাস তিনেক হ'ল। বাবাও তাঁকে সস্নেহে সযত্নে আশ্রয় ও আশ্বাস দিয়েছেন। সতেরো আঠারো বছরের অনূঢ়া কাজল তাঁরই মেয়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সাধারণ চেহারা, কেবল মুখটি বড় সুকুমার। আর চোখে একটা আশ্চর্য শান্ত কোমল দৃষ্টি।

শোক তারও লেগেছে, বিশেষ সংসারে আর কেউ তেমন নেই, জ্যাঠা কাকারা আছেন, কিন্তু তাঁদেরও সাধ্য সামান্য, হয়ত দুটো পেট তাঁরা চালাতেন, কিন্তু কাজলের বিয়ে দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। মা এখানে পূজা ধ্যান ও দেবকার্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। তার দিন কাটে কি করে? সে-ই সেধে গুরুদেবকে বলে দীক্ষা নিল একদিন, আর তারপর থেকে তার প্রাণপণ চেষ্টা হল গুরুদত্ত মন্ত্র ও শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তোলা।

প্রথম প্রথম মন্দিরের দরজার বাইরে একপ্রান্তে বসে জপ করত, কিছুক্ষণ পরেই যেন জপে বা জপের দেবতা ইষ্টে তদগত চিত্ত হয়ে যেত, অর্ধনিমীলিত সেই সুন্দর ভাবগভীর চোখ দুটি থেকে অবিরল অশ্রুধারা নামত।

দেখতেন সর্বানন্দ, বিস্মিত হতেন।

এত তাড়াতাড়ি মানুষ সাধনায় এমন নিবিষ্ট, একাগ্র হতে পারে? হয়ত সবটা তা নয়। শোক ভোলবার জন্যই এই পথকে আঁকড়ে ধরেছে, সে শোকও ওকে ছাড়ে নি। এ অশ্রুর কিছুটা ইষ্টের জন্য কিছুটা পিতার জন্য।

তা হোক তবু ভাল লাগত।

প্রথম প্রথম সে একাগ্রতা দেখে কৈলাসানন্দও বিস্মিত হয়েছেন, সুখীও হয়েছেন। তিনি ধ্যান যোগের আরও কিছু প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছেন, মনকে

একাগ্র করার পন্থা সম্বন্ধে উপদেশও দিয়েছেন। মেয়েটি নিষ্ঠার সঙ্গে নম্রতার সঙ্গে তা পালন করেছে।

এই নম্রতা, এই শান্ত সমাহিত ভাব, এই তদ্গত-চিত্ততাই আকৃষ্ট করেছে সর্বানন্দকে। শেষে একদিন বাগান থেকে বিস্তর ফুল তুলে এনে ফেলে রাখা সত্ত্বেও কেউ তখনও মালা গাঁথে নি দেখে, সর্বানন্দ কথাও বলেছেন, 'আপনি মালা গাঁথতে পারেন? গেঁথে দেবেন? মা আছেন, গায়ত্রী মূর্তি, শিবলিঙ্গ, নারায়ণ—অন্তত পাঁচটা মালা চাই। মার মালাটা গুঞ্জামালা হ'লে ভাল হয়, না হলেও একটু লম্বা করে গাঁথবেন, যাতে মূর্তির জানু পর্যন্ত পৌঁছয়।'

সহজভাবেই বলেছেন, ইষ্ট ও নিজের আত্মা সাক্ষী—কোন ভাবান্তরও হয়'নি মনে।

কাজল মালা গেঁথেছিল। ভালই গেঁথেছিল। নিপুণ দ্রুত হাতে গেঁথেছে, নির্ভুল হিসেবে, যে মালার যতটা দৈর্ঘ্য প্রয়োজন ঠিক ততটাই দীর্ঘ করেছে। খুশী হয়েছিলেন গুরুদেবও। মালা গাঁথার কাজ চলতে চলতেই তিনি এসে পড়েছিলেন, কিছুক্ষণ ওর কাজ দেখে বলে উঠেছিলেন, 'বাঃ জননী, তুমি তো দেখছি পাকা আর্টিস্ট। তুমিই তাহ'লে এই কাজটার ভার নাও মা। কে কখন দয়া ক'রে আসবে, কার মনে পড়বে, এক একদিন বড় অসুবিধে হয়।'

মেয়েটি মাথা নত ক'রে সম্মতি জানিয়েছিল।

ক্রমে শুধু মালা গাঁথা নয়, আরতির প্রদীপ সাজানো—এক এক আরতির বিভিন্ন আকারের প্রদীপ; কোনটা পঞ্চ প্রদীপ, কোনটা সাত, কোনটা বা ঝাড়; কর্পূর আরতিরও তাই—সে প্রদীপ পরে মার্জনা করা। একাজগুলো সহজেই সে হাতে তুলে নিল।

নিপুণতার সঙ্গে যে ভক্তির ভাব, যে তন্ময়তা তার দৃষ্টিতে, যে নম্রতা, সবই একটু একটু ক'রে আকৃষ্ট করবে একজন সত্যকার সাধককে এ তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলেই, আর ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা মনে এসেছে বলে সর্বানন্দ সচেতন হতে পারেন নি।

কেউই কোন বিপদের সঙ্কেত পায় নি।

অন্য আশ্রমবাসীদেরও কুৎসা রটাবার কথা মনে পড়ে নি, কাজলের মাও

এর মধ্যে কোন মন্দ দেখতে পায় নি। গুরুদেব তো মাত্র দিন পাঁচেক আগেই মুক্তকণ্ঠে ওর প্রশংসা আর ওকে আশীর্বাদ করেছেন, বলেছেন, 'অতি উত্তম আধার বেটি, আমার এখানে মেয়েদের সন্ন্যাস দেবার কোন ব্যবস্থা নেই, তবে আমি অন্যত্র সে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারব। মনে হচ্ছে অন্তও লাগবে না, তুমি শনৈ সিদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছ মা, তোমার চোখ দেখেই বুঝি মনকে কত উঁচুতে নিয়ে গেছ।'

তবু, কালই এই সর্বনাশ ঘটে গেল।

শয়ন আরতি করেন আশ্রম গুরু স্বয়ং, সর্বানন্দ তাঁকে সাহায্য করেন মাত্র—সামগ্রী হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে। আরতি শেষ হ'লে মন্দির বন্ধ করেন আর এক সন্ন্যাসী শিষ্য, এঁরা এসে এই সময় সকলের সঙ্গে পঙক্তিতে বসেন, গুরুদেব সামান্য একটু প্রসাদী দুধ মাত্র গ্রহণ করেন, তবে বসে থাকেন শেষ পর্যন্ত। এই সময়টাই তাঁর আশ্রমবাসীদের উপদেশ দেবার সময়—কারও কিছু জিজ্ঞাস্য বা অনুপপত্তি থাকলে তারও মীমাংসা করে দেন, সংশয় নিরসন করেন।

মেয়েরাও এই সময় প্রসাদ পায়, তবে সে অন্যত্র।

প্রসাদ গ্রহণের পর সর্বানন্দ গুরুকে তাঁর বিশ্রাম কক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে প্রণাম ক'রে নিজের ঘরে চলে যান। কোন কথা থাকলে গুরুই বসতে বলেন, তা না হলে আর অযথা বিলম্ব করেন না সর্বানন্দ। তিনি ঠিক রাত্রি আড়াইটেয় শয্যা ত্যাগ করেন, নিজের প্রাতঃকৃত্য জপ ধ্যান সারার পর ঠিক চারটের সময় গিয়ে মঙ্গল আরতি করেন। এরপর আর বিশ্রামের অবকাশ থাকে না। মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার পর আশ্রমের হিসাব নিকাশ চিঠিপত্র এইসব দেখতে হয়। এক একদিন একটু গ্রন্থপাঠেরও সময় পান না।

কাজেই, এ সময় ক্লান্তিতে দেহ ভেঙে আসে। সময়ও কম। এক এক-দিন গুরুদেবের উপদেশ দীর্ঘ বিলম্বিত হয়ে ঘরে পৌছতে দশটা বেজে যায়। কালও একটু বেশি দেরি হয়েছিল। দ্বিতলের কোণে তাঁর ঘর—নির্জনতার জন্যেই এই ঘর তাঁকে দিয়েছেন গুরুদেব। ছোট ঘর, গৈরিক বস্ত্রাবৃত একটি শয্যা, একটি আলমারীতে কিছু বই, মেঝেতে বড় একটা বাঘের চামড়া পাতা, নারকেল কমণ্ডলুতে জল, আর একটি চৌকীতে গুরুদেব ও ইষ্টের ছবি।

ঘরে সামান্য একটি প্রদীপ জ্বলে। আশ্রমে বিদ্যুৎ এসেছে কিন্তু এসব ঘরে আনতে দেন নি গুরুদেব। স্বল্প আলোয় চিত্ত স্থির হয় সহজে। অল্প আলোর জন্যই সর্বানন্দ দেখতে পান নি আগে, দরজা বন্ধ ক'রে শয্যার দিকে যেতে গিয়ে চোখে পড়ল, মাঝখানে স্থির হয়ে বসে আছে কাজল, তার পাশে একটি পাতায় কিছু ফুল।

সবিস্ময়ে ও প্রায় সভয়ে পিছিয়ে এলেন তিনি, 'এ কি! এসব কি?' কণ্ঠে বিরক্তিও যথেষ্ট।

'না না, রাগ করবেন না। আমি এখনি চলে যাচ্ছি। আমি—আমি আপনাকে পূজা করব, সামান্য একটু সময় দিন।'

'আমাকে পূজা করবে কি! তুমি কি পাগল। তোমার মতলব তো ভাল নয়। তোমাকে আমি ভালো মেয়ে, ভালো সাধিকা বলে জানি—'

'আমার কথাটা শুনুন, কেমন আমার মনে হয়েছে, আপনিই সাক্ষাৎ মহেশ্বর শিব। সত্যিই বলছি, যে কোন দিব্যি গালতে বলবেন, গালছি—আমি যত ইষ্ট চিন্তা করতে যাই, আমার শৈবমন্ত্রে দীক্ষা আপনি হয়ত জানেন—মন যত একাগ্র করি—আপনার মূর্তিই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেছি পারি নি। আজ তাই সকাল থেকে উপবাস ক'রে আছি, আপনাকে পূজা না করে জল খাবো না।. এটুকু ভিক্ষা আমাকে দিন।'

বলতে বলতে যেন দুই চোখের কূল প্লাবিত ক'রে অবিরল অশ্রু ঝরতে লাগল।

এও কি ছলনা? এতদূর হ'তে পারে! কিন্তু ওর মুখ দেখে তো ওকে সাত্ত্বিক নির্মল বলেই বোধ হয়। এখনও হচ্ছে।

এই আকুলতা দেখে আর কঠিন হ'তে পারলেন না। বিপন্ন কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এতে আমার যে পাপ হয়। শিব, শিব, নাও যা করবে তা সেরে নাও দ্রুত।'

পূজা করল, আঁচলে চোখের জল মুছে অস্ফুট কণ্ঠে মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে সে শিবপূজাই করল, তরুণ সাধুও বার বার শিব নাম উচ্চারণ ক'রে এই পূজা ও প্রণতি যথাস্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু পূজার শেষে প্রণাম করতে গিয়ে কাজল একেবারে পাগলের মতো

কাণ্ডকারখানা বাধিয়ে তুলল। ওঁর দুই পা তার চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল, সে কিছুক্ষণ এমনি দুই পায়ে মুখ ঘষে, পায়ে চুমো খেতে লাগল, পা থেকে ক্রমশ জানুতে—

এবার ব্যস্ত হয়ে সর্বানন্দ ওকে টেনে জোর ক'রেই ওঠাতে গেলেন, সে বাধা দিল না—কিন্তু দরজার দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করতেই সবলে, কঠিন-ভাবে জড়িয়ে ধরল ওঁকে, বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে তেমনি অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগল, 'একটু একটু, আর একটু। আর জীবনে কোনদিন আপনাকে বিরক্ত করব না। কোনদিন না—'

এরপর আর কিছু মনে নেই সর্বানন্দর।

কিছুই না। কোথা দিয়ে দুটি নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ প্রাণ নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বনাশ সাধন করল, তা ওরা কেউই বুঝতে পারল না।

মহামায়া? এই বুঝি মহামায়ার লীলা।

কৈলাসানন্দও ভেবে চলেছেন। এমনিই দ্রুত অতীত ইতিহাস ভেসে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে।

না, তিনি কামার্ত হয়ে কিছু করেন নি। সে ইচ্ছা কখনই তাঁর মনে আসে নি।

তিনি পুত্রার্ত হয়েছিলেন। একটি সন্তান, যাকে নিজের মনের মতো সাধক ক'রে দিতে পারবেন, সিদ্ধ সাধক—যে এই মন্দির আশ্রম পবিত্রভাবে পরিচালনা করতে পারবে, যে আরও বহু শিষ্য-শিষ্যাকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করতে পারবে।

তাই যোগিন্দর কাউর ওঁর কাছে সন্তান ভিক্ষা করতেই তাঁর মন দুলে উঠেছিল। তবু ঠিক এ সম্ভাবনাটা মাথাতে যায় নি তখনও। উনি দীর্ঘদিনের সাধনায় অনেক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, অনেক শক্তিও। সেই সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যাও কিছু কিছু। বহু তীর্থযাত্রী গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়ে ওঁর চিকিৎসায় নিরাময় হয়েছে, তারা ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ তো করেইছে, ওঁকে ভগবানের অংশস্বরূপ বলে মনে ক'রে।

কয়েকদিন কান্নাকাটির পর বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'তোমার স্বামীর

দ্বারা সন্তান উৎপাদন সম্ভব হবে না যোগিন্দর। তুমি বরং দত্তক নাও কাউকে।'

যোগিন্দর ওঁর পায়ে মাথা খুঁড়েছিল, 'না না, তাতে মন ভরবে না প্রভু, আপনি আমাকে গর্ভজ সন্তান দিন। আপনি সব পারেন।'

উনি দিয়েছিলেন সন্তান। এ সুযোগের লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। মনকে বুঝিয়েছিলেন এ ইষ্টেরই ইঙ্গিত, তাঁরই যোগাযোগ। তাঁর ইচ্ছাই বুঝি এই।

যোগিন্দরের দুটি সন্তানই তাঁর ঔরসজাত।

ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়েছে ঠিকই—কিন্তু এ শুধু সন্তানের কামনায়—এটুকু উনি ইষ্টকে সাক্ষী রেখে বলতে পারেন। নারীলোভে, যৌন লালসায় ভ্রষ্ট হন নি ব্রহ্মচর্য থেকে।

চোখ খুললেন গুরুদেব। সর্বানন্দর নবীন জটাবদ্ধ মাথা ওঁর পায়ে। তার অনুতাপের অশ্রুতে ওঁর পা দুটি সিক্ত।

উনি জোর ক'রেই তুললেন শিষ্যকে, তারপর দুটি হাত ধরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার অনুমান যথার্থ, সর্বানন্দ, আমি ব্রহ্মচর্য অস্খলিত রাখতে পারি নি। তুমি আমার ঔরসজাত সন্তান। তুমি ও তোমার গর্ভধারিণীর দ্বিতীয় সন্তানও। সে না জন্মালে আমি তোমাকে পেতাম না। সেইরকমই শর্ত ছিল। তখন মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি, মনের মতো একটি শিষ্য সন্তানের লোভেই এ কাজ করেছি।'

'না না, গুরুদেব। আমার অপরাধ অনেক বেশী। আপনাকে ঐ প্রশ্ন করা ঔদ্ধত্য শুধু নয় অপরাধও। আপনি যে প্রায়শ্চিত্ত বলবেন তাই করব, তুষানল অথবা প্রায়োপবেশন—কিন্তু ঐ মেয়েটার কি হবে?'

গুরুদেব আবারও ধীরকণ্ঠে বললেন, 'অতো বিচলিত হয়ো না বৎস, তুমি আমি একই অপরাধে অপরাধী। তোমাকে শাস্তি দেব, প্রায়শ্চিত্ত করতে বলব কোন্ অধিকারে? কিন্তু মেয়েটি কে? কাজল?'

মাথা হেঁট করলেন সর্বানন্দ, মৌখিক উত্তরের প্রয়োজন রইল না।

কৈলাসানন্দ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'তুমি কি সত্যই প্রায়শ্চিত্ত

করতে চাও?'

'হ্যাঁ প্রভু, যা বলবেন।'

'বাবা ডাক ছাড়লে কেন সর্বানন্দ? তপঃভ্রষ্ট সন্তানের ভ্রষ্ট পিতা, বাবা বলেই ডেকো। শোন, তুমি ওকে বিবাহ করো। শৈবমতে আমিই বিবাহ দিচ্ছি, তবে তুমি ওকে কামসহচরী ক'রো না, তপসহচরী ক'রো। উত্তর কাশীতে আমার গুরুদেবের একটি ছোট আশ্রম আছে, আমিই তার ট্রাস্টী, সেইখানে চলে যাও। দুজনে নিষ্কাম পুণ্য জীবন যাপন করো। একই সঙ্গে সাধনা করো। যদি সন্তান হয়, পুত্র সন্তান, তাকে তুমি সন্ন্যাসী ক'রো না, তাকে গৃহী ক'রো, বিবাহ দিও। সৎ গৃহী হয়ে যাতে থাকে, সেই চেষ্টা করো।'

অতীতের তীর হ'তে

বোম্বের সমুদ্রকূলে এক বিখ্যাত হোটেল।

খ্যাতি তার মহার্ঘ্যতার জন্যে এত বেশী, কি স্মাগলিং-এ অপর সবাইকে টেক্কা দিয়েছে বলে—তা বলা শক্ত।

অবশ্য সে হিসেবে আমার দরকার নেই।

জীবনে কোনদিন এত-টাকা-দৈনিক-ভাড়ার ঘরে থাকি নি, এমন কি মাসিক এত টাকা ভাড়া দিয়ে থাকতে হবে শুনে মাথা ঝিমঝিম করে—এত দামী (অ)খাদ্যও খাই নি। এক কাপ চায়ের যা দাম তা শোনার পর সে চা মুখে তুলতে ইচ্ছা করে না। এমন হোটেলে থাকতে পারব শুনে প্রথমে খুশী হয়েছিলুম খুব—কিন্তু এখন পদে পদে অস্বস্তি বোধ করছি। সুখশয্যা কণ্টক-শয্যা বোধ হচ্ছে। টাকা খরচ করারও শিক্ষা ও অভ্যাস দরকার।

তবে এসবই এক ফিল্ম কোম্পানীর দৌলতে। তাঁদেরই অতিথি। অবশ্য এখনও কনট্র্যাক্ট সই হয় নি, হবে কিনা তাও জানি না। তিন দিন কেটে গেলেও মালিকের আসবার ও 'গল্পটা নিয়ে বসবার' সময় হয় নি। তা হোক, যাতায়াতের টিকিট ক'রে দিয়েছে, হাত-খরচার টাকা আগাম দিয়েছে—এখানের ব্যবস্থাও তাদেরই, আমার কোন ক্ষতি নেই।

ক্ষতি না থাক ভালও লাগছে না। এমনি এত দামী হোটেলে থাকার

অস্বস্তি তো আছেই, অনিশ্চয়তার অস্বস্তিও কম না। তার ওপর এই নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার যন্ত্রণা।

কোথাও বেরোতেও পারি না। কোথায় বা যাব। বোম্বের সবই দেখা হয়ে গেছে। চেনা লোকের বাড়ি গেলে হাজার কৈফিয়ৎ। বসে থাকার ফলে ভাল ঘুম হয় না। সেদিন অনেকক্ষণ বই পড়ে শুয়েছি, তবু শেষ রাত্রেই ঘুম ভেঙে গেল। একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে আর একবার চোখ বুজব কিনা ভাবছি হঠাৎ কাচের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে চোখ পড়ল। সে চোখ আর ফেরাতে পারলুম না।

সামনে পশ্চিম দিগন্তে চন্দ্র অস্ত যাচ্ছেন—পুরোটা যান নি তখনও—তার মধ্যেই পিছনে বোধ হয় বালার্ক-আভা দেখা দিয়ে থাকবে, তারই একটা তেরছা আলো এসে পড়েছে আকাশে।

লোভ হ'ল খুব। এতদিন সমুদ্রতীরে ঘুরেছি, এমন দৃশ্য তো কখনও চোখে পড়ে নি। আসলে বোধ হয় এত ভোরে ঘুমও ভাঙে নি কখনও, তেমন কারণও ঘটে নি।

লোভ হয়ে উঠল অদম্য। বেরিয়ে যাবো নাকি? এখানের শান্ত, প্রায়-নিস্তরঙ্গ সমুদ্র বলে অবজ্ঞাই ক'রে এসেছি, আজ সেই সমুদ্রই দুর্বার আকর্ষণে টানতে লাগল!

দারোয়ানরা কিছু বলবে না তো? না, কী আর বলবে!

তবু দোরে চাবি দিয়ে চাবিটা রিসেপশ্যানে রেখে গম্ভীরভাবে তাদেরই বললুম, 'একটু সমুদ্রতীরে বেড়াবো।'

'অফ কোর্স!' মহিলা তৎক্ষণাৎ এক বেলবয়কে ডাকলেন। সে দরজা খুলে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর?

জনহীন বিশাল বেলাভূমি, কোথায় শুরু কোথায় শেষ তার কোন সীমা চোখে পড়ে না। নিঃশব্দও প্রায়, শুধু ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ উঠছে মধ্যে মধ্যে।

কোন মানুষ তো নেই-ই, কোন জীবিত প্রাণী পর্যন্ত চোখে পড়ল না। প্রাণহীন মৃদুশব্দধ্বনিত সমুদ্রবেলা ও ম্লান চন্দ্রালোক প্রতিফলিত জলরাশি বহু-

দূর দিগন্তের রহস্যময় আধ-অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। পিছনের বড় বড় কুশ্রী বাড়িগুলো চোখে না পড়লে মনে হ'ত এ যেন সৃষ্টির প্রত্যুষ-ক্ষণ আর আমিই সেই প্রথম মানব, আদম।

মুগ্ধ, অভিভূত হয়ে গেছি। কি দেখছি, কেমন একটু একটু ক'রে আকাশের রঙ পালটাচ্ছে—বলা যায় রঙের খেলা চলছে সেখানে,—তরঙ্গশীর্ষ থেকে জ্যোৎস্নায় চুম্বন চিহ্ন মুছে গিয়ে প্রভাতের আবির্ভাবে তা লজ্জারক্তিম হয়ে উঠেছে—এসব বিশেষ ক'রে লক্ষ্য কি উপলব্ধি করার মতো মনের অবস্থা আর নেই—চিন্তা কি বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি—সব কেমন একাকার হয়ে গেছে। যেন কোন এক জড়তায় ডুবে যাচ্ছি ক্রমশ—

হঠাৎই একটু কি শব্দ হ'তে চমকে চেয়ে দেখি আরও একটি-অন্তত জীবিত প্রাণী সমুদ্রের শোভা দেখতে বেরিয়েছে এবং—কতকটা নাটক উপন্যাসের রীতি অনুযায়ীই—সে একটি মেয়ে।

এমন সময়, একা, অল্পবয়সী মেয়ে!

সাহস তো কম নয়!

একটু ভয়ও যে পাই নি তা নয়—কোন ঝঞ্ঝাটে ফেলার মতলব নেই তো?

কিন্তু বেশীক্ষণ সংশয়ে থাকতে হ'ল না। কাছে এসে মেয়েটি থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'আরে, আপনি!'

গলাটা যেন চেনা চেনা!

ভাল ক'রে চেয়ে দেখলাম। ততক্ষণে অরুণ আলো প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে—গগনস্পর্শী বাড়িগুলোর জন্য আমাদের স্পর্শ করতে পারে নি, কিন্তু সে আলো আকাশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সমুদ্রের জলে, এই বেলাভূমি আলোকিত করেছে কিছু।

চিনতেও পারলুম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

বহুদিন, অন্তত চল্লিশ বছর আগে দেখা একটি মেয়ে।

অতি সামান্য পরিচয়। একবার মামলা উপলক্ষে কাঁদী যেতে হয়েছিল। পিসতুতো ভায়ের পরিচয়পত্র নিয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ি উঠি। দিন দশেক ছিলুম সেখানে। মেয়েটি সেই ভদ্রলোকেরই। হাসিখুশী মেয়ে, খুব আদরযত্ন

করেছিল। তবে গায়ে-পড়া নয়। কোন প্রেম এমন কি রোমান্সের কথাও মনে পড়ে নি তখন।

তারপর মাত্র একদিনই দেখা হয়েছে। সেও—বছর চোদ্দ-পনেরো পরের ঘটনা। আদিবাসীদের এক গ্রামে গ্রামসেবিকার কাজ করছে তখন। আর সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলুম মেয়েটি সুন্দরী। প্রশ্ন করেছিলুম, 'তুমি একা এদের মধ্যে থাকো, তোমার ভয় করে না?'

ও জবাব দিয়েছিল, 'এদের মধ্যে থাকি বলেই ভয় করে না। বাঙালীর মধ্যে বাস করতে পারি নি, বহু জায়গায় চাকরি পেয়েছি—সব জায়গা থেকেই পালাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ঐ যে জর্জ—কোন দরকার নেই—তবু সে আমার ঘরের বাইরের দাওয়ায় শুয়ে থাকে, পাহারা দেবার জন্যে। দরজা বন্ধ ক'রেই শুই, একটি না একটি ছাত্রীও থাকে—তবুও পাহারা দেয়।'

'তাহলে, তোমার প্রেমে পড়েছে বলো।'

'হ্যাঁ, তাই। তবে এও সে জানে যে সেদিকে কোন সুবিধে হবে না। সে চেষ্টাও করে না তাই।'

'কিন্তু ছেলেটা তো ভাল। লেখাপড়া জানে, আদর্শবাদী। এদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে—তুমিই বা এত অকরুণ কেন?'

'হ্যাঁ,' খুব সহজেই উত্তর দিয়েছিল, 'যদি আমার মন অন্য কোথাও বাঁধা না পড়ত তো ওকে আমি বিয়ে করতুম। কিন্তু—'

এই 'অন্য কোথাও' যে ঠিক কোথায়, সে প্রশ্ন আর করা হয় নি। বহু লোক এসে পড়েছিল। চলে আসতে হয়েছিল প্রায় তখনই।

তারপর এই দেখা।

'আরে, তুমি! বসো বসো। এমন স্থানে, এমন সময় এইরকম নাটকীয়-ভাবে তোমার দেখা পাবো তা কে ভেবেছিল। তুমি এখানে কি করছ? কোথায় আছ? একা এভাবে বেরোলে—'

বলতে বলতেই কথাটা মনে পড়ে গেল, 'কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। তোমার তো এতদিনে বুড়ী হয়ে যাবার কথা। অথচ চেহারা দেখছি একটুও তো পালটায় নি। সেই তো প্রথম দিনের মতোই—এমন কি পরে

যখন দেখছি, সেও তো পূর্ণ যুবতী আর কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে—এ তো সে চেহারাও নয়। তুমি কি কোন টাইম মেসিন পেলে নাকি—বয়স পেছিয়ে যাচ্ছে!'

'চেহারা তো আপনারও পালটায় নি একটুও!'

'হ্যাঁ, তা আর না। রীতিমতো বুড়ো হয়ে গেছি।'

'না। সেই প্রথম দিনের চেহারাই এখনও আছে। আয়নায় দেখুন।'

'আয়না কোথায় পাবো!'

'আমার চোখের মণিতে দেখুন। চোখের মধ্যে সুন্দর প্রতিফলন হয়। ফোটোর মতো—দেখেন নি কখনও লক্ষ্য ক'রে?'

'দেখব কি, তেমন সুন্দর চোখ পেলুম কোথায়!'

'সুন্দর না হোক, আমার চোখেই চেয়ে দেখুন, বয়স বাড়ে নি আপনার একটুও।' কেমন একটা যেন পীড়াপীড়ির ভাব ওর গলায়।

'কিন্তু তা কি ক'রে হবে! সেই আদিবাসীদের গ্রামে যে দেখা হয়েছে, সেও তো অনেকদিনের কথা হ'ল। প্রায় কুড়ি-একুশ বছর! না?...তোমার সঙ্গে দেখা না হোক তোমার খবর রেখেছি কিছু কিছু। সেই জর্জ নাকি তোমার জন্যে আত্মহত্যা করেছিল শেষ পর্যন্ত!'

'কে বললে?'

'তোমার সেই কাকা, সেই আমার বাবার পিসতুতো ভাই—যিনি সেদিন ভোরবেলা পথ দেখিয়ে এনে তোমাকে রায়পুরের বাসে তুলে দিয়েছিলেন!'

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললো, ঈষৎ ব্যথায় চোখ দুটি ম্লান হয়ে এসেছে, আজও তার চোখ তেমনি অপরূপ আছে, শ্রদ্ধায় ও স্নেহে মেশানো—'না, জর্জ আত্মহত্যা ঠিক করে নি। তাকে আগেই তো বলেছিলুম, সেও বুঝেছিল। সে আমাকে এতই ভালবাসত যে আমাকে দুঃখ দেবার কথা তার স্বপ্নেও মনে আসত না। সে—ভালবাসাও ঠিক নয়—যেন পূজোই করত। অকারণেই আমাকে পাহারা দিত, বোধহয় আমার জন্যে কিছু আত্মত্যাগ না করলে তার তৃপ্তি হ'ত না—সেদিন খুব ঝড়-জল, সাইক্লোনের ভাব, অনেক ক'রে বললুম, 'তুমি ঘরে যাও, না হয়ত এ-ঘরেই এসো—তোমাকে আমার ভয় নেই—' কিন্তু

সে সেই দাওয়াতেই রইল, বললে, 'এই সব রাতেই বদমাইশদের সুবিধে। আর তোমার ঘরে যাবো না। কোন লাভ নেই, বরং লোকসান আছে—দুর্নাম। আমার দুর্নাম সইবে, তুমি সহ্য করতে পারবে না।'···সেই জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হয়। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল কিন্তু তখন রোগ বেড়ে গেছে। সে যখন বুঝল তার আর বাঁচার কোন আশা নেই—আমার হাত ধরে বলেছিল, 'কখনও কিছু চাই নি তোমার কাছ থেকে, আজ চাইছি। তুমি আজই চলে যাও কোথাও। আমার মৃত্যুর জন্যে এরা তোমাকে দায়ী করবে। আমার যাবার আর দেরি নেই—তুমি কথা দাও, নইলে মাটিতে গিয়েও আমি শান্তি পাবো না।'···সেই দিনই চলে এসেছিলুম।'

'তারপর, কি করেছ এতকাল?'

'আবার কালের কথা কেন? কাল মানে দিন মাস বছর, ও তো মনে। কিছু করেছি বৈকি, নইলে আছি কি ক'রে?'

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললুম, 'তুমি যে জর্জকে বলেছিলে মন অন্য কোথাও বাঁধা পড়ার কথা— সে ভাগ্যবান কে জানতে ইচ্ছে করে। তোমার মতো রত্নের দাম বুঝল না। আমি হ'লে—'

'তুমি হ'লে কি করতে? কই করো নি তো কিছু?'

চমকে উঠি, "তবে কি—তবে কি আমিই? কিন্তু তা কি ক'রে হবে। কতটুকুই বা দেখেছ আমাকে। আমি তোমাকে ভুলতে পারি নি ঠিকই, কিন্তু তুমি—'

'তুমি যদি মনে ক'রে রাখতে পেরে থাকো সেই একদিনের কথা—আমিই বা পারবো না কেন।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থাকি, কত কথা মনে উদ্বেল-উত্তাল হয়ে ওঠে—এই মেয়েটিকে ঘিরে কত স্বপ্নের কথা। কি পেতে পারতুম, অবহেলায় কি হারিয়েছি—সেই কথা।

'ইস!···যদি ঘুণাক্ষরেও একথা মনে আসত। এ আশা যে মনে রাখা সম্ভব তাই তো ভাবতে পারি নি। ঘরে এলে না বলে আমার লেখায় তোমাকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি—কত নায়িকা তৈরী করেছি তোমাকে মনে রেখে—তবু তোমাকে যে পাওয়া সম্ভব তাই তো ভাবি নি।'

'এখনও তো সময় যায় নি।' আস্তে বলে সে, 'চলো এসব ফেলে কোথাও চলে যাই।'

'চলে যাবো? কোথায় যাবো? কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চাও।' ঠিক যেন বুঝতে পারি না কথাটা।

'যেখানে হোক। চলে যাবো—তুমি আর আমি—সেইটেই তো বড় কথা। কোথায় যাবো কি করবো এ তো তথ্য। হেমনলিনী দেবী বলে এক লেখিকার একটি ছোট উপন্যাস ছিল "লাইকা"—পড়েছ? এক বিহারী চাষী-ঘরের তরুণ দম্পতিকে পূর্ণিমার রাতে দিগন্তজোড়া মাঠের মধ্যে চাঁদে পেয়েছিল। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে মুগ্ধ মেয়েটি বলেছিল, 'চলো ভাগে।' কেন যাবে, পালাবার কি কারণ ঘটেছে, সে সব কোন প্রশ্ন করল না ছেলেটা, সেই মুহূর্তে উঠে নীরবে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটে কোন অজানা অনিশ্চয়তার মধ্যে হারিয়ে গেল।···একেই বোধ হয় বলে Ecstasy—না? তুমিই বা ভাববে কেন? এমন স্বপ্নময় প্রভাতে নাই বা এত কথা ভাবলে। চলো আমার সঙ্গে—যেখানে হোক থাকব, যা হোক ক'রে জীবন কাটাব। আমি তোমার সেবা করব। তুমি তা গ্রহণ করবে—শুধু তুমি আর আমি।'

প্রলোভন বড় বেশী।

তাই যাবো নাকি? কোন দিকে তাকাব না, কারও কথা ভাববো না? নতুন জীবনে নতুন ক'রে বাঁচবো?

বুঝি সত্যিই বলেছে ও, আমারও যৌবন এখনও যায় নি।

এতদিন যাকে নিয়ে বহু স্বপ্ন রচনা করেছি সেই স্বপ্নময়ী এসে হাত ধরেছে—কেন ভাবব? 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র প্রলোভনও তো কম নয়।

হ্যাঁ, তাই যাবো।

বলতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়···মাঝামাঝি একটা ঢেউ ভাঙল। সেই জলে বিচ্ছুরিত হ'ল প্রথম প্রভাত-আলোর জ্যোতি—আয়নায় ঠিকরে পড়ার মতো।

চেয়ে দেখলাম প্রভাত আরো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, নিশান্তের সে মায়া আর নেই। বাড়িগুলোর ছায়া পেরিয়ে প্রথম রৌদ্রের স্পর্শ লেগেছে সমুদ্রের জলে।

মনে পড়ল ঘরে স্ত্রী আছেন, আরো অনেক অনেক বন্ধন, অনেক কর্তব্য।

সব চেয়ে বড় কথা আমার লেখা আছে, আছে ভবিষ্যতে পাঠকদের স্মৃতিতে স্থান পাবার দুরাশা। নাম যশ প্রতিষ্ঠার লোভ। আরও কত লেখার কল্পনা—

না। এসব ছেলেমানুষির বয়স আর নেই।

মিষ্টি ক'রেই বললাম, 'না, আর তা হয় না। আজ তুমি যা বলছ আর ত্রিশ বছর আগে বললেও চলে যেতে পারতুম, নির্দ্বিধায়, কোন কথা ভাবতুম না, কারও কথা না। আজ অনেক দায়িত্ব। শুধু দায়িত্বই বা কেন, অনেক আশাও।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীরবেই সে উঠে দাঁড়াল।

এ দিকে ফিরল না, আমার দিকে তাকাল না। একটা বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত করল না। যেমন অকস্মাৎ এসেছিল তেমনি আকস্মিকভাবেই চলে গেল।

যেন মিলিয়েই গেল।

আমি আকুল হয়ে উঠে তাকে ডাকতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। উঠতে গিয়েও পারলুম না। এ কি হ'ল আমার। আবারও চেষ্টা করি তাকে ডাকার, তাকে ফেরাবার।

হঠাৎ কানে গেল, 'সা'ব সা'ব উঠিয়ে। আপকা টালিফুন আয়া।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। এ কি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম নাকি?

তাহলে কি এতক্ষণ যা দেখলুম শুনলুম—সবই স্বপ্ন! স্বপ্ন বলেই ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারি নি।

কিন্তু সে? সেও কি স্বপ্ন?

এতদিনের ভাবনার বা কামনার সে স্বপ্নকেই স্বপ্ন দেখলুম নতুন ক'রে?

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু

রাত চারটে না বাজতে বাজতেই ঘুরিয়ার বাবা ঘুরিয়াকে ডাকাডাকি শুরু করে। এমন রাগ হয় এক-একদিন! ইচ্ছে করে বাপের মুণ্ডটা ধ'রে মুখখানা

বালির সঙ্গে ঘষে দেয়। বদমাশ পাজী বুড়ো। নিজে নেশা ক'রে পড়ে থাকবে সন্ধ্যা থেকে, ঘুম হবে না—আর ঘুরিয়াকেও ঘুমোতে দেবে না! সে কতদিন তবু বুঝিয়ে বলেছে, 'আমার হ'ল বড়লোক মক্কেল—আমার কি তোর মতো হেঁজি-পেঁজি হোটেলের কেরানীবাবু মক্কেল সব? আমাদের বাবুরা সাতটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। খুব সকালে যে চান করতে যায় সেও নটার আগে বালিতে পা দেয় না। আটটায় বিরিকফাস্ট করবে, তারপর দাড়ি কামাবে তবে তো!' কিন্তু কে কার কড়ি ধারে! তখনকার মতো হয়ত এক্কলস্বামী ঘাড় নাড়ে—যেন কতই বুঝল সে—কিন্তু রাত তিনটে বাজলেই আবার যে-কে-সেই! এক্কলস্বামীর কিছুতেই খেয়াল থাকে না যে তাতে আর তার ছেলেতে ঢের তফাত।

সত্যিই—ঘুরিয়ার কর্মক্ষেত্র হ'ল রেলের হোটেল। একমাত্র বড় আর বিলিতী ঢংয়ের হোটেল এখানকার। আগে সাহেব মেম ছাড়া বিশেষ কেউ আসত না—এখন অবশ্য সবাই আসে—বাঙালীই বেশি, গুজরাটি, পার্শি, কেউ বাদ যায় না—মায় মারোয়াড়ী পর্যন্ত, আসে আর দর কষাকষি করে প্রত্যেক হাত। এটা যে বিলিতী হোটেল, এখানে সব বাঁধা রেট, তা কিছুতেই ওদের বোঝানো যায় না।

সে যাই হোক—সাহেব মেমরা এখন বিশেষ না এলেও যারা আসে তাদের মেজাজ আরও বেশি রকমের বিলিতী হয়ে যায়। ভোরে উঠবে কে? স্নান করতে যায় কম—যারা যায় তারাও বেশির ভাগ নামে 'লাঞ্চ্' এর আগে এগারোটা বারোটা। সাহেব মেম যারা আসে তারা তো সবাই প্রায় স্নান করে বিকেলে, তিনটে চারটেয়। এর আগেও তাই ছিল—তখন সকালে কাজই থাকত না কারুর, বিকেলের চায়ের আগে সবচেয়ে বেশি ভিড় হ'ত স্নানের—এক-একজন আবার চায়ের পর নেমে সন্ধ্যা পর্যন্ত পড়ে থাকত জলে, তবে তাদের আর নুলিয়ার দরকার হ'ত না—এই যা!

এক্কলস্বামী এত কথা বোঝে না। সে বলে, 'ভোরে উঠে সমুদ্দরের ধারে আমরা চিরকাল গেছি, ওতেই আমাদের ভাত, ওতেই আমাদের নেশা। আজ না গেলে চলে?'

ঘুরিয়া বলে, 'তুই তো নিত্য যাস ভোরবেলা, তাতে কত পয়সা হয়? রোজ

সন্ধ্যেবেলা আমার কাছ থেকে নেশার পয়সা নিতে হয়। ভাতের পয়সা তো উঠেই না—আমার ঘাড়ে চেপে খাস।'

এঙ্কলস্বামী এতে বিষম রেগে যায়, 'ভারি তো চার-ছটা পয়সা দিস নেশার—তার জন্যে এত কথা কিসের? পয়সা তোরই রোজগার হবে, আমার কি?'

'আমার রোজগার আমি বুঝব।' ব'লে ঘুরিয়া পাশ ফিরে শোয়।

গজগজ করতে করতে এঙ্কলস্বামী নিজেই উঠে বেরিয়ে আসে ওদের সেই বুকচাপ সঙ্কীর্ণ ঘর থেকে। 'অমন না হ'লে আর বুদ্ধি!' আপন মনেই গজরায় এঙ্কলস্বামী, 'নইলে ঘরের বৌটা বেরিয়ে যাবে কেন।'

অবশ্য অত ভোরে উঠে এঙ্কলস্বামীরও যে বিশেষ কিছু রোজগার হয়, তা নয়। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা সমুদ্রের ধারে বেরিয়ে খানকতক জমাট ফেনা কিংবা কিছু বাহারী ঝিনুক পেলে তো বরাত জোর—হোটেলের বাবুদের কাউকে উপহার দিয়ে সেলাম ক'রে দাঁড়ালে এক আনা দু আনা—কোন কোন ক্ষেত্রে চার আনা পর্যন্ত বকশিশ মেলে—অবশ্য মানুষ বিশেষে। একই হোটেলে একই 'চারজ্' দিয়ে থাকলেই যে এক রকম মেজাজ হবে তার কোন মানে নেই। কেউ কেউ যা কঞ্জুষ হয়!

যে হোটেলে এঙ্কলস্বামী কাজ করে—অর্থাৎ যে হোটেলের নামের আদ্য-ক্ষর তার মাথায় তালপাতার টুপিতে লেখা আছে—সে হোটেলেও কেউ যে সাতটার আগে স্নান করতে যায় তা নয়—তবু এঙ্কলস্বামী সাড়ে পাঁচটা থেকে গিয়ে বসে থাকবে হোটেলের বারান্দায়, কেউ দোর খুলে বেরোলেই ঘটা ক'রে সেলাম দেবে এবং প্রশ্ন করবে 'কী বাবু, কখন লামা হবে সমুদ্দুরে?' কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ওঠে, 'সক্কাল বেলা উঠে ব্যাটার মুখ দেখলুম, কী আছে অদৃষ্টে কে জানে!'

অবশ্য শুধু ঐ হোটেলের মক্কেল নিয়ে থাকলেই ওর চলে না। এই-টুকু তো হোটেল—সব ভরে গেলেও সাতাশটা সীট, তাতে টুপি দিয়ে রেখেছে ওরা ছ'জন নুলিয়াকে। কীই বা পড়ে ভাগে? বুড়ো ব'লে এঙ্কলস্বামীকে অনেকেই নিতে চায় না। মেয়েরা তো নয়ই—নাক সিঁটকে বলে, 'ঐ ঢড়ঢড়ে বুড়ো, ওকে কে সামলায় তার ঠিক নেই, ও আবার আমাদের

সামলাবে।' কথাটা শুনলে এক্কলস্বামীর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ছাখ না পরখ ক'রে, সামলাতে পারে কি না সে। আসলে ছোকরারা হাত ধরলে ভাল লাগে—তা কি বোঝে না। মনের আক্রোশে এক্কলস্বামী নোংরা কথা বলতে বাধ্য হয়।

তার কপালে তিন-চারটের বেশি লোক কোনদিনই হয় না হোটেলে। তবে হোটেলের বাইরেও লোক ধরতে বাধা নেই তার। ভোর থেকে এসে ধন্না দেয় সে কতক্ষণ ঐ জন্যেই, হোটেলের কে কখন যাবে জেনে নিয়ে সে আশেপাশের বাড়িতে সেলাম দিতে যায়। তাতেও খুব বেশি হয় না। কারণ অন্য মুলিয়ারাও তো বসে থাকে না। সব জড়িয়ে যেদিন দশ-বারো আনা হয় সেদিন এক্কলস্বামী লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফেরে। তাও হওয়া শক্ত বৈকি। রেট তো এক পয়সা থেকে বাড়তে বাড়তে এতদিনে দু আনার এসে পৌঁচেছে। সকলে কিছু দু আনাও দেয় না—চার পয়সা দু পয়সাতেও রাজী হ'তে হয় এক এক সময়, নইলে চলে না। 'সিজন্' যখন থাকে না তখন আরও কম। লোক এলে যেন ভাগাড়ে মড়া পড়ার মতো ছেঁড়াছিঁড়ি হয় শকুনে শকুনে—তখন দু পয়সা পেলেও ভাগ্য মনে হয়। সে সময় তো জাল-বোনা বা অন্য মজুরী খাটা ছাড়া উপায়ই থাকে না। জাল-বোনার সুতো জুটলে জাল-বোনাই সুবিধা, কিন্তু সুতোই বা আসে কোত্থেকে।

দশ আনা বারো আনা রোজগার হলেও সে ঘুরিয়াকে খাইখরচ হিসেবে কিছু দিতে পারে না। ঘুরিয়া রাগ করে কিন্তু এক্কলস্বামীর যে কুলোয় না কিছুতে। সারাদিন জলে থাকতে হয়, সেজন্যে গরম নেশা দরকার—সকাল-বেলা অন্তত বার দুই গাঁজা না খেলে চলে না। আগে মদ পাওয়া যেত, মদ খেলে আর কোন নেশা লাগে না। এখন মদ বন্ধ হয়ে এই তো হয়েছে মুশকিল। আবার সারাদিন পরে খেটেখুটে গিয়ে একটু আফিং খেতে হয়, এ নেশাটাও ধরেছে সে বহুদিন। ঘুরিয়ার শালা মদ চোলাই করে গোপনে, সেটা পাওয়া যায় যেদিন ঘুরিয়ার হাতে টাকা থাকে। ঘুরিয়া এক বোতল আনলে এক ভাঁড় এক্কলস্বামীও পায়—তবে সে রোজ জোটে না, অনেক ঝুঁকি নিয়ে যারা মদ তৈরী করে তারা সেই রকম দামই নেয়। ভগ্নীপতি ব'লে কিছু ঘুরিয়াকে সস্তায় দেয় না।

কাজেই—মদ রোজ জুটলেও না হয় আফিংটা ছাড়বার চেষ্টা করত এক্কলস্বামী—এমনি পারে না! আফিং খায় ব'লে এক কাপ চাও না খেলে চলে না। দুধ-মিষ্টি বেশি দেওয়া চা। যেদিন রোজগার প্রায় কিছুই থাকে না সেদিন গিয়ে কান্নাকাটি ক'রে হোটেলের চাকরের কাছ থেকে একটু চা খেয়ে নেয়।…গাঁজা আফিং ছাড়া চুরুট তো আছেই। মোট সাড়ে পাঁচ আনা বাঁধা। এর চেয়ে বেশী পয়সা হাতে এলে দুটোর মাত্রাই বেড়ে যায় তা বলা বাহুল্য। দু-একটা পয়সা এর ভেতর ধারও হয়ে যায় এদিকে ওদিকে—যেদিন সামান্য কিছু বেশি আসে সেদিন সেগুলো শোধ করতে হয়। নইলে—পরে আর ধার জোটে না—এই বড় মুশকিল হয়ে পড়ে।

ঘুরিয়ার অবস্থা অবশ্য সচ্ছলই। বিলিতী হোটেলের টুপি তাকে যোগাড় করতে হয়েছিল একটু কষ্ট ক'রেই—অনেকগুলি টাকা ঘুষও লেগেছিল কিন্তু তারপর থেকে আর ভাবতে হয় নি বিশেষ। ওখানের রেট ছ' আনা এখন, তবে সাহেবরা কেউই এক টাকার কম দেয় না। বাঙালী সাহেবরাও তাই দেয়। মারোয়াড়ী ভাটিয়ারা দর কষাকষি করলেও আট আনার কম দেয় না প্রায় কেউ। ফলে দৈনিক দুটো-তিনটে লোক ভাগে পড়লেও দুটো টাকা কেউ ঘোচায় নি। এই জন্যেই এক্কলস্বামী হিংসে করে। মুখে অবশ্য বলে অন্য কথা—বলে, 'ভোরে উঠে সমুদ্দুরের ধারে অন্য বাড়িগুলো ঘুরলে তো পারিস—হোটেলে যা হবার হবে, বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করলে কিছু দোষ হয়?' আসলে সে ঘুরিয়ার আরাম দেখতে পারে না, সেইজন্যেই ভোর না হতে হতে ওর পেছনে লাগে।

ঘুরিয়াও তা জানে। সেইজন্যে বেশি রেগে যায়। বুঝিয়ে বলবার যে চেষ্টা করে নি তা নয়। কতদিন বলেছে সে, 'ছ্যাখ্ এত বড় একটা সাহেবী হোটেলের টুপি থাকে আমাদের মাথায়, আমাদের ইজ্জত কত? আমাদের কি আর হেঁজি-পেঁজি লোকদের মতো দোরে দোরে ঘুরলে চলে? ম্যানেজার বাবুদের নজরে পড়লে কি বলবে?' কিন্তু এক্কলস্বামী কথাটা যেন বুঝেও বুঝতে চায় না। ইদানীং ঘুরিয়া তাই রাগ ক'রে খিঁচোয়, 'আসলে আমার রোজগার বেশি ব'লে তোর হিংসে হয়—আমি কি আর বুঝি না, নেশাখোর

বুড়ো কোথাকার! যা, তোকে আর কাল থেকে খেতে দেবো না, তুই অন্য ব্যবস্থা করবি। এত তো বুড়ো মুলিয়া আছে এ পাড়ায়—তোর মতো সব রোজগার নেশা ক'রে খেয়ে বসে থাকে কে তাই শুনি? নিজের যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিয়ে আমার রোজগারে নজর দিবি! ভারি আমার বাপ!'

বলে কিন্তু খাওয়াতেও হয়। সেই হয়েছে বিপদ। ঘুরিয়া যাই রোজগার করুক না কেন—এক পয়সাও থাকে না। তবুও ওর কপাল ভাল। বিয়ে-করা বৌটা ছেলেমেয়ে নিয়ে তার ভগ্নীপতির সঙ্গে পালিয়ে গেছে। কোন দায় নেই, ঝঞ্ঝাট নেই—শুধু সে নিজে আর বাপ। হ'লে কি হয়—ঘরের ভাড়া আছে, শুধু নুন ভাত খেলেও আজকাল চালের দাম কত—মাছ মাংস খেলে তো কথাই নেই। এ ছাড়া নেশা তো আছেই। এক বোতল মদ লুকিয়ে কিনতে গেলে একটি পুরো টাকা চলে যায়। গাঁজা লাগে তারও, চুরুটেও কম যায় না—সিদ্ধি পেলে খুশীই হয়, শুধু একটি নেশা ওর নেই সেটা হচ্ছে আফিং। সাংঘাতিক সর্বনেশে নেশা—মানুষকে একেবারে জানোয়ার ক'রে দেয়। ওর দেশের লোক যারা এখানে রিকশা চালায়, তাদের এক-একজন বারো আনা এক টাকার পর্যন্ত আফিং খায়, আবার বলে—না হ'লে পা চালাতে পারব কেন। আরে মর, সব রোজগার এক নেশাতে যদি চ'লে গেল তো খেটে লাভ কি? পেট খালি রেখে নেশা? এমন নেশা না করলে কি নয়? এরই জন্যে কি সেই সুদূর গঞ্জাম থেকে এখানে এসেছিস?

না—ও নেশা ওর নেই। জলের কাজ যারা করে তাদের চাই গরম নেশা। ওতে কীই বা হয়। ঝিমিয়ে দেয় সব হাত-পা···মদ বলো, গাঁজা বলো···এসব নেশার মানে আছে।

কোন নেশা না ক'রে যে থাকা যায় তা ওরা জানে না—ওদের শিশুরাও ওদের সামনে বসেই বিড়ি চুরুট খায়। ওদের দেশে পয়সা নেই, ভাত নেই—তাই এতদূরে ওরা এসেছে রোজগার করতে—গ্রামকে গ্রাম খালি ক'রে চলে এসেছে ওরা—কিন্তু তবু খাটা-পয়সাতেও যেন মায়া নেই। কাপড়ের বালাই পুরুষদের নেই, একটু একটু নেংটি পরে থাকলেই চলে, খাওয়াও শুধু ভাত, পান্তা ভাতই বেশির ভাগ—কেবল নেশা। নেশা আর মেয়েমানুষ—এইতেই এত কষ্টের পয়সা সব চলে যায়।

কথাগুলো এক এক সময়ে ঘুরিয়া ভাবে। প্রখর রৌদ্রে সমুদ্র যখন আঁকা ছবির মতো দূরে পড়ে থাকে, বালির তাপ ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে এসে মুখে লেগে তন্দ্রায় শিথিল ক'রে আনে হাত পা, তখন হোটেলের লঙ্কা-আম গাছটার ছায়ায় বসে বসে এক একদিন ঘুরিয়া ভাবে—কী ওদের জীবন, কী ওর জীবন! এই পরের অনুগ্রহের আশায় বসে থাকা, একটা লোক স্নান করতে যাবে বুঝলেই ছুটে গিয়ে টানাটানি—তারপর বকশিশের জন্যে কী কাঙালপনা; —এত কাণ্ডের পর সারাদিনে যা উপার্জন হবে কোনমতে দুটি ভাতে আর নেশায় তার সব খরচ করা। থাকে কুকুর বেড়ালের মতো—না কুকুর বেড়ালেরও অধম—এই বিলিতী হোটেলের চাকরা যে সুখে থাকে সে সুখ ঘুরিয়া কল্পনা করতেও ভয় পায়—খায় শুধু ভাত, কোনদিন তার সঙ্গে সস্তার একটু মাছ কি ডাল, যেদিন মেলে সেদিন তো ভোজ। পরে এই ছেঁড়া ট্যানা—বড়জোর কোন সাহেবের কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া একটা ছেঁড়া গেঞ্জি। এ বেঁচে থেকেই বা লাভ কি?

নেশাই কি মনের মতন করতে পারে? এক একদিন ইচ্ছে হয় বোতল বোতল মদ খেতে। আগে যখন এই হোটেলেই মদের দোকান ছিল তখন এক-একদিন দেখত সাহেবরা চার বোতল পাঁচ বোতল মদ খেয়ে কেমন খুশি থাকত—তেমনি ওরও খেতে ইচ্ছে করে। ভাল ভাল বিলিতী মদ—

না—সে দুরাশা। দেশী মদই এখন গোপনে কিনতে অনেক পয়সা চলে যায়। শালা দেড় টাকার কম একটা বোতল দিতে চায় না কিছুতেই। তার ওপর কি দিয়ে চোলাই করে কে জানে—আজকাল বুকটা বড় জখম হয়ে যায় নেশা করলে। পেটে যেন কী একটা ব্যথা ধরেছে—প্রায়ই ব্যথা করে। তবু সেইটুকুই যেন আশাতীত সৌভাগ্য।

এক-একদিন হোটেলের গুর্খা দারোয়ান রাজবাহাদুর ওকে বলে, 'কী হয় এত নেশা ক'রে? নেশা করিস কেন? ছাড়তে পারিস না!'

রাজবাহাদুর খুব হুঁশিয়ার, ছুটির দিনে শুধু মদ খায় একটু—কিংবা কাঁচা সুপুরি, অন্য কোন নেশা নেই ওর। মদও নিজের হাতে সে তৈরী করে নেয়।

ঘুরিয়া ভেবেছে রাজবাহাদুরের কথাগুলো।

নেশা ছাড়লে এ জীবন কি একদিনও যাপন করতে পারত ?

তাকে তো মানুষই ভাবে না ওরা—ঐ বড়লোক সাহেব আর নকল সাহেবগুলো। নিজেদের পোষা কুকুরদের যতটা সমীহ ক'রে তার অর্ধেকও যদি করত! বিশেষতঃ ওদের ঐ মেয়েগুলো। কতই বা বয়স ঘুরিয়ার—একদিন ও হিসেব করিয়েছিল হোটেলের খাসনামা গোলাম রসুলকে দিয়ে, সাতাশ বছর বুঝি বলেছিল সে—তা যাই হোক এখনও পূর্ণ যৌবন ওর, অথচ মেয়েগুলো নিজেদের একটা চোদ্দ বছরের ছেলেকে দেখলে যতটা পুরুষ ভাবে, ততটাও ভাবে না ওকে। পুরুষ! এক একদিন এক একটি যুবতী পূর্ণাঙ্গী মেয়েকে নিয়ে সমুদ্রের ঢেউ-এর তালে তালে যখন নাচতে থাকে ঘুরিয়া, তার দেহ এক-একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় যখন কোন কোন সময় একেবারে ঘুরিয়ার দেহের ওপর এসে পড়ে, নরম হাতগুলো জোর ক'রে ধরে রাখার অছিলায় যখন ঘুরিয়া বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে—তখন যে ঘুরিয়ার বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে—সে কথা কি ওরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না ? সবচেয়ে আঘাত লেগেছিল ওর সেইদিনই—যেদিন একটি অল্প-বয়সী পাঞ্জাবী মেয়ে ওর সামনে নির্জন বালুবেলায় ভিজে পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরেছিল! পৌরুষের এই দুঃসহ অপমানে সেদিন রাত্রে ঘুরিয়া পাগলের মত মাথা খুঁড়েছে নিজে নিজেই। কী ভাবে ওরা তাকে, সে কি মানুষ নয়, সে এমন কি কোনও জীবও নয় ? সে কি পারত না সবল বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে সেই মুহূর্তে তাকে নিষ্পেষিত ক'রে বুঝিয়ে দিতে যে—সেও পুরুষ, সেও তরুণ!

কী কষ্টে যে নিজেকে সামলেছে সে—তা সে-ই জানে।

না—এ জীবন এমনি বহন করা সম্ভব নয়। সজ্ঞানে এই কাজ করা—অসম্ভব। তাই নেশার পর নেশা ক'রে নিজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে হয়।

অথচ কীই বা করতে পারত সে ?

জাল কেনবার পয়সা থাকলে মাছ ধরত। জাল চাই, নৌকোর কাঠ চাই—অত পয়সা জীবনে চোখেই দেখে নি। এমনি একান্ত রিক্ততার মধ্যেই তার জন্ম হয়েছে, এমনি নিঃস্বতার মধ্যেই তার জ্ঞান হয়েছে একটু একটু ক'রে। একেবারে কিছুই নেই। একদিন রোজগার না হ'লে

সপরিবারে উপোস করতে হয়—ছেলেবেলা থেকেই এটা সহজ মেনে নিয়েছে ওরা।

ভালই হয়েছে বৌটা পালিয়ে গেছে—মনে মনে বলে ঘুরিয়া। আরও অভাব, আরও দুঃখ বাড়ত। অবিশ্যি সেও কিছু কিছু রোজগার করত কিন্তু সে আর কত, এর মধ্যে আরও কতকগুলো ছেলেমেয়ে হয়ে যেত। এদিক দিয়ে বেশ আছে সে—যেদিন মদ পায় না সেই পয়সাটা বাঁচে কিংবা মদ কিনেও চার ছ' আনা বাঁচে, সেদিন হাতের কাছে স্ত্রীলোকের অভাব হয় না। না, সে জন্যে তার দুঃখ নেই—দুঃখ শুধু হয় যখন সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে গিয়ে সন্ধ্যায় ভাত রাঁধতে বসতে হয় তখনই। বুড়োটা তাও করে না অর্ধেক দিন। ছ' আনার আফিং খেয়ে থুম্ হয়ে বসে থাকে এক জায়গায়। সে সব দিনে মারধোর ক'রেও তাকে নড়ানো যায় না।

রিকশা চালাবে? সেও খাটুনি কম নয়। মন্দির থেকে স্বর্গদ্বার আধ ক্রোশ রাস্তা—তিন আনা। মন্দির থেকে চক্রতীর্থ ছ' আনা—দেড় ক্রোশ পথ তো বটেই। পায়ে আর কিছু থাকে না। সেই দুঃখেই ওরা অত আফিং খায়।

স্টেশনে কুলীর লাইসিন্ পেলে বেঁচে যেত। কিন্তু পাবার উপায় নেই—ঢের চেষ্টা করেছে সে। অত টাকা কোথায়?

এক পাওয়া যায়—বাড়িতে চাকরের কাজ। কিন্তু সে বাঁধা জীবন কি আর এখন পারবে কাটাতে? বোধহয় না।

পালিয়ে যাবে কোথাও? কোন চা-বাগানের কাজ মিলবে না? কলকাতা খুব ভারি শহর সে শুনছে—সেখানে কোন কারখানায় কি কাজ মিলবে না? পেটের এই ব্যথাটা— ; থাকৃগে, তাতে কি?

সাহস হয় না যেতে। খুব শৈশবে ওদের দেশ ছেড়ে হাঁটাপথে ওরা এখানে এসেছিল, তারপর থেকে আর কোথাও যায় নি, কোন দেশ দেখে নি। যা কাজ ওর বাপ জানত, তাই শিখিয়েছে—সমুদ্রে প'ড়ে আছে, উত্তাল তরঙ্গিত—তাইতে জানে সে নাচতে, ঢেউ কাটাতে। সেই সামান্য অভিজ্ঞতারই সামান্য মূল্য পায়। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দু-চার আনা বকশিশ।

কষ্ট হয় খুব বর্ষাকালে। কোন লোক থাকে না—সারাদিনে চার আনা

আট আনাও রোজগার হয় না। ঝিনুকও থাকে না বেশি সে সময়—তবু সারাদিন ঘুরে ঘুরে তাই সংগ্রহ ক'রে সন্ধ্যাবেলা পাইকারদের কাছে ওজন দরে বিক্রি হয়—দু আনা এক আনা। তাতে কীই বা হয়! নেশা করতেও কুলোয় না। অর্ধেক দিনই বাপবেটায় উপবাসে কাটায়। সেই সময় এক-একদিন মরীয়া হয়ে উঠে ভাবে বিনা টিকিটে না হয় মার খেতে খেতে কলকাতায় চলে যাবে। কিংবা কোন সাহেবের কাছে চাকরি নেবে—বাসন মাজা ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজ ....

দিবাস্বপ্ন হঠাৎ ভেঙে যায়। উনিশ নম্বর কস্টিউম্ পরে নামছেন। হৈ হৈ ক'রে ছুটে যেতে হয়। তিনি হয়ত বেছে নেন রামস্বামীকে – হতাশ হয়ে ফিরে এসে বসে ঘুরিয়া।

এ বছর বৈশাখ মাস থেকে পেটের ব্যথাটা বড় বেশি জ্বালাচ্ছে। কিসের ব্যথা কে জানে। রাত্রে যেদিন চন্দন যাত্রা দেখতে যায় সেদিন তো নরেন্দ্র সরোবর থেকে ফেরবার সময় পথেই শুয়ে পড়তে হয়েছিল ওকে। তারপর থেকে প্রায়ই একেবারে শয্যাশায়ী ক'রে ফেলে।

এঙ্কলস্বামী বলেছিল, 'লিবারের ব্যথা। যা সব বাজে মাল দেয় তোর শালা মদের সঙ্গে। ওতেই লিবারে ঘা হয়েছে।'

শেষে হাসপাতালেও গিয়েছিল একদিন। তারা বলেছিল মদ ছাড়তে। মদ গাঁজা দুই-ই ছাড়তে হবে। কিন্তু কোনটাই হয়ে ওঠে নি।

আষাঢ় মাস থেকে রক্ত পড়তে শুরু হ'ল। মুখ দিয়ে—মলের সঙ্গেও। এঙ্কলস্বামী নিশ্চিন্ত নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে, 'পেটে তোর ঘা হয়ে গেছে—আর তুই বাঁচবি না।'

ঘুরিয়া গালাগালি দিয়ে উঠেছিল সেদিন, ক্ষমতা থাকলে মেরেও বসত হয়ত। 'আমি মলে তুই বাঁচবি কি ক'রে? খাবি কি?'

'ভগবান দেবে। কত লোকের ছেলেরা তো খেতে দেয় না—তারা খায় কি ক'রে?' সে বেরিয়ে যায় হাসতে হাসতেই। সে যেন খুশিই হয়েছে ছেলের এই অবস্থায়।

এখনও যাত্রী আসছে। রথ শেষ হয় নি। এই হ'ল রোজগারের সময়। দুদিন বাদেই একেবারে নির্জন হয়ে যাবে সব, পথ-ঘাটে পর্যন্ত লোক দেখা

যাবে না। রোজগার বন্ধ, খাওয়া বন্ধ। প্রাণপণে উঠে আসে ঘুরিয়া কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যোঝবার বল যেন আর নেই ওর, মাথা ঘোরে, হাতের বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে আসে। বিপদ ঘটতে পারে হাত খুলে গেলে, তাদের হাতে এত জোর নেই যে তারা ধরে রাখবে।

হাসপাতালে আর একদিন গেল। ডাক্তারেরা দেখে শুনে বললেন, 'ক্যান্‌সার।'

'সে কী রোগ বাবু?' ঘুরিয়া বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

'সে সারবার রোগ নয়। অনেক পয়সা খরচ করলে, কি কলকাতায় গিয়ে হাতপাতালে ভর্তি হ'লে সারতে পারে।'

ঘুরিয়া হামা টেনে টেনে বাড়ি ফিরল বলতে গেলে, মনের জোরের সঙ্গে পায়ের জোরও গেছে। কিন্তু এখানেই জ্বালার শেষ নয়, বাড়িতে গিয়ে দেখলে ওরই চ্যাটাইয়ের ওপর চুপ ক'রে শুয়ে আছে ওর বৌ। পাঁচ-ছ বছর পরে আবার কালামুখ নিয়ে ফিরে এসেছে। সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলো কেউ নেই। বোধহয় যমের দোরেই দিয়ে এসেছে—কে জানে!

রাগে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল ঘুরিয়ার, সে নিঃশব্দে গিয়ে রান্নার জন্যে রাখা একটা চেলাকাঠ নিয়ে বসিয়ে দিলে এক ঘা। বৌটা হাউমাউ ক'রে উঠে বসল! কান্নাকাটি করলে। তারপর বললে, দুটো দিন জায়গা চায় সে, দুদিন পরে কোথাও চলে যাবে।

ততক্ষণে ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়েছে ঘুরিয়া। শুধু প্রশ্ন করলে, 'সেগুলো কোথায়?'

'ছেলে দুটো মার খেয়ে খেয়ে পালিয়ে গেছে। মেয়েটা মরেছে।'

'কে মারত? সেই শালা?' রাগে দাঁত কিড়মিড় ক'রে উঠল ঘুরিয়ার।

কতই বা বয়স তাদের, এখন সাত-আট হবে হয়ত। কোথায় পালাল কে জানে। হয়ত চা-বাগানে ধরে নিয়ে গেছে, কিংবা মরেই গেছে। মরুক গে —সে তো নিজেই মরতে চলেছে—

'এই, ভাত রাঁধতে পারবি?'

'পারব। চাল আছে?'

'না। কিনে আন্। পয়সা নিয়ে পালাবি না তো?'

'ভারি তো পয়সা!'

বউ ভাত রাঁধে, খায়। ঘুরিয়াকেও খাওয়ায়। তারপর পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুরিয়ার রোগের বিবরণ শোনে। রাত্রে পাশাপাশিই শোয়—নইলে স্থান কোথায়? এক্কলস্বামী আসে না সে রাত্রে। কোথায় হয়ত নেশা ক'রে পড়ে আছে। ছেলের অবস্থা দেখে বুঝেছে রান্না ভাত আর পাবার আশা নেই।

বৌটা থেকেই যায়। ঘুরিয়া আর উঠতে পারে না একেবারে। পয়সা নেই, কেউ ধারও দেবে না। ঘুরিয়া আর ভাবে না, সে হাল ছেড়েই দিয়েছে। বৌটা কোথা থেকে মধ্যে মধ্যে যোগাড় ক'রে আনে—দুটি চাল কিংবা পকাড়—পান্তা ভাত। ভিক্ষেই ক'রে বোধ হয়। নইলে কে ওকে দেবে। খাটবার সময় নেই, কাজই বা কি জানে! অন্য রকমে? না —সে চেহারা আর ওর নেই। এককালে ছিল বেশ গোলগাল। এখন তো কঙ্কালসার।

তা বৌটা সেবা করে খুব। কেন যে এল, কোথা থেকে এল—ভেবে পায় না ঘুরিয়া, ভাবতেও চায় না। জগন্নাথের দয়া ধরে নিয়েছে সে।

ঝুলনে দু-চারজন লোক এসেছিল কিন্তু ঘুরিয়া একেবারেই উঠতে পারে না। মধ্যে মধ্যে সে শুধু মিনতি ক'রে বলে বৌকে, 'আমাকে একটু ধ'রে ধ'রে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যাবি?'

'কেন, কি হবে?' অবাক হয়ে যায় সে, 'সে যে অনেকখানি পথ।'

'তবে থাক।' অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'কী জানিস—ঐ আমাদের রোজ-গারের জিনিস, ঐ আমাদের সব। নোনা জল ছাড়া আমরা কি থাকতে পারি? বড় কষ্ট হয়।'

বৌ বসে বসে পায়ে হাত বুলোয় আর বলে, 'তুই একটু ভাল হ—আর একটু জোর পেলে যাস। আমাকে ধরে ধরে যাস বরং—'

ভাল! ভাল কী আর হবে?

হাসপাতালেই যেতে পারে না সে। ওষুধও আসে না। অসহ্য যন্ত্রণা পেটে। মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যায়—তখন কেমন যেন মনে হয় ওর বাপ ডাকছে, 'ওঠ্, ওঠ্, বেলা হয়ে গেছে ঢের—'

চমকে চোখ মেলে দেখে। কান পেতে শোনে সমুদ্রের গর্জন।

বৌকে ডেকে বলে, 'শোন্—যদি আর নাই বাঁচি একথা কটা শুনে রাখ্। মরবার আগে একটু মদ খাওয়াস একদিন। আর শেষ সময়ে যেমন ক'রেই হোক একবার ধরে ধরে কি টেনে টেনেও নিয়ে যাস সমুদ্রের ধারে—'

বৌ উত্তর দেয় না। কদিন চাল নেই। ভিক্ষেও মেলে না। সমুদ্র-তীর জনহীন। এক্কলস্বামী কোথায় সরে পড়েছে, কোন্ ভাইঝি-জামাইয়ের কাছে গিয়ে উঠেছে নাকি। মরণাপন্ন রোগীকে ফেলে খাটতেও যেতে পারে না সে।

পারবে কি বাঁচিয়ে রাখতে পূজো পর্যন্ত? তখন হয়ত আবার বাবুরা আসবে। কিছু পয়সা পেলে রিকশায় বসিয়ে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে পারে।

অতদিন কি বাঁচবে? কে জানে—এখনও প্রায় দেড় মাস।

মনে মনে হিসেব করে সে।

বিষয়

বুড়ী গহ্বরের মতো দন্তহীন মুখখানা হাঁ ক'রে নিঃশব্দে হাসে। খাইমুখ খুবই ছোট, পাতলা পাতলা ঠোঁট—তাই মাড়ি দেখা যায় না—শুধু একটা অন্ধকার শূন্যতা। হাসে প্রাণ খুলেই, কিন্তু আওয়াজ হয় না। অনেকক্ষণ এমনি হেসে নিয়ে বুড়ী বলে, 'এ আবার একটি, কুকুরের মতো গন্ধে গন্ধে এসেছে। চিল শকুনে ভাগাড়ে মরা দেখলে ছুটে আসে, এদের দেখতে হয় না, গন্ধ শুঁকেই এসেছে।'

'আর সেটি? গতবছর পর্যন্ত যাকে দেখে গিয়েছিলুম? গোব্‌রা?'

'পালিয়েছে।'

আবার তেমনি নিঃশব্দ হাসি। দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা চাতুর্য ফুটে ওঠে হাসির সঙ্গে।

হাসি থামলে আমার দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলে, 'বিষয়। বিষয়ের লোভে ছুটে আসে। আরে হতভাগারা আগে বিষ, তারপর বিষয়। বিষ

সহ্য করতে পারবি নি—অমনি অমনি বিষয় ভোগ করবি? জাম্বু বামনি সে মেয়ে নয়।'

আবার হাসি।

দিনকতক আদাজল খেয়ে এইসা পিছনে লাগলুম, পালাতে পথ পেলে না। সব ব্যাটা এসেই আগে বলে—তোমার জন্যে বড় মন কেমন করে, তাই এলুম, আহা বুড়োমানুষ একা একা থাকো—দেখাশুনো করবার তো একটা লোক চাই। আ মর্, দেখাশুনা করার লোক চাই সে কথা কি আমি জানি নি, তোদের ভরসায় বসে আছি? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি! কী বলো নাতি? বামুনের মেয়ের অভাব আছে কাশীতে? একটা যাচ্ছে আর একটাকে রাখছি। রাঁধে, বাজার করে, বাসন মাজে আবার সন্ধ্যেবেলা গা-হাত টিপে দেয়। খোরাক-পোশাক-মাইনে—কে না আসবে! আর ওঁরা, এসে ইস্তক বেড়ালের মতো ছোঁক্ ছোঁক্ করেন কখন কী হাতাতে পারেন!'

'কিন্তু ঝি-চাকররাও তো মেরে পালাতে পারে।' একটু থেমে প্রশ্ন করি।

'পাগল নাকি! আমি জেগে থাকতে? এখনও এক চড়ে তোর মতো জোয়ানকে শুইয়ে দিতে পারি। আর ঘুমন্ত? লোহার খিল ক'রে নিয়েছি দোরে—চাপা মজবুত ছিট্‌কিনি। ঘরের সঙ্গে কলঘর করিয়েছি কি অমনি? দোর বন্ধ ক'রে শুলেই নিশ্চিন্তি!'

আবার সেই নিঃশব্দ হাসি আর দৃষ্টিতে অপরিসীম ধূর্ততা!

একটু হেসে নিয়ে বললেন, 'এমনি মেরে ফেলে ঝি-চাকরের তো লাভও নেই। খুচরো বিশ-ত্রিশের বেশি ঘরে রাখি না। সব ব্যাঙ্ক না হয় পোস্ট আফিসে। সে আমি খুব সেয়ানা—নতুন ঝি চাকর এলেই বাক্স-প্যাঁটরার চাবি যেখানে-সেখানে ফেলে রাখি। ইচ্ছে থাকে বাক্স খুলে দেখুক কি আছে না আছে। যায় অল্পের ওপর দিয়ে যাক। না না নাতি, ভয় এদেরই। মরে গেলে বিষয় এদেরই অর্শাবে—ঝি-চাকররা তো আর মালিক হবে না। তাছাড়া এক বাড়ি ভাড়াটে—কেউ চট ক'রে পালাতে পারবে না।'

মান-সরোবরের এই বিরাট বাড়ি, এছাড়া বাঁশফট্‌কায় একটা, গৌরীগঞ্জে একটা। আরও কোথায় কী করেছে কে জানে। এই এক নেশা বুড়ীর—

একটা বেচে আর একটা তৈরী করে। মুনাফা পায় তো বেচে, নইলে ভাড়া দেয়। লোকসান নেই কোন দিকেই। নতুন তৈরী করা ছাড়াও—পুরানো বাড়ি কেনে জলের দামে। তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাকে মেরামত করে, হয়ত একটা দেওয়াল পালটে দিলে কিংবা একটা থাম—মানে যেগুলো খুব প'ড়ো-প'ড়ো। তারপর চুন ফিরিয়ে রং ক'রে যখন নতুনের মতো হয়ে যায় তখন মোটা লাভে বেচে। এই ব্যবসা, এই জীবিকা।

চমকে ওঠবার কথা কিন্তু এইটেই সত্য।

ব্রাহ্মণের বিধবা, আঠারো বছর বয়সে তিন বৎসরের শিশুপুত্র নিয়ে বিধবা হন। জ্ঞাতিদের বাড়ি ঝিয়ের মতো খেটে, ছেলে মানুষ করতে হয় তাঁকে। শ্বশুরবাড়িতে যে কিছু ছিল না তা নয়—জমি-জমা হয়তো তাঁদের ভাগেও কিছু পাবার কথা কিন্তু সে ভাগ ক'রে দেয় কে? তাছাড়া বুদ্ধিটা তাঁর বরাবরই তীক্ষ্ণ, তিনি বেশ জানতেন যে ও জমি-জমা নিজে দেখে তার আয় থেকে সংসার চালানো মেয়েছেলের সাধ্য নয়। বিশেষত পাড়াগাঁয়ে অল্পবয়সী মেয়েছেলে এ সব কাজ ক'রে বেড়ালে তখনকার দিনে বিষম নিন্দা হ'ত। সুতরাং সে চেষ্টা না ক'রে তিনি একাধারে ঝি এবং রাঁধুনি হয়ে ভূতের মতো খাটতে লাগলেন। কারোর কোন লাঞ্ছনা এবং অনাদরই গায়ে মাখতেন না। স্বাস্থ্য ছিল ভাল, কখনও অসুখ করত না ব'লে বাড়ির অপর স্ত্রীলোকেরা সমস্ত সংসার তাঁর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কেবল একটি বিষয়ে ভদ্রমহিলা কঠিন ছিলেন। সেটা হচ্ছে তাঁর ছেলের ব্যাপার। ওঁর ছেলেকে পয়সা খরচ ক'রে লেখাপড়া শেখাতে হবে—কাকা-জ্যাঠার এ কল্পনা ছিল না কোনকালেই। কিন্তু তিনি জোর ক'রে ইস্কুলে পাঠালেন এবং এ নিয়ে একটু কথা উঠতেই একদিন মাথায় ঘোমটা টেনে ভাসুরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠেই শুনিয়ে দিলেন, 'আমার ছেলের হিস্‌সে আছে এ সংসারে সেটা আমি জানি। এই জমিজমার আয়েই আপনাদের রাবণের গুষ্টি খাচ্ছে—আমার তো একটা ছেলে। এই নিয়ে গোলমাল করবার ইচ্ছে আমার নেই ব'লেই মুখ বুজে দাসীবৃত্তি ক'রে যাচ্ছি। গোলমাল যদি করতেই হয় তো কারুর চেয়ে কম করব না জেনে রাখবেন!… কড়া-ক্রান্তি পাই-পয়সা বুঝে নেব, তা ব'লে দিলুম।'

ভাসুর ওঁর এই স্পর্ধায় অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'একটা ছেলে নিয়ে ঘর করো বৌমা, তোমার সাহস তো কম নয়।'

'একটা ছেলের যদি কোন অনিষ্ট হয় তো—দশটা ছেলে দিয়ে শোধ তুলতে আমি জানি। ঘরে আগুন দিয়ে ঘুমন্ত পুড়িয়ে মারলে ধাড়ী বাচ্ছা এক ঘণ্টাতেই কাবার হবে। আমাকে ঘাঁটাবেন না—ছেলের লেখাপড়া কাপড়-জামা খাওয়া-দাওয়ার কোন ক্রুটি হ'লে রক্ষা রাখব না বলে দিলুম।'

সে কণ্ঠস্বরে ভাসুর দেওররা ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ভয় পাবার আরও কারণ ছিল। ছেলের দোষ দেখে শাসন করলে তিনি কাউকে কিছু বলতেন না—কিন্তু একদিন তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এক দেওর বিনা দোষে ছেলেকে একটা লাঠি দিয়ে মেরেছিলেন। রান্নাঘর থেকে তাই দেখে সটান বেরিয়ে এসে সেই লাঠি কেড়ে নিয়ে এমন এক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন দেওরের কাঁধে যে তিনি তিনদিন ব্যথায় উঠতে পারেন নি।

সেই থেকে গ্রামে তাঁর নাম রটে গিয়েছিল 'খুনে বৌ' কিন্তু আর কখনও কেউ তাঁকে ঘাঁটাতেও সাহস করে নি।

সেই ছেলে, পাঁচ ঠাকুরের দোর-ধরা পাঁচুগোপাল, একসময় এনট্রান্স পাস ক'রে কলেজে পড়তে গেল, কলকাতায়। বড়কর্তা সে সময়ও একবার আপত্তি তুলে ছিলেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন, বৌমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে এসো কলকাতায় থেকে কলেজে পড়বার খরচাটা আসবে কোথা থেকে?' তার উত্তরে 'বৌমা' রান্নাঘর থেকে বেশ চেঁচিয়েই বলেছিলেন, 'বট্‌ঠাকুরকে বলবেন যে পাঁচুর জাঠতুতো ভাইয়ের পড়ার খরচটা যেখান থেকে আসছে সেইখান থেকেই আসবে। বট্‌ঠাকুর তো আলাদা কিছু রোজগার করেন না—পৈতৃক জমি-জমা থেকেই খান।...তবে আবার খরচের কথা তোলেন কোন্ লজ্জায়?'

কিন্তু এফ্.এ. ফেলে ক'রে পাঁচুগোপালের জাঠতুতো দাদা যখন ফিরে এসে দেশে বসল, তখন কিছুতেই পাঁচুর খরচ ওর জ্যাঠা আর দিতে চাইলেন না। সে তখন ডাক্তারী পড়ছে, আর দু বছর পরেই পাস করার কথা। পাঁচুর মা দেখলেন জ্যাঠা কাকা সব একদিকে। বাড়ির কোন ছেলেই লেখাপড়া করে না। সরস্বতীর সঙ্গে অহি-নকুল সম্পর্ক সকলের। সে ক্ষেত্রে ওর জন্য পয়সা খরচ করাটা বাজে খরচ ব'লে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

তিনি এবার বুঝলেন যে আর ভয় দেখিয়ে কাজ হবে না। তিনি তখন প্রস্তাব করলেন যে তাঁর ছেলের আঠারো বছর বয়স হয়ে গেছে, তার সম্পত্তির ভাগ বুঝিয়ে দেওয়া হোক—তাঁরা বেচে কিনে চলে যাবেন। গ্রামের মাতব্বরদের ডাকা হ'ল। কিন্তু যে বেচে কিনে চলে যাবে তার চেয়ে যারা থাকবে এবং যাদের সঙ্গে জীবন কাটাতে হবে তাদের দিকে টান বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। হ'লও তাই—বিচারে স্থির হ'ল যে তাঁর তিন জ্ঞাতি তাঁকে একুনে নশো টাকা দেবে তারই বদলে ওঁরা শ্বশুরের বিষয়ের ওপর সমস্ত দাবী ছেড়ে দিলেন, এই রকম দলিলে সই করবেন, মা ছেলে দুজনেই।

জাহ্নবী ভয় পেলেন না—সই করতে তাঁর হাত কাঁপল না। সেই টাকার ওপর ভরসা ক'রেই ছেলের সঙ্গে কলকাতায় এলেন। টাকাটা পোস্টঅফিসে জমা ক'রে ছেলেকে ব'লে দিলেন, 'ঐতেই তোর খরচা চালা, আমার জন্য ভাবিস নি।'

তারপর তিন বছর তিনি যুদ্ধই করেছেন বলতে গেলে। নিজে এক বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ নিয়েছিলেন, তাতে খাওয়া-পরা চললেও নগদ টাকা বিশেষ হ'ত না। অগত্যা রাত জেগে খুঞ্চেপোশ আর লেস বুনে দুপুরবেলা বিশ্রামের সময়টা ঘুরে ঘুরে তা বিক্রি করতেন। পরীক্ষা দেবার পরও ছেলের খরচ কিছুদিন চালাতে হবে তা তিনি জানতেন—সেই জন্যই এই তপস্যা তাঁর।

ডাক্তারী পাস করার পর পাঁচুগোপাল ভাল চাকরি পেলে কোন্ এক বিলিতী মার্চেন্ট আফিসে। ভাগ্য ফিরল জাহ্নবীর। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া ক'রে ফার্নিচার কিনে বাড়ি সাজিয়ে একদিন মাকে নিয়ে এক সসম্মানে, রাজরানী ক'রে। পাগল ছেলে ঝি আর রাঁধুনী পর্যন্ত রেখেছিল—উনি এসে রাঁধুনীকে তাড়ালেন। ছেলেকে বললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে তোকে পরের হাতে খেতে দেব কেন? ঢের দিন তো মেসের খাওয়া খেয়েছিস।'

ছেলে উপার্জনের সব টাকাই তাঁর হাতে তুলে দিত। মাইনে ছাড়াও উপার্জন ছিল তার। চাকরি পাবার পরই বিয়ে দেবার জন্য জাহ্নবী উঠে পড়ে লেগেছিলেন, কিন্তু পাঁচু এই ব্যাপারে মায়ের কথা শোনে নি। বলেছিল, 'দাঁড়াও মা, আগে একটা বাড়ি করি। দেশের বিষয় থেকে কাকারা

বঞ্চিত করলেন যেদিন, সেদিন থেকেই প্রতিজ্ঞা, আগে ভূসম্পত্তি না ক'রে বিয়ে-থা করব না।'

জাহ্নবী এক বৎসরের মধ্যেই টাকা জমিয়ে কালিঘাট অঞ্চলে সস্তায় জমি কিনলেন, প্ল্যান হ'ল, বাড়ি শুরু হবে, ইটকাট পর্যন্ত বায়না হয়ে গেছে—এমন সময় তিনদিনের জ্বরে পাঁচুগোপাল মারা গেল। মরবার কয়েক মুহূর্ত আগেও বিহ্বল চক্ষু মেলে প্রশ্ন করেছিল, 'মা বাড়ির কত বাকী?'

এই আঘাতে ভেঙে পড়বারই কথা। ভেঙেও পড়েছিলেন জাহ্নবী, প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মধ্যে স্বপ্ন পেলেন, ছেলে যেন তাঁকে বলছে, 'তুমিও ভেঙে পড়লে মা, তবে আমার বাড়ির কি হবে?'

সেইদিন থেকে তাঁর যেন সম্বিৎ ফিরল, ছেলের কাজ বাকী আছে—শেষ করতে হবে তাঁকে। কিন্তু টাকা কোথায়? কি দিয়ে বাড়ি করবেন। যা সামান্য হাতে ছিল তা তো শ্রাদ্ধেই শেষ হয়ে গেছে। তিনি কি খাবেন সেই সংস্থানই নেই, তা বাড়ি।

আকাশ পাতাল ভাবছেন এমন সময় ছেলের আফিস থেকে এক সাহেব এসে তাঁকে ডেকে নগদ দু' হাজার টাকা গুণে দিয়ে গেল। সঙ্গে যে বড়বাবু ছিলেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে জাহ্নবী দেবীর অসহায় অবস্থা বুঝে কোম্পানী থেকে এই টাকা তাঁকে দেওয়া হচ্ছে।

এ যেন দৈবের ইঙ্গিত। অন্ততঃ জাহ্নবী দেবী তাই মনে করলেন। তিনি এ বাসা উঠিয়ে আসবাবপত্র বেচে কালীঘাটে একটি অন্ধকার কুঠরিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং তখনকার দিনের পুরললনাদের যা কল্পনার অতীত ছিল তাই করলেন—নিজে দাঁড়িয়ে মিস্ত্রী খাটিয়ে বাড়ি তৈরী শেষ করলেন। প্রথম প্রথম কিছু জানতেন না ব'লে একটু-আধটু ঠকেছিলেন, কিন্তু তারপরই সবটা আয়ত্ত ক'রে ফেললেন—তখন আর মিস্ত্রীদের ফাঁকি চলল না। এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যেই ওঁর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে গেল।

ছোট একতলা বাড়ি। তারই অর্ধেকটা ভাড়া দিয়ে একখানা ঘরে উনি এসে উঠলেন। বাকী জীবনটা গঙ্গাস্নান এবং পূজাব্রত নিয়ে কাটাবেন এই

ছিল ইচ্ছা।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্য। তাই হঠাৎ একদিন এক খদ্দের এল।

'এ বাড়ি বিক্রি করবেন?'

'না' বলতে গিয়েও জাহ্নবীর কী মনে হ'ল—বললেন, 'ভাল দাম পেলেই করব।'

'কত নেবেন বলুন। আমাদের এখনই চাই—কাজেই ছু-একশো বেশি দিতে আপত্তি নেই।'

জাহ্নবীর জমিসুদ্ধ খরচ পড়েছিল সাড়ে তিন হাজার টাকা। উনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'পাঁচ হাজার পেলে বিক্রী করব।'

আর একটু টানাটানির পর চার হাজার আট শতে ওরা রাজী হ'ল।

জাহ্নবী বায়নার রসিদ লিখে দিয়েই পাড়ায় ঘুরতে বেরুলেন। দিন-তিনেক খুঁজেই একটা অপেক্ষাকৃত বড় পুরানো বাড়ি বায়না করলেন—চার হাজার টাকা দাম ঠিক হ'ল। সে বাড়ি সারিয়ে রং ক'রে মাসকতক পরে বেচলেন সাত হাজারে।

এই শুরু হ'ল। তারপর যে কত বাড়ি করিয়েছেন, এবং কিনেছেন, আবার লাভে বেচেছেন তার ঠিক নেই। জমিও কিনেছেন, বালিগঞ্জ অঞ্চলে চারশো টাকা কাঠা জমি কিনে তেরশো টাকায় বেচেছেন। সেই জমিই আবার কিনেছেন উনিশশো টাকায়, বেচেছেন তিন হাজারে। এই নেশায় পুত্রশোক ভুলেছেন। শুধু অনেক বয়স হ'তে কলকাতার পাট তুলে কাশী এসেছেন। কিন্তু এখানেও ব্যবসা বন্ধ থাকে নি। শুধু এই মান-সরোবরের বাড়িটা বেচেন নি, মনের মত ব'লে। বলেন, 'আর এখন ওঠাউঠি করতে পারি না, বয়স হচ্ছে তো!'

এখন যে-কোন ইঞ্জিনিয়ারকে বাড়ি করা শিখিয়ে দিতে পারেন। ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানকে ডেকে নিজে প্ল্যান এঁকে দিয়ে বলেন, ঠিকমতো কালি বুলিয়ে দিতে। কোন্ মাপের ঘরে হবে জানলে, কত ইট এবং কত চুন-সুরকী লাগবে তার নির্ভুল হিসেব ব'লে দিতে পারেন মুখে মুখে। খাটতেও পারেন এখনও। নিজে গিয়ে মিস্ত্রী খাটান, রাত্রে ফিরে হিসেব নিয়ে বসেন। টাকা-পয়সার হিসেব, ব্যাঙ্কের সুদ, বাড়ি ভাড়া—হাজার রকমের হিসেব তাঁর। খাতাপত্র

ফাইল—দস্তুরমতো আফিস যেন। এখনও চলেন সোজা হয়ে, রাত্রে লুচি ও দুধ খেয়ে হজম করেন—গায়ের জোর যে কমে নি তা তো স্বচক্ষেই দেখেছি, জোয়ান হিন্দুস্থানী মজুর একটা উদ্ধতভাবে কি কথা বলেছিল—এমন টেনে চড় মারলেন যে সে সাত হাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। সকলে স্তম্ভিত হয়েছিল ওর ঐ কাণ্ড দেখে। সে যেদিনের কথা বলছি তখন বয়স ছিল ওঁর সাতাশি—এখন নব্বুই হয়ে গেছে।

ওঁর যে জ্ঞাতিরা দুঃখের দিনে তাড়িয়ে দিয়েছিল বিষয়ে বঞ্চিত ক'রে, দুঃসময়ে তারা যে কেউই খোঁজ নেয় নি তা বলা বাহুল্য। কিন্তু বিষয়ের গন্ধ কি ক'রে ঠিক গিয়ে পৌঁছল। সুসময়ে একে একে সবাই আসতে শুরু করলে, খুঁজে খুঁজে।

আমি বলেছিলুম একদিন, 'তখনই তাড়িয়ে দেন নি কেন?'

বুড়ী উত্তর দিয়েছিলেন, 'পাগল। তা হ'লে আর জব্দ করলুম কি? বিষয়ের লোভে এসেছে, থাক দুদিন। আগে হুল ফোটাই তবে তো মধু। বাড়িতে রেখে দু পায়ে থেঁতলে দুটি ক'রে খেতে দেব। মনে মনে গজরাবে, অথচ মুখে কিছু বলতে পারবে না। মাথা হেঁট ক'রে লাঞ্ছনার ভাত খাবে—তাতেই তো শোধ উঠবে আমার!'

চোখ দুটো প্রতিহিংসার আনন্দে চকচক ক'রে উঠেছিল বুড়ীর।

আজ তেমনি চকচক করছে।

বললেন, 'ইটি আমার ছোট দেওরের মেজো ছেলের ছেলে। ছোট দেওর নিজেই এসেছিল বৌঠাকরুনের খবর নিতে—বছর দেড়েক ছিল আমার কাছে। সে কী মাথা-ব্যথা দিন কতক। বৌঠাকরুন জলখাবার খান, বৌঠাকরুন আপনার পিত্তি পড়বে। বৌঠাকরুন রোদে ঘুরবেন না মাথা ধরবে। বৌ-ঠাকরুন একটু বিশ্রাম করুন। তারপর যখন আর আমার বাক্যবাণ সহ্য হ'ল না, তখন রাক্ষসী ডাইনি ব'লে গাল দিয়ে চ'লে গেল একদিন। তাও তো নাতি শুধুই বাক্যবাণ—খাবার কষ্ট আমি দিই নে তা তো জান। মায় কাপড়-জামাও কিনে দিয়েছিলুম। আগে আগে দু-একজনকে যত্নও করেছি। আমার বড় ভাসুরের ছেলে পা দুটো ধরে হাউ হাউ ক'রে কেঁদেছিল, আপনি ছিলেন

বাড়ির লক্ষ্মী, আপনাকে তাড়িয়ে বাড়ি থেকে লক্ষ্মী চলে গেল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন—এই সব কত কি।…একটু মনটা টলেছিল বৈকি। তারপর ভগবান বুদ্ধি দিলেন, ভাবলুম বাজিয়ে দেখি না। ওমা টোকা মারতেই ধরা পড়ল—ফাটা হাঁড়ি সব কটা।'

একটু থেমে নিঃশব্দে হাসলেন খানিকটা। আবার বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলুম ছোট দেওরের কথা। যাবার সময় ব'লে গিয়েছিল রেখে দে তোর বিষয়। আমার বংশের কেউ কোনদিন অমুক করতেও আসবে না এ বাড়ি। ওমা, বছর তিনেক পরেই খবর পেলুম সেটা টেঁসেছে। ওদের সংসার চলে না এমন দুরবস্থা। বড় ছেলেটা কেঁদে কেটে চিঠি লিখল, শ্রাদ্ধের খরচ ব'লে একশোটা টাকাও পাঠালুম। দিনকতক পরে সে মূর্তিমান নিজেই এল—ইয়া পিলে-লিবার, ম্যালেরিয়ায় মরমর। নিজে শুধু নয়, পরিবার ছেলেপিলেসুদ্ধ নিয়ে হাজির। যতটা পারলুম করলুম। মণার দশা হয়েছিল, হাজার হোক স্বামীর জ্ঞাতি, ছেলের ভাই—রোগের সময় দুঃখ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু ভাল হতেই নিজ মূর্তি ধরলুম। যদি বুদ্ধি থাকত কৃতজ্ঞতা থাকত তো সেটা সয়ে যেত—কিন্তু তিন দিন মুখ ছোটাতেই বৌটা তিড়িং বিড়িং ক'রে লাফিয়ে একেবারে চৌকাঠের বাইরে চ'লে গেল। পেছু পেছু সুড় সুড় ক'রে ছোঁড়াটাও। আপদ গেল ব'লে ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে পেছনে গোবর-ছড়া দিলুম। তারপর এল ওর বড় ছেলে; সেজ দেওরের একটাই ছেলে, সেও দিনকতক চার ফেলে গেল। তুমি যাকে সেবার দেখে গেলে গোব্‌রা, সে হ'ল আমার ভাসুরের নাতি। ওদের বংশে যারা আমার বিষয় টেঁকেছিল তারা প্রায় সবাই টেঁসেছে। সবাই ভাবে বুড়ী আর ক'দিন, আরে তোরা ক'দিন দ্যাখ। এখন আছে ঐ গোব্‌রা, এই কানু—আর দুটো। শুনেছিস নাতি, ওরা নাকি আমার বিষয় দেখিয়ে বিয়ে করে, মেয়ের বাপ দুটো তিনটে এসে খোঁজ ক'রে গেছে; এমনি তো একে মুখ্‌খু, তায় অষ্টোভক্ষধনু-র্গুণো অবস্থা—দেখে শুনে কি ভাল মেয়ে দেয়? আমায় বলে, 'তুমি কি ওদের বিষয় দেবে? তাহ'লে আমরা মেয়ে দিই।'

'আপনি কি বলেন তাতে?' কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি।

'আমি বলি বিষয় তো অনেক পরের কথা। তার আগে বিষ কিনে দিচ্ছি,

নিয়ে গিয়ে মেয়েকে খাওয়ান গে। অমন পাত্তরে দেওয়ার চেয়ে আফিং খাইয়ে মেরে ফেলাও ভাল।'

নিঃশব্দ হাসি খানিকটা। তেমনি কৌতুকপূর্ণ, তেমনি চতুর।

পাতানো সম্পর্ক। তবু একটা স্নেহের সুর বাজে বুড়ীর কণ্ঠে—তাই মাঝে মাঝে আসি। এবারেও পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এসেছি। পৌঁছেই স্নানটান সেরে দিদিমার ঘরে ব'সে গল্প করছি। সামনেই গঙ্গা, বর্ষার পরিপূর্ণতা না থাকলেও যৌবন একেবারে যায় নি। খরস্রোতে বয়ে চলেছে। জানলা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছি। বাড়িটা এমন ভাবেই তৈরী যে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকলে সামনের বাড়ি ঘাট কিছু নজরে পড়ে না, মনে হয় ঠিক এই বাড়ির নিচে দিয়েই গঙ্গা বয়ে চলেছে।

সেদিকে চেয়ে থেকে থেকে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, হঠাৎ কানের কাছে তীক্ষ্ণ কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠে বেজে উঠলো, 'বলি বাজার করতে গিয়ে কোথায় এতক্ষণ আড্ডা মারা হচ্ছিল নবাব পুত্তুরের? ইয়ার-বক্সি জুটেছে বুঝি এরই মধ্যে? বিড়ি তামাক চলছে?'

চেয়ে দেখলুম সতেরো আঠারো বছরের ছেলে একটি। ঘর্মাক্তকলেবরে এক পুঁটুলি বাজার এনে নামাচ্ছে। বুঝলুম এইটিই কানু। সে ভয়ে ভয়ে বললে, 'এই তো গেছি ঠাকুমা। এখনও এক ঘণ্টা হয় নি। এতটা পথ সেই দশাশ্বমেধ যাওয়া—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। বাজার কোথায় আমাকে শেখাতে হবে না। আমি ঘড়ি ধরে আধ ঘণ্টায় ফিরে আসতে পারি বাজার ক'রে। তবু তো আমি নব্বুই বছরের বুড়ী, আর তুই সাজোয়ান ছোকরা।'

'কী জানি। আমি তো জোরে জোরেই গেছি এসেছি—'

'ফের কথার ওপর কথা! জুতো মেরে তাড়িয়ে দেব এখনি। রাস্তার কুকুর, কুকুরের মতো থাকবি। তোর মতো কুকুর তাড়াতে লাঠি লাগে না, লাথিই যথেষ্ট।'

আমারই বাড়াবাড়ি মনে হ'ল এটা। কানুর মুখ এমনিই যথেষ্ট লাল হয়েছিল, এখন যেন জবাফুলের মতো টকটকে হয়ে উঠল। একবার করুণভাবে

আমার দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট করলে সে।

'নাও, আগে হিসেব পত্তর দাও। দেখি ক' পয়সা চুরি করলে। হিসেব ঠিক বুঝিয়ে দেবে জানি। এতক্ষণ কি আর বৃথা গেছে, কোথাও কারুর রকে বসে কি আর হিসেব মিলিয়ে আসো নি। ওসব আমি জানি। তবুও চুরি ঠিক বুঝব।'

কানু যা হিসেব দিলে, তাতে আমার অভিজ্ঞতায় চুরি সে এক পয়সাও করে নি কিংবা করলেও ঐ এক পয়সা পর্যন্তই দৌড়। কিন্তু সে কথা দিদিমাকে কে বোঝাবে? তিনি একেবারে ব'লে বসলেন, 'সাড়ে চার আনা মেরেছ দেখছি। দু বাণ্ডিল বিড়ি আর এক কাপ চা। হুঁ।'

কী সর্বনাশ! এক টাকা সাড়ে চার আনায় সাড়ে চার আনা চুরি! দিদিমা কি পাগল!

প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নিলুম। বুঝলুম যে এটাই ওঁর পরীক্ষা। কানুর সহিষ্ণুতাকে সহ্যের শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে চান।

বিকেলের দিকে কানুকে নির্জনে পেলুম। পথ চিনি না এই অজুহাতে আমিই দিদিমাকে ব'লে ওর ছুটি মঞ্জুর করালুম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে পড়েই কানু যেন ফেটে পড়ল, 'দেখলেন তো, বিনা অপরাধে কী অপমানটা করলেন উনি। মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে।'

আমিও কথাটা সকাল থেকেই ভাবছি, সেই ভাবনারই প্রতিধ্বনি করলুম, 'এমন ক'রে কি পারবে? কতদিন চালাবে এ ভাবে?'

কানু গলায় জোর দিয়ে বললে, 'পারতেই হবে। এতখানি বিষয় আমি হাতছাড়া হ'তে দেব না। নগদ টাকা যা ব্যাঙ্কে আছে তাও হাজার চল্লিশের কম নয়। চারখানা বাড়ি কাশীতে। এ ছাড়া জমি কেনা আছে এখনও কানপুরে অনেকখানি। আমি একদিন লুকিয়ে দলিলপত্র দেখেছি। এ ছাড়া, আবার নতুন ব্যবসায়ে হাত দিয়েছেন। দুখানা সাইকেল রিক্সার লাইসেন্স পেয়েছেন। তাতেও দৈনিক সাড়ে তিন টাকা আয়।'

'কিন্তু তাই ব'লে এত কষ্ট সহ্য ক'রে—'

'কষ্ট তো খাওয়া-পরার নেই। শুধু দুটো মুখের কথা। সে আমি তৈরী হয়েই এসেছি। দেখি কত কথা উনি বলতে পারেন। বাবা জ্যাঠা কাকাদের

মুখে গল্প তো কম শুনি নি—জেনে শুনেই এসেছি।'

'উনি যদি উইল না করেন? যদি এমনি মারা যান? তাহ'লে তো সব জ্ঞাতিরাই সমান পাবে। তুমি এত কষ্ট করবে আর ফল ভোগ করবে সবাই?'

কানুর বুদ্ধিসুদ্ধি দেখলুম বেশ পরিষ্কার। সে বললে, চেষ্টা করব উইল করিয়ে নিতে। নইলে সকলে পেলেও, একটা হিস্সে তো আমি পাবোই। তাই বা কে দিচ্ছে বলুন? লেখাপড়া শিখি নি, এমন যুদ্ধের বাজার গেল, তাই কিছু করতে পারলুম না—তো এখন। চাকরি-বাকরি পাবো না এটা ঠিক। ব্যবসারও টাকা নেই। এইটেই মনে করব চাকরি—কী বলেন? আর একটা কথা কি জানেন, তারাও তো সবাই এই যন্ত্রণা সহ্য ক'রে গেছে, কিছু কিছু ভাগ পাওয়া উচিত। আমি তো তবু ওঁর এই বয়সে এসেছি, ঝাঁঝ ঢের কম। বিরানব্বই হয়ে গেছে, কত দিনই বা বাঁচবেন? বড় জোর পাঁচ ছ বছর? আমারই বা কি বয়স এমন—পাঁচ চ বছর না হয় চাকরের মতো খাটলুমই।'

কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল বিষয়টা কানুর বরাতেই নাচছে।

এরপর যে কদিন রইলাম, তাতে সে বিশ্বাস দৃঢ়তর হ'ল। কানুর ধৈর্যের যেন শেষ নেই। যে গালাগালি এবং লাঞ্ছনা সে সহ্য করে, তাতে পাথরও বোধ হয় বিচলিত হ'ত। তার মুখও মধ্যে মধ্যে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে, কপালের শিরাগুলো ফুলে ওঠে নিরুদ্ধ রোষে—মনে হয় এই বুঝি ফেটে পড়ল—কিন্তু শেষ অবধি সামলেই নেয়। সেবাও খুব করে। বিনা প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরোয় না—দিনরাতই কাছে কাছে থেকে এটা ওটা মুখে যোগায়। সন্ধ্যার পর গা-হাত-পা টেপা তো আছেই। এ বড় কম শক্তি নয়—ঐকান্তিক সেবার বদলে অকৃতজ্ঞ ব্যবহার পেয়েও অবিচলিত থাকা। মনে মনে তারিফ করলাম কানুর। হ্যাঁ, সাধনা বটে।

মাস ছয়েক পরে আবার কাশীতে নেমেছিলাম একদিনের জন্য। কোন কাজ ছিল না, ঐ পথে ফেরার সময় কৌতূহল প্রবল হওয়াতেই নেমে পড়লাম।

দেখি শ্রীমান কানু এখনও টিকে আছেন। তবে উন্নতি হয়েছে নিশ্চয়ই —ভাল দামী জামা উঠেছে গায়ে, জুতোটাও বেশ মূল্যবান। দিদিমারও উন্নতি হয়েছে—কটুবাক্য বলছেন তবে তাতে আগের ঝাঁঝ আর নেই। এবং কথায় কথায় অপমানও করেন না। কানু বাজারে বেরিয়ে যেতে চুপিচুপি বললেন, 'ছোঁড়াটা বোধ হয় টিকল রে। সাত চড়েও রা করে না যে।'

'আপনিও অনেকটা নরম হয়েছেন।'

'না হয়ে করি কি বল। বলে পায়ে-পড়ারে ছাড়া ভার। জুতো খেয়েও পরের মুহূর্তে এসে যে পা টিপতে বসে, তাকে কি বলব ? আমারও তো একটা বিবেচনা আছে। বিষয় যখন একজনকে দিয়ে যেতেই হবে—যে এত সহ্য করছে তাকেই দিয়ে যাবো, আর কতদিন এমন বাছাই করব।'

এই সুযোগে আমি কথাটা পাড়লুম, বললুম, 'তা মন যখন স্থির ক'রেই ফেলেছেন তখন এইবেলা একটা লেখাপড়া—'

'ওরে আমি কি এতই বোকা ? আমি অবশ্য এখনই মরব না তা জানি। তবু ওকে লুকিয়ে উইল আমি একটা করে ফেলেছি। ওকে জানতে দিই নি, তাহ'লে ছোঁড়া পেয়ে বসবে।'

বুড়ীর মন খুবই নরম হয়েছে দেখলুম। একটু থেমে রীতিমতো স্নেহকোমল কণ্ঠেই বললেন, 'ছোঁড়ার পাঁচ টাকা ক'রে হাত-খরচেরও বরাদ্দ ক'রে দিয়েছি। বড় হয়েছে বিড়ি সিগারেট খায় নিশ্চয়ই। নইলে চলবে কি ক'রে ? আমার এক-একদিন ওর ঐ গায়ে-পড়া দেখে কি মনে হয় জানিস নাতি, আমার পাঁচুগোপালই বুঝি আর এক জন্ম ঘুরে আমার কাছে এসেছে। নইলে এত বিষ সহ্য ক'রেও কি পড়ে থাকতে পারত ?'

কানুকে মনে মনে অভিনন্দিত করলুম। ছোকরার এলেম আছে—বংশে এতগুলো লোক যা পারে নি তাই ও সম্ভব করলে। বাহবা!

আরও মাস-ছয়েক পরে, কানু বা দিদিমার কথা যখন ভুলেই ব'সে আছি, অকস্মাৎ টেলিগ্রাম মণিঅর্ডারে চল্লিশটা টাকা এসে পৌঁছল, সেই সঙ্গেই দিদিমা লিখেছেন, 'একবার এসো। খুব জরুরী।' পাকা কাজ বুড়ীর—টাকার কথা ভুল হয় নি। তখনও ট্রেনের সময় ছিল, পাঞ্জাব মেলে রওনা হয়ে গেলুম। পৌঁছতেই দোরের কাছে দিদিমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই

কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'এসেছিস নাতি। ওরে, দুর্দিনে তুই ছাড়া আর কারুর কথা মনে পড়ল না। তাই তোকেই টেনে আনতে হ'ল।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'কী কুক্ষণেই যে মনে হয়েছিল যে পাঁচুগোপালই আবার ফিরে এসেছে। বিশ্বনাথ যে ছেলের সেবা আমায় নিতে দেবেন না, তা ভুলেই গেছি। ছোঁড়ার বিয়ে দেব সব ঠিক-ঠাক—আর দুদিন পরেই বিয়ের তারিখ। এমন সময় অসুখে পড়ল।'

'কি অসুখ?'

জ্বর। প্রথমে অত গ্রাহ্য করি নি। তারপর বাঁকা দাঁড়াল। শুনলুম টাইফয়েড। বড় ডাক্তার ডাকলুম। কাল শুনলুম ওর ওপর প্লুরিসিতে দাঁড়িয়েছে। তাইত ভয় পেয়ে তোকে তার করলুম। আমি আর ছুটোছুটি করতে পারি না—পা যেন এইবার ভেঙে আসছে। তা ছাড়া মনের জোরও গেছে, হাত-পা পাই না কোন কাজে। কাকে ডাকব বল, ওর যে জ্ঞাতিরা আছে তারা এসে ওকেই মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে, জানে যে ও ম'লে বিষয় তারা পাবে। এই এক হয়েছে জ্বালা। বাড়ির লোককেও বিশ্বাস নেই। তুই বাবা যেমন ক'রে হোক ওকে বাঁচিয়ে তোল্। যেখানে যা ডাক্তার আছে নিয়ে আয়—খরচের জন্যে ভাবিস নি। যাতে ভাল হয় তাই কর্।'

কানুকে দেখলাম। খুবই দুর্বল—আমাকে দেখে ওর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'আমি কি বাঁচব না দাদা—এত কষ্ট বৃথা হবে?'

উৎসাহ দিলুম, 'ভয় কি? বড় ডাক্তার আনছি।'

যেখানে যত ডাক্তার ছিল প্রায় সব জড়ো করলুম। বাড়ির লোকের ওপর দিদিমার সন্দেহ ব'লে নার্স ঠিক করলুম। দিনেরাতে দু'জন পালা ক'রে থাকবে। বুড়ীও ঠায় বসে রইল। এককালে এই বাড়িতে যে কেনা গোলামের মতো ছিল, তারই চিকিৎসায় রাজকীয় আয়োজনের কোন ত্রুটি হ'ল না। প্রত্যহ আড়াইশো টাকা ক'রে বেরিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আরও দিন আষ্টেক ভুগে ও ভুগিয়ে কানু একদিন পার্থিব বিষয়ের মায়া কাটাল চিরকালের মতো।

দিদিমা প্রথমটায় আছড়ে পড়েছিলেন কিন্তু তারপরই সামলে. নিলেন। নিজে গেলেন মণিকর্ণিকা পর্যন্ত। বললেন, 'পাঁচুর মুখে আগুন দিয়েছি যখন তখন এটাই বা বাকী থাকে কেন, আমার সব সইবে।'...

পরের দিনই দিদিমা উকিল ডেকে পাঠালেন। উইল বদল করতে হবে। আমাকে সাক্ষী রেখে পুরানো উইল বাতিল ক'রে বিষয় তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে দান করলেন। শুধু কিছু কিছু নগদ টাকা তাঁর পুরানো রাঁধুনি ও ভাড়াটেদের দিয়ে গেলেন। অবশ্য এ সবই তিনি মরবার পর অর্শাবে। উইল ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না—গাড়ি ডাকিয়ে আদালত পর্যন্ত গিয়ে রেজেষ্ট্রী ক'রে দিলেন।

আমি নিরস্ত করার চেষ্টা করলুম, 'এত তাড়াতাড়ি কি দিদিমা, দুদিন পরেই না হয় হ'ত।'

কেমন একরকম অদ্ভুত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু হাসলেন। মুখে শুধু বললেন, 'না। আজই সারতে হবে।'

সন্ধ্যের সময় আমার ডাক পড়ল। নির্জন ঘরে দোর বন্ধ ক'রে আমার হাতে গুণে দিলেন নগদ দু হাজার টাকা। বললেন, 'শাস্ত্রমতে যা করবার সবই কানুর জন্যে করতে হবে। কোন ত্রুটি না হয়। বাহুল্যের দরকার নেই—তবে কাঙালী খাইও কিছু।'

ব্যাকুল হয়ে বলতে গেলুম, 'আর আমাকে কেন দিদিমা—'

এ কী বিপদে আমাকে জড়াচ্ছে বুড়ী। ভাড়াটে সম্পর্ক মা ওঁকে 'মা' বলেছিলেন, সেই সুবাদে দিদিমা বলি। আমি এর মধ্যে কী করব ?

'তুমি ছাড়া. আর কে করবে ভাই ? যাকে দেব সেই তো চুরি করবে। এইটি উদ্ধার ক'রে দিয়ে যাও। যদি বেঁচে থাকি তো পিণ্ডিটা আমিই দেব, নইলে যাকে দিয়ে হোক সেরো। তবে কানুর জন্যে হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করবে—বাকি হাজার রইল আমার শ্রাদ্ধের জন্যে। জ্ঞাতিদের কাউকে খবর দিতে হবে না। এটা তুমিই ক'রো। আর একটা কথা, উইলের তুমি অছি, তাই আর সেখানে কিছু দিতে পারি নি—এই গয়নার বাক্সটা তুমি নিয়ে যাও। কানুর বৌয়ের জন্যে গড়িয়েছিলুম। প্রায় চার হাজার টাকার গয়না—এ যেন তোমার বৌয়ের ভোগে লাগে।'

'আঃ! এসব কথা এখন থাক না।'

'উহুঁ।' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন দিদিমা, 'থাকলে চলবে না। এতকাল পাঁচু গেছে, একদিন ছাড়া তাকে স্বপ্ন দেখি নি। আজ ভোরে তাকে দেখেছি। বুঝেছি এতদিনে মনে পড়েছে মাকে। হয়ত ডাক এসেছে এইবার। তৈরী থাকি। গয়না যে তোমাকে দিলুম তা লেখা আছে ঐ বাক্সের মধ্যেই।... এইবার তুমি শুতে যাও।'

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙল রাঁধুনির কান্নায়।

এত বেলা হয়েছে উঠছেন না দেখে সে গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গেছে। শরীর কাঠ আর ঠাণ্ডা। ঘুমের মধ্যেই বুড়ী কখন মারা গেছে—কেউ টের পায় নি।

প্রেরণা

খেয়া একটা পারাপার করে বটে, কিন্তু শুধু খেয়াঘাট সেটা নয়। ভেতরের দিকে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে নৌকো ছাড়া যাওয়া যায় না। সেই সব গ্রামের যাত্রীদের জন্যই সকালে ও বিকেলে একটা করে বাস ছাড়ে, একেবারে মহকুমা শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। ঐ একটিই বাস—দুবার যাতায়াত করে। কোনদিন কল বিগড়ে গেলে স্থানীয় লোকদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। একটা ভাঙা ঝরঝরে গাড়ি আছে, ট্যাক্সি নামটা তার পক্ষে অতিশয়োক্তি, সেইটেই সে-সব দিনে একমাত্র ভরসা। ঐ যাত্রী-বাসের মালিকরাই তখন সেটা চালান এবং তদাকার একখানা মোটরগাড়িতে বারোজন পর্যন্ত অনায়াসে তোলেন।

বাস খারাপ না হ'লে কিন্তু সে গাড়িও আসে না। নিতান্ত 'মেল' কন্ট্রাক্ট আছে বলেই সেটা তখন বার করতে হয়, নইলে এ রাস্তায় ট্যাক্সি আনলে নাকি গাড়ির আর কিছু থাকে না। সুতরাং—উর্মিলা যখন নৌকো থেকে সেদিন এসে নামল তখন শেষ বাস ছেড়ে গেছে এবং শহর পৌঁছবার আর কোন যানবাহনই পাওয়া তখন সম্ভব নয়। অবশ্য বাসওয়ালাদের দোষ দেওয়া যায় না, কেন না তাদের গিয়ে ট্রেন ধরাতে হবে, তবু তো ছাড়বার সময়ের পুরো

উনিশটি মিনিট পরেই ছেড়েছে তারা।

উর্মিলা একবার অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকাল। বুড়ো মাঝির জন্যই এই কাণ্ডটি হ'ল—কিছুতেই সে জোরে বাইতে পারলে না, বখশিশ দেবার বহু রকম প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও না। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই, আকাশের দিকে চেয়ে উর্মিলা বহুক্ষণই বুঝতে পেরেছে যে তার অদৃষ্টে আজ বহু দুঃখ আছে। ওর হাতঘড়ি ছিল না সঙ্গে, কিন্তু সাড়ে পাঁচটার বাস যে আর থাকা সম্ভব নয়, তা বেলার দিকে চাইলেই বোঝা যায়, ঘড়ি দেখতে হয় না।···তবু একটা ক্ষীণ আশা হয়ত কোথায় ছিল, সেটুকুও নদীর পাড় ভেঙে ওপরে উঠতেই একেবারে চলে গেল। বাস তো নেই-ই, ঘাটে একটা লোক পর্যন্ত নেই। যাত্রী কম বলে সব সময়ে এখানে দোকানপাট থাকে না, সকালে বাসের সময় থেকে বিকালের এই সময়টা পর্যন্ত, তারপরই সব ঝাঁপ ফেলে বাড়ি ফিরে যায়। আর দোকানও তো ভারি! গোটা-দুই চা, পানবিড়ি, খাবারের দোকান, তারই সঙ্গে দরকার মতো দু'একটা মনোহারী জিনিসও থাকে আর একটা আছে শুধুই বিড়ির দোকান। এছাড়া দুপুরবেলায় গাছতলায় একটা নাপিত, একটা মুচিও বসে। কিন্তু সেও ঐ বাসের সময় পর্যন্ত, তার-পর কারুর টিকি দেখা যায় না।

অবস্থাটা শুধু বিরক্তিকর নয়, বিপজ্জনকও বটে। দক্ষিণ বঙ্গের নিবিড় জঙ্গল চারিদিকে, তারই মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসে স্থানটাকে রীতি-মতো ভয়াবহ করে তুলেছে। বাঘ তো এখন এধারের জঙ্গলে থাকেই, সুন্দর-বনের এত কাছে যখন, তখন রয়াল বেঙ্গলও থাকা বিচিত্র নয়। তা ছাড়া, রাজনীতি করতে এসে না হয় পুলিসের ভয় ত্যাগ করতে হয়েছে, তাই বলে চোর-ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ের ভয় থাকবে না এমন কোন কথা নেই। ভয়ে উর্মিলার গা ছমছম্ করতে লাগল। পূর্ণেন্দুর কথা শুনে আজকের রাতটা ওদের ওখানে থাকলেই হ'ত, কাল সকালেই সে আসবে, উর্মিলাকেও সেই সঙ্গে আসবার কথা বলছিল ; কিন্তু কী যে ওর দুর্মতি হ'ল—কাল সন্ধ্যায় কলকাতায় মিটিং আছে এই অজুহাত দেখিয়ে ও কিছুতেই থাকতে রাজি হ'ল না। অবশ্য মিটিং আছে ঠিকই, খুব জরুরী মিটিং তাতেও সন্দেহ নেই, কিন্তু সে এমন কেউ নয় যে সে না গেলে সভা বন্ধ থাকত, কিংবা কোন বিশেষ প্রস্তাব 'পাস' হ'ত

না। তার এমন কিছু বলবারও নেই, বক্তৃতা দিতে ভালও লাগে না। ওটা শুধুই বাহাদুরী। পূর্ণেন্দুর কণ্ঠে 'স্ত্রীলোক' বলে যে একটা আশঙ্কার সম্ভাবনা উঁকি মেরেছিল—সেইটের জবাব দিতেই কতকটা সে জোর করে বেরিয়ে পড়ল। দেশের কাজে যখন নেমেছে, তখন আবার পুরুষকে ছাড়া একা ভ্রমণ করতে পারবে না—এমন কোন দুর্বলতা উর্মিলার নেই। পূর্ণেন্দু দেখুক যে উর্মিলা ঠিক সাধারণ মেয়েছেলে নয়—সে একাই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে।

তবে এ সম্ভাবনাটা তখন মনে হয় নি একবারও। আর সময়ও ছিল ঢের, সব মাটি করলে ঐ বুড়ো মাঝিটাই। এ-ও পূর্ণেন্দুর একটা চালাকি। বিশ্বাসী লোক বলে বেছে বেছে ঐ বুড়ো মাঝির নৌকোই সে ডেকে আনলে। যেন অন্য মাঝিরা ওকে খেয়ে ফেলত মাঝপথে বা খুন করত!—এখন ও কি করে!

নিচের দিকে চেয়ে দেখলে যে, দিনের বাকি আভাসটুকুকে কাজে লাগাবার জন্য ইতিমধ্যেই বুড়ো নৌকো ফিরিয়েছে বাড়ির দিকে। ভাটার টানে সেটা চলেও গেছে অনেকটা, ওর ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বান এখন আর তার কাছে পৌঁছবে না। খেয়ানৌকোটা ওপারে রেখে মাঝি বাড়ি গেছে। বাস ছেড়ে গেলে আর যাত্রী থাকে না, খেয়া-চলাচল পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কাছাকাছি গ্রাম নেই, অন্তত ওর চোখে পড়ল না। কতদূরে আছে কে জানে। প্রশ্নই বা করবে কাকে। আর কিছু না হোক, একটা আশ্রয় তো চাই রাত্রে!—এতবার মহামান্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পুলিসবাহিনীর হাত এড়িয়ে এসে শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটে সে যেতে পারবে না কিছুতেই।

কিন্তু সত্যিই কি কেউ নেই?

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে ওর নজর পড়ল বিড়ির দোকানের পেছন দিকে একটি ছোক্‌রা দাঁড়িয়ে দোরে তালা লাগাচ্ছে। সে এতক্ষণ ভেতর থেকে দোকান বন্ধ করছিল বলেই চোখে পড়ে নি! যাক—তবু মানুষের মুখ দেখা গেল। উর্মিলার মুখ আশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলে, 'শোনো, এখানে কি গাড়ি-টাড়ি কিছু পাওয়া যায় না? নিদেন গোরুর গাড়ি?'

ছেলেটি এতক্ষণ ভেতরে ছিল বলে ওর অস্তিত্ব বোধ হয় টেরই পায় নি, হঠাৎ গলার আওয়াজে চম্‌কে উঠল, 'কে গা? কী বলছ?'

ঊর্মিলা ওর দিকে চেয়ে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, হয়ত বা অকারণেই। মানুষটিকে যেমন মনে করেছিল ও তেমন নয়—তার চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ। বড়জোর উনিশ কুড়ি বছর বয়স, বেশ জোয়ান চেহারা, গায়ের রং মিশ্‌ কালো। চোখ দুটিতে আদিম সরলতা ও কৌতূহল মাখানো, ঊর্মিলাকে দেখে যেন বিস্ময়ের অন্ত নেই ওর। ঊর্মিলা ওর দিকে চেয়ে একটু যেন থতিয়ে গিয়ে বললে, 'বলছিলুম, এখানে কোন গাড়ি পাওয়া যায় না?'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে একটু কৌতুক খেলে গেল। প্রশ্ন করল, 'তোমার দেশ কোথা? কোত্থেকে আসছ?'

সেই আদিম প্রশ্ন। এখানকার কোন পল্লীগ্রামেই এ প্রশ্নটির উত্তর না দিয়ে নিজের কোন প্রশ্নের জবাব পাবার উপায় নেই। বিরক্ত কণ্ঠে ঊর্মিলা বললে, 'বাড়ি আমার কলকাতা। গাড়ি পাওয়া যাবে কি? শহরে যাব—'

'গাড়ি? হুঁ!' ছেলেটা হেসে উঠল, 'এখানে গাড়ি কোথা!'

'গোরুর গাড়িও পাওয়া যায় না?'

'যায়, দিনের বেলা। রাতের বেলা বাঘের মুখে পড়বে কে বলো!'

ঊর্মিলার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা শিহরণ বয়ে গেল। সে উদ্বিগ্ন মুখে বললে, 'কোনরকম গাড়ির ব্যবস্থা কি করা যায় না? আচ্ছা, ঐ নৌকোটা তো আমাকে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারে? যাবো রতনপুর।'

'ও তো খেয়ানৌকো। মাঝি সারাদিন খেটেছে, এখন দূর পাল্লায় যেতে চাইবে না। তাছাড়া পারানি-নৌকো ঘাট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার আইন নেই।'

'তবে?' ঊর্মিলার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'তবে আমি এখন যাবো কোথায়?'

এবার ছেলেটির চোখে অনুকম্পা ফুটে উঠল। সে একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'গ্রামে যাবে?'

'গ্রাম কত দূর?'

'তা প্রায় আধকোশ রাস্তা হবে।' বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে জবাব দেয় সে।

এই অন্ধকারে এক মাইল রাস্তা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটা? ঊর্মিলা শিউরে উঠল, 'সে আমি পারব না! একা যেতে পারব না। তবে তুমি যদি যাও—'

আমি তো যাবো না।'

'কেন? তোমার বাড়ি কোথায়? গ্রামের মধ্যে না?'

মাথা নেড়ে ছেলেটা জবাব দেয়, 'গ্রামে বাড়ি আছে, তবে বাড়িতে কেউ নেই, আমি এইখানেই থাকি। ঐ যে পথের পাশে ঐ চালাটা, ওখানে। ওটা আমিই তুলেছি—' সগর্বে বলে সে।

চালাটা এত ছোট, এবং এমন ভাবেই বাঁশঝাড় ও কাঁঠাল গাছের মধ্যে ঢেকে আছে যে এতক্ষণ ঊর্মিলা দেখতেই পায় নি! এইবার ঠাউরে দেখলে। কিন্তু এখন উপায়?

হঠাৎ ছেলেটা প্রশ্ন করল, 'তোমার সঙ্গে মরদ ছাওয়াল কেউ নেই? কেমনতরো মেয়েছেলে তুমি!'

রাগে ঊর্মিলার মুখ লাল হয়ে উঠল, কান দুটো হয়ে উঠল গরম। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'আমরা শহরের মেয়ে, আমাদের সঙ্গে পুরুষ দরকার হয় না, আমরা একাই যেতে পারি! দেশের কাজ ক'রে বেড়াই আমরা জানো না? পুলিস পর্যন্ত আমাদের ভয় করে।'

'তবে গ্রামে চলে যাও না সোজা। ভয়টা কি?'

ঊর্মিলা টপ্ ক'রে উত্তর দিতে পারলে না। একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'বাঘের ভয় আছে যে! নইলে—আচ্ছা, তুমি আমাকে পৌঁছে দাও না?'

মাথা নেড়ে বললে সে, 'সে আমি পারব না। আমার বুঝি বাঘের ভয় নেই!'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে কী ভেবে সে বললে, 'আমার ঘরে থাকবে রাত্তিরে? এখন আর কোথায় যাবে নইলে?'

ততক্ষণে অন্ধকার বেশ ভাল ক'রেই নেমেছে। নিবিড় নিস্তব্ধ বনের মধ্যে দিয়ে বাসের রাস্তাটা বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। কোথাও কোন লোক নেই—লোকালয়ও নেই। এমন করে তো থাকা যায় না। আশ্রয় একটা চাই-ই, যেমন ক'রে হোক। প্রায় মরীয়া হয়েই ঊর্মিলা বললে, 'চলো, তাই যাবো।'

নিতান্তই ছোট একটা কুঁড়ে—সামনে মাটির দাওয়া এক ফালি। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রও তথৈবচ। একটা খেজুর পাতার চ্যাটাই পাতা এক পাশে, তাতে একটা ময়লা কাঁথা এবং ততোধিক ময়লা ছেঁড়া বালিস পড়ে আছে। সেদিকে চাইলে গা বমি-বমি করে—এতই ময়লা সেগুলো। ছেলেটা এক টান দিয়ে পায়ে ক'রে কাঁথা-বালিশগুলো সরিয়ে দিলে, তারপর বললে, 'ব'সো। মুখ হাত ধুয়ে আসি আমি।'

একটা মাটির কলসী হাতে সে নিমেষে পিছনের বাঁশবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিস্তব্ধ ঘর। বাইরেটা আরও শব্দহীন। কেমন যেন গা ছম্‌ছম করে ঊর্মিলার। সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজার কাছে, ভেতরে এসে বসতে সাহসে কুলোয় না। একটু পরেই ঘরের মালিক ফিরে এল এক কলসী জল কাঁধে। ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, 'ঐ! বসো নি যে! আরে ব'সো ব'সো—'

তারপর কী মনে হ'ল ওর। একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসি হেসে বললে, 'ঘেন্না করে—না? শহরের মেয়ে তোমরা!' এই বলে হঠাৎ কোঁচা দিয়ে চ্যাটাইটা ভাল ক'রে ঝেড়ে দিলে। তারপর বললে, 'এবার ব'সো। নয়ত মুখে হাতে একটু জল দিয়ে নাও।'

ঊর্মিলা মাথা নেড়ে বললে, 'কিছু দরকার নেই। ও তো পুকুরের জল? ওতে ম্যালেরিয়া হয়। ও জল মুখে দিতে পারব না।'

একটুখানি ভ্রূ কুঁচকে সে বললে, 'জল এ পুকুরের ভাল। সবাই খায়। তা, নদীর জল এনে দেব?'

'না, না, দরকার নেই। আমি এমনিই বসছি।'

সে জুতো খুলে কোনমতে চ্যাটাইটার একধারে বসে পড়ল।

তারপর একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। একটু পরে ঊর্মিলা প্রশ্ন করলে, 'ভোরে বাস আসে কখন্?'

'সে সেই যার নাম আটটা। ন'টায় ছাড়ে।' আরও একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে সে, 'তাই তো! ভারি মুশকিলের কথা হ'ল তো!'

'কী মুশকিল?' ভীত চোখ তুলে তাকাল ঊর্মিলা।

'তুমি খাবে কী ? মিষ্টির দোকান তো সব বন্ধ ক'রে চলে গেছে। আমার দোকানে আছে শুধু বিড়ি আর দেশলাই। লজঞ্চুস আছে বটে ক'টা। তা তো আর খেতে পারবে না।'

'আমার কিছু দরকার নেই। কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।'

কিন্তু সেদিকে সে কোন কানই দিলে না। মনে মনে সে খানিকটা কি ভেবে নিয়ে বললে, 'আচ্ছা, আমি তো রান্না করবই। তুমি কি আমার হাতে খাবে ? আমরা কিন্তু জাতে গোয়ালা।'

তারপর যেন কতকটা খাপছাড়া ভাবেই বললে, 'আমার নাম রাজু। রাজু ঘোষ।'

ঊর্মিলা মাথা নেড়ে বললে, 'জাত-ফাত মানি নে অবশ্য আমরা। মানুষ মানুষই, তার আবার জাত কি ! তবে আমার জন্যে কিছু রাঁধবার দরকার নেই।'

'সে কি একটা কাজের কথা হ'ল। এতবড় রাতটা কাটবে কিসে ?' রাজু মাথা নেড়ে বিজ্ঞভাবে বললে, 'তবে আমাদের মোটা চালের ভাত—ঐ যা হয় ক'রে ঢুটো খেয়ো।'

সে উঠে পড়ল। ঘরেরই এক কোণে একটা কাঠের উনুন, তার ওপর সিকেয় একটা পোড়া হাঁড়ি ঝোলানো। রান্নার সরঞ্জাম বলতে তো ঐ। আর এক কোণে ছু'একটা হাঁড়িকুড়ি, বোধ হয় চাল ডাল থাকে। একখানা কলাইয়ের থালা আর অ্যালুমিনিয়মের বাটি গোটা ঢুই—সংসার বলতে ওর মোটে এই।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে ঊর্মিলা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'তোমার কেউ নেই ?'

'না।'

'মা বাবা—কেউ না ?'

'না।' বেশ সহজ কণ্ঠেই বললে রাজু, 'মা ছিল, মরে গিয়েছে গত বছর। তার পর থেকেই আর বাড়ি যাই না।'

সে উঠে গিয়ে বাইরে কোথা থেকে কাঠকুটো, শুক্‌নো নারকেল ও খেজুর পাতা যোগাড় করে আনল। কলসীর জল গড়িয়ে হাঁড়িটাও ধুলে। তারপর উনুনটা জ্বালাতে গিয়ে কিন্তু কী মনে ক'রে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটুখানি

চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মূলেই ভুল! আমি খাই নুন-ভাত অর্ধেক দিন, সে তো আর তুমি পারবে না! ঘরে কিছুই নেই। হয়ত চারটি ডাল পড়ে আছে, কিন্তু শুধু ডাল দিয়ে···ঠিক হয়েছে, ব'সো, বাইরে থেকে গোটাকতক কাঁচকলা পেড়ে আনি—'

ঊর্মিলা বিষম ব্যস্ত হয়ে ওকে বাধা দিতে গেল। কিন্তু তার আগেই রাজু বেরিয়ে গেছে, তাছাড়া ঊর্মিলার এরই মধ্যেই ক্ষিধেটা যে রকম পেকে উঠেছে তাতে সারারাত নিরম্বু কাটানো কতটা যুক্তিযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে এর ভেতরেই বেশ একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে ওর।···অবশ্য রান্নার যা সাজসরঞ্জাম, তাতে খেতে ইচ্ছে করে না ঠিকই,—কিন্তু মনে মনে নিজেকে ধমক দেয় ঊর্মিলা, দরিদ্র ভারতবাসী, অসহায় মূর্খ ভারতবাসী ওদের ভাইবোন। তাদের সঙ্গে সহজে না মিশতে পারলে কিছুতেই তাদের উন্নতিসাধন করতে পারা যাবে না। দেশের কাজে যে জীবন উৎসর্গ করেছে তার এত ঘৃণা থাকা ঠিক নয়।

মিনিট কয়েক পরেই গোটা কয়েক সদ্য-পাড়া কাঁচকলা ও তিন-চার থোলো ডুমুর নিয়ে রাজু ঘরে ঢুকল। হেসে বললে, 'এইতেই যা হয় হবে আজ। তবে তরকারি-ফরকারি আমি রাঁধতে জানি নে। ভাতেই ছেড়ে দেব— কেমন?'

হঠাৎ ঊর্মিলা উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আমিই রাঁধছি রাজু। তুমি আমাকে একটু যোগাড় করে দাও।'

রাজু বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'সে কি কথা! সে তুমি পারবে না। শহরের লেখাপড়া-জানা মেয়ে তোমরা, উনুনের ধারে যেতে পারো কখনো। হয়ত কাপড়ে আগুন ধরিয়েই ফেলবে।'

'কিচ্ছু হবে না। রান্না আমার অভ্যাস আছে।···তুমি তো রোজই রাঁধো, একটি দিন আমিই রেঁধে খাইয়ে যাই।'

এই বলে সে ভ্যানিটি ব্যাগটা বাঁশের একটা খোঁচায় ঝুলিয়ে রেখে শাড়ির আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিলে।

ঊর্মিলা রান্না করে আর রাজু অবাক্ হয়ে দেখে। বাস্-লাইনের ধারে দোকান করে সে, হরেক রকমের লোক আসে যায়, নানা রকমের কথা হয়

সেখানে। তাতে সবটা ঠিক না জানলেও এইটুকু একটা আবছা ধারণা ওর হয়েছিল যে, এই শ্রেণীর লেখাপড়া-জানা মেয়ে-মরদরা কোন কাজই জানে না, কিছুই করে না ওরা ঘরে। এখন উর্মিলাকে গুছিয়ে রান্না করতে দেখে ওর কেমন একটা বিস্ময় লাগে মনে মনে। অবশ্য কাঠের জ্বালটাতে উর্মিলার অসুবিধা হচ্ছে বটে—ধোঁয়াতে ওর ডাগর চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে, অনবরত ফুঁ পেড়ে পেড়ে মুখও হয়ে উঠেছে রক্তবর্ণ। চোখের জল আর কপালের ঘামের সঙ্গে মাথার দু-একটি চুল এবং নারকেল পাতার ছাই জড়িয়ে যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে।···মেয়েছেলে বলতে রাজু যাদের দেখেছে তারা ওর সেই আত্মীয়া ও গ্রামবাসিনী। এ ছাড়া অন্য কোন মেয়ের দিকে এতদিন ভাল ক'রে তাকিয়েই দেখে নি। শহুরে মেয়েদের সম্বন্ধে কানে যা শুনেছে তা মনে পৌঁছয় নি ওর। বন্য এবং সরল অনভিজ্ঞতাতেই অনায়াসে ও উর্মিলাকে 'তুমি' বলতে পারছিল, কোথাও বাধে নি। এখনও সেই সহজ সম্বোধনের মধ্যে কোন অসৌজন্যই খুঁজে পায় নি ও। তবু সবটা জড়িয়ে ওর মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব জাগে। আর এটা বেশ বুঝতে পারে যে এরা ঘরকন্নার কাজ করে না বটে, তবে ইচ্ছে করলে সব পারে।

অবশেষে এক সময়ে রান্না শেষ হয়। রান্না তো ভারি। ভাত, ডাল আর একটা কাঁচকলা-ডুমুরের তরকারি। তা-ও হলুদ এবং কাঁচালঙ্কা ছাড়া কোন মশলা নেই। তবু ওর ভিতরেই গুছিয়ে রাঁধে উর্মিলা, এ যেন ওর-ও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। কতদিন পরে রাঁধল ও—কিন্তু সেটাই সব নয়। যেখানে এবং যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে, যেভাবে ওকে রাঁধতে হ'ল—সেটা যেন নিজে ক'রেও বিশ্বাস হয় না। সব শেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে ও বলে, 'এইবার একটু মুখ-হাত ধোয়ার দরকার—জলে ম্যালেরিয়া নেই তো? ঠিক জানো?'

রাজু যেন তন্দ্রার ঘোরে ছিল, হঠাৎ চমক ভেঙে বলে, 'না, ভাল জল। দাঁড়াও, আলো ধরি।'

কেরোসিনের কুপি হাত-আড়াল দিয়ে বাতাস বাঁচিয়ে বাইরে আনলে রাজু। ভাল ক'রে মুখে হাতে জল দিয়ে ভেতরে এসে উর্মিলা প্রসাধন করতে বসে। ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে ছোট্ট আয়না বার করে—দেখতে গিয়ে হাসি আসে ওর। এ কী ছিরি হয়েছে! ভাগ্যিস খদ্দরের শাড়িটা রঙীন

ছিল, নইলে ছাই আর কালি লেগে যা হয়েছে, ভদ্রসমাজে আর বেরোনো যেত না।

সে পাউডারের পাফ্‌টা মুখে বুলোয়, চিরুনি দিয়ে চুল ঠিক করে,—অবাক হয়ে দেখে রাজু। এসব তার চোখে অভিনব, বিস্ময়কর। অত ফরসা মুখে পাউডার মাখবার দরকার কী ভেবে পায় না সে।

হঠাৎ ওর বিস্মিত চোখের দিকে নজর প'ড়ে অপ্রতিভ উর্মিলা চট্‌ ক'রে ব্যাগটা বন্ধ ক'রে বলে, 'হাঁ, এইবার তোমাকে ভাত দিই—কিন্তু থালা যে তোমার মোটে একটা। তাতেও তো তরকারি ঢেলেছি—'

'দাঁড়াও, পাতা কেটে আনি।' রাজু বঁটিটা নিয়ে অন্ধকারে পা বাড়ায়।

উর্মিলা চট্‌ ক'রে উঠে গিয়ে ওর বঁটিসুদ্ধ হাতটা ধরে ফেলে বলে, 'না না, অন্ধকারে আর বেরিয়ো না।'

তারপরই অপ্রস্তুত হয়ে হাতটা ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু ওর সে লজ্জাটা বোধ হয় লক্ষ্যই করলে না রাজু, বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কেন? কী হয়েছে?'

'যদি বাঘ থাকে বাইরে?'

'হ্যাঁ, এই সন্ধ্যারাত্তিরে বাঘ আসে কখনো! এই তো পেছনেই কলাঝাড়, এখনই আসছি, তুমি ব'সো।'

সে নির্ভয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আসল ভয়টা উর্মিলারই। বাইরের নিঃসীম অন্ধকারের দিকে চেয়ে ওর বুক কাঁপে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ ক'রে। সেটা ঠিক বাঘের ভয় কি ভূতের ভয়, কি চোর-ডাকাতের ভয়, তা ও জানে না।

যাই হোক—রাজু প্রায় তখনই ফিরে এল কলাপাতা নিয়ে। নিজেই কেটে ধুয়ে পাতলে ভাল ক'রে। উর্মিলা ভাত বেড়ে দিলে। বাটিতে ডাল আর পাতায় তরকারি। আয়োজন কম, সরঞ্জামও লজ্জাকর। কিন্তু ক্ষুধাটা উগ্র ব'লে ভালই লাগে উর্মিলার। রাজুর তো মনে হয় অমৃত! এত ভাল রান্না কতদিন সে খায় নি। উর্মিলার মতো মেয়ে রান্না ক'রে কোনদিন ভাত বেড়ে খাওয়াবে—এ ওর কাছে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। স্বপ্নেরও অতীত। সবটা কেমন অবাস্তব বলে মনে হয়, খায় সে কতকটা বিহ্বল ভাবেই।

খাবার পরেই শোবার সমস্যা। রাজুই বাসনগুলো এক কোণে সরিয়ে

রেখে ন্যাতা দিয়ে মেঝে পেড়ে নিয়ে পরিষ্কার করলে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। কথাটা পাড়তে পারে না ও। অপরিচিতা যুবতী মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে শোওয়া কেন দোষার্হ্ বা লজ্জার তা সে ঠিক জানে না, তবে অস্পষ্ট একটা ধারণা আছে যে সেটা উচিত নয়; অথচ উপায়ই বা কি? অনেক ভেবেও যখন কিছু বুঝতে পারলে না, তখন প্রশ্নটা সোজাসুজি ক'রেই ফেলল, 'শোবে কোথায় বলো তো?'

কথাটা উর্মিলাও ভাবছিল। সে মাথা নেড়ে বললে, 'আমি বসেই থাকব। তুমি শুয়ে পড়ো।'

রাজু বাইরের দিকে চেয়ে বললে, 'দোর বন্ধ করতে হবে কিন্তু।'

চমকে উঠে উর্মিলা বলে, 'তা কেমন ক'রে হবে না না, দোর খোলা থাক্।'

'পাগল নাকি! শুধু কি বাঘ! কত রকম আছে। নইলে তো আমি বাইরেই শুতে পারতুম।'

বিপন্ন মুখে উনুনটার দিকে চেয়ে থাকে উর্মিলা। ঘুমও পাচ্ছে খুব. সারাদিন পরিশ্রম কম হয় নি, ঘুম পেতেই পারে।

রাজু বললে, 'তা এক কাজ করো। তুমি দোর বন্ধ করে শোও, আমি দোকানে গিয়ে শুচ্ছি।'

'না না।' সভয়ে বলে ওঠে উর্মিলা, 'একা থাকতে পারব না আমি।'

'তবে?' রাজু বুঝতে পারে না কি করা উচিত। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তবে ঐ উনুন-গোড়ায় আমি শুচ্ছি মাটিতেই—তুমি ওখানে শোও। কী আর হবে, একটা রাত।'

সে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দেয়। উর্মিলা বললে, 'মাটিতে শোবার দরকার নেই, তোমার বিছানা তুমি নাও। আমি এখন বসেই থাকব। চ্যাটাইটা হ'লেই হবে।'

একটু মলিন হাসি দেখা দিল রাজুর মুখে, 'ও বিছানায় শুতে পারবে না জানি। বড্ড ময়লা। আচ্ছা, আমি সরিয়ে নিচ্ছি।'

সে কাঁথা বালিশটা টেনে নিয়ে ঘরের এক কোণে বিছিয়ে আর কথা না কয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শোবার আগে আর একটি কাণ্ড করল সে—হঠাৎ

এক ফুঁয়ে কুপিটা নিভিয়ে দিলে। এটার জন্য প্রস্তুত ছিল না ঊর্মিলা, অন্ধকার ঘরে একটা অপরিচিত যুবকের সঙ্গে শোওয়া—! অথচ, বলেই বা কি ? সত্যিই তো, বন্ধ ঘরের মধ্যে কেরোসিনের ল্যাম্প সারারাত জ্বালা ঠিক নয়, তা ছাড়া কেরোসিনে আজকাল বিশেষ টান পড়েছে, সব সময়ে পাওয়া যায় না।

ঘর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কী যেন একটা ঠাণ্ডা ভাব ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। সেটা ভয়ই, কিন্তু কিসের ভয় তা সে জানে না। এতদিন ধরে সে বহু লোকের সঙ্গে মিশেছে—খানিকটা মানুষ চেনবার ক্ষমতা হয়েছে তার। সাধারণতঃ পুরুষের চোখে সুশ্রী স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে উদগ্র ক্ষুধা ও লালসা ফুটে ওঠে, এর চোখে তা নেই, সরল বন্য চাহনি। না, সে ভয় নেই তবু, কিসের একটা ভয় বা উত্তেজনা অনুভব করে সে, ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে আর সেই অন্ধকারেই, ওর মুখ-চোখ যে লাল এবং গরম হয়ে উঠেছে—তা বুঝতে পারে।

তবু ঊর্মিলাই ঘুমিয়ে পড়ে আগে। বসে থাকতে থাকতে কখন্ যে শ্রান্তিতে চোখের পাতা বুজে আসে তা ও বোঝে না, একসময় ভ্যানিটি ব্যাগটা মাথায় দিয়ে চ্যাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ে।

কিন্তু রাজু যেন কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। আশ্চর্য! আজ কী হল ওর? সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর অন্যদিন তো শুতে তর সয় না! কি একটা উত্তেজনা আর অস্বস্তি যেন দেহের ভিতর, ওকে কিছুতেই স্থির থাকতে দেয় না। কি জন্যে যে এমন হচ্ছে তাও ও বোঝে না।

চুপ ক'রে জেগে শুয়ে থাকে রাজু। ঊর্মিলা যে এতক্ষণ বসে ছিল, এইবার শুয়ে পড়ল—তা ও বেশ বুঝতে পারে। একটু পরেই তার নিশ্বাসের শব্দ গভীর এবং নিয়মিত হয়ে ওঠে। ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারী। ভদ্দরলোকের মেয়ে ওরা, এই মাটির ঘরে, চ্যাটাইয়ের ওপর শোওয়া কি ওদের কাজ!···কেমন যেন মনে মনে একটা লজ্জা অনুভব করে রাজু, ওর দারিদ্র্যের জন্যে—অপরিচ্ছন্নতার জন্যে। ঠিক ক'রে কিছু বোঝে না ও—অত স্পষ্ট ধারণাও নেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে—তবু একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা। ও যে দরিদ্র—তার চেয়েও বেশি, ও যে নোংরা, অপরিচ্ছন্ন—এই অনুভূতিটা প্রথম

ওর জীবনে এল। হয়ত খানিকটা ঝাপসা ভাবে, তবুও এল। ও যা পয়সা রোজগার করে, তাতে খেয়ে প'রে বেশি কিছু থাকে না বটে, তবু চেষ্টা করলে একটা তক্তপোশ কিংবা একটা বাঁশের মাচা অন্তত তৈরি করাতে পারত। আর কিছু না হোক,—সোডা সাজিমাটি দিয়ে কাঁথাখানা কাচাও চলত। কিছুই করে নি সে—এ সম্বন্ধে কোন ধারণা পর্যন্ত ছিল না ওর। আজ সেজন্যেও যেন সে লজ্জিত।

ক'দিন ঝড়বৃষ্টি হয়ে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল, কিন্তু এখন যেন কেমন গরম বোধ হচ্ছে—হয়ত সেই জন্যেই ঘুম আসছে না। রাজু হাতটাই পাখার মতো নেড়ে একটু হাওয়া খেতে থাকে। ঘরে জানলা নেই, দক্ষিণ দিকে খানিকটা চারকোণা জায়গায় শুধু ছিটে-বাঁশ, মাটি ধরানো হয় নি—সেইটেই জানলা বলে ধরা হয়। কিন্তু তাতে আর যাই হোক ঘরে হাওয়া আসে না। একটা পাখা কিনে রাখা উচিত ছিল, এটাও কি মনে থাকে না ছাই! হয়ত মেয়ে-টারও কষ্ট হচ্ছে গরমে—পাখা থাকলে তো এখন ও একটু হাওয়া করতে পারত।

আচ্ছা, রাজু তো নিজের নাম ওকে বলে দিলে, কিন্তু ওর নাম তো জানা হল না! কী নাম কে জানে। কোথায় থাকে তাই বা কে জানে—বললে তো, কলকাতায়।...বললে তো দেশের কাজ করে। দেশের কাজ যে কী তা রাজু জানে না, শুনেছে যে একদল মেয়েপুরুষ স্বদেশী করে বেড়ায়—হয়ত তাকেই দেশের কাজ বলে।

রাজুর বাবা ছিল ঘরামি, দিন আনত দিন খেত। যখন সে মরে গেল তখন ছ'বছরের রাজুকে মানুষ করতে ওর মাকে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষ ক'রে এই অঞ্চলটায় ঝি-চাকরের কোন মজুরিই ছিল না আগে। খুব বড় গৃহস্থ হ'লে তারা ঝি রাখত—এবং সে ঝি অতগুলি লোকের সমস্ত বাসন মাজা, বাড়ির পাট, মায় গোরু-বাছুর পর্যন্ত দেখলে, হয়ত পেত খোরাকি আর এক টাকা মাইনে। সে জায়গায় একটা ছেলেকে সুদ্ধ খাওয়াতে কী অসম্ভব পরিশ্রম করতে হ'ত তা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং, রাজু যখন মাত্র বছর-দশেকের তখনই সে বেরোয় রোজগার করতে। রোজ এতটা পথ হেঁটে এসে এখানে সুরেনের দোকানে বিড়ি পাকাত। তাতে

মজুরি পেত যৎসামান্যই—কিন্তু তখনকার দিনে খরচও ছিল কম। কোন-মতে মা-বেটার চলে যেত। তবু খাটতে হ'ত বৈকি। দিনরাত ঘাড় গুঁজে বিড়ি পাকিয়ে যাওয়া, কোন দিকে মাথা তুলে তাকাবার কিংবা কান পেতে কোন কথা শোনবার সময় ছিল না ওর। তারই ভেতর ও পয়সা জমিয়ে, কিছু বা ধার ক'রে নিজের দোকান দিলে একদিন। সে দেনা শোধ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওর মায়ের হ'ল অসুখ। এদেশে অসুখ করলে গরিব লোকেরা কখনও ডাক্তার ডাকে না, ডাকে রোজা, সে এসে ঝাড়ফুঁক ক'রে দেয়। তাতেই যে বাঁচে সে বাঁচে—যে বাঁচে না, ওরা বোঝে তার পরমায়ু নেই। কিন্তু রাজু তার মায়ের জন্যে ডাক্তার ডেকেছিল। অবিশ্যি ওর মা তাতে বাঁচল না, কিন্তু আবার কিছু দেনা হ'ল। সে দেনা শোধ ক'রে এখানে ঘর তুললে রাজু—তার দেনাটা এখনও শুধছে।...তাই, বয়স ওর কুড়ি-একুশ হ'লেও জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ওর খুব কম। স্ত্রীলোকের দিকে তো তাকাতেই সময় পায় নি। ওর বয়সী, এমন কি ওর চেয়ে কমবয়সী যে সব ছোকরারা ওর আশেপাশে থাকে, অন্য দোকানে কাজ করে, তারা ইতিমধ্যেই সিনেমা ও বেশ্যাপল্লী ঘুরে বিস্তর অভিজ্ঞতা ও কুৎসিত ব্যাধি সংগ্রহ ক'রে এনেছে, কিন্তু রাজু সে অবসর পায় নি। এমন কি, এক বিড়ি ছাড়া অন্য নেশাও করে নি ও। একদিন সবাই ওকে জোর ক'রে তাড়ি খাইয়েছিল—ওর ভাল লাগে নি একটুও। বমি ক'রে মাথা ঘুরে অস্থির। পরের দিন অবধি মাথা ধরে ছিল। পয়সা খরচ ক'রে এমন নেশা করার দরকার কি, রাজু তা বোঝে না—বিশেষত যাতে এত শরীর খারাপ করে। সে আর কোন-দিন তাড়ি খায় নি।

কতকটা সেই জন্যেই—রাজু আজ বুঝতে পারে না, এ ওর কিসের অস্বস্তি। ঘুম ওর চোখে কেন আসছে না! গরম হচ্ছে বটে একটু, কিন্তু এর চেয়েও ঢের গরমে ও এই ঘরে ঘুমোয়, বাইরে শোওয়া তো কোনদিনই চলে না এখানে।

তবে?

কোন জবাবই পায় না—নিজের উপরেই যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে। আচ্ছা, মেয়েটি কী ক'রে ঘুমোচ্ছে এই গরমে? নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে খুব। কী ক'রে

শুয়েছে বেচারী কে জানে—একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। একবার দেখবে নাকি ও আলো জ্বেলে?

যখন রাঁধছিল ও, রাজু তখন দেখেছে বটে—বেশ ভাল লাগছিল ওর, যাই বলো বাপু। আর একবার ওর দেখতে ইচ্ছে করছে খুব। তা ছাড়া, দেখাও তো উচিত, শুধু চ্যাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছে, কতদিন এই চ্যাটাইয়ের নিচে থেকে ও বিছে বার ক'রে মেরেছে—!

আস্তে আস্তে উঠে রাজু দেশলাই জ্বেলে কুপিটা ধরালো। অগাধে ঘুমোচ্ছে ঊর্মিলা, আলো জ্বালার শব্দে ঘুম ভাঙল না। কতকটা ভয়ে ভয়েই জ্বেলেছিল রাজু—কে জানে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে কী মনে করবে ও!

দুটো শয্যার ব্যবধান খুব বেশি নয়—ঘরই বা কতটুকু! ওর বিছানা থেকেই বেশ দেখা যাচ্ছে ঊর্মিলাকে। আহা, বেচারী! ভ্যানিটি ব্যাগটা বালিশের মতো করেছে বটে, কিন্তু সে বড় নিচু, তাই একটা হাতও মাথার নিচে দেওয়া আছে। গরম বোধ হয়েছে ওর-ও—কপালে, গলায়, ঠোঁটের ওপর মুক্তোর মতো ঘাম জমে উঠেছে। ব্লাউজের মধ্যে থেকে কাঁধ বেরিয়ে পড়েছে খানিকটা—সেখানেও।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রাজু। মেয়েছেলে এমনি কিছু কিছু দেখেছে সে দূর থেকে, বাস থেকে নেমে কত শহরের মেয়েকে দেশে যেতে দেখেছে। কিন্তু এত ভাল দেখতে তারা নয়। ঠিক সুন্দর কাকে বলে তা রাজু জানে না—তবে ওর ভাল লাগে একে দেখতে। সুগোল হাতটি ভাঁজ হয়ে কাঁধের নিচে চলে গেছে—ঊর্মিলা ঠিক ফরসা নয়, কিন্তু রাজুর চোখে গৌরবর্ণই লাগে—শুভ্র নিটোল বাহুমূল, দেখলে যেন চোখ ফেরানো যায় না। পাতলা ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে থেকে সাদা সাজানো দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে। নিয়মিত নিশ্বাস পড়ার তালে তালে বুকটি উঠছে পড়ছে। নিশ্চিন্ত সহজ নিদ্রা।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে কেন কে জানে—যেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে, কতকটা ওর অজ্ঞাতসারেই। বেদনাবোধের, অভাব বোধের কোন কারণ যে থাকতে পারে তা ও জানে না—তবু নিশ্বাস ঠেলে ওঠে ওর বুক থেকে।...অবশেষে আবার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে।

উর্মিলার ঘুম ভাঙে একটু বেলাতেই। তা ব'লে এই রকম স্থানে, এই শয্যাতে যে ও এতটা ঘুমোতে পারে তা কে জানত! সে ঘুম ভেঙে ধড়মড় ক'রে যখন উঠে বসল তখন চারিদিক বেশ ফরসা হয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ, এই-খান থেকে এত বেলায় যদি কেউ তাকে বেরোতে দেখে সে কী মনে করবে! কাল যখন নিরাপদ আশ্রয়টাই বড় কথা হয়ে উঠেছিল তখন একরকম মরীয়া হয়েই এসব প্রশ্নগুলোকে মন থেকে সরিয়ে দিয়েছিল উর্মিলা। কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটার গ্লানি যেন ওকে মনে মনে পীড়া দিতে লাগল। তবু ভাগ্যিস ঐ ছোঁড়াটা নেই! ও কখন ভোরেই উঠে বেরিয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বেশবাস ঠিক ক'রে নিয়ে উর্মিলা বাইরে এল। বেশ বেলা হয়েছে, যদিও ঠিক রোদ ওঠে নি এখনও। তবে একটা সুবিধা, এখনও লোক-জন রাস্তায় দেখা দেয় নি, দোকানগুলোও বন্ধ।...সে বেরিয়ে ইতস্তত করছে কী করবে, বাগানের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল রাজু। বেশ সহজ ভাবেই বললে, 'ঐ পেছনটার বাগানে কেউ নেই, পুকুরের জলও ভাল। মুখ-হাত ধুয়ে এসো গে। আমি দোকানে যাচ্ছি। তুমি ঘরেই ব'সো, মোটর এলেই ডাকব।'

ছেলেটার যা মুখের চেহারা তাতে ওর 'তুমি' সম্বোধন কাল মোটেই বেমানান লাগে নি, আজও ঠিক লাগল না—তবু এই অন্তরঙ্গতায় ওর মনে যেন একটা বিরক্তি ঘনিয়ে উঠল। ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে সে বললে, 'ঘরে বসার আর দরকার হবে না, আমি নদীর ধারে পায়চারি করব যতক্ষণ না বাস আসে। ঘরে তুমি তালা লাগিয়ে যেতে পারো।'

রাজু খুব আস্তে আস্তে জবাব দিলে, 'আচ্ছা।' ওর মনে কালকের বিনিদ্র রজনী অনেক পরিবর্তনই ঘটিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যে। ও বুঝেছে যে, যে কোন কারণেই হোক—উর্মিলার মতো মেয়ের পক্ষে ওর ঘরে ঐ চ্যাটাইয়ের উপর বসা শুধু কষ্টকর নয়, লজ্জাকরও বটে। এমন অতিথির মতো কোন আয়োজনই ওর ঘরে ছিল না, আতিথ্য-সৎকারের কোন ব্যবস্থাই ও করতে পারে নি—এই ধিক্কার ওকে মনে মনে এমনিতেই পীড়া দিচ্ছিল। ও আর কথা বাড়ালে না, নিঃশব্দে এসে ঘরটাতে তালা লাগিয়ে দোকানের পথ ধরলে।

কেমন ক'রে রাজু মনে মনে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, এই মেয়েটিকে

কোন রকম স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়, সুতরাং বৃথা কোন অনুরোধ করতে ওর মন সরলো না—নিঃশব্দে অবস্থাটাকে ও মেনে নিলে।

উর্মিলা পুকুর থেকে মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলে। কাঁচা ঘাট। তালগাছের গুঁড়িতে পা দিয়ে নামতে হয়। তবু—ঘাটটা খুব নির্জন। চারিদিকে নিবিড় বন—কোথাও থেকে কারুর দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা নেই। সে ব্যাগ খুলে চুলটা ঠিক ক'রে মুখে একটু পাউডার দিয়ে কাপড়টা গুছিয়ে পরলে। শাড়িটাই তাকে সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছিল—অথচ বদলাবারও কোন উপায় নেই। একটা ছোট সুটকেস তার সঙ্গে ছিল বটে, কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে আসবার সময়ে সে-বোঝাটা চাপিয়েছে পূর্ণেন্দুর ওপর। পূর্ণেন্দুর অবশ্য আজই আসবার কথা—তবে সে যেন সকালে না আসে—মনে মনে এইটেই প্রার্থনা করছে উর্মিলা, শাড়ির প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও। পূর্ণেন্দু এলেই বিপদে পড়তে হবে, জবাবদিহি শুরু হবে নানা রকমের। তাকে বলতে হবে রাত্রির আশ্রয়ের কথাটা—সে তো হাসাহাসি করবেই, কথাটা পাঁচ কানে ছড়িয়ে পড়বে। সকলেরই উপহাসের খোরাক হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। আর পূর্ণেন্দু না এলে বাসে উঠে বসবে, সকলেই মনে করবে যে সে ভোরেই এসেছে নৌকো বেয়ে।

উর্মিলা তাড়াতাড়ি রাস্তায় এসে উঠল। রাজু তখনও দোকান খোলে নি, সুরেনের দোকানের সামনে বেঞ্চিটাতে চুপ ক'রে বসে আছে। ভালই হয়েছে কেউ আসে নি। অবশ্য রাজু গল্প করবে—কিন্তু যাদের কাছে সে করবে তাদের হাসিঠাট্টাটা আর যা-ই হোক ওর স্তরে এসে পৌঁছবে না।

উর্মিলা কাছে আসতে রাজু উঠে দাঁড়াল। ভেবেছিল কিছুই বলবে না, তবু একবার সসঙ্কোচে সে বললে, 'এখানে বসবে একটু? আমি এখনই উঠে যাবো।...দোকান খুললে চা কেক সব পাওয়া যাবে।'

উর্মিলা মাথা নেড়ে বললে, 'না, কিছু দরকার নেই। আমি একটু পায়-চারিই করব।' তারপর হঠাৎ কী মনে ক'রে ব্যাগটা খুলে একটা টাকা বার ক'রে বললে, 'রাজু, এই টাকাটা রাখো, মিষ্টি কিনে খেয়ো।'

রাজু টাকাটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই এক পা পিছিয়ে গিয়েছিল—একটা

তীব্র প্রতিবাদও ওর গলা অবধি ঠেলে উঠেছিল—তবু ঠিক গুছিয়ে কিছু বলতে পারলে না। খানিকটা বিবর্ণ মুখে ঊর্মিলার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে টাকাটা শেষ পর্যন্ত হাত পেতেই নিলে। ও কিছুই করে নি, কোন রকম যত্নই করতে পারে নি—বরং ঊর্মিলা যে ওর ঘরে দয়া ক'রে থেকেছে রাত্রিটা, এইতেই ও চরিতার্থ হয়েছে, পুরস্কারের কোন কারণ নেই, প্রয়োজনও নেই—বোধ হয় এমনি কিছু ও বলতে চেয়েছিল, কিন্তু বলতে সাহস হ'ল না। মলিন কাগজের টাকাটা হাতের মধ্যে মুঠো ক'রে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রাজু। ঊর্মিলা ততক্ষণে নদীর পাড় বেয়ে জলের কাছে নেমে গিয়েছে।···

অবশেষে আরও ফরসা হ'ল। দোকানপাট খুলল একে একে, এক সময়ে বাসও এল। ঊর্মিলার বরাত ভালই—পূর্ণেন্দু বাস ছাড়ার সময়ের মধ্যে এসে পৌছতে পারলে না। খুব সম্ভব সে বিকেলের বাসে আসছে। আরও একটা আশঙ্কা ঊর্মিলার ছিল, বাস ছাড়ার সময়ে রাজু আবার না এসে আত্মীয়তা শুরু ক'রে দেয়। কিন্তু ছেলেটার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, সে একবারও সে-চেষ্টা করলে না, এমন কি সামনে দিয়ে আসবার সময়ও চোখ তুলে চাইলে না। তবু—বাস ছাড়তে ঊর্মিলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাসের মধ্যে বসে দূরের পারঘাটার দিকে চেয়ে চেয়ে এখন বরং কাল রাত্রের কথাটা মনে হয়ে ওর হাসিই পেতে লাগল। ভয়ে মানুষ কী জন্তুই হয়ে যায়। ছিঃ!

বাসখানা ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজু জোর করে স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে গা-নাড়া দিলে। কাজ-কর্ম ঢের পড়ে রয়েছে। সে শুধু ওর নিজের দোকানের জন্যেই বিড়ি পাকায় না, ওর বিড়ি পাইকারীও কাটে খুব। সন্ধ্যার বাস ছাড়ার আগে পাইকাররা এসে যাবে—তার আগে কাজ সেরে রাখা দরকার। নিজে কাজ করে, তা-ছাড়া একটা ছোকরাও রেখেছে ও। সে ছেলেটা এসে বসে আছে সকাল থেকে, তাকেও কাজ বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

কেষ্টকে কাজ বুঝিয়ে দিলে বটে, কিন্তু নিজে কিছুতেই সেদিন কাজে মন দিতে পারলে না। কী সব এলোমেলো চিন্তা মনে আসে তাও ঠিক বোঝে না। কিসের একটা আলস্য—কিসের একটা ক্লান্তি যেন। বোধ হয় কাল রাত্রে ঘুম হয় নি সেইজন্যেই এমন হচ্ছে। কতকটা নিজের উপরেই বিরক্ত

হয়ে রাজু গিয়ে সকাল ক'রে স্নান করে এল। কিন্তু তাতে শুধু চোখে তন্দ্রাই এল বেশি ক'রে জড়িয়ে—কাজে উৎসাহ পেলে না।

অন্যদিন সন্ধ্যায় যে ভাত রাঁধে তারই কিছুটা জল দেওয়া থাকে, নুন লঙ্কা ও তেঁতুল দিয়ে দুপুরবেলা তাই খায় রাজু। কাল লজ্জাতে সে কথা উর্মিলাকে বলতে পারে নি, অথচ আজও ওর নতুন ক'রে রাঁধতে ইচ্ছা হ'ল না। মনোহরের দোকান থেকে দু-এক পয়সার তেলেভাজা খাবার খেয়ে ও দোকানেরই এক পাশে শুয়ে পড়ল। কেষ্ট ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার জ্বর আসছে নাকি রাজুদা?' ও শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলে, 'না।'

ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে উঠে বেশ খানিকটা কড়া চা খেয়ে নিয়ে কাজে লাগল রাজু। চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে? যার যা! ভালই হয়েছে মেয়েটা একটা টাকা দিয়ে গেছে। ভাগ্যিস টাকাটা ফিরিয়ে দেয় নি বোকার মতো। কতগুলো বিড়ি বেচলে তবে একটা টাকা লাভ হয়! ওরা বড়লোক, সখ ক'রে স্বদেশী ক'রে বেড়ায়—ওদের অভাব কি! পুলিসের ভয় নেই ওদের—বাঘের ভয়ে মলেন! বাঘ যেন পুলিসের চেয়ে বেশি ভয়ানক! হাসি পায় রাজুর এদের কাণ্ড দেখলে। একেই বলে মেয়েছেলে।…যাক গে, ভয় পেয়েছিল তাই একটা টাকা রোজগার হল—আবার একবেলা রান্নার মেহনত-টাও বাঁচল।

এলোমেলো নানা কথা ভাবতে ভাবতে একসময়ে রাজুর গতি শ্লথ হয়ে আসে। যাই বলো, বড় কষ্ট হয়েছে বেচারীর কিন্তু! ঐ ঘরে ওদের কি সাতজন্মে শোওয়া অভ্যাস আছে, বিশেষ ঐ চ্যাটাইয়ের ওপর! তার ওপর হাওয়া বাতাস নেই ঘরটাতে একটুও—গরমে কী কষ্টই পেয়েছে মেয়েটা। ও অবিশ্যি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, অত টের পায় নি। কিন্তু, কষ্ট হয়েছে ঠিকই। কি রকম ঘেমেছিল রাজু তো তা নিজের চোখের দেখেছে!…

কথাটা মনে পড়তেই ছবিটা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে রাজুর। সুন্দর ললাটে, ওষ্ঠে, কণ্ঠে সেই বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর সেই মুক্তোর মতো দাঁত! হাত ওর আপনিই যেন থেমে আসে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের কাছে মুচড়ে মুচড়ে ওঠে—যদিও সেটা রাজু বুঝতে পারে না, আপনার দিবাস্বপ্নে আপনিই তন্ময় হয়ে থাকে।

অবশেষে আবার একসময়ে চৈতন্য হয়, জোর জোর হাত চালাতে থাকে। না, ঘরে একটা চৌকি করতেই হবে—আর একটা বিছানা। সুরেনের দেনা প্রায় শোধ হয়ে এসেছে, চাইলে আরও দশটা টাকা দেবে বোধ হয়। দশ টাকায় হবে না কি? না হয় দু-এক টাকা ও কারবার থেকে দিতে পারবে।

কিন্তু এখন আর চৌকি-বিছানাতে লাভ কি! ওর নিজের প্রয়োজন আছে কি না—এ কথাটা রাজুর একবারও মনে পড়ল না।

সন্ধ্যার সময়ে দোর খুলে ঘরে ঢুকে হঠাৎ ও থমকে দাঁড়িয়ে যায়। সকালে ওরা দুজনে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে গেছে—সুতরাং ঘরের অবস্থাটা সেই মুহূর্তেই থেমে আছে। থমথম করছে ঘরের আবহাওয়াতে সেই স্মৃতিই। মনে হচ্ছে ঊর্মিলা বেরিয়ে গেছে এইমাত্র! কেমন যেন মনে মনে একটা ধাক্কা খায় রাজু।

একটু পরে ঘরের মধ্যে ঢুকে ওর কাঁথা-বালিশটা চ্যাটাইয়ের ওপর জড়ো ক'রে রাখতে গিয়ে নজরে পড়ল একটা মাথার কাঁটা—চ্যাটাইয়ের ওপরই পড়ে আছে। ঐ মেয়েটার নিশ্চয়, মাথা থেকে খসে পড়েছিল, সকালে দেখতে পায় নি। নিজের অজ্ঞাতসারেই নাকের কাছে তুলল রাজু; এ ওর সহজাত সংস্কার, হাত আপনিই যেন উঠে গেল। খুব মৃদু একটা কি সুগন্ধ, যে গন্ধ-তেল মাখে চুলে তারই। সারাদিনেও গন্ধটা যায় নি, আশ্চর্য! কী তেল কে জানে—আর তার কত দাম!

অন্যমনস্ক রাজু কাঁটাটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর এই নিভৃত, অবজ্ঞাত, অকিঞ্চিৎকর জীবনে আজ যেন কী একটা বিপর্যয় ঘটে গেল—ওর মসৃণ, অক্ষত মনের মধ্যে এই সামান্য লোহার কাঁটাটা একটা যেন গভীর চিরস্থায়ী ক্ষতর সৃষ্টি করলে। পল্লীগ্রামে প্রকৃতির মধ্যে বাস করে ও, ফুলের গন্ধ চারিদিকে, তবু সেদিকে ও কোনদিন লক্ষ্যই করে নি। আজ একটা লোহার কাঁটার সৌরভ ওকে যেন ক্ষণকালের জন্য—হয়ত বা বহুকালের জন্যই মোহগ্রস্ত করল। ওর যে পৌরুষ ছিল সুপ্ত, যে যৌবন ছিল অস্বীকৃত—সেই পৌরুষ ও যৌবন আজ ওর জীবনে প্রথম ঐ কাঁটাটার স্পর্শে জেগে উঠল। সে জাগরণের আকস্মিকতায় আর প্রবলতায় ও বিহ্বল হয়ে পড়ল।

সে কঠিন সুপ্তিভঙ্গের বেদনায় ওর হৃদয়ের রক্ত ছলছলিয়ে কেঁপে উঠল। ওর পড়াশুনো নেই, অভিজ্ঞতা আরও কম—ও কিছুই বুঝতে পারলে না, শুধু এইটে অনুভব করলে যে, ওর জীবনে আজ কী একটা বিপুল পরিবর্তন এল। আজ এমন কিছু একটা ঘটল যার নাম জানল না রাজু—তবু বোঝে যে এটা না ঘটলেই ভাল হ'ত। ওর নিশ্চিন্ত তুচ্ছ জীবনযাত্রায় কিছু না হোক, শান্তি ছিল ; আজ বুঝি সেটাও গেল।···

অনেকক্ষণ পরে ওর একমাত্র জামার পকেটে কাঁটাটা সযত্নে রেখে দিয়ে রাজু কলসী নিয়ে ঘাটে গেল। সারাদিন খাওয়া হয় নি, সুস্থ শরীর ক্ষিদেতে ঝিমঝিম করছে। ভাত চড়ানো দরকার। কিন্তু কাঠকুটো জল সংগ্রহ করে ভাত রাঁধতে বসে আবার ওর খারাপ লাগে। হাঁড়িটা মেয়েটি কাল ভাত দেবার পর কেমন যত্ন ক'রে ধুয়ে রেখে গেছে—ঐ চাল-ডালের হাঁড়িগুলোতেও তার হাতের স্পর্শ আছে লেগে। সত্যিই সারাদিন খেটেখুটে এসে আবার রাঁধতে বসা বিড়ম্বনা। এ কি পুরুষ মানুষের কাজ? কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে আবার রাজু মনকে ধমক দেয়—চিরকাল যা ক'রে এসেছে আর চিরকালই যা করতে হবে তাতে অত অরুচি কেন? একদিনেই কি অভ্যাস বদ্‌লে গেল নাকি!···যদিই বা বিয়ে করে—তাদের ঘরের মেয়ে এসে আর কত গুছিয়ে সংসার করবে! সবাই নোংরা—জংলী।

ভাত রেঁধে খেতে বসল সে—শুধু নুন-ভাত। খানিকটা ভাত জল দেওয়া রইল নিত্যকার মতো। অভ্যস্ত জীবনযাত্রাতে ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু আজ সে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে, অত ক্ষিদের পরও শুধু-ভাত যেন ভাল লাগে না। ঘরে ডাল ছিল, দুটি ভাতে দিলেও তো হ'ত। সে যেন জন্তু হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। ভাত খেয়ে উঠে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল রাজু। তবে কাঁথাটা আর চ্যাটাইয়ের ওপর পাড়তে ইচ্ছা হ'ল না। বড্ডই ময়লা, সত্যি। ঐ তো মেয়েটা কাল শুধু চ্যাটাইয়ের ওপরই শুয়েছিল—সে-ই বা পারবে না কেন। রাজু আন্দাজে আন্দাজে, মেয়েটা ঠিক যেখানে শুয়েছিল সেইখানে শুয়ে পড়ল। এটা ইচ্ছে ক'রে নয়—নিজের অজ্ঞাতসারেই।

সেদিনও রাত্রে ওর ঘুম এল না ; আগের দিন রাত্রে ঘুম হয় নি, তবুও না। হয়ত দুপুরবেলা ঘুমিয়ে উঠে অতটা চা খেয়েছে বলেই ঘুম আসছে না।

অন্ধকার ঘরে জেগে শুয়ে শুয়ে ওর মন স্বাভাবিক ভাবেই কাল রাত্রের ঘটনায় ফিরে এল। ঐ কাঁটাটা যদি না থাকত তাহলে আজ অনায়াসে মনে হতে পারত যে সবটা অবাস্তব কল্পনা—স্বপ্ন। এতক্ষণে ওর মনে হ'ল যে, ও যেখানটাতে শুয়েছে ঠিক সেইখানটাতেই এমনি করে হাতে মাথা রেখে শুয়ে ছিল মেয়েটা। তার খালি হাতখানা এইখানকার চ্যাটাইটাই ছুঁয়ে ছিল বোধ হয় সারারাত, যেখানে এখন ওর হাত আছে—হয়তো বা তার হাতের ঘামে ওখানকার চ্যাটাইটাই ভিজে গিয়েছিল। এখনও ভিজে থাকা সম্ভব নয়, তবুও সে-দেহের অদৃশ্য কোন চিহ্ন এখনও যেন লেগে আছে ওখানে।

হঠাৎ ওর কী হ'ল, ধড়মড় ক'রে উঠে আলো জ্বাললে তাড়াতাড়ি। আলোতে ও যেন সেই চ্যাটাইটা পরীক্ষা করতে চায়। কিন্তু আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুল বুঝতে পারল রাজু, শূন্য ঘরের নির্জনতা ওকে যেন নিঃশব্দে বিদ্রূপ ক'রে উঠল। লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন দুপুরবেলা ও এক ফাঁকে সুরেনকে প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা সুরেনদা, দেশের কাজ মানে কী গো?'

সুরেন বিস্মিত হয়ে তাকাল ওর দিকে, 'কেন বল তো?'

'না—এমনিই। এমনি জিগ্যেস করছি, বলো না।'

অনেকক্ষণ শূন্যভাবে তাকিয়ে থেকে সুরেন জবাব দেয়, 'কী জানি। ও-কথা তো কখনও শুনি নি—তবে সব স্বদেশী করে বটে শুনেছি। তা—'

সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রাজু বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ হবে। তা স্বদেশী করাই বা কী?'

এবার তাচ্ছিল্যের সুরে জবাব দেয় সুরেন, 'ঐ আর কি। কংগ্রেস না কী আছে না? তারই মেম্বার হয় সব, তারপর জেল-টেল খাটে। মানে—সরকার বাহাদুর যে সব অন্যায় জুলুম করে ওরা তা মানতে চায় না। তাই জেল খেটে মরে। হাজার হোক, তারা রাজা, তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? ঐ যে রে, যারা ঐ খদ্দর-টদ্দর পরে। বন্দেমাতরম্ বলে চেঁচায়। মহাত্মা গান্ধী আছেন—তিনিই নাকি ওদের ঐ সব করতে বলেন।'

কথাটা রাজুর ভাল লাগল না। যারা পুলিসের ভয় করে না তারা যে

খুব সহজ লোক নয়—এটা ওর ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও ও বুঝতে পারে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সেদিন তারিণীদা বলছিল যে, যারা স্বদেশী করে তাদের মধ্যে যে যতবার জেল খাটে তার তত খাতির। কেন বলো দেখি?'

এবার সুরেন কিছু বিব্রত হয়ে পড়ল। ঢোঁক গিলে বললে, 'মানে, ওরা তো আর চুরি-ডাকাতি ক'রে জেলে যাচ্ছে না—তাই আর কি। ওরা যায় শুধু শুধু—শখ ক'রে। অতখানি কষ্ট সহ্য করছে ইচ্ছে ক'রে, সহজ তো নয়!'

রাজু বুঝতে পারে যে, সুরেনের কাছে এর আর কোন জবাব পাবার সাম্ভবনা নেই। আরও খানিকটা চুপ ক'রে থেকে সে বলে, 'আচ্ছা, ঐ যারা স্বদেশী করে তাদের তুমি চেনো?'

ওর অজ্ঞতায় এবার সুরেনও হেসে ফেলে। বলে, 'দূর পাগল—সে কি একটা ছুটো যে, চিনে রাখব? সব জায়গাতেই দু-চারজন ক'রে আছে। এই তো আমাদের গাঁয়ের চক্রবর্ত্তীদের ছোট ছেলেটা, এখনও জেল খাটছে, কত বছর হয়ে গেল কিছুতেই ছাড়ছে না। তারপর কেশব মাস্টার, দেঁতো হরিশ—সবাই তো স্বদেশী করে। কেন, তুই শুনিস নি?'

রাজু সত্যিই শোনে নি অত গরজ ক'রে। এতদিন তার প্রয়োজনও হয় নি। তার জগৎ ছিল শুধু বিড়ি, বিড়ির পাতা, সুরেনের দেনা—এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ঘাড় গুঁজে কাজ করেছে, কোন দিকে তাকায় নি। আজও যে কী প্রয়োজন জানবার—তাও ও বোঝে না, কিসের এ তাগিদ মন থেকে ঠেলা দিচ্ছে অনবরত! শুধু বোকার মতো সুরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।...

পরের দিন বাস-ড্রাইভার তারিণীকে পাকড়াও করলে রাজু। বড় ক'রে ছুটো বিড়ি পকিয়ে ওর হাতে দিয়ে প্রশ্নটা করলে। তারিণী নিত্য শহরে যায়, শহরেই থাকে বলতে গেলে—ও অনেক জানে-শোনে। আর তারিণী বলেও ঠিক-ঠিক। সাধারণত ইস্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরাই স্বদেশী ক'রে বেড়ায়। অনেকে অবিশ্যি দেশের কাজ করতে গিয়ে পড়া ছেড়েও দিয়েছে। তাদের মাথার ওপর নেতারা আছেন। এই যে গরীব লোকেরা খেতে পাচ্ছে না, এই যে পুলিসরা ঘুষ নেয়, এই যে সাহেবরা যা খুশি তাই করে—এরই জন্যে লড়াই চালাচ্ছেন তাঁরা। এই সব অনাচার বন্ধ করতে চান। এসব

কিছু থাকবে না, ওরাই রাজত্ব শাসন করবে, মানে পাঁচজনে মিলে মিশে, পাঁচ-জনে যা বলবে তাই হবে। রাজা তা হতে দিতে চান না, তাই এত গোলমাল, তাই সবাই বারবার জেল খাটে, আটক থাকে, মার খায়।

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল রাজু। এইবার বলে ফেললে, 'আচ্ছা তারিণীদা, যারা এই সব করে তুমি তাদের চেনো?'

তারিণীও হাসে। বলে, 'কটাকে চিনব বল। সে কি দুটো-একটা! আমাদের দেশে-ঘাটে যারা আছে তাদের সবাইকে চিনি বটে।'

'সে আমিও চিনি,' বাধা দিয়ে বলে রাজু। 'ঐ যে কলকাতা থেকে যারা আসে মাঝে মাঝে—তাদের চেনো?'

'সে তো নিত্য আসছে কত দল। সকলকে কি আর চিনে রাখা যায়?'

আর একটু ইতস্তত ক'রে রাজু কথাটা বলেই ফেলে। 'আচ্ছা ঐ যে পরশুর আগের দিন যারা এসেছিল, তাদের চেনো? পরশু সকালার গাড়িতে চলে গেল?'

'কে জানে, অত লক্ষ্য করি নি।' তারিণী উঠে পড়ে, 'সুরেনদা, ভাল ক'রে জমিয়ে এক কাপ চা করো দিকি!' তার আগ্রহ ঐ দিকে। কেন রাজু এত প্রশ্ন করছে এ কৌতূহলও নেই।

তার পর থেকে রাজুর যেন এইটেই হয়ে পড়ল এক নেশা। শহরের লোক পেলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে। কেউ বিরক্ত হয়—কেউ বা জবাব দেয়। প্রায় সকলেই কিছু কিছু ভুল বলে—কারুর সঙ্গে কারুর কথা মেলে না। অজ্ঞ, মূর্খ রাজু সে-সব তথ্যের সমুদ্রে দিশাহারা হয়ে যায়, মনে মনে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করে। যে কথা দু'তিনজন লোকের মুখে একই ভাবে শোনে, বুঝতে পারে সেই কথাগুলোই সত্যি। এইভাবে এখানে কোথায় কোথায় কে আছে, কী কাজ হয়, তার মোটামুটি বিবরণ সে পেয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও সেই মেয়েটির বর্ণনা মেলে না—যার খবর ও জানতে চায়। শহর থেকে যতবার বাস্ আসে, ও সব কাজ ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ায়; যখন খদ্দেরের ভিড় থাকে, বাইরে দাঁড়াতে পায় না, তখনও একটা চোখ ও বাইরেই মেলে রাখে। কিন্তু সে আর আসে না—সত্যি সত্যিই সে যেন স্বপ্ন, সে যেন

প্রলাপ—বোধ হয় সে পৃথিবীতে কোথাও নেই, রাজু বিকারের ঘোরে ভুল দেখেছিল। অথচ—এইটে ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেও সে নিশ্চিন্ত হ'ত—তাও পারে না, সেই লোহার কাঁটাটা যেন ওর বুকের মধ্যে, ওর সমস্ত চিন্তার মধ্যে খচখচ করতে থাকে। ওর দিনরাতের সমস্ত ভাবনার মধ্যে গভীর ভাবে বিঁধে থাকে। কাঁটাটা যে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

কিন্তু দেখা পেলে যে কী হবে তা রাজু জানে না। হয়ত সে আর চিনতেও পারবে না। অন্তত আর যে ওর ঘরে আশ্রয় নেবার তার দরকার হবে না এটা ঠিক, তবু রাজুর সমস্ত মন যেন একাগ্র হয়ে তপস্যা করে। ও লেখাপড়া শেখে নি, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রে দেখার ক্ষমতা ওর নেই, এমন কি সে এ ব্যাপারের অস্তিত্ব পর্যন্ত জানে না—শুধু জানে যে একটা দুর্বার শক্তি ওর মনকে টানছে ঐ দিকে, একটা অন্ধ আবেগ, একটা তীব্র ইচ্ছা অহরহ ঐ মেয়েটির চিন্তার মধ্যে ওকে অনুক্ষণ টেনে রাখছে। সে আকর্ষণকে বাধা দেবার ওর শক্তিও নেই, ইচ্ছাও নেই।

এধারে ওর কাজের ক্ষতি হয়। খদ্দেররা মাল পায় না ঠিক সময়ে। কেষ্ট ফাঁকি দেয়, মশলা চুরি করে—সুরেনদা টাকার তাগাদা দেয়। সবই বোঝে, মাঝে মাঝে অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগে। কিন্তু কিছুদিন না যেতে যেতেই আবার একটা ক্লান্তি অনুভব করে। কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে। আজকাল ঘরে যাওয়া ও প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। অর্ধেক দিনই দোকানের মধ্যে কোনমতে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে—নয়ত সুরেনদার দোকানের বেঞ্চে। ভয়-ডরও চলে গেছে ওর। বাইরে শুতে কিছুমাত্র ভয় করে না। তবু ঘরেরও পরিবর্তন হয়েছে নানা রকম। ভাল ক'রে ছ্যাচা বাঁশ দিয়ে একপাশে একটা তক্তপোশের মতো মাচা বাঁধা হয়েছে। তাতে চটের মধ্যে খড় পুরে গদি। তার ওপর সেই চ্যাটাইটা পাতা থাকে। কাঁথা-বালিশগুলোও একটু ফরসা ও ভদ্র হয়েছে আজকাল। তা ছাড়া আরও যে বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ হয়েছে তা হচ্ছে শহর থেকে একটি ভাল আয়না আর চিরুনি। দেওয়ালেই টাঙানো থাকে। আর থাকে গান্ধীজীর ছবি দেওয়া একটা ক্যালেণ্ডার। সবাই ঠাট্টা করে ওর এই ঘর-কন্না সাজাবার দিকে মনোযোগ দেখে। সুরেন বলে, 'আহা ভাল, ভাল,—কেউ কোথাও

নেই, চিরকাল কি আর এমনি নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবি—আর ভেসে ভেসে বেড়াবি। তাই কর্—বৌমাকে ঘরে আন্, নতুন করে ঘর-সংসার পাত্। মেয়ে একটি আছেও আমার হাতে ভাল। সত্যি! যে বয়সের যা, এখন একটু সংসার-সুখ না হলে কি আর কাজ-কর্মে মন লাগে?'

এসব কথা কিন্তু রাজুর একদম ভাল লাগে না, সুরেনের অসভ্যতায় বিরক্ত হয় মনে মনে।...বিয়ে ক'রে এই জীবনেরই পুনরাবৃত্তি ক'রে যাওয়া অসম্ভব। এই সামান্য বিড়ির দোকানে বসে সামান্যতম পরিধির মধ্যে জীবন কাটানোর কল্পনাটা ওকে যেন পীড়াই দেয় মনে মনে। বৃহত্তর জীবনের কথা জানে না ও, তবে এটা জানে যে, যে জীবন ও কাটাচ্ছে সেটা বড়ই ছোট, বড়ই অকিঞ্চিৎকর! অথচ কী ক'রে এর থেকে মুক্তি পাবে—তাও বুঝতে পারে না।

যার কথা ও ভাবতে সাহস করে না ভাল ক'রে, অথচ যার চিন্তাই আসলে ওর মনের একটা অংশকে চিরকালের মতো পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে দিয়েছে—সে-দিনকার সেই নাম-না-জানা মেয়েটিকে আর একবার ও দেখতে চায়—এটা সত্য কথা। কিন্তু, তার আগে চায় ও এই তুচ্ছতা থেকে মুক্তি পেতে। কোনমতে—তার উপযুক্ত না হোক—তার সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা না নিয়ে সে দেখাও চায় না আর। এর মধ্যে অনেকবার ওর মনে হয়েছে, শহরে গিয়ে খোঁজখবর করলে হয়ত দেখা পাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। কলকাতা শহরের বিপুলত্ব সম্বন্ধে ওর কোন ধারণাই ছিল না। তাই এমন কথাও ওর ভাবতে বাধে নি যে শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহরে গিয়েই যদি একটু ভাল ক'রে খোঁজে তাহ'লে তো নিশ্চয়ই দেখা পেতে পারবে! 'কংগ্রেস' কথাটা ওর কানে ছিল—কংগ্রেস অফিসে খোঁজ করলে স্বদেশীওলাদের দেখা পাওয়া যায়, এ আশ্বাসও তারিণীর কাছ থেকে সে পেয়েছে। কিন্তু তবু ওর ইচ্ছা হয় নি। যে দেখা ওদের হয়েছে সেই দেখা হওয়ার দিনটির দৈন্য—যার জন্য সেদিন ওর কিছুই মনে হয় নি, লজ্জাবোধ করবার কোন কারণ আছে তা বুঝতেও পারে নি—আজ মনে হ'লে ওর যেন মরে যেতে ইচ্ছে করে।...ও লেখাপড়া শেখে নি, ওর অর্থ নেই, ওর জীবনযাত্রা পরিচ্ছন্ন নয়—এই কথাগুলো আজকাল যেন ও নতুন ক'রে বুঝতে শিখছে। এই তথ্যগুলো মনে পড়ে আর লজ্জায় ঘৃণায় ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠে, ভগবানকে জানায় বার বার যে, যেমন ক'রে হোক,

তুমি এর থেকে মুক্তি দাও।

এইভাবেই দিন যায়। অবস্থার কোন উন্নতি হয় না, বরং আর্থিক অবস্থা কাজে গাফিলতির জন্য দিন দিন যেন খারাপই হয়। পরিচিতদের বকুনি খায়, অনুতপ্ত হয়—কিন্তু বকুনি খাবার কারণ আবারও ঘটে।···

কিন্তু হঠাৎ জীবনের এই একটানা গতানুগতিকতার মধ্যে একটা নতুন কিসের আবির্ভাব হয়। সেই ক্ষুদ্র আরণ্য গ্রামেও সংবাদ এসে পৌঁছয় যে ভারতের দ্বারে যুদ্ধ এসে উপস্থিত হয়েছে, শত্রু এল ব'লে। খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না, যুদ্ধের সঙ্গে এইটুকুই ছিল এতদিন সম্পর্ক। মধ্যে একবার বোমার হিড়িকে অনেক শহরের লোক এসেছিল গ্রামে, তারা আবার ফিরে গেছে—এখন আর কোন ভয় নেই, এমনিই একটা ভাসা-ভাসা খবর রাখত ওরা। কিন্তু এবারে আর একটু বেশি যেন ঘটেছে বলে মনে হ'ল। এই সংকটকালে দেশনেতারা স্বাধীনতা চেয়েছিলেন, না পেলে তাঁরাও রাজার সঙ্গে অন্য রকম যুদ্ধ চালাবেন বলে নাকি ভয় দেখিয়েছিলেন। ফলে সহসা সমস্ত দেশ-নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে। প্রায় সব শহরে, এমন কি গ্রামেও, সে ধরপাকড়ের জের এসে পৌঁছল, আর তাইতেই দেশবাসী উঠল ক্ষুব্ধ হয়ে। নেতারা নেই, জনতাকে সংযত রাখতে পারে, অহিংসায় স্থির রাখতে পারে এমন লোক কেউ নেই—সুতরাং হিংসা ও বিশৃঙ্খলার একটা স্রোত বয়ে গেল দেশের ওপর দিয়ে।

রাজু এত কথা বোঝে না—শুধু চারদিকে দেখে একটা চাপা ষড়যন্ত্র, লোকের চোখে মুখে গোপন একটা উত্তেজনা। ওর কেমন ক'রে হঠাৎ মনে হয় যে এইবার সময় এসেছে। এই তুচ্ছতা, এই ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ বলে পরিচিত হবার এমন সুযোগ আর হয়ত পাওয়াই যাবে না। ও প্রস্তুত হয়, কিন্তু পথ দেখতে পায় না। যাদের স্বদেশীওলা লোক বলে জানত তারা এখন সবাই জেলে। এখন যারা বিদ্রোহের পথে নেমেছে, তাদের আভাস পায়, কিন্তু নাগাল পায় না। ও এগিয়ে গেলে তারা পিছিয়ে যায় —রাজু মূর্খ, রাজু বোকা—ওরকম লোক দিয়ে কাজ হয় না, সবাই এই কথা জানে—বরং এদের মতো বোকারাই কাজ পণ্ড করে। তাই যাদের দলপতি মনে ক'রে রাজু নিজের কথাটা বলতে যায় তারাই ব্যাপারটা

আগাগোড়া অস্বীকার করে। হেসে উড়িয়ে দেয়, নয়ত ওকে ধমক দেয়। ক্ষোভে লজ্জায় রাজুর যেন মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা করে। যে জীবনের এই মূল্য সেই জীবনটাকে অস্বীকার করাই যেন হয়ে ওঠে ওর একমাত্র কাম্য।

বোধ হয় বাসনাটা তীব্র থাকলে একদিন না একদিন মানুষ তা পূরণের পথ দেখতে পায়ই. রাজুরও তাই হ'ল। অতিকষ্টে কানা-ঘুষায় খবর যোগাড় করলে যে, কাল রাত বারোটার সময় একদল লোক যাবে সাত মাইল দূরের থানা লুট করতে। কলকাতা থেকেও নাকি আসছে কারা, তারাও সঙ্গে থাকবে।

রাজু মন স্থির করে। চোখ ওর জ্বলতে থাকে আশায়, এবার ওর মূল্য স্বীকার করাবেই, প্রাণ দিয়েও প্রমাণ ক'রে দেবে যে, সে কারুর চেয়ে খাটো নয়।

যে পথে বিদ্রোহীর দল যাবে রাজু তার সন্ধান পেয়েছিল আগেই। সেই পথে রাত্রির গোপন অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমে একে একে তারই কাছে বনের মধ্যে এসে জড়ো হ'ল এক দুই ক'রে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। কারুর হাতেই বন্দুক নেই—আছে সাধারণ অস্ত্র—বল্লম, সড়কী, লাঠি। আঁধারে কারুর মুখ দেখা গেল না, কাউকে চেনা গেল না—তার প্রয়োজনও নেই। ওরা যে-ই হোক, ওদের লক্ষ্য, ওদের ব্রতর সঙ্গে রাজুর লক্ষ্য মিলে গেছে—তাই যথেষ্ট।

যতটা সম্ভব চুপিচুপি ওরা এগিয়ে চলে। কখন রাজু এসে ওদের সঙ্গ নেয় তা তারা বুঝতেও পারে না। তখন কে কার হিসেব রাখে—টর্চ আছে কিন্তু আলো জ্বেলে সকলকে পরীক্ষা করার কথা মনেও আসে না কারুর।

বোধ হয় ওরা ভেবেছিল অতর্কিতে থানায় গিয়ে পৌঁছবে ওরা, অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে ঐ সামান্য অস্ত্রেই দখল করবে। কিন্তু কাছে আসতেই বোঝা গেল পুলিস আগেই খবর পেয়েছে—সজাগ সতর্ক আছে। গাছের আড়ালেই তখনও আছে ওরা—শুধু পাতা কি ছোট ডাল কেঁপেছে হয়ত কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে চলল গুলি—গুড়ুম্!

এর জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ, সবাই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। গুলি

কারুর গায়ে লাগে নি এই যা! হয়ত শুধু সন্দেহ করেই গুলি ছুঁড়েছে—স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়ত সন্দেহটা কেটে যাবে, মনে করবে বাতাসে গাছ নড়ছে।

কিন্তু না—সন্দেহ নয়, ওরা খবর পেয়েছে। আবার গুলি ছুটল। এ যাত্রাও সবাই বেঁচে গেছে, জয় ভগবান, জয় মা কালী! ঐ একটা লোকের হাতেই বন্দুক আছে, ছোট থানা, একটার বেশি বন্দুক থাকার কথা নয়। কে যেন বলছে চুপিচুপি ফিসফিস করে রাজুর পাশেই—'কোনমতে গিয়ে বন্দুকটা কেড়ে নিতে পারলেই কাজ হাসিল করা যায়। ঐ একটাই বন্দুক আছে, তারপর আমরা আর ওরা—মুখোমুখি!'

কণ্ঠস্বরটা খুবই মৃদু, বিকৃত না হ'লেও স্বাভাবিক থাকা সম্ভব নয়—তবু রাজুর মনে হয় যেন ওর পরিচিত। এ কণ্ঠ যেন কোন সুদূর অতীতে সে শুনেছিল, হয়ত আবার শোনবার আশাও রেখেছিল। কোনও মেয়েছেলের গলা—

অত ভাববার সময় ছিল না। রাজু ভাবলেও না—শুধু বার বার ওর কানে যেন কে বলতে লাগল—ওরে এই সুযোগ! অকস্মাৎ, কেউ কিছু বোঝবার আগেই ও গাছের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল সামনের খোলা জায়গায়।

কিন্তু সামনের ফাঁকা মাঠটা অনেকখানি, এক লাফে, অতর্কিতে বন্দুক-ধারীর কাছে পৌঁছনো সম্ভব নয়, তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার যে-সব কলাকৌশল আছে তাও রাজুর জানা ছিল না। বন্দুক আবার গর্জে উঠল—আগুন উঠল ঝলসে। রাজু ঠিক কিছু বুঝতে পারল না, শুধু মনে হ'ল ওর পাঁজরের মধ্যে কী একটা যেন জ্বলে উঠল। তবুও থামে নি, ওর গতি শ্লথ হ'লেও এগিয়ে চলেছে ও, এমন সময়ে আবার! এবারে ওর কপাল!

কে যেন বনের মধ্য থেকে চেঁচিয়ে উঠল—ফেরো ফেরো—ফিরে এসো!

রাজু ফিরল, কোনমতে আবার গাছের আড়ালে এসেই পড়ে গেল মাটিতে। আর শক্তি ছিল না ওর। পাশে যে ছিল সে টর্চ জ্বালল একবার চকিতে। রক্তাক্ত ধুলোমাখা মুখ রাজুর—চিনতে পারবার কথা নয়। ঊর্মিলাও চিনতে পারল না। সে চমকে ব'লে উঠল, 'বাই জোভ—এ কে?

এ তো আমাদের পার্টির কেউ নয়!'

কিন্তু সে প্রশ্ন মীমাংসার সময় তখন নেই। সিপাহীরা হৈ হৈ ক'রে এগিয়ে আসছে, সেই বন্দুকধারী লোকটি সকলের পুরোভাগে। পালাও—পালাও! এ যাত্রা ব্যর্থ হয়েছে, এভাবে আর আসা চলবে না।…পালাও!

সবাই দ্রুতগতিতে নিবিড় বনের মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ পথ ধরে ছুটল। শুধু আর উঠতে পারল না রাজু। তার পক্ষে আর কখনই ওঠা সম্ভব হবে না, কোনদিন নয়।

জীবনের জয়মাল্য

মেহগনি কাঠের ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড সিক্রেটেয়ারটার উপর জুতাসুদ্ধ পা দুইটা তুলিয়া দিয়া সোমনাথ কহিল, 'বিয়ে? পাগল হয়েছ?…একপাল ছেলেপিলে, তাদের হাজারো রকমের ঝঞ্ঝাট আর বায়না—তার ওপর এক মোটাসোটা গিন্নি, যিনি দিনরাত কাপড়-গয়না-টয়লেটের ফর্দ, অনাবশ্যক কৌতূহল আর অসংখ্য কৈফিয়ৎ নিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরে থাকবেন! অসম্ভব, ও সব ঝামেলা আমার নার্ভ্‌স একদিনও সহ্য করতে পারবে না।'

ইন্দ্রজিৎ পাইপে তামাক ভরিতে ভরিতে কহিল, 'কি নিয়ে থাকবে তা হ'লে? শুধু টাকা? আর টাকাই বা তাহ'লে কার জন্যে?'

সোমনাথ জবাব দিল, 'কি নিয়ে থাকব মানে কি? আমাকে নিয়ে থাকব। আমারই জন্যে সব। টাকা দরকার আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে; আমার মোটর চাই, রেস চাই, পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া চাই, ভাল স্যুট চাই, আরামে বাস করবার জন্য! যা কিছু সব আমি। তোমরাও কি দিনরাত ঐ বিশেষ 'আমি'-টির পাশেই ঘুরছ না?'

ইন্দ্রজিৎ মুহূর্ত-কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'কিন্তু যে উপায়ে টাকা তুমি রোজগার করছ, তাতে সত্যিকারের স্বাচ্ছন্দ্য কি কোনদিন পাবে? ঐ যে গরীব লোকগুলি সরল বিশ্বাসে তোমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে যাচ্ছে, ওদের অভিশাপ কি তোমার সুখের পথে আগুন ছড়িয়ে যাবে না? আর এই দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, এরাও কি তোমায় ঐ টাকা স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে দেবে?'

চুরুটটা দাঁতে চাপিয়া সোমনাথ কহিল, 'কাওয়ার্ডস !···ওসব অভিশাপে আমার কি হবে ? তারা প্রত্যেকেই সাবালক, তারা জানে যে মানুষ চারিদিকে বসে আছে ঠকিয়ে টাকা নেবার জন্যে। সব জেনেও তারা কি জন্যে আমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে যাচ্ছে ? তারাও আলটপ্‌কা টাকা পাবে, এই লোভে তো ? তাতে যদি তারা সে টাকা না পায় বা ঠকে, সে কি আমার দোষ ?··· আর তা ছাড়া দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার কথা যা বললে, ঐটেই তো আমার মূলধন।··· কিছু না দিলে অর্থ আসবে কোথা থেকে ? তোমার য়্যাটর্নির অফিসে বসে দুশ্চিন্তা কি কিছু কম করতে হয় ? সেটা পরের জন্যে—এটা না হয় নিজের জন্যে, এইটুকু তফাৎ তো ?'

কেরানী নরেশবাবু ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, 'একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাইরে বসে আছেন।'

সোমনাথ কহিল, 'বলোগে এখন ভেতরে লোক আছেন। মিনিট-পাঁচেক পরে নিয়ে এস।'

ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'যা ভাল বোঝ করো ভাই। কিন্তু আমার বড় ভয় হয়।'

তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আচ্ছা, আজ তবে আসি—'

পাশের অন্য একটা পর্দা সরাইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সোমনাথ আই. এ. ফেল করিয়া দাদার সহিত বিবাদ করে এবং তেরো টাকা হাতে লইয়া একদা ধানবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আজ ঠিক তেরো বৎসর আগেকার কথা। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত সে অনেক কিছুই করিয়াছে জীবিকার্জনের জন্য, সম্প্রতি একটি পথ সে আবিষ্কার করিয়াছে যাহাতে দ্রুত অনেক টাকা উপার্জন করা যায়। কোন একটি লিমিটেড কোম্পানী খুলিয়া কিছুদিন তাহার শেয়ার বিক্রি করে, তাহার পর সহসা একদিন বিচিত্র উপায়ে কোম্পানীকে ইন্‌সল্‌ভেন্সি আদালতে পৌঁছাইয়া দেয়। তাহার বর্তমান উদ্যমটা ব্যাঙ্ক ; স্থাপনের সময় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে যাঁহারা এই ব্যাঙ্কের শেয়ার কিনিয়া অন্ততঃ কিছু টাকা রাখিবেন, তাঁহাদের শেয়ারের অংশের দশগুণ পর্যন্ত টাকা, পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নাম

মাত্র স্থদে ধার দেওয়া হইবে—অবশ্য ছয় মাস পরে। বলা বাহুল্য যে শেয়ার ক্রেতার অভাব হয় নাই, টাকা জমাও যথেষ্ট পড়িয়াছিল, কিন্তু এদিকে ছয় মাসেরও বেশী বিলম্ব নাই। সেই কথাটা চিন্তা করিয়াই সোমনাথ তাহার য্যাটর্নী বন্ধু ইন্দ্রজিৎকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে এবং কোন্ আইনের পথ ধরিয়া এতগুলি লোকের টাকা অন্তর্হিত হইবে, তাহাও বিশদ্ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছে। এখন সে নিশ্চিন্ত···

নরেশবাবু যাঁহাকে লইয়া আসিলেন, তাঁহার বয়স খুব বেশী হয় নাই কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়াই গিয়াছেন। বেশভূষাও অত্যন্ত মলিন, জীর্ণ। তিনি ঘরে আসিতে সোমনাথ চেয়ারটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'বস্থন···তারপর, কি করতে পারি আপনার জন্যে বলুন দেখি? শেয়ার চান? কত টাকার? বেশী শেয়ার আপনাকে তো আর দিতে পারব না—'

মলিন মুখে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'বেশী টাকাই বা কোথা পাবো বলুন? দশখানি শেয়ারের প্রথম কিস্তির টাকা আর সেভিংস ব্যাঙ্কের পঞ্চাশটি টাকা জমা, এই একশোটি টাকাই যে ক'রে এনেছি তা ঈশ্বর জানেন। একটি পয়সা জমাতে পারি নি অথচ মেয়ে আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়েছে; স্ত্রীর গয়নাও নেই, ছেলেপিলের অস্থখেবিস্থখে সব গেছে, শেষ যেটি ছিল তাই বেচে এই টাকা ক'টি এনেছি—'

প্রসন্ন হাস্যে অভয় দিয়া সোমনাথ কহিল, 'তা দশখানা শেয়ার আপনাকে দিতে পারব। যান ঐ ঘরে, টাকা জমা দিয়ে দিন—শেয়ার সার্টিফিকেট পরে পাঠানো হবে।'

বৃদ্ধ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, 'কিন্তু তার আগে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, টাকাটা ঠিক পাবো তো? মেয়ে পার করার আর কোন উপায় নেই আমার!'

সোমনাথ কহিল, 'বিলক্ষণ! টাকা পাবেন না? কোম্পানীর আইন যখন হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই পাবেন, নইলে জুচ্চুরির কেসে পড়বো যে!···তবে হ্যাঁ, আর একটা জামিন চাই।'

ব্যাকুলভাবে বৃদ্ধ কহিলেন, 'জামিন? জামিন কোথা পাবো?'

সোমনাথ কহিল, 'ওঃ, সেটা কিছু নয়। হয় এই ব্যাঙ্কেরই কোন শেয়ার

হোল্ডার নয়ত আপনার কোন অফিসের বন্ধুকে দিয়ে একটা সই করিয়ে দেওয়া। আর তা-ও যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তো সে ব্যবস্থাও ক'রে দেওয়া যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাইয়া বাহির হইয়া যাইবার আগে আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'শেয়ার বেশ বিক্রী হচ্ছে, না?'

সোমনাথ স্মিতহাস্যে কহিল, 'শেয়ার? আপনাকে দশখানি দিলে আর মোটে ন'খানি বাকী থাকবে। তার মানে এর পর যিনি আসবেন তাঁকে পুরো দশখানাও দিতে পারব না। আচ্ছা নমস্কার।'

ইহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া সোমনাথ ডেস্কের কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং বাকীগুলি পুনরায় রাখিয়া দিয়া ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টার বোতাম টিপিল।

নরেশবাবুই ঘণ্টার উত্তরে প্রবেশ করিলেন, হাতে একতাড়া নোট একটি রবারের সূতায় বাঁধা। কহিলেন, 'আজকের কলেক্‌শান এই সব; খুচরো টাকাগুলি রেখে দিলুম।···আজ ছ'মাস পুরো হ'ল, কাল থেকেই কিন্তু 'লোনে'র দরখাস্ত আসবে—'

সোমনাথ কহিল, 'জানি।···আমার এখানে আসা আজকেই শেষ। ব্যাঙ্কের তহবিলে শ' দু'তিন টাকা আছে, ওটায় আর হাত দিও না। কাল থেকে দরখাস্ত পড়বে যখন, তখন এখনও সাতদিন সময় আছে, এই সাতদিনে যা আসবে সব তুমি নিও, দারোয়ানটাকে মাইনে বলে কিছু দিও না, এমনি শতখানেক টাকা দিয়ে দিও। তারপর চাবি ইন্দ্রজিতের কাছে পৌঁছে দিও। আচ্ছা আমি চললাম—'

কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্বেই নজরে পড়িল, দেবেনবাবু দ্বারপ্রান্তে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। দেবেনবাবু সি-আই-ডি'র লোক, মোটা বেতন পান। আর বার-দুই ইঁহার শুভাগমন হইয়াছিল। তখন সোমনাথ ভয় পায় নাই, একরকম করিয়া ইঁহাকে হিসাব বুঝাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু আজ যেন সহসা বুক কাঁপিয়া উঠিল।

তবুও জোর করিয়া মুখে অভ্যর্থনার হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, 'আসুন

দেবেনবাবু; নরেশ, তুমি বাইরে বোসগে—'

দেবেনবাবু নরেশবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'বাইরে আমার দু'জন সাব্‌ইন্‌সপেক্টার বসে আছে, দেখে ভয় পাবেন না, কিংবা একেবারে বাইরে যাবেন না। দারোয়ানটাকেও বাইরে পাঠাবার চেষ্টা করবেন না, পুলিস আছে বাইরে—'

তাহার পর সোমনাথের টেবিলের সামনে একটা দামী চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'সোমনাথবাবু, আজ যে আপনার ব্যাঙ্ক খোলার পর থেকে ছ'মাস পুরো হ'লো, তা আমি ভুলি নি। আজই যে আপনার শেষ এখানে আসা, তাও আমি অনুমান করেছিলুম—'

সোমনাথ অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, 'আমাকে কি আপনি য়্যারেস্ট করতে চান ?'

দেবেনবাবু কহিলেন, না, 'ঠিক য়্যারেস্ট নয়; তবে বোঝাপড়াটা না হওয়া পর্যন্ত একটু নজরে রাখতে চাই—'

মিনিট-দুয়েক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সোমনাথ নোটের তাড়াটা উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিল, 'দেখুন, আমি জানি যে আমাকে য়্যারেস্ট করার ক্ষমতা এখন আপনার নেই, ইন্‌সল্‌ভেন্সি কোর্টেও আমার কোন ভয় নেই। তবে এখন বা পরে আমাকে আপনি জ্বালাতন করতে পারেন, এ-ও জানি। আমাকে যখন এই কাজ ক'রেই খেতে হবে, তখন আপনাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে লাভ নেই।···এই তোড়াতে প্রায় হাজার টাকা আছে, ইচ্ছে করলে নিয়ে যেতে পারেন।'

দেবেনবাবু মধুর হাসিয়া নোটের বাণ্ডিলটি টানিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, 'আচ্ছা, আসি তাহ'লে। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।'

সোমনাথ মিনিট পনেরো পরে যখন নিচে নামিয়া আসিল তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নাই। তাহার বিরাট গাড়িখানা প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সোমনাথের মনে পড়িল এখন কিছুদিন তাহাকে গা-ঢাকা দিয়া থাকিতেই হইবে; সুতরাং কলিকাতা শহরে, অন্ততঃ বছর-খানেকের জন্য, আজই তাহার শেষ রাত্রি, কিছুদিনের মতো এই শহরকে অনুভব করারও

ইহাই শেষ সুযোগ! সে শোফোয়ারকে গাড়ি গ্যারেজে রাখিয়া দিবার আদেশ দিয়া বহুদিন পরে হাঁটিতে শুরু করিল।

তখন তাহার ঠিক বাসায় ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। সাফল্যের আনন্দে মন তাহার পরিপূর্ণ, ঠিক যেমনটি সে কল্পনা করিয়াছিল, প্রায় তেমনিই ঘটিয়াছে। দেবেনবাবুকে অনর্থক হাজার টাকা দিতে হইল বটে; কিন্তু তা হউক, অর্থ উপার্জনেই তাহার আনন্দ—সঞ্চয়ে নহে। এই ছয় মাসে সে যত টাকা পাইয়াছে সমস্তই সে এক মুহূর্তে দান করিতে পারে, কারণ সোমনাথ জানে যে ইচ্ছা করিলে সে পুনরায় উহার চতুর্গুণ টাকা উপার্জনও করিতে পারিবে।

সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে কখন যে বৌবাজারে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই। আজ যেন শহরের এই কোলাহল-মুখরিত রাজপথ অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল, এই আলো, এই শব্দ যেন নিবিড় করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

কিন্তু সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল কালিদাসকে দেখিয়া। কালিদাস তাহার বাল্যবন্ধু, দীর্ঘ দশ বৎসর পরে তাহার সহিত দেখা। প্রকাণ্ড এক পুঁটুলি বাজার, কডলিভার অয়েলের শিশি, হরলিক্স প্রভৃতি অতি কষ্টে এক হাতে সামলাইয়া অন্য হাতে রাস্তার পাশের ঠেলাগাড়ি হইতে জাপানী পুতুল বাছিতেছে—

সোমনাথ তাহার পিঠে হাত দিয়া কহিল, 'আরে কালিদাস যে! কী ব্যাপার?'

মুখ তুলিয়া সোমনাথকে নজরে পড়িতেই কালিদাসের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সস্নেহে কহিল, 'সোমনাথ তুই!...বহুদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল। কি করছিস আজকাল? পোশাক দেখে তো মনে হচ্ছে ভালই আছিস—'

সোমনাথ জবাব দিল, 'আমি ভালই আছি। তোর খবর কি? এখানে কি করছিস?'

কালিদাস পুনশ্চ দ্রুতহস্তে পুতুল বাছিতে বাছিতেই জবাব দিল, 'এই—ছেলেটার জন্যে একটা পুতুল বাচছি ভাই! ছেলে আমার নবাবপুত্তুর, রোজই

তার নতুন একটা পুতুল চাই। নইলে মহা কান্নাকাটি—'

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, 'ছেলে যখন হয়েছে তখন বিয়ে নিশ্চয়ই করেছিস। কবে করলি ?'

কালিদাস কহিল, 'বছর চারেক হ'ল।'

সোমনাথ প্রশ্ন করিল, 'কটি ছেলে ?'

কালিদাস জবাব দিল, 'ঐ একটি, বছর দুয়েকের হ'ল। তোর ক'টি ?'

সোমনাথ হাসিয়া কহিল, 'ছেলের মধ্যে আমি, বৌয়ের মধ্যেও আমি।'

কালিদাস বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তার মানে ? বিয়ে করিস নি বুঝি ?… সে কিরে ? বিয়ে কর্, বিয়ে কর্,—'

ততক্ষণে পুতুল কেনা শেষ হইয়াছে, সে সোমনাথকে কহিল, 'একটু দাঁড়া ভাই, পো'টাক ছানা কিনে আনি—'

বলিতে বলিতেই সে দৌড় দিল ছানার দোকানে। তাহার চোখ-মুখের প্রদীপ্ত একাগ্রতা এবং অসাধারণ ব্যস্ততা দেখিয়া সোমনাথ অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। এই কালিদাস তাহাদের ক্লাসের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলস এবং মন্থর ছিল, তাহার মধ্যে এত উদ্দীপনা আসিল কোথা হইতে ?

কালিদাস প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই ছানা কিনিয়া ফিরিয়া আসিল। সোমনাথ কহিল, 'ব্যাপার কি, এত ছুটোছুটি করছিস কেন ? এত জিনিস কিনে কি ক'রে নিয়েই বা যাবি ?'

কালিদাস একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, 'তুই কোন্ দিকে যাবি ? আমার আবার ছ'টা কুড়িতে ট্রেন। আমি বালিগঞ্জে থাকি কিনা।…যাবি ওদিকে ?…'

সোমনাথ অন্যদিন হইলে হয়ত কালিদাসের এই স্বার্থপর ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া বলিত, 'না।' কিন্তু সেদিন কি মনে হইল কে জানে, সে-ও তাহার সহিত জোরে জোরে হাঁটিতে শুরু করিল। কালিদাস কতকটা কৈফিয়তের সুরেই বলিয়া চলিল, 'মোটে একলা থাকতে পারে না। একটু দেরি ক'রে গেলেই বুকে মাথা রেখে এমন কাঁদে যে দেখলে বড় কষ্ট হয়।…আর শরীরটাও ভাল নেই কিনা। ছেলেটা হবার পর থেকেই সেই যে শরীর খারাপ হ'লো আর কিছুতেই সারতে পারলে না—'

সোমনাথ কহিল, 'কডলিভার বুঝি তারই জন্যে?'

কালিদাস কহিল, 'হ্যাঁ। তাই কি কিনতে দেয়! বলে 'আমার এ ছাই-ভস্ম দেহের জন্যে তোমাকে আর বাজে পয়সা খরচ করতে হবে না।' গত মাসে হাতে-পায়ে ধরে রাজী করিয়েছিলুম, তাই একটি বোতল খেয়েছিল। খেয়ে শরীরটা, বলতে নেই, একটু ভালই হয়েছে দেখে আজ একেবারে আর এক বোতল কিনে নিয়ে যাচ্ছি।...কত রাগারাগি করবে এখন—'

সোমনাথ তাহার অনর্গল বকুনিতে বাধা না দিয়া অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। এ কিসের আলো এ লোকটির মুখে? এ কোন্ আনন্দের আকর্ষণ?...একটু পরে সে প্রশ্ন করিল, 'কি করিস এখন?'

কালিদাস জবাব দিল, 'বার্মাশেলে কাজ করি। পঁচাশি টাকা মাইনে, তা তাইতেই আমাদের বেশ চলে যায়। মোটে তো আড়াইটি প্রাণী, কি-ই বা এমন পয়সার দরকার আমার?...'

সোমনাথ যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল। মাত্র পঁচাশি টাকা? এ লোকটা পাগল নাকি? সে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, 'গিন্নির কাপড়-গয়না ঐ টাকাতেই যোগাতে পারিস?'

কালিদাসের সমস্ত মুখ প্রেমের গর্বে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিল, 'কাপড় জামা দিয়ে ভালবাসা আমাকে কিনতে হয় নি। একবার শুধু শখ ক'রে একখানা কাপড় কিনতে চেয়েছিল, দোকানে খোঁজ ক'রে দেখি তার দাম মোটে পাঁচ টাকা, আর এই এতদিনের মধ্যে একটি মুক্তোর আংটি চেয়েছে। তবে ঐ এক আবদার—'দিনরাত আমার কাছে থাকো!' একদিন যদি অফিসের কাজে ফিরতে সাড়ে-সাতটা আটটা হয়ে যায় তাহ'লে আর রক্ষে নেই, ছেলেমানুষের মতো কাঁদে—বলে 'আর আমাকে তুমি ভালোবাসো না'!...'

ততক্ষণ শিয়ালদা' আসিয়া পড়িয়াছে। মোড়টা পার হইতে গিয়া সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কালিদাস কহিল, 'ঐ যাঃ, কিছু মিষ্টি তো নেওয়া হয় নি! দাঁড়া এক মিনিট—'

আবার সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল সন্দেশওয়ালার দোকানে, কোনমতে পয়সা বাহির করিয়া দিয়া ঠোঙাটা পকেটে পুরিয়া আবার ছুট—

কাছে আসিয়া কহিল, 'আর মোটে দু-টি মিনিট বাকী আছে, একটু পা চালিয়ে আয় ভাই—'

তাহারও যেমন মনে হইল না যে, এই লোকটার তাহার সহিত ছুটিবার কোন কারণ নাই, সোমনাথও সে কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল না। ছুটিতে ছুটিতেই কালিদাস কহিল, 'ছেলেটার আবার জিবেগজায় ভারী লোভ, একদিন ভুলে গেলে রক্ষে থাকে না! আর কী যে দুরন্ত হয়েছে কি বলব! তেমনি বুদ্ধিও, কে বলবে যে দু'বছরের ছেলে।'

প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি আসিতেই ছাড়িবার ঘন্টা শুরু হইল। কালিদাস উর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা ছুটিয়া গিয়া ছুটিতে-ছুটিতেই মুখ ফিরাইয়া কহিল, ঐ যাঃ, তোর ঠিকানাটা তো নেওয়া হ'ল না, একদিন আসিস না এখানে, কসবা ঘোষালপাড়া—'

শেষ মুহূর্তে কোনমতে সে জিনিসপত্রসুদ্ধ গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। আর একটু হইলে বোধহয় পড়িয়া যাইত।

বহুক্ষণ প্ল্যাটফর্মের প্রবেশপথে সোমনাথ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যেন কতকটা টলিতে টলিতে গিয়া একটা ট্যাক্সির ভিতর বসিয়া পড়িল। তাহাকে যেখানে খুশি চালাইবার আদেশ দিয়া সে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া সুগভীর ক্লান্তিতে চোখ বুজিল। জীবনের মধ্যপথে আসিয়া আজ সে প্রথম অনুভব করিল যে সে ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত! সে আজ একান্ত-ভাবে শুধু বিশ্রাম চায়।*

* এই গল্পের স্থানে স্থানে O. Henry-র প্রভাব আছে।

দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা

আশ্চর্য—দুটি ঘটনাই ঘটেছিল ট্রেনে। আর একই বছরে—মাত্র মাস দুয়েকের ব্যবধানে।

কিছুদিন আগে ডুমরাওঁর কাছাকাছি ডাউন অমৃতসর মেলে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে, তার বিস্তৃত বিবরণ আপনারা খবরের কাগজে পেয়েছেন। ওর

মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনার কথা সব কাগজেই বেশ মোটা হরফে ছেপেছিল। কোন কাগজে যেন একটা ছোট শিরোনামাও দিয়েছিল, 'রাখে হরি মারে কে!' অবশ্য এমনিতে তুচ্ছ এবং অর্থহীন হ'লেও, এই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতোই। এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক নাকি, সেই অমৃতসর থেকেই, ইঞ্জিনের পাশের কামরাতে চেপে আসছিলেন, হঠাৎ কী মনে হয় তাঁর, অকারণেই মোগল সরাইতে কামরা বদল ক'রে পিছন দিকের একটা বগিতে চলে যান। ফলে তিনি বেঁচে গিয়েছেন তো বটেই—তাঁর গায়ে এতটুকু আঁচও লাগে নি। আগের কামরাতে থাকলে বাঁচা সম্ভব হ'ত না—কারণ সে কামরা কেন, গোটা বগিটারই কোন চিহ্ন ছিল না বলতে গেলে। সম্ভবত একজনও বাঁচে নি তার আরোহীদের মধ্যে থেকে।

এ ঘটনা ঠিক ঠিক লিখলেও কাগজওয়ালাদের একটা কথা একটু ভুল লেখা হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা ঐ একটিই নয়। আরও একটি ঘটেছিল। আরও একজন দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল মোগল সরাইতে নেমে পড়ায়। আমি জানি, জোর ক'রেই বলতে পারছি, কারণ আমিই সেই ব্যক্তি। আমিও ছিলুম ঐ বগীতে। বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে এক কামারাতে ছিলুম। আমাকেও হঠাৎ নামতে হয়েছিল মোগল সরাইতে। নইলে আমাকে আজ বেঁচে থেকে এ গল্প লিখতে হ'ত না। তবে 'স্থানীয় সংবাদদাতা'দের এ খবর জানবার কথা নয়, কারণ আমি কাউকে বলি নি কথাটা এ পর্যন্ত। তাছাড়া আমার নেমে পড়াটা আমার ইচ্ছাধীন ছিল না। তাই আকস্মিক হ'লেও ঠিক অকারণ নয়।

কিন্তু সে কথা পরে বলছি। তার আগের ঘটনাটা আগে বলে নেওয়া দরকার।

ডুমরাওঁ-এর ঘটনার মাস-দুই আগে আমাকে একবার পুরী যেতে হয়েছিল। পুরী এক্সপ্রেসে স্লিপিং কারে স্থান না থাকায় হায়দ্রাবাদ-জনতায় গিয়েছিলাম। খুরদা রোড পর্যন্ত তো আরামে যাওয়া যাবে—তার পরের পথটুকু এক্সপ্রেসে কোনমতে ঠেলেঠুলে উঠতে পারব, তার জন্যে অত চিন্তা নেই। তাছাড়া সাধারণত খুরদাতে পৌঁছতে পৌঁছতে একটু হালকাও হয়ে আসে। কিন্তু সেদিন, আমার অদৃষ্টক্রমেই বোধ হয়, গাড়িতে একটুও জায়গা ছিল

না। সেদিন বোধ হয় অক্ষয় তৃতীয়া, জগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা শুরু হবে—পুরীযাত্রীদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তারিখটা—যতদূর মনে হচ্ছে ৬ই মে, রবিবার। ঘটনাটা যেমন ঘটেছিল—আমি যেমন দেখেছি—তেমনই লিখছি, এর মধ্যে গল্প-লেখকের কোন মার-প্যাঁচ নেই।

হ্যাঁ, যা বলছিলুম। গাড়ি আসতে চোখে অন্ধকার দেখলুম একেবারে। ওঠা হ'তই না, যদি না আমার এক ভাইপো আমার জন্যে মুখ বাড়িয়ে থাকত ঐ কামরার জানলায়। সে-ই হাঁকাহাঁকি ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং মালগুলো জানলা গলিয়ে তুলে নিয়ে আমাকেও কোনমতে দরজার ছ'ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে তুলে নিল। অসাধ্য-সাধনই একরকম—কারণ এই বিপুল দেহ যে ঐটুকু ফাঁক দিয়ে সত্যিই ঢুকল, তা ওঠবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজেরই বিশ্বাস হ'তে চাইল না।

শুধু ওঠা নয়, বাবাজীর দৌলতে একটু বসবারও জায়গা মিলল। বসে সবে একটু হাঁপ ছেড়েছি, গাড়ি তখনও ছাড়ে নি স্টেশন থেকে, ভাইপো মণি বলে উঠল, 'জানেন কী বিশ্রী একটা ঘটনা ঘটে গেল কাল আমাদের কামরাতে। একটা লোক বসে বসে মরে গেল হঠাৎ!'

'সে কি! কখন রে? কী হয়েছিল?'

মৃত্যু নিত্যই দেখছি, যেখানে-সেখানে যখন-তখন অতর্কিতে এসে ইহলোক থেকে ছিন্ন ক'রে মানুষকে মুহূর্ত মধ্যে অপর কোথাও, অন্য কোন লোকে নিয়ে যাচ্ছে, তবু কারও মৃত্যুর কথা শুনলে এখনও চমকে উঠি। এখনও যে-কোন লোককে মরতে দেখলেই মনের মধ্যে যেন একটা ধাক্কা লাগে। তা ছাড়া, কে জানে কেন, বিশ্বাসও হ'তে চায় না ঠিক। একটু আগেও যে লোকটা হাসছিল কথা বলছিল ঝগড়া করছিল—সে আর নেই? একেবারেই নেই? আর সে কখনও কথা বলবে না, হাসবে না, ঝগড়া করবে না?... তেমনি—একরকম আকস্মিক মৃত্যু খুব একটা অঘটন নয় জেনেও মনের মধ্যে একটা বিস্ময় ও অবিশ্বাস জাগে—আমাদের এই কামরাতেই, ট্রেনে যেতে যেতে একটা মানুষ মারা গেল—হঠাৎ?

মণিকে উত্তর দেবার সময় না দিয়েই আবার প্রশ্ন করি, 'ভীড়েই মরে গেল নাকি? তা তাকে কোথায় নামাল?'

মণি কিন্তু নির্বিকার, আজকালকার ছেলেরা বোধ হয় আমাদের চেয়ে ঢের বেশী পোড়-খাওয়া বলেই আমাদের চেয়ে অনেক সহজে নিতে শিখেছে জীবনের শিক্ষা। সে সহজ ভাবেই উত্তর দিল, 'না, ভীড়ে মরে নি। এমনিই, বসে থাকতে থাকতে বার-দুই যেন হেঁচকির মতো তুলল, থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল দু-এক মিনিট, তারপরেই সব স্থির হয়ে গেল। এই তো একটু আগে, তখন বোধ হয় রাত চারটে হবে।'

'তারপর? কী করলি তখন? চেন টেনে গার্ডকে খবর দিলি? নাকি কোন স্টেশন এসে গিয়েছিল?'

'কিছুই করা হয় নি। কে ওসব ঝামেলায় যায় বলুন! ঐ তো পড়ে আছে—আপনি তো ওকে ধাক্কা দিয়েই ভেতরে এলেন!'

আবার একদফা চমকে উঠি—সমস্ত শিক্ষা ও সংস্কার সত্ত্বেও শিউরে উঠি একটু।

মরা লোককে ছুঁয়ে, ধাক্কা দিয়ে চলে এসেছি!

সে কি!

কিন্তু কথাটা ঠিকই। না ছুঁয়ে আসবার উপায় নেই—তা নিজেই দেখতে পেলুম। আজকালকার কামরা, একদিকে সামনাসামনি বড় বেঞ্চি, আর একদিকে জানলার গায়ে বসানো একটি ক'রে সীট, দরজা খুলে এদিকে আসতেই প্রথম যে সীটটা পড়ে, তারই পেছনের খাঁজে ঠেস দিয়ে বসে আছে মানুষটা—নিজেরই কী একটা ছোট পুঁটুলির ওপর। চোখটা অর্ধ-নিমীলিত, স্থির, মুখটা একটু হাঁ করা। মৃত্যু বলে বোঝবার উপায় নেই, মনে হচ্ছে যেন সারারাত ঘুম হয় নি বেচারার ভীড়ে আর গরমে—এখন ভোরের হাওয়া পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই দেশেরই—অর্থাৎ উড়িষ্যার লোক বলে মনে হ'ল। খালি গা, একটা ছিটের ফতুয়া এবং গামছা কোলের ওপর গোঁজড়ানো, পরনের ধুতিটাও যৎ-পরোনাস্তি ময়লা। হয়ত টিকিটও ছিল না, ভিক্ষুকশ্রেণীর কেউ হবে। পায়ে—অনাবৃত উরুতে একটা ফোঁড়া রয়েছে—ভিড়ের চাপে ফেটে গিয়ে থাকবে, তার পুঁজ ও রক্ত এখনও জমে আছে সেখানটায়। মনে হচ্ছে এখনও তাজা, হয়ত আর একটা ধাক্কা লাগলে এখনই গড়িয়ে পড়বে।

কিন্তু মৃত লোকটির গায়ে এসব কি ?

একটু ঝুঁকে দেখি খান দুই শক্ত-হয়ে-যাওয়া বাসি লুচি, আলু-চচ্চড়ির আলু গোটাকতক, দু-তিনটে চিনাবাদাম, একটা ঢিলও বোধহয় !

বিস্মিত হলুম, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়। কারণ শুধু আমার ভাইপো নয়—ঘটনাটা বিবৃত করতে আরও অনেকেই দেখলাম উৎসুক। কতকগুলি ছেলে যাচ্ছে—সম্ভবত একই কলেজের ছেলে, এক্সকারশ্যান চলেছে, উনিশ কুড়ি একুশের মধ্যেই বয়স বেশির ভাগ ছেলের, তারা দুই দরজার মধ্যবর্তী স্থানটা ও বাথরুম জুড়ে নিজেদের মাল রেখে নিজেরাও সেইখানে বসেছে এবং বয়সোচিত হৈ-হল্লা ও কালোচিত অসভ্যতা করতে করতে যাচ্ছে। তারাই—লোকটা যখন মারা যায় তখন সত্যিই মরেছে কিনা পরখ করবার জন্যে—ঢিল বা পাথরের বদলে লুচি আলু ও চিনেবাদাম ছুঁড়েছে। জলও দিয়েছে কেউ কেউ। লাঠি দিয়ে খোঁচাও দিত—নেহাৎ মরামানুষ ছোঁওয়া সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন একটা আতঙ্ক অল্প-বিস্তর সকলের মধ্যে থাকাতেই, এ যাত্রা লোকটা রক্ষা পেয়ে গেছে।

ঘটনাটা শুনতে ভালো লাগল না। কারণ ছেলেগুলি আমারই প্রদেশ-বাসী—বাঙালী। এরাই এ দেশের ভাবী নাগরিক, এদের হাতেই দেশের আশা-ভরসা। গাড়িশুদ্ধ বাকী আরোহীরা সকলেই বিরক্ত ওদের ব্যবহারে, সারারাত ধরে হৈ-হল্লাই শুধু করে নি, অপর যাত্রীদের ওপর জুলুমও করেছে যথেষ্ট।

কিন্তু যাদের ওপর জুলুম করেছে তারা যদি প্রতিবাদ বা প্রতিকারের চেষ্টা না ক'রে থাকে তো আমি কি করতে পারি ? চুপ ক'রে বসেই রইলাম, বসে বসে ভাবতে লাগলাম ঐ লোকটার কথা। ও যেদিন ওর বাপ-মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করে, সেদিন না জানি কত আশা কত ভরসা তাঁরা করে-ছিলেন ওর ওপর। সেদিন কে ভেবেছিল যে নামহীন পরিচয়হীন একটা মৃতদেহরূপে তার জীবনের এমন শোচনীয় পরিসমাপ্তি ঘটবে! কে জানে ওর কেউ আছে কি না—আত্মীয়স্বজন স্ত্রী-পুত্র। থাকলেও, তারা জানতেও পারবে না হয়ত ওর এই মৃত্যুর কথাটা। হয়ত তাদেরও অবস্থা ভাল নয়। তবু যেখানেই হোক আর যেমনই হোক—কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে কি

স্বগ্রামেও যদি মরত, তবু আগুনটা পেত, সৎকার হ'ত একটা। এ যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি—বেওয়ারিশ লাশ প্রথমত পুলিস মর্গে যাবে, তারপর পাচার হবে কোন হাসপাতালে, ছাত্রদের হাতে ছেঁড়া-কাটা হ'তে। শেষ পর্যন্ত হয়ত সেই গলিত শবদেহটারও সৎকার হবে না, ডোমরা অস্থিগুলো নিয়ে কঙ্কাল হিসেবে বিক্রি করবে মোটা দামে।

ভাবতে ভাবতেই একসময় পুরী এসে গেল। একটু দেরিই হ'ল, কারণ সাক্ষীগোপালে কে একটি ছেলে কাটা পড়ল আমাদের গাড়িতেই—তার জন্যে সেখানে আটকে থাকতে হ'ল অনেকক্ষণ।...পুরীতে আসতে আগেই হুড়মুড় ক'রে হৈচৈ করতে করতে নামল সেই ছেলের দল। তারপর একে একে আরও অনেকে নেমে গেলেন। আমি অপেক্ষা করলাম শেষ পর্যন্ত। সঙ্গে গঙ্গাজল কি প্রসাদী তুলসী নেই—নইলে ওর একটা শেষকৃত্য করার চেষ্টা করতাম। তবু যতটুকু পারি তা করব—আগেই মনে মনে স্থির করেছিলাম। সকলে নেমে যেতে, আমারও মালপত্র নিয়ে কুলীরা ও মণি নেমে যাবার পর, আমি কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে গীতার যে তিন-চারটি শ্লোক মুখস্থ ছিল অনুচ্চ-কণ্ঠে তাই উচ্চারণ করলাম, তারপর তারকব্রহ্ম নাম শুনিয়ে বললাম, 'ভাই, তুমি যে-ই হও তোমার আত্মা যদি কাছাকাছি কোথাও থাকে তো ভগবানের এই নামেই পরিতৃপ্ত হও, উদ্ধার লাভ ক'রে স্বর্গে চলে যাও।'

আর বেশী কিছু বলার সময় মিলল না, প্ল্যাটফর্ম থেকে অসহিষ্ণু ভাইপো ডাকাডাকি করছে। কী করছিলুম খালি গাড়িতে এতক্ষণ ধরে—কৈফিয়ৎ চাওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু আমি তো কিছুই বলতে পারব না। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে মাল নিয়ে কুলীদের সঙ্গে তকরার জুড়ে দিলুম ; দেরি হওয়ার প্রশ্নটা চাপা পড়ে গেল।

এ ঘটনাটা ঘটেছিল মে মাসের প্রথমে ; জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, একুশ তারিখের অমৃতসর মেলে আসছিলাম লক্ষ্ণৌ থেকে। কাশীতে ঠাকুমা আছেন। এদিকে এলে আসা-যাওয়ার পথে বরাবরই নামি একবার ক'রে, কিন্তু সেদিন আর নামতে ইচ্ছা হ'ল না। প্রথমত জরুরী কাজ পড়ে আছে কলকাতায়, দ্বিতীয়ত কোনমতে এই তিন চার ঘণ্টা ধবস্তাধ্বস্তির পর ওপরের বাঙ্কে একটু জায়গা পেয়েছি হাত-পা ছড়াবার, আজ নামলে কাল আদৌ

গাড়িতে উঠতে পারব কি না সন্দেহ। তাছাড়া আবার মাস-দুই পরেই হয়ত আসতে হবে এদিকে, সেই সময় একবার নামলেই হবে—এই বলে মনকে সান্ত্বনা দিয়ে পড়ে রইলাম।

মোগলসরাই পৌঁছতেই যথারীতি আবার সেই ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। কিন্তু আমি তো এখন পাকাঘুঁটি' তাই নিরাসক্ত ভাবেই চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম—সামান্য স্থান সংগ্রহের জন্য সেই অসামান্য উন্মত্ততা, এমন সময় হঠাৎ কানে গেল কে যেন প্ল্যাটফর্ম থেকে আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে, 'কনকবাবু আছেন কোন্ গাড়িতে, কনকবাবু!'

আমারই নাম ধরে ডাকছে, না অন্য কাউকে? ঠিক বুঝতে না পারলেও একটু উৎকণ্ঠা বোধ করলাম। অথচ উঁকি মেরে যে দেখব তারও উপায় নেই। দরজার কাছেই শুধু নয়, প্ল্যাটফর্মের দিকে জানলার কাছেও অমানুষিক ভীড়।

কিন্তু ডাকটা আমার কামরার কাছে এসেই থামল না।

ঐ যে কে একটা লোক, যেন সবাইকে ঠেলেঠুলে ধাক্কা দিয়ে মুখ বাড়াচ্ছে ভেতর দিকে—

'কনকবাবু! কনকবাবু আছেন এ গাড়িতে? এই যে। ও বাবু আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলুম। নেমে পড়ুন—নেমে পড়ুন শিগগির। আর টাইম নেই মোটে।'

সে কি! কাকে বলছে এ নামতে? আমাকেই নাকি?

কেনই বা বলছে? আমাকে তো চেনে দেখছি কিন্তু আমি তো একে চিনি বলে মনে পড়ছে না।

কালোমতো একহারা গোছের লোকটা। একটা ছিটের ফতুয়া গায়ে, কাঁধে গামছা। পরিষ্কার বাংলাই বলছে বটে কিন্তু সামান্য একটু বিদেশী টান আছে। কতকটা উড়িষ্যাবাসীর মতো। হসন্ত উচ্চারণ হয় না—হয়রাণ উচ্চারণ করছে শেষের অক্ষরটা অকারান্ত করে—হয়রাণ্-অ।

চেয়েই আছি অবাক হয়ে, লোকটি আবার অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল, 'নামুন, নামুন শিগগির; আগের ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার একেবারে ছাড়ার ঘণ্টা পড়বে। আপনার ঠাকুরমার খুব অসুখ—বাঁচবার আশা আর নেই।

এখন শুধু গলার কাছে প্রাণটা ধুকধুক করছে—বোধ হয় আপনার হাতের জলটুকুর জন্যেই—'

আর বলতে হ'ল না। নিমেষে সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা কেটে গেল। ছিয়াশি বছর বয়স ঠাকুমার, মৃত্যুটাই এখন স্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত নয় অন্তত। তবে এমন নির্বান্ধব ও অনাত্মীয় অবস্থায় মৃত্যুটা বাঞ্ছনীয় নয় আমাদের কাছে। বিশেষ যখন তাঁর এখনও তিনটি ছেলে এবং এতগুলি নাতি-নাতনী বর্তমান। বহুবার বুড়িকে সাবধান ক'রে দিয়েছি, এই ভয়ই দেখিয়েছি কিন্তু শুনবে না তো কারুর কথা! বলে, 'আমার বিশ্বনাথ আছেন, তিনিই দেখবেন। মরতে তো হবেই, আর কখন কী ভাবে মরব কেউ লেখাপড়াও ক'রে দিতে পারে না, তবে এই বয়সে কাশী ছেড়ে যাব কেন?'

কিন্তু সে সব কথা ভেবে লাভ নেই এখন। সময় অতি সামান্য, এক মিনিটও বোধ হয় আর নেই। নাম্ নাম্—'এ ভেইয়াজী, এ সর্দারজী—তানি গোড় রাখনে দিজিয়ে—ভয় নেই আপকা। উতার যাতা হ্যায়, যানে দিজিয়ে থোড়া।' বিছানাটা বাঁধবারও সময় হ'ল না। কোনমতে জড়িয়ে নিয়ে এক হাতে সুটকেস এক হাতে বাস্কেট ও বগলে বিছানা ক'রে ঠেলেঠুলে লোকের পা মাড়িয়ে কনুইয়ের গুঁতো খেতে খেতে একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন নেমে পড়লাম বা নেমে পড়তে পারলাম, তখন গাড়ি চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে। তবু ঠিক নিচে পা দেবার সময়টাতেই হোল্ডঅলের স্ট্র্যাপটা এক মুসলমান ভদ্রলোকের হাতের ছাতিতে আটকে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। হয়ত চাকার নিচেই গিয়ে পড়তাম দুজনে, যদি না আর একজন সেইরকম ঝুলে-যাওয়া যাত্রী চোখের নিমেষে স্ট্র্যাপটা ছাড়িয়ে দিতেন! ফলে জলের ক্যারিয়ারটা যে আনা হ'ল না—সেটা মনে পড়তে আরও বহুক্ষণ সময় লাগল। ততক্ষণে আমার বগীটা চোখের বাইরে চলে গিয়েছে।

মালগুলো প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে খানিকটা দম ছেড়ে একটু সুস্থ হ'তেই মনে পড়ল লোকটির কথা। সে গেল কোথায়, বিছানাটা বাঁধুক না।

কিন্তু কোথায় সে? আশেপাশে কোথাও তো নেই। ভীড়ে কোথাও মিশিয়ে থাকবে সে সম্ভাবনাও নেই, প্ল্যাটফর্মের ভীড় অনেকখানিই হাল্‌কা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, এ গাড়ি থেকে যারা নেমেছিল তারা সবাই চলে গেছে—

যে যার মালপত্র নিয়ে—এখন কয়েকটি কুলী, ভেণ্ডার এবং আমার মতো শেষ-মুহূর্তে-নেমে-পড়া দু'একজন যাত্রী ছাড়া আর কেউ নেই।

বিরক্তি বোধ হ'ল। লোকটার নামও জানি না যে চিৎকার ক'রে ডাকব। অগত্যা একটা কুলীই ডাকলাম—'বিছানাটা বেঁধে দে তো বাবা।'

সে এসে মাথার বিড়েটা ঠিক করতে করতে প্রশ্ন করল, 'কাঁহা জাইয়েগা? বাহার জাইয়েগা কেয়া?'

'বনারস জানা হ্যায়—' সংক্ষেপে উত্তর দিই।

'বনারস? তব্ তুরন্ত চলিয়ে। বাস অভি ছোড়নে-আলা হ্যায়।'

'বাস? কোই ট্রেন নেহি হ্যায়?'

'জী নেহি। সব চলা গিয়া।'

'তব চলো।'

বলেই মনে পড়ল—কিন্তু সে লোকটা? গেল কোথায়? নামটা তো জানি না ছাই—ওকে বাদ দিয়েই যাব নাকি?

বিপন্ন মুখে তাকালাম চারিদিকে। ততক্ষণে কুলীটি বিছানা বেঁধে মালপত্র গুছিয়ে তুলে নিয়েছে। সেও অসহিষ্ণু। আর দেরি করা যায় না।

আচ্ছা, গাড়িটাড়ি ঠিক করতে যায় নি তো! তাহলে তো বলে যাওয়া উচিত। কী রকম লোক পাঠিয়েছে এরা, বুনো, জংলী।

সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল কথাটা—

কে পাঠিয়েছে? ঠাকুমা তো শুনছি অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়িওলাদেরও এক বৃদ্ধা ও একটি বালক ছাড়া কেউ থাকে না ওখানে। তাঁদেরও—যতদূর জানি—চাকর রাখার ক্ষমতা নেই, ঠিকে ঝি এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়।

তাছাড়া, আমি যে এই ট্রেনে ফিরছি তাঁরা জানবেন কি ক'রে? আমি যে লক্ষ্ণৌতে এসেছি তাও তো জানবার কথা নয় তাঁদের। হঠাৎ এসেছি এক দিনের জন্যে, কাউকেই জানানো হয় নি।...কলকাতার আত্মীয়রাই সকলে জানে না। তবে...

আর ঐ লোকটাই বা চিনল কি ক'রে আমাকে!

আমি তো ওকে কখনও দেখি নি, চিনিও না। অথচ ও আমাকে খুঁজে চিনে বার করেছে এটাও তো ঠিক।

বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম বোধ হয়, কুলীর তাড়ায় চমক ভাঙল, 'চলিয়ে না বাবু, কেয়া দেখতে হেঁ ইধার উধার। ভারী সামান শির পর লেকে—'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম ওর পিছু পিছু। রহস্য যাই হোক, সে পরে ভাবা চলবে। আপাততঃ তাড়াতাড়ি গণেশমহল্লা পৌছানো দরকার। ঠাকুমা মৃত্যুশয্যায়, এতক্ষণ আছে কিনা তাই বা কে জানে। তবু যদি শেষ মুহূর্তে জলটুকু দিতে পারি মুখে। অনেক আদর খেয়েছি, মনটাও কেমন করছে।

আমরা পুল পেরিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছতে পৌঁছতেই একটা বাস ছেড়ে গেল। পরের বাস আধ ঘণ্টা বাদে ছাড়বে। অতক্ষণ অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই আমার। সামনে একটা স্টেশন-ওয়াগন দাঁড়িয়ে ছিল, একার পক্ষে অত বড় একটা গাড়ি ভাড়া করা খুবই বাড়াবাড়ি কিন্তু আমার তখন অত ভাবলে চলে না, দরদস্তুর ক'রে তাতেই উঠে পড়লাম।

আরও একবার তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে, গাড়ি ছাড়ার আগে, যদি লোকটাকে এখনও কোথাও দেখা যায়। কিন্তু জনা-পাঁচ ছয় রিক্সাওয়ালা, আর জনাকতক গোলাপী-রেউড়ী ইত্যাদির ফেরিওয়ালা ছাড়া কেউই নজরে পড়ল না।

আশ্চর্য, লোকটা কি বাতাসে উবে গেল ?

কে লোকটা—অত কাণ্ড ক'রে নামাল আমাকে ট্রেন থেকে, বিলক্ষণ চেনে বলেই মনে হ'ল অথচ ঠিক নামার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় সরে পড়ল। আর টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না! একেবারে হাওয়া হয়ে গেল!...

অন্ধকার রাত—পথের দুদিকে তেমন ঘর-বাড়ি নেই, যা আছে সে সব বাড়ির অধিবাসীরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ—চারিদিকে থম থম করছে অন্ধকার। মোগলসরাই আর গঙ্গাপুলের আলো পিছনে ফেলে এসেছি, কাশী শহরের আলো এখনও বেশ দূরে। সেই ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মনটা ঘুরে ফিরে আবার ঐ লোকটিতে এসেই ঠেকল। কে হ'তে পারে ও, কার লোক ? আমাদের কোন পুরনো চেনা লোক ? হঠাৎ কাশীতে এসে পড়েছিল ঠাকুমার কাছে। হয়ত এই ট্রেনেই যাবার কথা, আমাকে খবরটা দিয়ে আবার নিজের কামরায় উঠে পড়েছে ?

কিন্তু জানল কী ক'রে ?—যে আমি এই ট্রেনে আছি ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরটাও মনে এল। হয়ত ও এমনিই এসেছিল, ছাউনী স্টেশন থেকে ট্রেন ধরবে বলে। চলন্ত গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢোকার সময় জানলার কোন্ ফাঁক থেকে দেখেছে আমায়। তখনই মনে পড়েছে আমাকে খবর দেবার কথা। সেটা ওখানে আর হয়ে ওঠে নি, নিজের জায়গা খুঁজে উঠতে উঠতে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—মোগলসরাইতে নেমে তাই খুঁজছিল কোন্ কামারাতে আছি। ট্রেন ছাড়ার সময় খবরটা দিয়েই ছুটে গিয়ে আবার নিজের কামরাতে উঠেছে।

ঠিক তাই। এই সহজ কথাটা এতক্ষণ মাথাতে যায় নি! আশ্চর্য!

সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে মনটা অনেকটা সুস্থির হয়। নড়ে চড়ে সুস্থির হয়ে বসি।

কিন্তু লোকটা কে তাহ'লে?

আমাদের চেনে, ঠাকুরমাকে চেনে, সেখানে গিয়েছিল খুঁজে খুঁজে—নিশ্চয়ই পারিবারিক পরিচয় আছে—অথচ আমি চিনতে পারলাম না কেন? কোন পুরনো চাকর? কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যত পুরনো চাকর দেখেছি, সকলকেই তো মনে আছে। যুধিষ্ঠির, গিরিধারী, ভূপতি, শিবু—তাদের তো কেউই নয়।

অবশ্য ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছে, খুব পরিচিত না হ'লেও—একেবারে অ-দেখা মানুষও নয়। এক-আধবার যেন কোথায় দেখেছি ওকে। কেমন একটা পরিচিত আদল, পথে ঘাটে ট্রামে বাসে দু-একবার কোন লোককে দেখলে, পরে যেমন তার সম্বন্ধে আব্ছা অস্পষ্ট একটা স্মৃতি জাগে তেমনিই—

অথচ ও তো আমাকে ভাল রকমই চেনে। ঠিক এরকম এক-আধবারের দেখা লোককে মানুষ ভীড়ের মধ্যে এক লহমায় দেখে চিনতে পারে না।

দূর হোক গে, মরুক গে। অত ভাবতে পারি না আর। কিছু একটা আছেই রহস্য, সময় হ'লে তা আপনিই উদ্‌ঘাটিত হবে। এখন বুড়ি কেমন রইল সেই ভাবনা, ঠিক থাকবে কি আমার পৌঁছনো পর্যন্ত?

গণেশ মহল্লার বাসায় পৌঁছে কিন্তু বেশ একটু অবাকই হয়ে গেলুম। সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, নিস্তব্ধ। কোন ঘরে কোথাও একটু আলোর আভাস

নেই। নিচের দরজা জানলা সব বন্ধ। যেমন ঘর-দোর বন্ধ ক'রে লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে যায়—তেমনি। শান্ত ও সুষুপ্ত।

রাত এমন কিছু হয় নি। ঘড়ি দেখলাম—সবে সওয়া নটা। কাশী শহর তো গমগম করছে, আলোতে, কোলাহলে ও জনস্রোতে। সাইকেল-রিক্সার মালা ভেদ ক'রে গোধুলিয়ার মোড় পেরুতে পুরো পাঁচ মিনিট সময় লাগল। এরই মধ্যে এমন নিস্তব্ধতা!

এঁরা অবশ্য সকাল ক'রে শুতেই অভ্যস্ত, কাজই বা কী এঁদের আছে—যা রাত্রিবেলা আলো জ্বেলে করতে হবে। একটা বাচ্চা আছে, পড়াশুনো করতে সে-ই করে কিন্তু তারও ঘুমিয়ে পড়ার সময় হয়েছে। তবু—যে বাড়িতে মুমূর্ষু রোগী সে বাড়িতে আলো জ্বলবে না একটাও, কেউ জেগে থাকবে না—এ কেমন কথা?

নাকি, শেষ হয়েই গেছে বুড়ি? নিয়ে চলে গেছে সকলে? তাহ'লেও তো একটা আলো জ্বলবার কথা। অন্তত সে ঘরে। এই তো সদরের ঠিক ওপরের ঘরেই ঠাকুমা থাকেন বা থাকতেন, সে ঘরের জানলাও খোলা, তবে আলো দেখা যাচ্ছে না কেন?

ইতস্তত করছি, সঙ্গে যে লোকটা মাল বয়ে এনেছিল বড় রাস্তা থেকে, সে তাড়া দিয়ে উঠল। অগত্যা সমস্ত দ্বিধা বিসর্জন দিয়ে কড়া নাড়লুম।

প্রথমটা তো কোন সাড়াই মিলল না। আবার কড়া নাড়তে সাড়া এল আমারই মাথার ওপর থেকে। এবং সে গলা চিনতেও কোন অসুবিধা হ'ল না, আমারই ঠাকুরমার।

'কে র‍্যা ····কে ডাকে?'

তারপর স্পষ্ট শুনতে পেলুম তাঁরই অর্ধ-স্বগতোক্তি, 'কলাবতীর মা এল নাকি, ওমা, এরই মধ্যে ভোর হয়ে গেল? বলি কি রে, সাড়া দিস না কেন? এ যে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। এত রাত থাকতে কোন্ মড়া এল আবার!'

ঠাকুমা নিঃসন্দেহ। এ গলা এবং এ ভাষা আর কারুর হ'তেই পারে না। কিন্তু কী রকম হ'ল তাহ'লে?

এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে কোনরকম সাড়া দেবার ক্ষমতা ছিল না। পিছন থেকে মালবাহী লোকটি আবার তাড়া দিয়ে না উঠলে হয়ত

অনেকটা সময় লাগত গলা দিয়ে স্বর বেরোতে।

'আরে, আপকো নাম বলিয়ে না বাবু। ঝুটমুট দেরি হোতা হ্যায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি। ঘুম ভাঙুক বুড়ির।' তাকে একটু মৃদু ধমক দিয়ে যেন নিজের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনি।

এবার চেঁচিয়ে বলি, 'ও ঠাকুমা, আমি। আমি কনক।'

'কে—কে বলসি? কনক! আমাদের থাবু! কী হবে মা। তুই এত রাত্তিরে আবার কোথা থেকে এলি।...বলি অ বড় বৌ, অ স্বদেশের মা, ছাখো না বাছা কে এল।...আমার কোমর ছাড়িয়ে উঠতে তো এখনও চার দণ্ড। কত রাত হ'ল তাও তো ঠাওর পাই না ছাই।'

ও ধারের ঘরে আলো জ্বলল। লোকের গলার আওয়াজও পাওয়া গেল। আলো জ্বলল সিঁড়িতেও। সদরের ওধারে তালাতে চাবি পড়ল। তারপর শুনতে পেলুম স্বদেশবাবুর মার নিদ্রালু কণ্ঠ, 'কে গা, কে ডাকছে?'

'ও কাকীমা, আমি।'

'এস এস। এত রাত্রে কোথা থেকে?'

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন তিনি।

ওপরে উঠে দেখি ঠাকুমা তাঁর রাত্রিবাসের খাটো কাপড়খানি গুছিয়ে পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। বাতের শরীর, বিছানা থেকে উঠতেও দেরি হয় যেমন, তেমনি উঠে খানিকটা না খোঁড়ালে পায়ে জোর পান না।

আমাকে দেখে বুড়ির মুখে হাসি ফুটল।

'ও মা, সত্যিই তো তুই দেখি। তা এত রাত্রে এমন হঠাৎ? একটু খবর দিয়ে তো আসতে হয়। এখন কি খেতে দিই তোকে? কত রাত হ'ল গা বড় বৌমা? উনুন জ্বালবে নাকি?'

'রোসো, রোসো—ব্যস্ত হয়ো না। এখন আর উনুন জ্বালতে হবে না... তুমি কেমন আছ আগে বল দিকি? অসুখ-বিসুখ কি করেছিল এর মধ্যে?'

'হ্যাঁ—আমার আবার অসুখ। যম ভুলে বসে আছে আমাকে। চিত্রগুপ্ত সকলের পাতা ওলটায় আমার পাতা ওলটানোর কথা মনে পড়ে না একবারও।'

তারপরই কৌতূহল প্রবল হয়ে ওঠে, 'কেন বল্ দিকি? হঠাৎ আমার অসুখের খবর? বলি স্বপ্নটপ্ন দেখিছিস নাকি?'

অন্ধকারে যেন কূল দেখতে পাই! তাড়াতাড়ি বলি, 'ঠিক ধরেছ তো। একটা কাজে এসেছিলুম লক্ষ্ণৌ, তা নামবার ইচ্ছে ছিল না তেমন। কিন্তু কাল রাত্তিরে স্বপ্ন দেখলুম, তোমার খুব অসুখ? তাই মনটা কেমন ক'রে উঠল—'

'ষাট্ ষাট্—বলে আপনার দেখলে পরের হয়। ত্যাখ, অন্য কার ঠাকুমা বুঝি পটল তুলছে! তবে একরকম ভালই হয়েছে, তবু তো একবার নামলি। নইলে তো অমনি অমনি চলে যেতিস।'

মুখে যা-ই বলুন, বুড়ির দেখলুম মুখে হাসি আর ধরে না, সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আছে তা হলে, এখনও এমন লোক আছে, যে তাঁর অসুখের স্বপ্ন দেখে ছুটে আসে। এই বয়সের লোকের কাছে এটা বোধহয় অভাবনীয় একটা সু-সংবাদ···

যাই হোক, আহারাদির কোন অসুবিধা হ'ল না। যথাসময়ে বিছানা-টিছানা ক'রে আবার সকলে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার চোখে তন্দ্রা নামল না বহুক্ষণ পর্যন্ত।

কী হ'ল ব্যাপারটা! কে ও লোকটা, কেন নামাল, আমাকে অমন মিথ্যা খবর দিয়ে? আমাকে চিনলই বা কী ক'রে? আমার ঠাকুরমা এখানে থাকেন তাই বা জানল কী ভাবে?

এদের সব কথা খুলে বলা যায় না, তবু যতটা সম্ভব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেছি। কোন চেনা লোকই দু'এক দিনের মধ্যে এখানে আসে নি শুনলুম। কলকাতার পরিচিত কোন লোক গত ছ মাসে এ বাড়ি মাড়ায় নি—ঠাকুরমা বেশ জোর দিয়েই বললেন।

তবে কে ও? কেন এমন উদ্ভট রসিকতা করল আমার সঙ্গে?···

ভাবতে ভাবতে একেবারে শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মতো এলো। পাতলা ঘুম, আধো জাগ্রত অবস্থা বলাই উচিত। তারই মধ্যে স্বপ্ন দেখলাম মাস-দুই আগেকার দেখা একটা দৃশ্য।

পুরী এক্সপ্রেসের একটা কামরায় বিশেষ একটা খাঁজে সামান্য একটুখানি পুঁটলির ওপর গাড়ির দেওয়াল ও সীটের খাঁজে ঠেস দিয়ে বসে আছে দীনহীন গোছের একটা লোক। তার চোখ দুটো অর্ধনিমীলিত স্থির, মুখটা ঈষৎ একটু ফাঁক হয়ে আছে, কোলের মধ্যে একটা ছিটের জামা ও গামছা গোঁজড়ানো, উরুতে তখনও টাটকা দগদগে একটা ফোঁড়াফাটা ঘা। আর আমি হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছি—

সেই স্বপ্ন আর তন্দ্রার মধ্যেই হঠাৎ মনে হ'ল ঐ ছিটের জামা আর গামছাটা যেন আমার চেনা, সম্প্রতি কোথায় দেখেছি। তারপর সব চিন্তা আর চৈতন্য একাকার হয়ে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন বিকেলে আবার রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, খবরের কাগজটা এল। প্রথম পৃষ্ঠাতে বড় বড় হেড লাইন চোখে পড়ল—"ডাউন অমৃতসর মেলে শোচনীয় দুর্ঘটনা।" "বহুলোক হতাহত।" "সামনের বগীগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ" ইত্যাদি।

এক রাত্রির অতিথি

বুড়ো মাঝিটাকে তাড়া লাগানো বৃথা জেনেই অনিমেষ বহুক্ষণ আগে চুপ করে ছিল। তার ফলে মাঝি আর আরোহী দুজনেই হাল ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। মাঝির বকাটাই রোগ—এমন কি ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল ঐটেই পেশা। ওর বৌ কতদিন মরেছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে কী ভুল করেছে, জামাই কেন মেয়েকে নেয় না—ছোট জামাইটা জুয়াড়ী, ছেলেটা নেশা করতে পেলে আর কিছু চায় না—খুব ছেলেবয়সে একবার ও কলকাতা গিয়েছিল কিন্তু অত হট্টগোলে মাথা ঠিক থাকে না বলে পালিয়ে আসতে পথ পায় নি—আবার একবার যাবে মা কালীকে দর্শন করতে, ইত্যাদি তথ্য পরিবেশন করবার ফাঁকে ফাঁকে কেবলমাত্র দম নেবার প্রয়োজনে যখন থামে তখনই শুধু দাঁড় বাইবার কথা মনে পড়ে ওর। সুতরাং শহরে যাবার বাস যে পাবে না তা অনিমেষ আগেই বুঝেছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে পড়বে তা কল্পনা করে নি। বাস

তো নেই-ই, আশেপাশে কোথাও মানব-বসতির চিহ্নও যেন চোখে পড়ে না।

নৌকো এসে যেখানটায় ভেড়ে সেখানে বাঁশের মাচামতো একটা আছে, জাহাজঘাটা হলে অনায়াসে জেটি বলা যেত। সেই মাচাতে নেমে অসহায় ভাবে অনিমেষ একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। নিচে ময়ূরাক্ষীর কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। তার স্রোতের গতি থাকলেও তবু একটু প্রাণস্পন্দন বোঝা যেত—এত মন্থর তার স্রোত, এত নিস্তরঙ্গ—যে মনে হচ্ছে সমস্ত জলটা যেন জমাট বেঁধে স্তব্ধ হয়ে গেছে—আর তার সেই অতল কালো বুকে কত কী রহস্যময় জীব স্পন্দনহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে কৌতুকের হাসি হাসছে—

ওপারে ভগীরথপুর গ্রাম, বেশ সম্পন্ন গ্রাম তা সে জানে, বহু লোকের বাস, অনেক পাকা বাড়ি ইস্কুল ডাকঘর আছে কিন্তু এখান থেকে তার কিছুই দেখা যায় না। ঘাট থেকে উঠে যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গিয়েছে তার সাদা বালির আভাস নিবিড় বনের অন্ধকারে মিশে গেছে একটুখানি গিয়েই। দু'দিকে বড় বড় গাছ—কী গাছ তা বোঝা যায় না, কিন্তু তারই অসংখ্য শাখাপল্লব সমস্ত গ্রামটাকে যেন চোখের আড়াল ক'রে রেখেছে। একটা আলোর রেখা পর্যন্ত চোখে পড়ে না।

ওপারেই যদি এই হয় তো এপারের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এপারে যেদিন সে এসেছিল সেদিন দিনের বেলাও কোনও গ্রাম ওর চোখে পড়ে নি। বাসটা এসে একেবারে এই ঘাটের ধারে দাঁড়ায়, যাত্রীরা সবাই ভগীরথপুরে চলে যায়। সেদিন অন্তত এমন কেউ ছিল না যে এপারে কোথাও যাবে। আসার সময়ও দুদিকে আম গাছের ঘন বন কাটিয়ে এসেছিল—বেশ মনে আছে। হয়ত ছিল কোথাও ঘরবাড়ি, কিন্তু তা ওর চোখে পড়ে নি।

পারাপারের জন্য একটা খেয়া নৌকো আছে, চওড়া ভেলার মতো প্রকাণ্ড বস্তু—কিন্তু শেষ বাস চলে যাবার পর আর ওপার থেকে কেউ আসার সম্ভাবনা নেই জেনে সে ইজারাদারও বহুক্ষণ বাড়ি চলে গেছে নৌকোটা ওপারে বেঁধে রেখে।

'বাবু ভাড়াটা?' তাড়া লাগায় মাঝি।

বিহ্বলতা কাটে কিন্তু যেন আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে অনিমেষ।

'ভাড়াটা কিরে। এই অন্ধকার রাত্রিতে আমি এখানে কোথায় থাকব। তুই তো এক ঘণ্টার রাস্তা সাত ঘণ্টায় এনে আমাকে এই বিপদে ফেললি। এখন নিদেন ওপারে পৌঁছে দে। দেখি কোথাও একটু আশ্রয় পাই কি না, এপারে এই জঙ্গলে শেষে কি বাঘের পেটে প্রাণ দেব। চল্, ওপারে নিয়ে চল্—'

'উটি লারলম্ আজ্ঞা!'

'সে কি! কেন রে? কী হয়েছে?'

তার উত্তরে মাঝি যা বলল তার অর্থ হচ্ছে এই যে, ওপারে অন্য নৌকো গেলে খেয়ার ইজারাদার বড্ড বকাবকি করে, পুলিসে ধরিয়ে দেয়। সুতরাং ওপারে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

অনিমেষ তাকে অনেক ক'রে বোঝাল। ওপারে তাকে ধরবার জন্য ইজারাদার যদি বসে থাকত তো অনিমেষ তাকেই ডাকত; শুধু ইজারাদার কেন, জনমানবের চিহ্ন থাকলেও সে মাঝিকে এ অনুরোধ করত না। কোন-মতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে যাক—তাতে যদি কেউ তাকে ধরে তো অনিমেষ তার দায়ী—ইত্যাদি সব কথার উত্তরে তার সেই একই উত্তর, 'উটি লারলম্ আজ্ঞা!'

অনিমেষ তখন রাগ করে বলল, 'তবে তুইও থাক্, আমি তোর নৌকোতেই রাত কাটাই।'

'আজ্ঞা, উটিও লারলম্!' শুধু তাই নয়, দাঁড়ের একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা খানিক দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

'টাকাটা ছুঁড়ে ছ্যান্ কেনে—বাড়ি চলে যাই!'

'তবে টাকাও পাবি না যা!' রাগ করে বলে অনিমেষ, কিন্তু যখন দেখে বুড়োটা সত্যি-সত্যিই একটা নিশ্বাস ফেলে ঘর-মুখো হচ্ছে তখন সে একখানা এক টাকার নোট দলা পাকিয়ে ছুঁড়েই দেয়।

'যা বেটা যা। পথে ডুবে মরিস তো ঠিক হয়।' মনে মনে বলে অনিমেষ।

ব্যস্! এরপর সব পরিষ্কার! ওপারে ঘন বনের নিবিড় তমিস্রা, সামনে অতল শান্ত জলে তারই রহস্য যেন জমাট বেঁধে—আর এপারে তার চার পাশ

ঘিরেও দৈত্যের মতো কতকগুলি গাছপালা ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তার করে সমস্ত সভ্যতার চিহ্ন, এমন কি আকাশকেও যেন আড়াল ক'রে রেখেছে। বাস এসে দাঁড়ায় এবং ঘোরে যেখানটায় সেখানে খানকটা ফাঁকা জায়গা আছে বটে কিন্তু সে যেন আরও ভয়ঙ্কর।

স্যুটকেসটা মাচার উপর পেতে সেখানেই জেঁকে বসল অনিমেষ। বাঘ ভাল্লুক যদি সত্যিই আসে তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে—এখানেই খানিকটা তবু নিরাপদ।

খর খর ঝট পট শব্দ ক'রে কী একটা পাখী উড়ে বসল মাথার ওপরে। ভয় পেয়ে চমকে উঠল অনিমেষ। কাছেই কোথায় শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কী একটা সরীসৃপ চলে গেল বোধ হয়। সামান্য শব্দ, তবু বেশ স্পষ্ট। জলের মধ্যে হঠাৎ একটা মাছ ডিগবাজী খায়। ঐটুকু আওয়াজ—কিন্তু অনিমেষের মনে হ'ল যেন বন্দুকের শব্দ উঠল কোথায়।

বিশ্রী লাগছে। নক্ষত্রের আলোতে যতদূর দৃষ্টি চলে বহুক্ষণ ধরে ধরে হাতঘড়িটা দেখল—মাত্র রাত ন-টা। কলকাতায় সবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে নিষুতি রাত। এখনও দীর্ঘ সময় তাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। কখন ভোর হবে, তারপর কখন ইজারাদারের ঘুম ভাঙবে তবে সে একটু লোকালয়ের মুখ দেখতে পাবে। বাস একটা আসে এখানে সকাল আটটা নাগাদ—সন্ধ্যাতে যেটা এসেছে সেটা কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকে, সাতটা নাগাদ এখানে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রায় বারো ঘণ্টা এখনও—

আচ্ছা, হাঁটলে কেমন হয়? বাসের রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকলে কি আর গ্রাম একটা পাওয়া যায় না কাছাকাছির মধ্যে?

কিন্তু সেখানে যদি তাকে আশ্রয় দিতে কেউ না চায়? ডাকাত বলে মনে করে? তাছাড়া দু'দিকে যা ঘন বন, যদি বাঘ আসে? মুর্শিদাবাদ জেলায় এসব অঞ্চলে প্রায়ই বাঘ বেরোয়।

দরকার নেই। দশ-এগারো ঘণ্টা সময়—একরকম করে কেটেই যাবে।

'ও মশাই শুনছেন? বাস মিস করেছেন বুঝি? কোথাও আশ্রয় পান নি?'

অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে চমকে ওঠে অনিমেষ, বরং আঁৎকে ওঠে বলাই ঠিক। কখন নিঃশব্দে কে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—কৈ একটুও তো টের

পায় নি। সামান্য কুটো নড়ার শব্দের দিকেও তো সে কান পেতে ছিল।

কয়েক মুহূর্ত যেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে, ঘাড় ফেরাতেও সাহস হয় না। কথাগুলো যে বলেছে সে একেবারে ওর পিছনে এসেই দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত, যেন একটা কথা শেষ হবার আগেই আর একটা শুরু হয়েছে—এই-ভাবে পর পর তিনটি প্রশ্ন ক'রে আগন্তুকটিও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়েই অনিমেষ ফিরে তাকায়।

রোগা কালো গোছের একটি মানুষ, খুব বেঁটে নয়—তাই বলে ঢ্যাঙাও বলা চলে না। উসকোখুসকো একমাথা চুল ও ঘন দাড়ি গোঁফ। ঘন দাড়ি কিন্তু আবক্ষ বিস্তৃত নয়। মধ্যে মধ্যে কামানো বা ছাঁটা হয়—এমনি দাড়ি, খোঁচা খোঁচা। একখানা খাটো আধময়লা কাপড় পরনে—কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ানো। মোটা ভুরুর আড়ালে কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিঃশব্দে শুধুমাত্র চাউনির দ্বারাই যেন অনিমেষের সমস্ত ইতিহাস পূর্বাপর আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে।···

'বলছিলুম যে আপনি বোধহয় কোথাও আশ্রয় পাচ্ছেন না—না? তা হ'লে বরং চলুন না হয় আমার কুটিরেই—কোনমতে রাতটা কাটিয়ে দেবেন।'

হায় রে! আগুল্‌ফলম্বিত-কুন্তলা বনমালা-শোভিতা কপালকুণ্ডলারা শুধু উপন্যাসেই দেখা দেয়!

যাক গে, নবকুমারের অদৃষ্ট তার নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে। তাই বলে কি ওর চেয়ে ভদ্র চেহারার কেউ জুটতে নেই! এ লোকটাকে দেখেই যেন পাগল বলে মনে হয়—শেষ পর্যন্ত এর আশ্রয়ে গিয়ে কি আরও বিপদে পড়বে!

'কী বলেন? যাবেন নাকি?'

'আ-আপনি এখানে—মানে—' আমতা আমতা করে অনিমেষ।

'আমার এখানেই একটা ঘর আছে, এই যে।'

লোকটা আঙুল দিয়ে দেখায়।

সত্যিই তো, এই তো, বলতে গেলে তার সামনেই পাড়ের ওপর একখানা খড়ের ঘর—ও অঞ্চলে যেমন হয় তেমনি। আশ্চর্য, এতক্ষণ তার চোখে কি হয়েছিল?

লোকটি বোধ হয় তার মনের ভাব বুঝেই হেসে বললে, 'ঘরে আলো ছিল না কিনা, তাই অন্ধকারে টের পান নি। আমিও বাড়ি ছিলুম না. নদীর ধার দিয়ে দিয়ে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। অন্ধকারে একা একা বেড়াতে আমার বেশ লাগে।'

'এখানে বাঘের ভয় নেই ?'

'আছে বই কি। তবে আমার অত ভয় নেই।···মরবার ভয় করি না। ক'রে লাভই বা কি বলুন, মরতে তো একদিন হবেই।'

না, লোকটাকে ঠিক পাগল বলে তো মনে হয় না।

'চলুন চলুন, ঘরে বসেই কথাবার্তা হবে'খন।' লোকটা তাড়া লাগায়।

'চলুন,' বলে স্যুটকেসটা তুলে নেয় অনিমেষ।

একখানা নয়—পাশাপাশি দুখানা ছোট ঘর, সামনে একফালি দাওয়া। ভেতর দিকে আরও কি আছে তা ওর নজরে পড়ল না। দাওয়া বেশ ঝক-ঝকে ক'রে নিকানো, পরিচ্ছন্ন। লোকটি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে 'দাঁড়ান আলো জ্বালি' বলে ওকে দাওয়াতেই দাঁড় করিয়ে রেখে দোর খুলে ভেতরে ঢুকল। তালাচাবির বালাই নেই, দোর শুধু ভেজানোই ছিল, ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটা আলো জ্বেলে লোকটি বলল, 'আসুন—ভেতরে আসুন।'

ঘরে আসবাবপত্র বেশি ছিল না। একটি তক্তপোশের ওপর একটা মাদুর বিছানো,—শয্যা বলতে এই। একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। একপাশে একটা দড়ি টাঙানো, তাতে খান দুই কাপড়, তার মধ্যে একটা লাল মেঝেতে জলের মেটে কলসী, একটা কাঁসার ঘটি এবং পিতলের পিলসুজে একটা মাটির প্রদীপ। এ ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই।

'বসুন বসুন। ঐ চৌকিটার ওপরই বসুন।'

তারপর খানিকটা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিজের দুই হাত ঘষে কেমন এক রকমের বিচিত্র হাসি হেসে বলল, 'ভাল বিছানা আমার নেই। ঐ স্যুট-কেসটা মাথায় দিয়েই শুতে হবে।···আর খাবারও তো কিছু দিতে পারব না। ঘরে আমার কিছুই নেই।···আপনি মদ খান ?'

যেন একটা আকস্মিক উগ্রতা দেখা দেয় ওর প্রশ্ন করবার ভঙ্গীতে।

'না-না। রক্ষে করুন। কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না আমার জন্যে। আশ্রয় পেয়েছি এই ঢের।'

'ঐ আশ্রয়টুকুই যা। বাঘ ভাল্লুকের হাত থেকে তো বাঁচলেন অন্তত। —তা আশ্রয় ভালই। ঘরখানা মন্দ নয়, কী বলেন?'

বলতে বলতে হেসে ওঠে সে। সাদা ঝকঝকে দাঁত কালো দাড়ির ফাঁকে চকচক করে।

অনিমেষের যেন ভালো লাগে না ওর ভাবভঙ্গী। আবারও সেই সন্দেহটা মনে জাগে—পাগলের পাল্লায় এসে পড়ল না কি?

'আপনি এখানে কি করেন?'

'আপাতত কিছুই না। আচ্ছা বসুন। আমি আসি। মুখহাত ধোবেন নাকি?'

ধুতে পারলে ভালই হ'ত কিন্তু অনিমেষের তখন নড়তে ইচ্ছে করছে না। সে বলল, 'না—দরকার নেই।'

লোকটি বেরিয়ে গেল। অনিমেষ স্তব্ধ হয়ে বসেই রইল। ভালো বোধ হচ্ছে না ওর। কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী করে লোকটা এখানে, এমন একাই বা থাকে কেন? ঘরে কোন রকম কিছু খাবার নেই তো ও নিজে খায় কি? চোর ডাকাত নয় তো? লোকজনকে ভুলিয়ে এনে শেষে—

ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন—ব্যাগে ওর খানকতক পুরনো কাপড়জামা ছাড়া আর কিছুই নেই। পকেটেও মাত্র টাকা-ছয়েক আছে। কিন্তু, একটু পরেই সমস্ত দেহ হিম হয়ে ওর মনে পড়ে···এই সব উদ্দেশ্যে যারা নিয়ে আসে ভুলিয়ে, টাকা না পেলে আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। তা ছাড়া মেরে ফেলে তো দেখবে কী আছে না আছে। ওদের দেশে একবার খুব ডাকাতের উপদ্রব হয়েছিল, তারা একটা লোককে খুন করার পর পেয়েছিল, মাত্র একটি আধলা।

কখন গৃহস্বামী আবার নিঃশব্দে ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অনিমেষ টেরও

পায় নি। যদিও খোলা দরজার দিকে চেয়েই বসেছিল সে। আশ্চর্য!

লোকটি বলল, 'এখনই শুয়ে পড়বেন নাকি? যদি ঘুম পেয়ে থাকে তো স্বতন্ত্র কথা। নইলে একটু বসি। কতদিন লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাই নি। বলেন তো তুটো কথা কয়ে বাঁচি।...এখানে তেমন লোকজন তো নেই, আসেও না কেউ—'

অনিমেষ আবারও পূর্ব প্রশ্নের জের টানল, 'তা এমন জায়গায় আপনি থাকেনই বা কেন?'

সেই হাসি গৃহস্বামীর মুখে। তেমনি নিঃশব্দ হাসি, দাড়ির ফাঁকে শুভ্র দন্তের সেই বিজলী প্রকাশ!

'ভয় নেই। আমি চোর ডাকাতও নই। ঘরে কিছু নেই মানে আমার কিছুর দরকার নেই। থাকারও দরকার হয় না আমার। কেন জানেন?'

তারপর—যেন কতকটা অসংলগ্ন ভাবেই বলে ওঠে, 'আমি সাধক। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী।'

'সন্ন্যাসী?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে চায় অনিমেষ।

অপ্রতিভ হয়ে লোকটি বলে, 'না—সন্ন্যাসী মানে ঠিক অভিষিক্ত সন্ন্যাসী নই—তবে সাধক বটে।'

উবু হয়ে ঘরের মেঝেতেই বসল লোকটা, কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে বলল, 'তাহলে আপনাকে বলেই ফেলি সেটা। কাউকে কখনও বলি নি, বলবার সুযোগও পাই নি বিশেষ। এই অঞ্চলেরই লোক আমি, বুঝলেন? ছেলে-বেলা থেকেই নানা বইয়ে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের অদ্ভুত সব ক্ষমতার কথা পড়ে ঐ দিকে মনটা ঝোঁকে। মনে হ'ত আমিও ঐসব সাধনা ক'রে সিদ্ধ হবো, তার-পর প্রাণ ভরে পৃথিবীর সব ঐশ্বর্য ভোগ করব—আর আমাকে পায় কে! হায় রে, তখন কি আর জানতুম যে ভোগের উদ্দেশ্যে সাধনা করতে এলে সিদ্ধি তো দূরের কথা সমস্তই খোয়াতে হয় একে একে।'

এই পর্যন্ত বলে লোকটি চুপ করল। এতক্ষণ অনিমেষও অনেকটা সহজ হয়েছে। লোকটির ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তায় সত্য কথা বলছে বলেই মনে হয়। দুশ্চিন্তা অনেকখানি কমে গেল ওর।

'বাড়ি আমার এ অঞ্চলে নয়। বাড়ি সেই পাঁচথুপির কাছে। এখানে

কেন এলুম? বলছি দাঁড়ান।···বলেছি আপনাকে ছেলেবেলা থেকেই ঐ দিকে ঝোঁক গিয়েছিল। ইস্কুলের পড়া হ'ল না, তার বদলে যত সব ঐ ধরনের বই পড়তে লাগলুম। পড়তে পড়তে বিশ্বাসটা খুব পাকা হয়ে গেল। কিন্তু গুরু কই? দু-একটা সন্ন্যাসী যা হাতের কাছে পেলুম দেখলুম সব বাজে—কেউ কিছু জানে না। অথচ পথ দেখাবে এমন লোক না পেলে এগোব কি ক'রে?···মনটা বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠল। খাবার চিন্তা ছিল না। মাথার উপর বাবা, বড় ভাই ছিল—জমিজমা তারাই দেখাশুনো করত। অবশ্য আমি বকুনিও খেয়েছি ঢের, কাজকর্ম কিছু করি না বলে, কিন্তু সেসব গায়ে মাখি নি।

'তবে যত দিন যেতে লাগল মনটা ততই ব্যাকুল হয়ে উঠল। শেষমেষ আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে বাড়ি থেকে সামান্য কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ বুঝেছিলুম ঘরে বসে আর কিছু হবে না।···এ তীর্থ ও তীর্থ ক'রে অনেক দেশেই ঘুরলুম। ভাল চাকরি বা ভাল বিয়ে করার অনেক সুযোগও পেয়েছিলুম; সংসার—বুঝলেন মশাই, মায়ার ফাঁদ পেতে রেখে দেয় সারা জগতে—যাই হোক সেদিকে মন ছিল না বলে কেউ বাঁধতে পারল না। কিন্তু আসল যা উদ্দেশ্য তাও কিছু হ'ল না।···এমনি ভাবে যখন ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠেছি তখন একদিন—বাড়ি ফেরার পথে বলতে গেলে বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ একজনকে পেয়ে গেলুম। বক্রেশ্বরের শ্মশানে এক সাধু থাকেন শুনলুম, উলঙ্গ থাকেন শ্মশানে শুয়ে, কেউ খেতে দিলে খান নইলে এমনি থাকেন। কাঁচা মাংস, পাতা লতা এমন কি বিষ্ঠা খেতেও তাঁর আপত্তি নেই বোধ হয়—এমন নিস্পৃহ তিনি।

'খোঁজ ক'রে ক'রে গেলুম। প্রথম তো দেখাই পাওয়া যায় না। শেষে তিন দিন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকতে দর্শন পেলুম। বিপুল দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, পাগলের মতো ভাবভঙ্গী—কিন্তু পাগল নন। একদিন আমার চোখের সামনেই—দু'দিক থেকে দু'দল ভক্ত তাঁকে দর্শন করতে আসছে দেখে, আমার চোখের সামনে শিয়ালের দেহ ধরে বনের মধ্যে গিয়ে সেঁধুলেন, কেউ আর খুঁজেই পেল না। বুঝলুম যে এতদিন ধরে যাকে খুঁজছিলুম এতদিন পরে তাকে পেয়েছি।'

অনিমেষের মনেও ততক্ষণে গল্প জমে উঠেছে। লোকটি থামতেই সে বললে, 'তারপর ?'

'লোক তো পেলুম—তাকে ধরি কী করে ? কিছুতেই ধরা দেয় না। কিছু বলতে গেলে শ্মশানের পোড়া কাঠ তুলে তেড়ে আসে। একদিন খুব কান্না-কাটি করতে সব শুনলে মন দিয়ে, কিন্তু তারপর যা বকুনিটা দিলে, বললে, "ভাল চাস তো এসব মতলব ছাড়্। সাধনা করবি তুই, ঐ দেড় ছটাক কাঁপা নিয়ে ? তোর কাজ নয়—বুঝলি, মরবি একেবারে। তা ছাড়া ভোগ করবার জন্যে এসব কাজ যে করতে আসে তার একূল ওকূল দুকূল যায়। রামকৃষ্ণ পরমহংসের গল্প পড়িস নি ? মাকে বলেছিল মা অষ্ট সিদ্ধাই দে—হৃদে বলছে চাইতে। মা বললেন, কাল সকালে এর উত্তর পাবি। পরের দিন সকালে দোর খুলতেই নজরে পড়ল একটি মেয়েছেলে ঐ দিকে ফিরে শৌচ করতে বসেছে—পরমহংস অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে এসে ভাগ্নেকে এই মারে তো এই মারে। বুঝলি—এমনি তুচ্ছ শুধু নয়, ছোট জিনিস ওসব। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা—বিয়ে-থা কর্। নিজে-নিজেই ভগবানকে ডাক্, নয়তো কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিস।" অনেক কাকুতি-মিনতি করলুম, বাবার আর দয়া হ'ল না। আমি কিন্তু মশাই হাল ছাড়লুম না। আমার তখন জেদ চেপে গেছে কি না।···ঐখানেই পড়ে রইলুম, বলতে গেলে না খেয়েদেয়ে—আর গোপনে ওঁর দিকে নজর রাখলুম। যদি আসল প্রক্রিয়ার কিছু হদিস পাই—বুঝলেন না ? এতদিন কি আর বৃথাই এ লাইনে ঘুরেছি। আসল মানুষ না পাই, ওদের ভেতরের কথা কিছু কিছু জেনেছি বৈকি !

'তারপর হ'ল কি মশাই, আরও দু-একজন সাধক আর ভৈরবী ওখানে এল বাবার সঙ্গে দেখা করতে। গোপনেই এল কিন্তু আমি তো ঐখানেই পড়ে থাকি, আমাকে এড়াবে কি ক'রে ?···পরপর কদিন ওঁদের চক্র বসল। তাও দেখলুম।—মনে হ'ল যে, আর কি, সব শিখে গেছি···ওখান থেকে রওনা হয়ে আর বাড়ি ফিরলুম না, নির্জন স্থান অথচ শ্মশান, লোকালয় কাছে এই রকম খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লুম। পথে নলহাটীতে একজন তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষাও নিয়ে নিলুম !

'ও মশাই, এলুম তো এখানে। কিন্তু সাধনা আর হয় না। প্রথম দিন

থেকে বিঘ্ন। উপকরণ জোটে তো দিন পাই না, দিন পাই তো উপকরণ নেই —শেষে অনেক কৌশল ক'রে অনেক নিচে নেমে যদি বা সব যোগাড় করলুম, মঙ্গলবার অমাবস্যার রাত পেয়ে যেমন আসন করে বসেছি—কী বিঘ্ন! ধ্যানে মন দেব কি, কিছুতে মনই স্থির করতে পারি না···এখন এটা বাসের রাস্তা হয়ে শ্মশান এখান থেকে সরে গেছে, আগে এখানটাতেই শ্মশান ছিল, এখন যেখানে ঘর দেখছেন, এই যেখানে আমরা বসে আছি, এইখানেই সেদিন আসন ক'রে বসেছিলুম—'

নিজের অজ্ঞাতেই অনিমেষ যেন একটু সরে বসে। তারপর বলে, 'আচ্ছা বিঘ্ন কি রকমের? ভয় পেলেন? শুনেছি তো এ রকম সাধনায় বসলে প্রথম প্রথম নানা রকমের ভয় দেখায়—কিন্তু সেটা শুধুই পরীক্ষা করার জন্যে। আপনিও তো সে রকম শুনেছিলেন নিশ্চয়, তবে ভয় পেলেন কেন?'

হাসল লোকটা আবারও। কাউকে ছেলেমানুষি করতে দেখলে বিজ্ঞ মানুষেরা যেমন হাসে কতকটা তেমনি হাসি। বললে, 'জানে তো সবাই কিন্তু শোনা এক জিনিস আর অভিজ্ঞতাটা আর এক। তেমন অভিজ্ঞতা হ'লে বুঝতেন!···শুনবেন কেমন?···মড়ার বুকের ওপর বসেছি আসন ক'রে, মড়ার খুলিতে ক'রে মদ খাচ্ছি—মনে ভয়ডর কিছুই নেই, এই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই লোকেরই বুকের মধ্যে হিম হয়ে গেল সে সব শুনে। না না, তেমন ভয়ানক কিছু নয়, প্রথম শুরু হ'ল শুধু ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ, খিলখিল হাসি, চাপা হাসিই। ক্রমে সেইটাই বাড়তে লাগল। মনে হ'ল দশজন, বিশজন, একশজন—হাজার হাজার। আপনার চার পাশে যদি লক্ষ লোকের ফিস্ ফিস্ কথারই শব্দ হ'তে থাকে তো কেমন হয়? আর তার সঙ্গে চাপা এক ধরনের হাসি। তবু আমি স্থির হয়ে আসনেই বসে রইলুম—নড়লুম না। যদিও কাজে আর মন দিতে পারলুম না, এটাও ঠিক।

'তার পর মশাই—স্পষ্ট দেখতে লাগলুম শ্মশানের মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে যেন মড়াগুলো উঠছে। কতকাল থেকে মরেছে সব—কত হাজার হাজার বছর ধরে। এক এক জনের বীভৎস চেহারা, রোগে যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। কেউ বা খুন হয়েছিল, কেউ বা ঠ্যাঙাড়ের হাতে প্রাণ দিয়েছে, কেউ বা গলায়-দড়ির মড়া। ঠিক সেই অবস্থায় উঠেছে—তেমনি কন্দকাটা কিংবা হাড়গোড় ভাঙা

অবস্থায়। সকলেরই মুখে রাগ, চোখের দৃষ্টিতে আগুন। তারা সবাই আমার দিকে আঙুল তুলে শাসাতে লাগল, পাপিষ্ঠ, তুই এখানে কেন? শ্মশান অপবিত্র করতে এসেছিস। চলে যা, দূর হয়ে যা। জানিস না এখানে আমরা পাহারা দিচ্ছি? মনে পাপ নিয়ে তুই এসেছিস শ্মশান জাগাতে। চলে যা—তার মধ্যে একজনের আবার শুধু কঙ্কাল, বোধ হয় তাকে পুঁতে রেখেছিল কোথাও মেরে—তারপর তাকে তুলে পোড়াতে হয়েছে।···সেটাই সবচেয়ে কাছাকাছি এল, মুখে সেই এক শব্দ, "দূর হ। দূর হ!" ভয় পেলুম খুব, তবু এও জানি একবার ভয় পেলেই গেল—চিরকালের মতো। প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম, যাবো না, যাবো না। উঠব না আমি। ব্যস্—আর যায় কোথা, সেই কঙ্কালটা আরও এগিয়ে এসে তার সেই হাড়ের আঙুল কটা দিয়ে আমার গলাটা চেপে ধরলো। ওঃ, সে কী চাপ, যেন মোটা লোহার সাঁড়াশী। কত চেষ্টা করলুম মুক্ত হবার, কিন্তু সে বজ্রকঠিন মুষ্টি খোলে কার সাধ্য। দম বন্ধ হয়ে গেল, বুকে সে এক অসহ্য যন্ত্রণা—মনে হ'ল যেন দেহের প্রতিটি শিরা ফেটে যাচ্ছে।···আকুলি বিকুলি করতে লাগলুম এক ফোঁটা হাওয়ার জন্যে—সে হাওয়া চারিদিকেই রয়েছে তবু এক বিন্দু বুকের মধ্যে নিতে পারলুম না। বরং আরও চেপে বসতে লাগল সেই সাঁড়াশীর মতো আঙুলগুলো—।·'

'তার পর?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

'তারপর?' আবার সেই হাসি, 'তারপর আর কি, মুক্তি। সেই থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানেই। কাজ নেই কামাইও নেই। জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারি নে।··সব চেয়ে কষ্ট হয়, কথা কইবার লোক নেই বলেই—'

'—কি—কিন্তু'—কথা কইতে গিয়েও একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে অনিমেষের যেন গলা কেঁপে যায়, 'আপনি মুক্তি পেলেন কি ক'রে?'

'তা আমিও জানি না। এক সময় দেখলুম যে, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমারই ভূতপূর্ব আশ্রয় অর্থাৎ কিনা দেহটার পাশে। যারা এসেছিল তাদেরও তো কাজ শেষ, তারাও সব যে-যার মিলিয়ে গেছে। এক কথায় সব কিছুর শান্তি।'

তবু বুঝতে কয়েক মিনিট দেরি লাগে অনিমেষের, কথা কইতে গিয়েও

গলার স্বর বিকৃত হয়ে যায়, 'তার—তার মানে কি? আপনি কি বলতে চান যে আপনি তখন মা—মারা গেলেন? আ—আপনি কি মড়া?'

প্রশ্নের শেষ অংশটা আকস্মিক আর্তনাদের মতো চিৎকারে পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রশ্ন সে করছে কাকে? কেউ তো নেই। শুধু সে একা বসে আছে ঘরে, বাকী জিনিসগুলো ঠিক আছে, পিদিমটা তেমনি জ্বলছে। শুধু উবু হয়ে বসে যে লোকটা কথা বলছিল সে আর নেই—

কোথা দিয়ে গেল লোকটা, কখন উঠে গেল তার চোখের সামনে দিয়ে?

বার বার এই ব্যাকুল প্রশ্ন ওর মনে উঠতে লাগল কিন্তু উত্তর দেবে কে! খানিক পরে আসল প্রশ্নটা আবার প্রবল হয়ে উঠল, তাহ'লে কি লোকটা যা বলে গেল তাই সত্যি, ও লোকটা মানুষ নয়—অশরীরী, বিদেহী আত্মা! খাবার কিছু লাগে না ওর—বলেছিল বটে। মরবার ভয় নেই।

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে অনিমেষের কিন্তু সে শিক্ষিত ছেলে, বিজ্ঞান-পড়া ছেলে। এসব মিথ্যা—কল্পনা, আত্ম-সম্মোহন বলেই জানে। সে বিশ্বাস করবে না এ কথা যে, এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বসে সে ভূত দেখছে।

আচ্ছা, পিছনে ছায়া পড়েছিল কি ওর? মনে করবার চেষ্টা করে অনিমেষ।

সত্যিই কি—? না লোকটা তার সঙ্গে তামাশা করছে? আগে যা ভেবে ছিল তাই? ডাকাত বা ঠাঙাড়ে জাতীয়—ভয় দেখিয়ে গেল, এর পর কাজ হাসিল করা সোজা হবে ভেবে?

মনকে প্রবোধ দেয় সে, এইটে হওয়াই সম্ভব। ভূত হ'লে আলোয় থাকবে কি ক'রে?··বদমাইশ। আরও বেশী ভয় দেখাবার জন্যে ম্যাজিকওয়ালাদের মতো চোখের নিমেষে সরে গেছে।

দোরটা বন্ধ ক'রে দেবে নাকি?

দেওয়াই উচিত।

পালাবে?

কোথায় যাবে এই অন্ধকারে! আরও তো ওদের কবলে গিয়েই পড়তে হবে। সে দেখতে পাবে না ওদের, ওরা দেখবে। তার চেয়ে দোর বন্ধ করে বসে থাকা মন্দ নয়—যা হবার হবে, আলো তো থাকবে এখানে। লোক-

গুলোকে চোখে দেখা যাবে।

অনিমেষ অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। হাতে পায়ে যেন জোর নেই। কোন-মতে উঠে গিয়ে সন্তর্পণে দোরটা বন্ধ করে দিলে। ভাগ্যিস ভেতরে খিল আছে। বেশ মজবুত খিল। দেখে শুনে ভাল ক'রে বন্ধ করল। যাক, নিশ্চিন্ত।

কিন্তু এ কী?

হঠাৎ আলোটা নিভে গেল যে! মুহূর্তের মধ্যে, কোন রকম নোটিশ না দিয়েই—ঘরটা, তার চার পাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভরে গেল। তেল ছিল না? কিন্তু তাহ'লে তো একটু একটু ক'রে ম্লান হয়ে আসবে—

তবে—ভয়ে ওর গা-টা হিম হয়ে গেল—তবে কি ঘরের মধ্যে কেউ ছিল? এখন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে? সেই লোকটাই কি? হয়ত তক্তপোশের নিচে ঢুকে গিয়েছিল তখন, সেইখানেই লুকিয়ে ছিল, তাই সে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করে নি। নিশ্চয়ই তাই।

কী সর্বনাশ! এ যে হিতে বিপরীত হ'ল। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে একেবারে ওদের মুঠোর মধ্যেই এসে পড়ল। পকেটেতো দেশলাই পর্যন্ত নেই। যতদূর মনে পড়ে ব্যাগেও নেই। ব্যাগটাই বা কোথায়? চৌকিটা যে ঠিক কোন্ দিকে, তাও তো মনে পড়ছে না!

উঃ—কী বদমাইশ লোকটা!

ক্রুদ্ধস্বরে, হয়ত বা একটু ভীত কণ্ঠেই অনিমেশ বলে উঠল, 'কে? কে ওখানে? আলো জ্বালো বলছি শীগগির, নইলে ভালো হবে না, দেখিয়ে দেব মজা। কি? জ্বাললে না?'

নিস্তব্ধ চারিদিকে। কোথাও একটা জনপ্রাণী আছে বলে মনে পড়ে না। রহস্যময় সুগভীর স্তব্ধতা।

ঘরে কি জানলা ছিল? তাও তো মনে পড়ছে না ছাই।

জানলা খুলে দিলে তবু একটু নক্ষত্রের আলো আসে।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকেও জানলা কোন্ দিকে মনে পড়ল না। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গেলেই তো দেওয়াল, হাতড়ে দেখতে দোষ কি!

পরক্ষণেই মনে পড়ল, আরে! আচ্ছা বোকা তো সে! দোরটাই তো

রয়েছে, খুলে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়। ঘরের অন্ধকারের চেয়ে বরং বাইরের অন্ধকার ভাল, তারার আলো আছে। ব্যাগটা? থাকগে, প্রাণ তো বাঁচুক।

যেদিকে দোর দিয়েছে এইমাত্র, সেই দিকেই হাত বাড়াল। কই সে দরজা? অথচ—ও তো সবে বন্ধ ক'রে এপাশ ফিরেছে আর আলো নিভেছে।

তবে কি ও দিক্‌ভুল করেছে? এদিকে দরজা ছিল না?

আন্দাজে আন্দাজে এগিয়ে যায় সে। এইটুকু তো ঘর, দেওয়াল পেলে, দেওয়াল হাতড়ে হাতড়ে ঘুরলেই দরজা পাবে। শুধু ভয় হচ্ছে, ও লোকটা না এই সুযোগে পেছন থেকে মেরে বসে! কিন্তু উপায়ই বা কি? এদের কবলে যখন এসে পড়েইছে—

মরীয়া হয়েই এগোয় অনিমেষ। এক পা এক পা ক'রে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে এগোয়।···এক দুই·· এ কি, এ যে কুড়ি পা হয়ে গেল। ঘরটা যত-দূর আন্দাজ হয় দশ-বারো ফুটের বেশি হবে না লম্বায়। নেহাতই ছোট্ট ঘর। অথচ কুড়ি পা মানে অন্তত পনেরো ফুট।

আরও দু পা···আরও দশ—আরও কুড়ি।

এ কি সে মাঠে চলেছে নাকি?

কী রকম হ'ল! চল্লিশ পা চলার মতো ঘর তো নয়। কোণাকুণি হাঁটছে? তাতেই বা এতদূর হবে কেমন ক'রে? তবু আরও কয়েক পা যায় সে। হয়ত চলতে চলতে কখন গতি বেঁকে গিয়েছে। সোজা হয়ে হাঁটে আরও খানিকটা।

না, তবু দেওয়াল নেই। রহস্যময়, অন্ধকার, অনন্ত শূন্যতা। বাইরের মুক্ত শূন্যতা নয়, চার দেওয়াল চাপা—তবু তা অনন্ত।

এইবার কপালে ঘাম দেখা দেয় অনিমেষের। এতক্ষণ ডাকাতের ভয়ে যা হয় নি এবার তাই হ'ল, পা দুটো কাঁপতে লাগল থর্ থর্ করে।···একে-বারে যেন ভেঙে এল। অসহায় ভাবে সেইখানেই বসে পড়ল।

এ তার কী হ'ল! কী চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল সে?

তবে কি সে লোকটা অশরীরী—সত্যি-সত্যিই? সে কি তাহ'লে কোন

প্রেতযোনির মায়াতে এসে পড়েছে?

বিহ্বল হয়ে ভাবে অনিমেষ কি করবে কিন্তু কোন পথ দেখতে পায় না।

ঐ যে কারা আসছে না? হ্যাঁ, ঐ তো কত লোকের পায়ের আওয়াজ। অন্তত আট-দশজনের কম নয়। কিংবা আরও বেশি। এই বাড়ির কাছেই আসছে, ঐ তো দাওয়ায় উঠল।

'ও মশাই শুনছেন? ও মশাই—'

গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। টাকরা শুকিয়ে গিয়েছে! গলা কাঠ।

কিন্তু ওরাই যদি সেই ডাকাতের দল হয়? তা হোক, তবু তো তারা মানুষ। ভরসা হ'ল একটু অনিমেষের। তাহ'লে অন্তত এটা প্রেতের মায়া নয়। আঃ—বাঁচা গেল।

হ্যাঁ—ডাকাতই।

নইলে ওরা অমন ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা কইবে কেন? বহু লোক যেন পরস্পরের সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা কইছে। আরও লোক বাড়ছে। আরও বহু পায়ের শব্দ, অসংখ্য, অগণিত ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কথা বলার আওয়াজ—

এ কি—ওরা কি ঘরে ঢুকেছে নাকি?

কেমন ক'রে ঢুকল?

ওর যে চারিদিকে শব্দগুলো এগিয়ে আসছে। ওরই চার পাশে, খুব কাছে। খিলখিল ক'রে চাপা হাসির শব্দ—অনেকে হাসছে তবু শব্দটা খুব জোর নয়।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরফ নেমে যায় যেন দেহের মধ্যে। হাত-পায়ে আর কোন সাড় থাকে না। আতঙ্ক যে এমন জিনিস তা আগে অনিমেষ কল্পনাও করে নি। মস্তিষ্কসুদ্ধ যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে আসছে···

চিৎকার করবে? সাধ্য নেই। পালাবে? পথ কই?

কিন্তু কিছু তো একটা করা উচিত।

লোকগুলো যেন ওকে ঘিরে ধরছে। তাদের নিঃশ্বাস, দূষিত তীব্র, উষ্ণ, নিঃশ্বাস ওর সর্বাঙ্গে···

মনে পড়ে গেল লোকটার বর্ণনা। সেও তো এমনি ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ শুনেছিল, এমনি হাসি। তারপর? তারপর? সেই মৃতের পুনরুত্থান, সেই

কঙ্কালের অভিযান।

তারও অদৃষ্টে কি তাই হবে? সে তো কোন দোষ করে নি। সে তো সাধনা করতে আসে নি শবের বুকের ওপর চড়ে?

অকস্মাৎ কে একজন হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠল তারই আশেপাশে কোথাও। তীক্ষ্ণ চড়া গলার সে হাসি মনে হ'ল যেন তার চার পাশের অন্ধকারকে বিদার্ণ ক'রে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে, আবার চারদিকের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তারই চারদিকে। বহুক্ষণ ধরে যেন সেই এক হাসির শব্দ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল তাকে ঘিরে। বিশ্রী, তীক্ষ্ণ একটা উপহাসের হাসি—সে হাসির জাল যেন তাকে চারদিক থেকে পেড়ে ধরেছে, আর নিস্তার নেই—

প্রাণপণ চেষ্টায় মরীয়ার মতো চিৎকার ক'রে উঠল একবার অনিমেষ, 'হে ভগবান, এ কী করলে!'

সত্যিই তো! ভগবানের কথা তো তার মনে ছিল না। তাঁকে তো সে ডাকে নি।

'হে ভগবান, হে হরি, বাঁচাও—হে রামচন্দ্র!' আর কিছু মনে এল না তার। গায়ত্রী মনে আছে কি? হ্যাঁ আছে। পৈতেটা কোথায়?···

সুগভীর ক্লান্তি আর অসহ তন্দ্রায় সমস্ত চৈতন্য শিথিল হয়ে আসে তার।

ঘুম যখন ভাঙল অনিমেষের, তখনও সকাল হয় নি কিন্তু ফরসা হয়েছে একটু। খানিকটা সময় লাগল তার সবটা মনে করতে, তারপর ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ভাল ক'রে চেয়ে দেখল যে, সে বাস দাঁড়াবারই ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে ঘুমিয়েছ কখন—সুটকেসটা খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় পড়ে আছে।···আরে—সে ঘর? সে ঘরটা কোথায় গেল? যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন ঘরের চিহ্নমাত্রও তো নেই। সে কি বাস থেকে নেমে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিল? তাই হবে হয়ত। হয়ত সবটাই ওর স্বপ্ন।···

সে উঠে নদীতে গেল মুখ-হাত ধুতে।

শিষ্যা

মহামান্য আদালত বার-দুই কাশলেন, একবার একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, নিজের ডান হাতে বাঁ হাতের তিনটে আঙুল ধরে বোধ করি তার নখের গোড়াগুলো পর্যবেক্ষণ করলেন, নিজের গলার টাইটায় টান দিলেন একটু, পেশকারের মুখের দিকেও তাকালেন বার কতক—তারপর আরও একবার কেশে গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে আসামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'এ পিটিশ্যন্‌টা আপনার ?'

আসামী মাথাটা ঈষৎ নেড়ে সায় দিলেন।

'আপনি লিখেছেন কী একটা স্টেট্‌মেণ্ট দিতে চান আজ, আদালতের কাজ শুরু হবার আগে—। এ স্টেজে অবশ্য এ ধরনের স্টেট্‌মেণ্ট নেওয়ার কোন আইন নেই, হাউএভার, য়্যাজ এ স্পেশ্যাল কেস আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি। বলুন কী বলবেন। নাকি লিখিত কোন স্টেট্‌মেণ্ট দাখিল করতে চান ?'

আসামী যেন ইতিমধ্যেই একটু অন্যমনস্ক, একটু আত্মস্থ হয়ে পড়েছিলেন ঃ এখন—আদালত তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অনুভব ক'রে যেন চমকে সচেতন হয়ে উঠলেন।

'লিখিত—? না না, মুখেই বলব। যদি দরকার বোধ করেন, আপনার এখানে তো লিখে নেবার লোক আছে, তাদের লেখা কপিতে সই ক'রে দেব।'

'বেশ, তাহ'লে বলুন কী বলতে চান ?'

তবু ঠিক তখনই যেন আসামী কিছু বলতে পারলেন না। তখনও যেন কিসের একটা দ্বিধা, কিসের একটা সঙ্কোচ এসে তাঁর কণ্ঠরোধ ক'রে ধরছে। আর কী একটা চিন্তা—দুশ্চিন্তা নয়—অন্য কী এক ধরনের, বোধ করি কোন অপার্থিব চিন্তা তাঁকে অন্যমনস্ক ক'রে রেখেছে। অন্তত তাঁর মুখের দিকে চাইলে তাই মনে হয়।

আদালতও—বিশেষ এক সুস্পষ্ট কারণেই—কিছুমাত্র অসহিষ্ণুতা দেখালেন না, অথবা দেখাতে সাহস করলেন না। তাঁর সামনে যে দৃশ্য তিনি

দেখেছেন, আদালতে প্রবেশ করার সময়ই যে দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে—তা তাঁর বিচারক-জীবনের অভিজ্ঞতায় অভাবনীয়, অভূত-পূর্ব। এ রকম ভিড় তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নি তো বটেই—এ রকম মানুষের ভিড় যে কোনদিন তাঁর আদালতে হবে, তাও কখনও কল্পনা করেন নি। সাধারণ জনতা নয়—যাদের ধমক দিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে দমিয়ে দেওয়া যায় বা পুলিসের সাহায্যে সরিয়ে দেওয়া যায়। বড় বড় উকীল, ব্যারিস্টার, পদস্থ সরকারী কর্মচারী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা—বিচারক বিনয়েন্দ্র মল্লিক যাঁদের চেনেন তাঁরাই তো যথেষ্ট। এঁদের উদ্ধত অবজ্ঞাপূর্ণ সকৌতুক দৃষ্টির সামনে বসে থাকাই তো এক জ্বালা। যাঁদের চেনেন না তাঁদেরও বেশভূষা, চেহারা, হাবভাব এবং মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গী থেকেই তাঁদের পদবী সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। কেউই নিতান্ত কেওকেটা নয়। পরিচয় পেলে হয়ত বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবে, গলা দিয়ে স্বর বেরোবে না বিনয়েন্দ্র মল্লিকের।

এমন লোক এক-আধজন নয়। বহু, অসংখ্য, অগণিত। আদালতের সুপ্রশস্ত ঘর, বাইরের করিডর ছাড়িয়ে সারা সিঁড়ি, এমন কি নিচের তলা পর্যন্ত জমাট বেঁধে আছে সে ভিড়। অন্য কোন মামলা হ'লে এ ভিড় বরদাস্ত করতেন না, অন্য কোন জনতা হ'লেও না। পুলিস ডেকে হোক বা যেমন ক'রে হোক ভিড় সরিয়ে দিতেন, খালি করিয়ে নিতেন আদালত কক্ষ। কিন্তু এ যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সরিয়ে দেবার সাহস তাঁর নেই। অনেকেই তাঁর ওপরওলা বা ঐ শ্রেণীর। যাঁরা এখন কোন পদে অধিষ্ঠিত নেই—অবসর-প্রাপ্ত বিচারপতি কি সরকারী কর্মচারী কিংবা বড় বড় য়্যাডভোকেট—তাঁদেরও চিরকাল সমীহ ক'রে এসেছেন, শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছেন—তাঁদেরই বা 'চলে যাও' বলেন কী ক'রে? এঁদের সামনে চেয়ারে বসে থাকাই তো অশোভন তাঁর পক্ষে, উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানানোই উচিত। নিতান্ত এই আসনটা ধর্মাধিকরণের নামে চিহ্নিত বলেই তাঁর এ আচরণকে এঁরা কেউ ধৃষ্টতা মনে করছেন না।

আসামীও তাঁর বক্তব্য শুরু করার আগে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁরই শিষ্য এঁরা। তাঁরই সন্তান। যারা ঠিক শিষ্য নয় তারাও

ভক্ত, শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হ'তে উৎসুক। তাঁর চরণাশ্রিত। এমন আরও আছে। নিচে আদালতের বাইরে যে এক বিপুল জনতা এই প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা ক'রে অপেক্ষা করছে তা তিনি চোখে না দেখেও অনুভব করতে পারছেন। হাতির-দাঁতের-কাজ-করা তাঞ্জাম এনেছে ওরা—কোন্ পুরাতন রাজবাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে, আদালতের রায় দেওয়া হ'লে ঐ তাঞ্জামে চড়িয়ে নগর পরিক্রমা করবে। ফুলের মালা এসেছে অন্তত শ' পাঁচেক, তাছাড়াও কুঁচো ফুল মণ-দুই। এই ফুল ছড়াতে ছড়াতে যাবে ওঁরা তাঁর মাথার ওপর।

ওরা প্রস্তুত হয়েই এসেছে, বিজয়োৎসবের জন্য। কারণ এ মামলার ফল কী হবে তা ওরা জানে, সবাই জানে। রামের আগে রামায়ণের মতোই এ ফলাফল সকলকার জানা। যে মন্দভাগ্যেরা গুরুমহারাজ শ্রীশ্রী ১০৮ রাম-দাসানন্দ বা পাগল বাবার নামে মামলা আনতে গিয়েছিল, তাদের একেবারেই মাথা খারাপ না হ'লে তারাও এ কাজ করবার আগে বহুবার ভেবে দেখত কথাটা। ভেবে দেখাই উচিত ছিল তাদের। নিতান্ত জেদে অন্ধ হয়ে গিয়ে-ছিল বলেই এমন ভাবে আগুনে হাত দিতে নেমেছে তারা। কারণ পাগল বাবা ইচ্ছা করলে কী না করতে পারেন! এই বিশ্বচরাচরকে প্রলয়ে ডুবিয়ে দেওয়া তো তাঁর পক্ষে এক লহমার কাজ। তাঁর কথায় চন্দ্র-সূর্যের মর্ত্যে নামাটাও এমন একটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়, অন্তত তাঁর ভক্ত শিষ্যরা কেউ কিছুমাত্র বিস্মিত হবে না এমন একটা অঘটন ঘটতে দেখলে। সুতরাং তাঁর পক্ষে একটা মামলা তো নগণ্য ব্যাপার।

আর তা ছাড়া—এটা তো মিথ্যাই। সর্বৈব মিথ্যা। এ ধরণের কোন কলুষ যে কখনও ওঁর মতো লোককে স্পর্শ করতে পারে না, এ তো ওঁর দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায়। এমন কি অভিজ্ঞ বহুদর্শী বিচারক বিনয়েন্দ্রেরও এই কথাটাই মনে হয়েছিল ওঁর দিকে চেয়ে। এখনও সেই কথাটাই ভাবছেন তিনি। এমন মানুষের নামে অপবাদ! ওরা আনল কী ক'রে? এই বিশাল দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল রক্তাভ গৌর বর্ণ, উদার-বিস্তৃত বক্ষপট, কাঁচায়-পাকায় মেশানো অযত্নবিন্যস্ত স্বভাব-কুঞ্চিত বিপুল কেশদাম, মানানসই সুন্দর শ্মশ্রু-গুম্ফ, প্রশস্ত ললাটে পীতচন্দনের তিনটি রেখার মধ্যে শুভ্র বিভূতি-তিলক, গেরুয়া রঙের গরদের জোড় ও রুদ্রাক্ষের মালা—সবটা জড়িয়ে কী অপরূপই

না দেখাচ্ছে ওঁকে। যেন সেই পুরাণের কোন মুনিঋষি, স্বর্গের কোন তপস্বী, মর্ত্যের মানুষকে দয়া করতে মাটিতে নেমে এসেছেন।

অথচ কী কুৎসিত অভিযোগই না আনা হয়েছে এই তপস্বীর নামে। চিত্ররেখা মৌলিক নামে একটি মেয়ে সে অভিযোগ এনেছে। মুশকিল হয়েছে এই যে, মেয়েটিও নিতান্ত নগণ্য তুচ্ছ কোন মেয়ে নয়—কোন সাধারণ নষ্ট মেয়েমানুষও নয়। দর্শন আর ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম.এ. পাস করা মেয়ে —বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্বর্গগত সনৎ মৌলিকের কন্যা। ঐ একই মেয়ে লক্ষপতি মিঃ মৌলিকের—মা-বাপ-মরা স্বাধীন মেয়ে। প্রকাণ্ড বাড়ি আর প্রকাণ্ড গাড়ির অধিকারিণী। রেখা মৌলিককে কলকাতার ইংরেজীধরণ-ঘেঁষা অভিজাত সমাজ সকলেই চেনে। অধিকাংশই তাকে পুত্রবধূ বা নিজের স্ত্রী ক'রে নিতে উৎসুক, ক্ষেত্রবিশেষে। মেয়েটি দেখতেও সুশ্রী—খুব সুন্দরী না হ'লেও কামনা করার মতো তো বটেই।

রেখা মৌলিক কিন্তু এ পর্যন্ত কারও কাছেই ধরা দেয় নি। বরং গত বছরদুই যেন সে তার অভ্যস্ত ও পরিচিত সমাজকে এড়িয়েই চলছে। কিম্বদন্তী —ধর্মজীবনের দিকেই ঝুঁকেছে সে। অমন শ্রীময়ী বিত্তশালিনী মেয়ে সন্ন্যাসিনী হবে নাকি? অনেকেই যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন কথাটা শুনে—দিনকতক গায়ে-পড়ে বাড়িতে আনাগোনাও শুরু করেছিলেন কিন্তু রেখা কাউকে আমল দেয় নি। দেখাই করত না বিশেষ কারও সঙ্গে, 'বাড়ি নেই' বলে দারোয়ান ফিরিয়ে দিত দরজা থেকে। তবে তাই বলে একেবারে হাল ছেড়ে দেন নি সবাই। উৎসাহী হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই ওর গতিবিধির খবর রাখতেন। ও যে মহাজীবনের ঘাটে ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে চলেছে তাও তাঁদের অজানা ছিল না। কদিন সে গহনানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে গেল, কদিন চৈতন্যময়ী মায়ের কাছে আনাগোনা করল, আর বেলুড় মঠ ও পণ্ডিচেরী আশ্রমে গেল কবার—তা প্রায় মুখস্থ বলে দিতে পারে কেউ কেউ।

ইদানীং অনেকেই কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, গোয়েন্দাগিরিটাও কমিয়ে দিয়েছিলেন। ও বড় শক্ত মেয়ে, চট্ ক'রে কোথাও ধরা দেবে না বা গলে পড়বে না—এটা শুধুই ওর অম্বল-চেখে বেড়ানো—এমনই একটা ধারণা হয়ে

গিয়েছিল সকলের। আর সেই জন্যই যে সে কখন এবং কবে—এমন পরিপূর্ণভাবে পাগল বাবার খপ্পরে এসে পড়েছে, তা অতটা বুঝতে পারে নি কেউ। বুঝতে যেদিন পারল সেদিন সবাই শুনল যে ইতিমধ্যেই নিউ আলিপুরে আশ্রম করবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছে রেখা এবং শীঘ্রই বাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে সমস্ত সম্পত্তি গুরুদক্ষিণা রূপে লিখে দিয়ে পুরোপুরি ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করবে।

বলা বাহুল্য সমাজে আলোড়ন বড় কম জাগল না এই সংবাদে। বিশেষ ওদের সমাজে। অনেকেই বাধা দেবার জন্য জীবন পণ করলেন। অনেকেই—অনেক আত্মীয়-স্বজন ছুটে এলেন ওকে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করবার জন্য। যা গেছে তা যাক, যেটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে সেটুকু বেহাত হয় কেন? কিন্তু আবারও এঁদের ছুটোছুটি সার হ'ল। রেখার ধরাছোঁয়া পাওয়া তো দূরের কথা—দেখাই পেল না কেউ। গুরুদেব তথা আশ্রমের জপতপ পূজা-পাঠের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মগোপন ক'রে রইল সে।

২

তারপর, যখন সকলে একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বা সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে, তখন অকস্মাৎ এই কাণ্ড। কেউই জানত না কিছু, এর উদ্যোগপর্বের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি—একেবারে খবরের কাগজে পড়ল সবাই। রেখা মৌলিক শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাসানন্দের নামে গুরুতর সব অভিযোগ এনেছে, ফৌজদারী আদালতে মামলা শুরু হয়ে গেছে। পাগল বাবাকে নাকি গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, জামিনে খালাস আছেন।

অভিযোগ অনেক; একটা হ'ল পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রতারণার—মিথ্যা অজুহাতে এই টাকাটা আদায় ক'রে পরে স্বামীজীর গৃহ নির্মাণে লাগানো হয়েছে; আশ্রম-টাশ্রম বাজে কথা, জমি স্বামীজীর নিজের নামে কেনা, বাড়িও উঠছে তাঁর ব্যক্তিগত। দ্বিতীয় অভিযোগ, নানাবিধ কৌশলে ফুঁসলে তাকে শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য চাপ দেওয়া ও তার সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া এবং তৃতীয় ও শেষ অভিযোগ (কিন্তু অকিঞ্চিৎকর নয় আদৌ) তার শ্লীলতাহানি ও তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার চেষ্টা।

বলা বাহুল্য, এই সংবাদের পর সমাজে আবারও প্রচণ্ড এক আলোড়ন উঠল। কিন্তু এবার আশ্চর্যরকম ভাবেই, রেখার হিতৈষীর সংখ্যা কমে গেল। নিতান্ত যারা এখনও ঐ তুচ্ছ পঞ্চাশ হাজার বাদে বাকী তিন-চার লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখে, আর সেই সঙ্গে প্রায়-রূপসী এই মেয়েটিকে—তারা ছাড়া আগেকার অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ই তাকে ত্যাগ করলেন। শুধু তাই নয়—তার ঘোরতর নিন্দা ক'রে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা। তার কারণ তাঁরাও বেশির ভাগই পাগল বাবার ভক্ত বা শিষ্য। এমন কি উক্ত ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ তার জীবন-সংশয় ঘটাবার ভয়ও দেখাতে লাগলেন, আর সেজন্য রেখা মৌলিককে আদালতের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল, বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসাতে।

কিন্তু মামলা যে টিকবে না—সেটা প্রথম থেকেই প্রায় নিশ্চিত বোঝা গিয়েছিল। 'বাবা'র পক্ষে বহু বড় বড় য়্যাডভোকেট উকীল ও ব্যারিস্টার, তার চেয়েও বড় কথা—অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির দল। সাক্ষ্যে প্রমাণে যুক্তিতে মামলা আসামী পক্ষেই প্রায় দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল। রেখার অভিযোগ প্রথমেই ফেঁসে গেল টাকাটার ব্যাপারে। দেখা গেল এই টাকাটা দেওয়ার আগে টাকাটা গ্রহণ করানোর জন্য অনুনয় বিনয় ক'রে নিজে হাতে চিঠি লিখেছে সে, বাবার প্রধান শিষ্য ব্রহ্মচারী শিবপ্রসন্ন দাদাকে। সে চিঠি আদালতে দাখিল করা হ'ল এবং রেখাকেও স্বীকার করতে হ'ল যে, সে চিঠি তার লেখা। তাছাড়া নিউ আলিপুরে আশ্রম-ভবনের জমিও যে 'বাবা'র নিজের নামে খরিদা নয়, আশ্রমের ট্রাস্টিদের নামে কেনা (সে ট্রাস্টিদের মধ্যে অবশ্য পাগল বাবাও আছেন, কিন্তু তিনিই অদ্বিতীয় নন)—সেটা দলিল দেখিয়ে নিঃসন্দেহে প্রমাণ ক'রে দেওয়া হ'ল। বোঝা গেল নালিশ করার আগে রেখা কোন জনশ্রুতির উপর নির্ভর করেছিল, নিজে দলিল দেখে নি বা দেখতে চায় নি।

দ্বিতীয় অভিযোগও টিকল না—কারণ বাংলা দেশের দশ-বারোজন বিশিষ্ট নাগরিক—প্রায় সব ধরনের বৃত্তি ও জীবন-মান থেকে বাছাই ক'রে নেওয়া, —শিক্ষক, ব্যবহারজীবী, জমিদার, সম্ভ্রান্ত সরকারী কর্মচারী, এম. এল. এ. প্রভৃতি—এসে সাক্ষী দিলেন যে রেখা 'বাবা'র চরণে আশ্রয় পাবার জন্য কী

পরিমাণ কাকুতি-মিনতি করেছে এবং বাবা কত বার কত রকম ভাবে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন, সৎ-পাত্র দেখে বিবাহ ক'রে সংসারযাত্রা নির্বাহ করার সদুপদেশ দিয়েছেন।

আর সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ তো আদৌ টিকল না, কারণ রেখা তার স্বপক্ষে একটিও সাক্ষী কিংবা এতটুকু প্রমাণ উপস্থিত করতে পারল না। ঘটনাটা আগাগোড়া গুরুদেবের সাধন-কক্ষে ঘটেছিল—নির্জনে লোক-চক্ষুর আগোচরে—সে সময়ে সে ঘরে বা তার কাছাকাছি কারও থাকা সম্ভব নয়—এ যুক্তি গ্রহণীয় বলে গণ্য হ'ল না কারও কাছেই। একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের মেয়ের কথার উপর নির্ভর ক'রে কিছু এত বড় একটা সম্ভ্রান্ত লোককে অবিশ্বাস করা যায় না—বিশেষ যেখানে অপর দুটি অভিযোগ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে দেখা গেছে যে বাদিনী কোন কারণে নিতান্ত বিদ্বেষবশতই মিথ্যা মামলা এনেছে।

মামলা চলেছে মাস দুই ধরে। সন্ন্যাসী সেই প্রথম দিন ছাড়া একদিনও নিজে আসেন নি, আসবার প্রয়োজন হয় নি। আজও প্রয়োজন হ'ত না—শিষ্যরাই ধরে এনেছে বলে এসেছেন। আজই মামলার শেষ, আদালত আজ রায় দেবেন। রায় যে কী হবে তাও সকলের জানা—সেই রায়ের পর বিজয়-শোভাযাত্রাসহকারে গুরুদেবকে নিয়ে নগর পরিক্রমা করা হবে বলেই ওঁকে একরকম জোর ক'রে ধরে এনেছে এরা। তিনিও এতগুলি ভক্তের আকিঞ্চন এড়াতে পারেন নি বলেই আসতে রাজী হয়েছেন। অন্তত এদের তাই বিশ্বাস।

৩

এ পর্যন্ত সব ঠিক ছিল ; ঠিক ঠিক—পূর্বসূচী অনুযায়ী চলছিল সব। গতরাত্রে বাবাকে রাজী করিয়েছে এরা, তিনি এদের অনুরোধেই এসেছেন—অন্তত তাই সবাই জানে। এর মধ্যে তিনি কাকে দিয়ে কী পিটিশ্যন করিয়েছেন আর কেন—তা কেউ জানে না। তবে, উনি যা করেছেন তা ভাল ভেবে ভালর জন্যই করেছেন সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। স্টেট্‌মেন্ট দেবেন মানে বাণী দেবেন—সে বাণী সময়োপযোগী ও স্মরণীয় কিছু হবে তাতেও কারও

কিছুমাত্র সংশয় নেই। এই নাটকীয় মুহূর্তে এমন কিছুই বলবেন 'বাবা' যা বিশ্বের—মানবজাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সকলে তাই সজাগ ও উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল, যারা বাইরে ছিল তাদের আপসোস হ'তে লাগল 'মাইক' না আনার জন্য।···

ইতিমধ্যে কিন্তু অনেকটা সময় কেটে গেছে। বিনয়েন্দ্র মল্লিকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে। হাজার হোক এটা ধর্মাধিকরণ, তিনি বিচারক। কাঁহাতক এমন ক'রে এক আসামীর খুশি ও মর্জির জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে থাকেন ?

তিনি আবারও একটু কাশলেন, তারপর গলাটা একটু চড়িয়েই বললেন, 'বলুন কী বলবেন, আমরা অপেক্ষা করছি। সরকারী কাজ—'

'বটেই তো!' ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন পাগল বাবা। আর একবার—যেন মনে হ'ল শেষবারের মতোই তাঁর সেই অগণিত ভক্তপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বোধ হ'ল যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বললেন, 'আমারই অন্যায় হয়েছে বাবা।···অভ্যাসবশতঃ বাবা বলে ফেলেছি কিছু মনে করবেন না—হুজুর।'

'না না, ঠিক আছে। That's alright! মোদ্দা—আপনি কি বলবেন একটু তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।'

'বলছি।' তবু, শেষ মুহূর্তেও এ কী দ্বিধা তাঁর মনের! আত্মাহঙ্কারের এ কী ছলনা!···কিন্তু এ দুর্বলতা তাঁর সাজে না। এ তাঁর পক্ষে আত্ম-গোপনের মতোই। যেন নিজের ওপর রাগ ক'রেই বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলেন স্বামী রামদাসানন্দ, 'এই যে অবাঞ্ছিত মামলা চলছিল একটা—শুনলাম আজই তার শেষ। আপনি নাকি দয়া ক'রে বলেছেন—আজই আপনার রায় দেবেন।' —এক মুহূর্ত থামেন 'বাবা', তারপরই আবার তেমনি দৃঢ় কণ্ঠে বলতে শুরু করেন, 'মামলার বিবরণ যা আমার সন্তানদের কাছে শুনেছি তাতে রায় আমার অনুকূলে এবং বাদিনী কল্যাণীয়া রেখার প্রতিকূলে যাবার কথা। এই মামলা প্রধানত পরিচালনা করেছেন আমার সন্তানরাই, আমি এতকাল দর্শকমাত্র ছিলাম। কিন্তু ঠিক নির্লিপ্ত দর্শক ছিলাম বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। মনে মনে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, মনেপ্রাণে নিজের এই জয়ই কামনা করেছি।

কিছু কিছু যুক্তি-পরামর্শও যে দিই নি তা নয়। কিন্তু কাল রাত্রে আমার চোখ খুলেছে, গুরুদেব দয়া ক'রে আমার অন্তরে আবির্ভূত হয়ে সত্য পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন। এ মিথ্যা জয়ের বোঝা, এই সম্মানের বোঝা আর আমি বইতে পারব না। তাই আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি—মিথ্যার এই সহস্র ভুজবন্ধন থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন। বাদিনী যে যে অভিযোগ এনেছেন আমার বিরুদ্ধে—সব সত্য। টাকাটা অবশ্য আশ্রমগৃহ নির্মাণের জন্যেই তিনি দিয়েছেন, আমিও তাই নিয়েছি, ঠিক আমার ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তির জন্যে নিই নি। আইনের দিক থেকে আমি মুক্ত—কিন্তু ন্যায়ের দিক থেকে নয়। এক্ষেত্রে আশ্রমগৃহও যা, আমার নিজের বাসগৃহও তাই। তাছাড়া ঐ টাকাটা আদায়ের জন্যে কিছু কিছু কৌশলও অবলম্বন করেছি, কিছু কিছু অভিনয়ও করতে হয়েছে। সেটা ঠিক হয়তো সচেতন অবস্থায় করি নি, মনের অবচেতনে প্রবৃত্তিই নিয়ন্ত্রিত করেছে আমার বাক্‌-কৌশলকে। কিন্তু মনের অগোচর পাপ নেই—এটুকু যে আমার দ্বারা হয়েছে তা আমি অনুভব করেছি।'

এই পর্যন্ত বলে থামলেন একবার 'বাবা'। সমস্ত আদালত কক্ষ, বাইরের দালান, সিঁড়ি, নিচে পর্যন্ত যেন সমস্ত পাথর—সবাই নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেছে। একটা অপ্রাকৃত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে ঘরময়। সকলেরই একটা স্তম্ভিত অবস্থা, মায় স্বয়ং বিচারক বিনয়েন্দ্র মল্লিকেরও।

অবশ্য সন্ন্যাসী রামদাসানন্দ যে সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত হলেন তা মনে হ'ল না। কোনদিকে চেয়েও দেখলেন না তিনি। কথা বলতে বলতে চোখ বুজে এসেছিল, বুজেই রইল। তেমনি ভাবেই, যেন মুহূর্তখানেক দম নিয়ে, আবার বলতে শুরু করলেন, 'বাদিনীর দ্বিতীয় অভিযোগও সম্পূর্ণ সত্য। তাঁকে আমার শিষ্যা করার জন্য আমি প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ বহু চাপ দিয়েছি, বহু চেষ্টা করেছি। তার মূলে তার বিপুল সম্পত্তির লোভও ছিল, কিছু প্রচারের লোভও। তার মতো বিদুষী ও বিখ্যাত লোকের কন্যা আমার শিষ্যা হ'লে আমার প্রচার ও প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেত তাতে সন্দেহ নেই। শিষ্য-সংখ্যা আমার কম নয়, তার মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোকও বিস্তর আছেন—তবু লোভের তো কোন শেষ বা সীমা নেই বাবা।'

আবারও একবার থামলেন সন্ন্যাসী। চোখ বুজেই আছেন, তবু যেন বিনয়েন্দ্র মল্লিকের মনে হ'ল, তাঁর শুভ্র সুগৌর মুখখানা কী এক সুগভীর আবেগে বা লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করল।

শ্রোতারা সকলে স্তব্ধ হয়ে আছে তেমনি। বরং যেন আরও উদ্‌গ্রীব, আরও উৎকর্ণ। এইবার আসছে সর্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগের প্রশ্ন। সব-চেয়ে হীন, সবচেয়ে লজ্জাকর অধ্যায় এ মামলার। এটাও স্বীকার করবেন নাকি উনি? কী মতলব ওঁর? এ কী করছেন, মাথা কি ওঁর খারাপ হয়ে গেল একেবারে?...

ঈষৎ একটু গলাখাঁকারি দিয়ে, গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে তেমনি পরিষ্কার দ্ব্যর্থবিহীন ভাষাতে বললেন, 'এবার বাদিনীর তৃতীয় প্রশ্ন। লজ্জার সঙ্গে হ'লেও অকপটে স্বীকার করছি—সে অভিযোগও সর্বৈব সত্য। মুহূর্ত-কয়েকের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলুম, এমন কথা বলতে পারলেও একটা স্বস্তি অনুভব করতুম,...কিন্তু আজ এই ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে কোন মিথ্যা বলব না বলেই কৃতসঙ্কল্প হয়েছি—এ এক-আধ মুহূর্তের ব্যাপার নয়, জ্ঞান হারানোর ব্যাপারও না। একটু একটু ক'রেই আমার লালসা উগ্র হয়ে উঠেছে, যা করেছি তাও বেশ সজ্ঞানেই করেছি। বাদিনী যে কোন সাক্ষী সামিল করতে পারে নি, অর্থাৎ সেদিন যে কেউ আমার কক্ষের ধারেকাছে ছিল না—সেও আমার সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল; যারা থাকতে পারত, আমিই তাদের বিভিন্ন কাজের ছুতোয় অন্যত্র পাঠিয়েছিলুম।...আমার বক্তব্য শেষ করেছি হুজুর, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, অন্যের বিনানুরোধে সত্য কথা বলেছি—এখন যা শাস্তি দিতে হয় দিন—আমি মাথা পেতে নেব এবং আমার প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ দিলেন বলে ধন্যবাদ দেব।...হয়ত আজই রায় দিতে পারবেন না—হয়ত বিচারের গতি বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করার অপরাধেও অপরাধী হলুম, সরকারী সময় ও অর্থ দুই-ই অপচয় হ'ল—কিন্তু সেদিক দিয়েও আমার কোন কৈফিয়ত দেবার নেই। আমি সব অপরাধ মাথা পেতে নিয়ে নীরব হলুম।'

একটি ছুঁচ পড়লেও শব্দ পাওয়া যায়—এটা কথার কথা, কিন্তু প্রায় সেই রকমই নিঃশব্দতা বিরাজ করতে লাগল সেই আদালত কক্ষের ঘরে ও বাইরে।

পাখার হাওয়া কাটার সামান্য শব্দ ও সেই হাওয়াতে বিচারকের টেবিলে রাখা কী দু-একখানা কাগজের প্রান্ত ওড়ার সামান্যতম শব্দও শোনা যেতে লাগল। আর কোন শব্দ নেই, এমন কি এতগুলো লোকের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন বন্ধ হয়ে গেছে। শব্দও যেমন নেই—তেমনি কোন স্পন্দনও নয়। যেন কোন্ রাক্ষসীর নিঃশ্বাসে সেই বাল্যে শোনা রূপকথার পুরীর মতো এই আদালত ভবনের সব কটি প্রাণী পাথরে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু সে খুব বেশী সময়ের জন্যে নয়। হয়ত বা মিনিট-দুই হবে। তার-পরই সেই ঘরের প্রান্ত থেকে একটা অস্ফুট ও অব্যক্ত শব্দ পাওয়া গেল—ফোঁপানি কান্নার।

যেন এইটুকুরই অপেক্ষা করছিল সকলে—এইটুকু প্রাণ-লক্ষণের। নিমেষ মধ্যে সকলে সচকিত হয়ে উঠল, সচেতন হ'ল। অনেকগুলি নিঃশ্বাসের শব্দ উঠল—বহুক্ষণের চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে যাওয়ার একটা বিচিত্র আওয়াজ। সেই সঙ্গে এতগুলি প্রাণীর ঈষৎ নড়াচড়ার শব্দ ও পোশাকের সামান্য খস-খসানি। অর্থাৎ ঐ কান্নার শব্দটুকুর আঘাতে ঘুমন্ত প্রাণহীন পুরী যেন বেঁচে উঠল আবার।—আর সঙ্গে সঙ্গেই সকলে উৎসুক ও কৌতূহলী হয়ে উঠল সেই কান্নার উৎস সন্ধানে।

নজরে পড়তেও দেরি হ'ল না সে মানুষটাকে, যে কাঁদছে।

রেখা। রেখা মৌলিক।

স্বর্গগত ব্যারিস্টার মিঃ মৌলিকের একমাত্র এবং উচ্চ-শিক্ষিতা কন্যা।

ওর আজ আসবার কথা নয় এখানে। প্রয়োজন নেই কিছু। তার জবানবন্দী ও সাক্ষ্য শেষ হয়ে গেছে, আর তাকে কোন দরকার নেই। তার থাকা উচিতও হয় নি। আজ যে এটা তার পরাজয়ের দিন তা এঁদের মতো সেও জানে। তবুও এসেছে, এই আশ্চর্য। সম্ভবত সকলের আগেই এসেছে, তাই কেউ লক্ষ্য করে নি। সকলের আগে এসে এই কোণে চুপ ক'রে বসে আছে, আশ্রয় নিয়েছে এই আড়াল-মতো জায়গাটায়। হয়ত এই বিপুল জনতা দেখেই ভয়ে আত্মগোপন করেছে এখানে।

কেঁদে উঠেছে সে-ই।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে। সম্ভবত চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঠেলে

বেরিয়ে এসেছে কান্নাটা। কিন্তু সেও ঐ অল্প কয়েকটি মুহূর্তের জন্য। তার পরই উঠে দাঁড়াল সে। সেই ফোঁপানি তখনও রয়েছে, চাপা অশ্রুতে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আছে দুই চোখ। সেই অবস্থাতেই—অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে, মাতালের মতো টলতে টলতে কোনমতে দরজার কাছে এল। তারপর সেই ভাবেই—সকলকে ঠেলে সরিয়ে, বা পা মাড়িয়ে ঘর থেকে করিডর, করিডর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল। যেন পালিয়ে এল কী একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার সামনে থেকে। কী ক'রে যে এল তাও যেন জানে না কিছু, কী ক'রে এসে নিজের গাড়িতে পড়ল অর্ধমূর্ছিতের মতো তাও না। বহুক্ষণ আর বহুদূর চলবার পর সে টের পেল যে সে আদালত থেকে বেরিয়ে এসেছে, পালিয়ে এসেছে।

৪

হাকিম বিনয়েন্দ্র মল্লিক কিন্তু এধারে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বিরক্ত ও বিব্রতও। এসব কি হচ্ছে আজ। এ কী কাণ্ডকারখানা শুরু হয়ে গেল এখানে? এটা আদালত না কি গুলির আড্ডা—না কি রামায়ণ গানের আসর? হ্যাঁ, সেই আখ্যাই বোধ হয় বেশী সমীচীন হবে। কারণ যে কোলাহল উঠেছে—সেটা ভক্তিরই উচ্ছ্বাস প্রধানত।

পাগল বাবার যে বিপুল শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলী এতক্ষণ বিস্মিত, বিহ্বল ও নিস্তব্ধ হয়ে ছিল, তারা যেন রেখা মৌলিকের এই কান্না এবং ছুটে পালিয়ে যাওয়ারই অপেক্ষা করছিল। এইবার তারা একযোগে জয়ধ্বনি ক'রে উঠল বাবার। 'আহা' 'আহা' এই দুটো শব্দের একটা তরঙ্গ উঠে যেন এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হিল্লোলিত হ'ল সেই নিরবচ্ছিন্ন জনসরোবরে।

দু-একটি অতি সাধারণ কথাও শোনা গেল এদিকে-ওদিকে।

'বাবা, তোমার এত দয়া!'

'আহা, বাবার কী কৃপা!'

'বাবা, বাবা গো! আমরা যে অধম পাপীতাপী বাবা, তোমার মহিমা কি আমরা বুঝতে পারি!' কে একজন ডুকরে কেঁদেও উঠল।

কিন্তু এই মুগ্ধতার অভিব্যক্তিই নয় শুধু, জয়ধ্বনিরও তরঙ্গ উঠল—এক নয়

একাধিক। সে তরঙ্গ-ধ্বনি সমুদ্রগর্জনের মতোই সরব হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

'জয় স্বামী রামদাসানন্দ কী জয়!'

'জয় পাগল বাবা কী জয়!'

একবার নয়, দু'বার নয়। বারবার জয়ধ্বনি তুলেও যেন তৃপ্তি হয় না ভক্তদের। একটি সংকীর্ণ সংশয়ের দু পারে ছিল গুরুদেবের দুই ভবিষ্যৎ। সেই সঙ্গে নিজেদেরও। বাবার এই জবানবন্দী সত্য হ'লে তাঁর প্রতি ধিক্কারের চেয়েও আত্মধিক্কারের প্রশ্নটাই প্রকট হয়ে ওঠে। এই লোককে আমরা গুরু ও গোবিন্দের আসনে বসিয়েছি! সেটা ভাবাও অসুবিধা। সেটা ভাবা মানে নিজেদের চরম অপমান। নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির প্রতি অবমাননা। রেখার এইভাবে ছুটে পালিয়ে যাওয়াটা সংকট মুহূর্তে তাদের এই সংশয়ের এপারে পালিয়ে আসবার সুযোগ দিয়ে গেল। এপারে অর্থাৎ বিশ্বাসের পারে আসতে পেরে বেঁচে গেল তারা। এ জয়ধ্বনি সেই মুক্তিরই আনন্দাভিব্যক্তি। দু-একজন বাহু তুলে হরিধ্বনির সঙ্গে নাচবারও চেষ্টা করল, এতটুকুও স্থান না থাকায় সম্ভব হ'ল না তা, শুধু হাত দুটোই উঠল, এবং অনেক ক্ষেত্রে উঠেই রইল।

বিনয়েন্দ্র মল্লিক শুধু বিরক্ত নয়, রুষ্টই হয়ে উঠলেন এবার। টেবিলের ওপর শব্দ তুলে উচ্ছ্বাস-কোলাহলটা অতিকষ্টে শান্ত করলেন তিনি। বার কতক 'দরওয়াজা' বলেও ডাকলেন কিন্তু দ্বাররক্ষী সিপাহী কোথায় কোন্ কোণে পিষ্ট হয়ে আছে, কোনমতেই এগিয়ে আসা সম্ভব হ'ল না তার। বিনয়েন্দ্র ভ্রূকুটি ক'রে সাধারণ ভাবে ভিড়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনারা এরকম গোলমাল করতে থাকলে আমাকে বাধ্য হয়ে সিপাহী ডেকে ভিড় সরাতে হবে। মনে রাখবেন এটা আদালত, হরিসভা কিংবা কথকতার আসর নয়! আবার যদি গোলমাল হয় তো আমি সবাইকে জরিমানা ক'রে দেব—এখানে যাঁরা আছেন সবাইকে।'

সাধারণ ভাবে তাকাবার মস্ত সুবিধা, কোন বিশেষ বা বিশিষ্ট লোককে চোখে পড়ে না। দৃষ্টি মেলে না কোন অভিজাত শীতল দৃষ্টির সঙ্গে। ফলে ধমকটা আসল ধমক হয়ে ওঠে। বিনয়েন্দ্র মল্লিকের ধমকটাও ধমকের

মতোই শোনাল। আর তাতে কাজও হ'ল। স্তব্ধ হয়ে গেলেন সবাই। জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি দুটোরই উৎসাহ কমে গেল।

এবার সামান্য একটু কেশে নিয়ে মল্লিকসাহেব আসামীর দিকে তাকালেন। বার-দুই যেন আপাদমস্তক দেখে নিয়ে আসামীর বক্তব্যের কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা বোঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর সেই ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি সাধারণ ভাবে নিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'দেখুন—এ, মানে এসব বড়ই বিরক্তিকর ব্যাপার। বড়ই গোলমেলে। আপনার মতো লোকের একটা ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে মিথ্যা কথা বলা বড় অশোভন—অপরকে লজ্জা থেকে রক্ষা করার জন্যও মিথ্যাচারণ করা অন্যায় আপনার পক্ষে। মিথ্যা সাক্ষ্য মানে পারজ্যারের চার্জ—বড় গুরুতর। হাউএভার, আমার কিছুই করবার নেই এক্ষেত্রে। আপনার অরিজিন্যাল মামলা মিটে গেছে। উইটনেস একজামি-নেশ্যন যখন হয় তখনও পর্যন্ত আপনার কিছু বলবার সুযোগ ছিল, এখন সমস্ত য়্যাফেয়ারটাই ক্লোজড্ হয়ে গেছে। আমার রায় লেখা শেষ হয়েছে, আমি এখনই পড়ে দিচ্ছি। এর পর যদি পুলিসকে দিয়ে আপীল করাতে চান করাতে পারেন, সে সময় আবার আপনি সুযোগ পাবেন দোষী কি নির্দোষ স্বীকার করার—কিংবা কাউকে দিয়ে আবার নতুন মামলা দায়ের করাতে পারেন—সে আপনার যা খুশি। আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এখনেই এ মামলা ক্লোজ করতে চাই।'

এই বলে তিনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে (অনেকক্ষণ পরে হাকিম-জনোচিত দৃঢ়তা ফিরে পেয়েছেন আবার), তাঁর রায় বার ক'রে পাঠ করলেন। আইনের শব্দ-বিন্যাস বাদ দিলে সে রায় যা দাঁড়ায় তার অর্থ হ'ল এই যে বাদিনী চিত্র-রেখা মৌলিক তার অভিযোগের কোন দফাই ঠিক ঠিক প্রমাণ করতে পারে নি ; বরং, সাক্ষ্য প্রমাণ দৃষ্টে আদালতের মনে হয়েছে যে কোন এক কারণে সাময়িক ভাবে বিক্ষুব্ধ, ঈর্ষান্বিত বা ক্রুদ্ধ হয়ে বাদিনী যেমন-তেমন ভাবে এই মামলাটি গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন—এর মূলে আদৌ কোন সত্য ছিল না। সেই কারণে এই আদালত ফরিয়াদী স্বামী রামদাসানন্দ ওরফে পাগল বাবাকে বেকসুর খালাস দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন—ইত্যাদি।

অবশ্য এই ইত্যাদিটা আর কেউই শুনতে পায় নি।

কারণ তারপর যে জয়ধ্বনি উঠেছে তাকে ভরা-জোয়ারের সমুদ্র-কল্লোল না বজ্র-গর্জনের সঙ্গে তুলনা করবেন ভেবে পেলেন না বিনয়েন্দ্র মল্লিক। অনেক-বার ঘণ্টা বাজালেন, অনেকবার সিপাহী ডাকলেন কিন্তু তাঁর সেই ক্ষীণ একক কণ্ঠ প্রচণ্ড জনকল্লোল-আরাবে কোথায় মিশে হারিয়ে গেল তা তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না।

৫

তারপর ঠিক কী হ'ল তা পাগল বাবাও হয়ত জানেন না। জানবার উপায়ও ছিল না। কারণ মাটিতে আর পা ছিল না তাঁর। বিপুল একটা বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে। কে বা কারা তাঁকে তুলে কাঁধে করল, কারাই বা কোথা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় কোন্ তাঞ্জামে চড়াল—সে তাঞ্জাম বইল কারা, কোন্ দিক দিয়ে গেল সে তাঞ্জাম—কোথা থেকে কে কে তাঁকে ফুলের মালা দিল, কী ভাবে থেকে-থেকেই পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল তাঁর মাথার উপর, তা তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। বুঝতে চানও নি অবশ্য। সেই অসংখ্য কাঁসর ঘণ্টা ঘড়ি শাঁখের শব্দ, সেই সহস্রকণ্ঠ-সমুত্থিত সম্মিলিত জয়-ধ্বনিতে তাঁর দুই কানে তালা লাগবার উপক্রম হয়েছিল। তিনি দু হাতে কান ঢেকে চোখ বুজে বসে বোধ করি প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্রই জপ করতে লাগলেন। অবশ্য সেটাও তাঁর যথার্থ সাধক-তপস্বীজনোচিত বিনয় বলে ব্যাখ্যাত হ'তে বিলম্ব হয় নি। ফলে জয়ধ্বনি ও হরিধ্বনি বেড়েই গিয়েছিল—কমে নি।

একেবারে যখন এই ভক্তির, এই বিজয়-গৌরবের, এই জন-বহুলতার আতিশয্য থেকে ছাড়া পেলেন—তখন রাত একটা বেজে গিয়েছে। এই প্রথম নিঃসঙ্গ হবার সুযোগ পেলেন তিনি। তাও, এ সুযোগটুকু একরকম জোর ক'রেই আদায় করতে হয়েছে। শেষ যে কটি ভক্ত নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে ছিল 'বাবার চরণে', তাদের রূঢ় ভাষাতেই তাড়াতে হয়েছে, স্মরণ করাতে হয়েছে যে এখনও তিনি ইষ্টকে প্রণাম করবার অবকাশ পান নি, আর তা না হ'লে মুখে জলটুকুও দিতে পাচ্ছেন না। সেটা এতক্ষণ শিবপ্রসন্নরও স্মরণ ছিল না, সে-ই লজ্জিত হয়ে পড়ে ঠেলেঠুলে সবাইকে সরিয়ে বাবার স্নানের আয়োজন ক'রে সাধনকক্ষে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা ক'রে রেখে

ওদিকের পথে কোলাপ্‌সিব্‌ল ফটক বন্ধ ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বাবা স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সাধন-কক্ষের নীল আলোটি জ্বেলে দিয়ে চলনের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির সে প্রান্ত থেকে।···

পাগল বাবা ভেতরে এসে সাধনকক্ষেরও দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন। তারপর সেইখানেই দাঁড়িয়ে নীরবে একবার তাকালেন ঘরের দিকে। এ ঘরটি তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই অপরূপ প্রতিভার অবদান। বৈরাগ্য ও সম্ভোগের এমন বিচিত্র সমন্বয় ঘটাতে আর কেউ পেরেছে কিনা সন্দেহ। এ ঘরটি বিশেষ ভাবে তৈরী, কতকটা গুহার আকারে। ওঁর যে সাধনগুহা ছিল উত্তরকাশীতে, তারই অনুকরণে তৈরী। এ বাড়িটি তাঁর এক স্বর্গত শিষ্যের উপহার—'বাবা'র আদেশ ও নির্দেশ অনুসারে এ ঘরটি তৈরী করিয়েছিলেন তিনি বহু অর্থ-ব্যয় ক'রে। সিঁড়ির কাছ থেকে সংকীর্ণ দীর্ঘ চলন পেরিয়ে এখানে আসতে হয়—সে চলনের দুদিকে নিরেট নিরন্ধ্র দেওয়াল। এ ঘরও তাই। সিমেন্ট ও কাঁকর জমিয়ে পাহাড়ে-গুহার অনুকরণে এর দেওয়াল তৈরী, জানালাগুলিও কতকটা অদৃশ্য। ওপরে যে স্কাই-লাইট আছে তা রাত্রে বোঝাই যায় না; দিনেও তার আলোটুকু শুধু পাওয়া যায়—সে আলোর আগমন-পথ থাকে দৃষ্টির আড়ালে। অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না কোথাও। ঘরটি শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং পাখার মতো স্থূল পদার্থও দৃষ্টিকে আঘাত করে না।

গুহার শেষপ্রান্তে একটি বেদিতে তাঁর ইষ্টদেবতা ও গুরুর ছবি পাশা-পাশি সাজানো। সামনে রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত বিভিন্ন পাত্রে পূজার সরঞ্জাম। একদিকে রূপোর ঢাকা চাপা দেওয়া ঠাকুরের ভোগ রেখে গেছে শিবপ্রসন্ন। সামনে একটি মৃগচর্মের আসন। আর এপাশে, একটি নরম পালঙ্কের তোশকের ওপর গেরুয়া রঙের গরদের চাদর পাতা, তার ওপর একটি বড় বাঘের চামড়া। 'বাবা' দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত আসনে থাকেন, সে ধ্যান যখন ভাঙে তখন ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়তে চায় সমস্ত শরীর, তখন বাইরে কোথাও গিয়ে শয়ন সম্ভব হয় না—তাই এ বৃহত্তর আসনের ব্যবস্থা। কেউ কেউ বলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে জপ করেন বাবা রাত্রে, সেই অবস্থায় ভাবসমাধি

হয়ে পড়ে যান। দু-একবার খুব নাকি আঘাতও পেয়েছেন। সেই জন্যই এত বিস্তৃত শয্যার আয়োজন রাখতে হয়েছে।

পাগল বাবা বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন এসব। এ তাঁরই কীর্তি। নিজে কিছুই করেন না—কিন্তু অপরকে দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার দুর্লভ শক্তি তাঁর আছে। অনেক দিনের অভ্যাসে এ শক্তি আয়ত্ত হয়েছে তাঁর। সবই তাঁর জানা, দেখা—তবু মনে হ'ল—আজ নতুন ক'রে দেখলেন এগুলো। নতুন ক'রে নজরে পড়ল, এর পিছনে তাঁর যে ভোগ-বাসনা জাগ্রত—তার নগ্ন চেহারাটা।···দেখতে দেখতে কী এক রকমের অদ্ভুত এবং দুর্জ্ঞেয় আত্মকৌতুকের দৃষ্টি ফুটে উঠল তাঁর চোখে। যেন নিজেকেই নিজে বিদ্রূপ করতে লাগলেন। অথবা এই বিশেষভাবে নির্মিত ঘর, এই আসবাব, এই শয্যা, এই খাদ্য, এই শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—এগুলোই বিদ্রূপ করছে তাঁকে, সেই বিদ্রূপই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দৃষ্টিতে।

অবশ্য বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলেন না। সাধনার শরীর হ'লেও মানুষের শরীরই। আজকের এ ধকলের পর দাঁড়িয়ে থাকা কোন দৈত্যের পক্ষেও কঠিন হ'ত বোধ হয়। তিনি কতকটা টলতে টলতে এসেই শ্রান্তভাবে বসে পড়লেন তাঁর আসনে। না, ইষ্টের দিকে সামনে ফিরে নয়—এদিকে মুখ ক'রে। দেবতার চোখকে ভয় করেন না তিনি—তাঁর ভয় মানুষের চোখকে। ঐ যে পাশে গুরুদেবের ছবি, ওঁর চোখ দুটো যেন বড় বেশী স্পষ্ট, বড় বেশী জীবন্ত। ওঁর দিকে চাইতে পারবেন না তিনি। কাল থেকেই এই ভাবটা হয়েছে, কাল থেকেই ওদিকে চাইতে পারছেন না।···

কাল একবার, এক বিশেষ মুহূর্তে চোখ পড়েছিল তাঁর—ঐ দুটি চোখের ওপর। তখনই যেন এক চাবুকে সম্বিৎ ফিরেছে, ঐ দৃষ্টির ঈষৎ ব্যঙ্গভরা, ঈষৎ অনুকম্পাভরা চাহনির আলোতেই নিজের চোখের সামনে থেকে মোহ ও লালসা, আত্মতৃপ্তি ও আত্মবিস্মৃতির মোটা ভারি পর্দাখানা সরে গেছে। তখনই পথ দেখতে পেয়েছেন তিনি, তখনই প্রায়শ্চিত্তের কঠোর সঙ্কল্প নিয়েছেন—আর এখনও পর্যন্ত সে সঙ্কল্পের পথ থেকে ভ্রষ্টও হন নি—তবু যেন ওদিকে চাইতে পারছেন না। পারবেনও না মনে হচ্ছে—বহু দিন। মনে হচ্ছে যে

ওদিকে তাকাবার যোগ্যতা হারিয়েছেন তিনি, তাঁর দৃষ্টির কলুষে গুরুদেবের পুণ্য-স্মৃতিকে অপবিত্র করা হবে—ওদিকে চাইলে। এতদিন চেয়েছেন, কিন্তু সে তো ঐ ভারী পর্দাটার মধ্য দিয়ে। তাতে দেখা যায় নি। কালই যেন প্রথম দেখলেন। ও ছবির দিকে না চেয়েই দেখেছেন। সেই মেয়েটা—স্নিগ্ধা না কী যেন তার নাম, তার চোখের মধ্যে বহুদিন পরে প্রথম দেখলেন গুরুদেবের চোখ।

সে কতদিনকার কথা! কতদিন থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছেন নিজের ঈপ্সিত পথ থেকে!

এ সন্ন্যাস কি তবে তাঁর আগাগোড়াই প্রবঞ্চনা? বিরাট একটা জুচ্চুরি, ধাপ্পাবাজী?

না না না!···কে যেন আর্তনাদ করে উঠল তাঁর মধ্যে।

বহুদিন আগে, দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশীদিন হ'ল প্রথম যৌবনে যেদিন তিনি গৃহত্যাগ করে একবস্ত্রে হিমালয়ের দিকে যাত্রা করেছিলেন, সেদিন তাঁর মনে তীব্র ঈশ্বর-দর্শন-আকঙ্ক্ষা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না, এ তিনি তাঁর গুরুর নামে, ইষ্টের নামে হলফ ক'রে বলতে পারেন। সেই আকাঙ্ক্ষাতেই পাগলের মতো ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছেন এক তীর্থ থেকে আর এক তীর্থে—এক গিরিশৃঙ্গ থেকে আর এক গিরিশৃঙ্গে। অবশেষে এক কুম্ভমেলায় দর্শন পেয়েছিলেন ওঁর এই সন্ন্যাসী গুরুর। কেমন ক'রে যেন তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন গুরু বলে। জন্মজন্মান্তরের সংস্কার বোধ হয় চিনিয়ে দিয়েছিল। এ সম্পর্কও নাকি জন্মজন্মান্তরের, তাই ভুল হয় নি কিছুমাত্র।

তবু তিনি কি সহজে ধরা দিয়েছিলেন! অনেক চেষ্টা করেছিলেন তাড়াবার, বহু কৌশল করেছিলেন ওঁকে এড়িয়ে যাবার। অনেক বুঝিয়েছিলেন, নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই কথাই বলেছিলেন—'তোর এখনও ভোগবিলাসের বাসনা যায় নি বেটা, এখনই তাড়াতাড়ি এ পথে আসার চেষ্টা করিস নি।' কিন্তু কোন কথাই শোনেন নি পাগল বাবা। জোর ক'রে সেই বহু সাধকের সাধনার ধন পা-দুটি ধরে পড়ে ছিলেন। গালাগালি, প্রহার, মিষ্টবাক্য, কিছুতেই নড়েন নি বা ছাড়েন নি সে পা। সেবাও করেছিলেন প্রাণপণে। অবশেষে বহুদিন পরে দয়া হয়েছিল তাঁর। প্রসন্ন হয়েছিলেন তিনি। তবে সে

সিদ্ধসাধক ভুল করেন নি। ওঁর ঐকান্তিকতা সত্য বলেই শেষ পর্যন্ত দয়া করেছিলেন। সেই মহাসাধক রামদাস বাবার চরণযুগল মনে সদা জাগ্রত রাখার জন্যই পাগল বাবা নিজে নির্বাচন করেছিলেন নিজের সন্ন্যাস নাম। হায় রে মানুষের আত্মপ্রবঞ্চনা, মিথ্যা আত্মবিশ্বাস।

তবু, সেদিনও যেমন ঐকান্তিকতার অভাব ছিল না, তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত নয়। যথার্থ তপস্যাই করেছিলেন উনি। মনেপ্রাণে ঈশ্বরকেই চেয়েছিলেন। সে তপস্যায় এতটুকু খাদ বা ভেজাল ছিল না—ঈশ্বরই জানেন। কঠোর তপস্যা—আর তার ফলও পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই ফল পাওয়াই কাল হয়েছিল ওঁর। অকস্মাৎ একটা আশ্চর্য শক্তি অনুভব করলেন উনি, সাধারণ মানুষে সম্ভব নয়—এমন শক্তি। মনে হ'ল এবার তো সিদ্ধি ওঁর করায়ত্ত,—ইতিমধ্যে এই শক্তিটা একটু পরখ ক'রে দেখতে দোষ কি? বুঝতে পারলেন না একবারও যে এইটেই গুরু-গোবিন্দের পরীক্ষা, এই লোভ সামনে ধরেই নিয়তি সিদ্ধি থেকে বহু দূরে ঠেলে দিতে চাইছে ওঁকে। কিছু না বুঝে, অন্ধের মতো চলে এলেন লোকালয়ে। পসার জমিয়ে বসলেন। সেই সামান্য-লব্ধ শক্তিতেই অসামান্য ফল ফলল। শিষ্য সেবক ভিড় ক'রে এল চারদিক থেকে। সাফল্যের নেশা ঘোর লাগাল মনে—মেতে উঠলেন তিনিও। অবশেষে ঐ ভক্ত আর শিষ্যদের কথাই ঠিক মনে হ'তে লাগল। মনে হ'তে লাগল নিজেকে মহাপুরুষ, ঈশ্বরের নির্বাচিত—ঈশ্বরের প্রিয় কোন মানুষ। সত্যিই মনে হ'ল ইচ্ছা করলেই তিনি নিজেও যেমন সেইখানে পৌঁছতে পারেন তেমনি পারেন অপরকেও পৌঁছে দিতে।

তারপর?

তারপর যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল।

একটি লোভ সহস্র লোভের পথ খুলে দিল। লোভ আর উচ্চাশা। গহনানন্দ ব্রহ্মচারীর মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবেন, চৈতন্যময়ী মায়ের মতো সমস্ত তীর্থে সমস্ত শহরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবেন—এই সাধ জাগল। মিটলও তা—ঠিক অতটা না হোক, কিছুটা তো বটেই। শিষ্যসেবকরা মুখ চেয়ে আছে, ভগবানের সঙ্গে তুলনা করছে, পাদোদক পান করছে, ভোগের সহস্র

মহার্ঘ্য উপচার পায়ের সামনে রেখে ধন্য কৃতার্থ হচ্ছে—বড় মিষ্টি নেশা। বড়ই বিভ্রান্তিকর। সেই নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠে বুঝতেও পারলেন না রামদাসানন্দ যে তাঁর ইষ্ট, সাধনা, গুরু সব পিছনে পড়ে রইল, কোন্ বিস্মৃতির ধূম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে মিলিয়ে গেল কোন্ কামনার মেঘমলিন দিগন্তে। ক্রমশ গরদের বহির্বাসে অভ্যস্ত হয়ে গেলেন, পালকের তোশক ও হিমাচল প্রদেশের নরম তুলোর মতো কম্বল দিয়ে সজ্জা রচিত হ'তে লাগল, ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করার নাম ক'রে রূপোর থালা ও সোনার বাটিও এসে পৌঁছল। আহার করতেন অবশ্য সামান্যই—ঈষৎ একটু প্রসাদ মুখে দিয়েই থালা সরিয়ে দিতেন কিন্তু আয়োজন অনাড়ম্বর হ'লে ভগবানের নাম ক'রেই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

তবু এতদিন একটা জিনিস বাঁচিয়ে রেখেছিলেন—সেটা ব্রহ্মচর্য। এবার সেই একমাত্র ভিত্তিও কেঁপে উঠল তাঁর সাধক জীবনের। কাঁপিয়ে দিল রেখা মৌলিক। চিত্ররেখা।

কী কুক্ষণে বা কি শুভক্ষণে যে দেখা হয়েছিল মেয়েটার সঙ্গে! বিদুষী—সুদ্ধমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-সর্বস্ব বিদ্যা নয়, যথার্থই লেখাপড়া করেছে রেখা, সে কথা তাঁর অন্যান্য বিদ্বান ভক্তরা সকলেই স্বীকার করে। ক্ষুরধার বুদ্ধিমতী, বিত্তশালিনী, বিখ্যাত ব্যক্তির কন্যা চিত্ররেখা যে এইভাবে এসে তাঁর পায়েই আত্মসমর্পণ করবে তা কে জানত! তাঁর নিজেরই অবাক লেগেছিল প্রথমটা। আরও দেখলেন, রেখা তার এতদিনের শিক্ষা-সংস্কৃতি যুক্তি-বুদ্ধি সব ভাসিয়ে এমন বিহ্বলভাবে সামান্যা প্রাকৃত নারীর মতো তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে দেখে—এতদিন পর্যন্ত যেসব উন্নাসিক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে বা তাঁকে পরিহার ক'রে চলত—তারাও আসতে আরম্ভ করেছে তাঁর কাছে। এবং বেশ একটু শ্রদ্ধার সঙ্গেই আসছে। অর্থাৎ এতকালের মধ্যে এই মেয়েটির ভক্তিশ্রদ্ধা-আকর্ষণই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়।

ক্রমশ প্রবলতর লোভ এবং কল্পনাতীত উচ্চাশা পেয়ে বসল তাঁকে। এই মেয়েটিকে চিরদিনের মতো বাঁধতে পারলে হয়ত তিনি ভারতের অনন্য ও শ্রেষ্ঠতম গুরু হয়ে উঠবেন একদিন। পণ্ডিচেরীর ঋষি বা দক্ষিণেশ্বরের অবতার হয়ে ওঠাও কিছুমাত্র অসম্ভব হবে না হয়ত। আর চিরদিনের মতো বাঁধতে হ'লে উত্তরসাধিকা করা ছাড়া উপায় কি? ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর জননী করতে

হবে। ওর জীবনের সঙ্গে এই আশ্রমের ভবিষ্যৎ বেঁধে দিতে হবে।···

সেই ভাবেই জাল বিস্তার করলেন রামদাসানন্দ।

তপস্বী সাধকের যখন বিষয়বুদ্ধি জাগ্রত হয় তখন যে-কোন সাধারণ বিষয়ী সংসারী মানুষের চেয়ে ঢের বেশী উগ্র হয়ে ওঠে তা। ঠিক কাকে দিয়ে কোন্ কথা বলালে কাজ হবে, কার কাছে কী কথা বললে সে কথা যথাসময়ে কানে উঠবে ওর, কখন কোন্ 'পোজ্'-এ থাকলে বেশী অভিভূত হবে, কী কথাকে দেবপ্রেরিত বাণী বলে বোধ করবে—এসব বুদ্ধি-ব্যবস্থা যেন আপনা-আপনি মাথায় এসে যেতে লাগল।

টাকাটা অবশ্য কিস্তিতে নেবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। সবটাই যখন তাঁর কাছে আসবে একদিন জানা কথা—তখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই উচিত ছিল। শুধু শিবপ্রসন্নর জন্যই ওটা নিতে হ'ল। নিউ আলিপুরের অতটা জমি বহুদিন ধরে কেনা পড়ে রয়েছে—ওখানে উপযুক্ত আশ্রম ভবন গড়ে তুলতে বহু সময় ও বহু অর্থব্যয় হবে। অথচ এখন আর এইটুকু বাড়িতে ধরছে না। নতুন বাড়ি এখনই আরম্ভ ক'রে দেওয়া দরকার। আর তার জন্য দরকার বেশ খানিকটা টাকা। একবার আরম্ভ হয়ে গেলে অবশ্য চারিদিক থেকেই টাকা আসবে কিন্তু তার জন্যও আরম্ভটা ঘটা ক'রে হওয়া দরকার। সেই কারণেই এই যাচা টাকাটা ফেরত দেওয়া গেল না। কথাটা অবশ্য শিবপ্রসন্নই সুকৌশলে শুনিয়েছিল—এবং পীড়াপীড়িটা ও-পক্ষ থেকেই এসেছিল —তবু তাঁর একটু মন খুঁতখুঁত করেছিল এটা ঠিক।

তবে তার পরের সব ঘটনার দায়িত্ব ষোল আনা তাঁরই। একটু বেশী তাড়াতাড়ি করতে গেলেন। লোভ, দুর্বার লোভই কাল হ'ল। লোভ আর তার সঙ্গে অহঙ্কারও। আর কী তুচ্ছ না সে অহঙ্কার! বিদ্যা নয়, বুদ্ধি নয় —তপস্যা কি সাধনার তো নয়ই—শেষে কিনা রূপের অহঙ্কার পেয়ে বসল তাঁকে! তাঁর কেমন ক'রে যেন এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'ল যে রেখার এই উন্মত্ত ভক্তি আসলে তাঁর প্রতি দেহজ আকর্ষণই। সেই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। এই প্রথম। এতকাল যে সম্ভোগ-লালসাই বোধ ক'রে থাকুন, নারীদেহ সম্বন্ধে মোহ এর পূর্বে দেখা

দেয়নি। প্রথম বলেই—এতকাল পরে এত বয়সের মোহ বলেই—এমন প্রবল হয়ে উঠল। দীক্ষা গ্রহণের জন্য শিবপ্রসন্নর দল পীড়াপীড়ি করাতে যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল রেখার মনে—গুরুদেবের প্রসন্ন ঔদাসীন্যে ব্যাকুল নিষেধে তা কাটতে পারত—এমন কত কেটেওছে এর আগে, সেসব খুব ভাল ক'রেই জানেন রামদাসানন্দ—কিন্তু বোধ করি মতিচ্ছন্ন হয়েছিল বলেই সে-সব বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা কোন কাজে এল না। তিনি জোর ক'রে ওর পলায়নের পথ বন্ধ করতে গেলেন—এই সাধন কক্ষই অপবিত্র করলেন তিনি, সাধনার নামে সাধনাকে চরম অপমান করলেন। আর তাতে ফল যা হবার তাই হ'ল, এখান থেকে বেরিয়ে রেখা সোজা গেল তার য়্যাটর্নীর কাছে, সেখান থেকে থানায়। তবু তো সব কথা বলতে পারে নি সে আজও, কারও কাছেই। অমার্জনীয় অপরাধ তাঁর। পাপ। সে পাপের শাস্তি তাঁকে বহন করতেই হবে। এ লোকে না হয় লোকান্তরে, এ জন্মে না হয় জন্মান্তরে।

৬

কিন্তু তাতেই কি চৈতন্য হ'ল তাঁর—ভণ্ড সন্ন্যাসীর! প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু যখন দেখলেন যে, সংবাদপত্র মারফত এত কুপ্রচারেও ভক্ত বা শিষ্যের সংখ্যা কিছুমাত্র কমল না, কেউই বিশ্বাস করল না এ অভিযোগ—বরং রেখার এই আচরণের মূলে অপর কোন ঈর্ষাতুর তথাকথিত মহাপুরুষের গোপন হস্তই অনুমান করতে লাগল—তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। অন্যায়টা আর নিজের কাছেও অন্যায় বোধ হ'ল না তত, বরং ক্রমশ নিজের অমানুষী শক্তিতে নিজেরই কেমন আস্থা জন্মাতে লাগল। তারপর মামলার গতি যখন একটু একটু ক'রে তাঁর অনুকূলেই মোড় ফিরল তখন তো কথাই নেই— সাহস এবং ভরসা আরও বাড়ল। এই বিজয়গর্বটা যেন নেশার মতো পেয়ে বসল তাঁকে—উগ্র উত্তেজক সুরার মতো চুমুকে চুমুকে উপভোগ করতে লাগলেন তা। এই যে আজকের নগর পরিক্রমা, বিজয়োৎসব পালনের আয়োজন—এ পরিকল্পনাও তো মূলতঃ তাঁরই। নিজের ইচ্ছাটা অপরের মনে সঞ্চারিত করার দুর্লভ শিক্ষা যাঁর এমন নিপুণভাবে আয়ত্ত হয়েছে, তাঁর কাছে আর এ কাজ এমন কঠিন কি?...

তার পর এল গতকালকার দিনটি।

দিনটি না বলে অপরাহ্ণটি বলাই উচিত।

আশ্চর্য! বহু বৎসর আগে ঠিক এই তারিখে—এই সময়টিতেই দীক্ষা পেয়েছিলেন তিনি গুরুর কাছ থেকে।

এতকাল মনে ছিল না, কালই মনে পড়ল সে কথাটা!

যিনি সদ্‌গুরু, তিনি দীক্ষা দানের আগে যতই ইতস্তত করুন, একবার শিষ্যত্বে গ্রহণ করলে চিরকালের মতোই তার ভার গ্রহণ করেন—এ বহু পুরাণ-পুঁথিতেই পড়েছেন পাগল বাবা। জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক গুরুর সঙ্গে, শিষ্যর ইষ্টানিষ্টের সমস্ত দায়িত্বই নাকি তাঁর। এইবার নিজের জীবনে তার প্রমাণ পেলেন। দীর্ঘদিন কোন সম্পর্ক নেই, গুরুদেব জীবিত আছেন কিংবা দেহ রেখেছেন তাও জানেন না—সাধনমার্গ থেকেই তো কবে সরে এসেছেন বলতে গেলে—তবু এতদিন পরে তাঁর কৃপাতেই এই বহু বৎসরের মোহতন্দ্রা ভাঙল, চোখের ওপর থেকে অহঙ্কার ও আকাঙ্ক্ষার কালো পর্দাটা সরে গেল। আবার নতুন ক'রে দেখা দিল জীবনের শাশ্বত পথ, জীবনের উদ্দেশ্য। অন্তত উনি যাকে উদ্দেশ্য বলে বোধ করেন।

আশ্চর্যের কথা—ওঁর এই নবীন দীক্ষা, নতুন ক'রে পুরনো পথের ইঙ্গিত—এও এলো একটি মেয়ের মারফতই।

রেখার অভিজ্ঞতার পর এ আর একটা নতুন লালসা, নতুন লোভ জেগেছিল তাঁর মনে। মনের মধ্যের ক্ষুধার্ত বাঘটা জেগেছিল তার এতকালের রক্ত-পিপাসা নিয়ে। ন্যায়-অন্যায় বোধের সামান্যতম অস্বস্তিটাও কেটে গিয়েছিল এই দু-তিন মাসে।…এরই মধ্যে বিখ্যাত ব্যারিস্টার ললিত চৌধুরীর কন্‌ভেণ্টে পড়া কিশোরী মেয়েটি অকস্মাৎ তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। তার লেখাপড়া কিছু আর ভাল লাগে না, ঘরকন্না তো নয়ই—বিবাহের কথা শুনলে শিউরে ওঠে—সে চায় শুধু ওঁর কাছে ব্রহ্মচারিণী—পরে সন্ন্যাসিনী হ'তে। বড় ভক্তিমতী, বড় সরল মেয়েটি। গুরুদেবের প্রবল আপত্তি সে দূর করতে চায় (আপত্তি ওর বাবা-মায়ের মুখ চেয়ে—তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন গুরুদেব, দুদিনের পাগলামি দুদিনেই কেটে যাবে ;

যদিচ মনে মনে এমনি একটি ভক্তিমতী শিষ্যাই তো খুঁজছিলেন।) নিজের নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায়—তাঁর কাঠিন্য গলাতে চায় সেবা ও নম্রতার দ্বারা।

সে বাড়িতে যাওয়া ছেড়ে দিল, কারও বাধা শোনে না, দিনরাত আশ্রমে থাকে। আপত্তি করতে গেলে কাঁদে শুধু। তার এই ভক্তি, এই গুরুপদগত তন্ময়তা সেকালের ব্রহ্মবাদিনী তপস্বিনী আর্যনারীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ওর ডাকনাম লক্ষ্মী—ঠাকুমা না কে যেন রেখেছিলেন—সত্যিসত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপিণী মেয়ে।

লক্ষ্মী দেখতেও সুশ্রী, সাহেবদের মতো রঙ ও কটা চুল না হলে সুন্দরীই বলা চলত। লেখাপড়াতেও ভাল, সারা ভারতের মধ্যে বেশী নম্বর পেয়ে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করেছে—এদিকে এমন ভাবে না ঝুঁকলে এতদিনে বি. এ. পড়ার কথা।

আবারও ভুল বুঝলেন রামদাসানন্দ, আবারও ভুল করলেন। ঈশ্বরের প্রাপ্যকে নিজের প্রাপ্য মনে করলেন, অমর্ত্য প্রেমকে জৈবিক আসক্তি বলে মনে করলেন।

গত কালকেরই তো কথা। মনে হচ্ছে যেন এক যুগ হয়ে গেছে। দিবানিদ্রার পরে (উনি বলেন তপস্যার ক্লান্তি অপনোদন ; শিষ্যরা কেউ কেউ বলে এই সময়টা ওঁর আত্মা অমরলোকে বিহার করতে যায়—একটু যারা কম আধুনিক, তারা বলে এটুকু রিলাক্সেশ্যন ওঁর প্রয়োজন, নইলে শরীর টিকবে কেন ? আধুনিক উগ্র সাহেবদেরই যত উদ্ভট বিশ্বাস) ডাবের জল নিয়ে এ ঘরে এসেছিল লক্ষ্মী, ডাব খাওয়া হ'লে বসেছিল পা টিপতে। পা দুটি কোলের ওপর নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল পায়ে। তুলোর মতো নরম হাত, ঈষৎ স্বেদাক্ত—সিরসির ক'রে উঠেছিল গুরুদেবের সর্বাঙ্গ। নির্জন ঘর, কোলাহল ও কৌতূহলী দৃষ্টির বাইরে, পরিবেশ সব দিক দিয়েই অনুকূল। আরাম ও আলস্যের আমেজ তখনও কাটে নি, তন্দ্রার রঙ তখনও লেগে আছে চৈতন্য ও অনুভূতিতে। নূতনতর সম্ভোগ-বিলাসের জন্য মন উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সুতরাং লক্ষ্মীর এই শ্রদ্ধা-তদ্‌গত অর্ধ-নিমীলিত চোখের মুগ্ধ দৃষ্টিকে আত্মনিবেদনের প্রার্থনা বলে মনে করা বিচিত্রও নয় খুব···হয়ত সেই ভুলই করেছিলেন পাগল বাবা। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে চেয়ে ছিলেন

রামদাসানন্দ ভক্তিমতী সেবিকার দিকে, হঠাৎ মেয়েটির একটা হাত ধরে টেনে তাকে একেবারে নিজের বুকের ওপর নিয়ে এলেন ; তারপর এক হাতে তাকে বেষ্টন ক'রে আর এক হাতে তার আনম্র পবিত্র মুখখানি তুলে চুম্বন করতে গেলেন— । সে বাধা দিল না, চিৎকার করল না, নিজেকে ওঁর বাহুবন্ধন থেকে ছাড়াবারও চেষ্টা করল না, শুধু কেমন এক রকমের বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাল ওঁর দিকে, ওঁর চোখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কোন অভিযোগ ছিল না, ভর্ৎসনাও ছিল না—শুধুই বিস্ময়, সুগভীর বিস্ময়।·· বিস্ময় আর তার সঙ্গে এক ধরনের মূক, বোবা বেদনা। এর চেয়ে সরব তিরস্কারও বুঝি ছিল ভাল, আতপ্ত আলিঙ্গনে আর উত্তপ্ত চুম্বনে সে তিরস্কার নীরব করিয়ে দেওয়া চলত। এক নিষ্পাপ ভক্তি-শুদ্ধা কুমারী তার চোখের সামনে ইষ্টদেবতাকে পশুতে পরিণত হতে দেখছে, লক্ষ্মীর চাহনিতে সেই বিস্ময়-বিহ্বলতাই ফুটে উঠেছিল। সেই চাহনিটাই যেন চাবুকের মতো এসে বাজল তাঁকে। মনে তো বটেই, বোধ হ'ল যেন দেহেও অনুভব করলেন সে আঘাত।

ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একটা ধাক্কা খেলেন তিনি। প্রবলতর আঘাত। যেন চাবুকের মতো এসে মুখে ও বুকে বাজল। ঐ মেয়েটির ঈষৎ-পিঙ্গল আয়ত চোখের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ মনে পড়ল আর একটি চোখের কথা। এ দৃষ্টি, এ চোখ যেন বিশেষ পরিচিত ওঁর। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল সেই চোখ যাঁর—তাঁর মুখখানাও। গুরুদেব। সেই চোখ, সেই দৃষ্টি। সেই চোখই যেন নীরব বেদনায় চেয়ে আছে ওঁর দিকে, নিঃশব্দে ধিক্কৃত করছে। সঙ্গে সঙ্গে অদ্যাপি-অননুভূত একটা গ্লানি যেন উঠল তাঁর আকণ্ঠ ফেনিয়ে, মনে হ'ল শুধু গুরুদেবেরই নয়—সমগ্র সাধু-সমাজেরই ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে ঐ দুটি চোখে—পৃথিবীর সমস্ত অগ্রজ সর্বত্যাগী মহাপুরুষের দল নীরব বেদনায় চেয়ে আছে ওঁর দিকে।

কয়েক মুহূর্তের কথা। তিন কি চার মুহূর্ত, এর বেশী নয়। তার পর আর কিছু মনে নেই।

কিছুক্ষণের জন্য যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন উনি। একমুষ্টি ফুলের মতো সেই কোমল তনুলতা জ্বলন্ত অঙ্গারের মতোই অসহ্য বোধ হয়েছিল—টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন তাকে। ছুটে বাইরে এসে, কোনদিকে

কারও দিকে না তাকিয়ে একেবারে সোজা ছাদে চলে গিয়েছিলেন। ভাগ্যে ঠিক সেই সময়ই উত্তর-পশ্চিম আকাশ জুড়ে নিবিড় কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, ওঁর সেই অসহায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে উর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকাকে ভুল বোঝবার অবকাশ মিলল। এটাকে মেঘ দেখতে ছুটে আসা ভেবে ভক্তরা আশ্বস্ত হ'ল—রাধিকার মতো মেঘের মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার কথাও আলোচনা করল কেউ কেউ—উৎকণ্ঠা কি উদ্বেগের কোন কারণ আছে কিংবা অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে কোথাও বলে ভাবতে পারল না।

৭

তারপর, কালও সারারাত এমনি বিনিদ্র কেটেছিল। এমনি অস্থির হয়ে পায়চারি করেছিলেন এই গুহার মতো বুকচাপা ঘরে। ইচ্ছা করেছিল গুরুদেবের ছবির সামনে গিয়ে মাথা কোটেন, চোখের জলে কলুষ ধুয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। সাহসে কুলোয় নি ছবির দিকে তাকাতেই। সাহস হয় নি ঐ প্রসন্ন গম্ভীর চোখের ওপর চোখ রাখতে। সামান্য চোখের জলে এ কলুষ ধোওয়া সম্ভব নয়, এত বছর ধরে সঞ্চিত কলুষ, ও পাপ। শুধুই মাথা কুটেছেন তাই, ক্ষমা প্রার্থনা হয়ে ওঠে নি।

সারারাত ভেবে অবশেষে প্রায়শ্চিত্তের পথ দেখতে পেয়েছিলেন। কঠিন সে পথ—তবু সেই পথই অবলম্বন করেছিলেন। সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা ধুলোয় লুটিয়ে অকপটে দোষ স্বীকার করেছিলেন প্রকাশ্য ধর্মাধিকরণে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস—সে প্রায়শ্চিত্তটুকুও ভাগ্যে জুটল না ওঁর। কেউ বিশ্বাস করল না ওঁর কথা। এমন কি সবচেয়ে বেশী যে জানে এর সত্যতা—সেই রেখা মৌলিকও না। তার ঐ আকুল বুকফাটা কান্নাই তার প্রমাণ। সেও ভাবল যে দোষ তারই—ওঁর কিছুমাত্র নয়।

এদের এই মিথ্যা পূজা, এই প্রশস্তি, এই জয়ধ্বনির চেয়েও বেশী বেজেছে তাঁর ঐ কান্নাটাই। কিছুতে ভুলতে পারছেন না সেই চাপা ফোঁপানিটা। কী ভেবেছিল মেয়েটা কে জানে, কী ভাবল! একটা কথা বহু লোকের মুখে শুনতে শুনতে একরকম আত্মসম্মোহনের অবস্থা হয়—সে কথাটা রামদাসানন্দ ভালই জানেন, তাতে নিজের চোখে দেখা ও নিজের অনুভব করা সত্যও

অনেক সময় মিথ্যা হয়ে যায়—অপরের মুখে শোনা মিথ্যাটাকেই সত্য বলে মনে হয়। রেখারও কি তাই হয়েছিল? এদের মুখে—ওঁরই শেখানো সাক্ষীদের মুখে—শুনতে শুনতে এই সময় তার মনে মনে বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে আসলে উনি মহাপুরুষ, সে-ই ওকে চিনতে পারে নি, ভুল বুঝেছিল?

অথবা ভেবেছিল—এও মহাপুরুষের লীলা, কিংবা সত্যিসত্যিই সাধনার অঙ্গ। বিশাল সে রহস্য-সমুদ্রের কতটুকুই বা জানে সে, কতটুকুই বা শুনেছে। আর দুটো দিন অপেক্ষা করলে সে রহস্য-যবনিকা উন্মোচিত হয়ে যেত তার চোখের সামনে। যা সত্য, যা ভূমা, যা অমৃত—তাই লাভ হ'তে পারত তার। কিংবা এ কান্নার আরও অন্য অর্থ আছে; তাঁর বুকে সে কান্না বাজারও।

কে জানে হয়ত সত্যিই উনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন মেয়েটার দিকে, হয়ত মেয়েটাও। প্রাকৃতজনেরা যাকে বলে ভালবাসা—হয়ত বা তাই-ই জন্মেছিল উভয়ের মধ্যে। কিন্তু উনি দেখছেন এর মধ্যে তাঁর ভাগ্যের পরিহাসটাকেই বেশী ক'রে। অদৃষ্টের অকরুণ প্রবঞ্চনা। মিথ্যার এই জয়-জয়কার ওঁর কাছে গুরুদেবেরই প্রচণ্ডতম ধিক্কার বলে মনে হচ্ছে।

এত সহজে নয়, এত সহজে হবে না।

এও একরকম আত্মপ্রবঞ্চনা তাঁর। নিজেকে, সেই সঙ্গে গুরুকে ও ইষ্টকেও বোকা বানানোর চেষ্টা। সাধনার পথকেই ব্যঙ্গ করা। না, আর কোন পথ ধরতে হবে। ভেঙেচুরে সমভূম ক'রে ফেলতে হবে এই মিথ্যার প্রাসাদ।···

সারারাত ধরে এই কথাটাই ভাবলেন তিনি। বাকী অবশিষ্ট রাতটুকু কাটল তাঁর সেই গুহাকৃতি সীমাবদ্ধ চাপা ঘরে অধীরভাবে পায়চারি ক'রে। মাঝে মাঝে শারীরিক ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে পা, তখন এসে বসেন। আবার বেশীক্ষণ বসে থাকতেও পারেন না।

এমনি অস্থিরতার মধ্যেই—একরকম মরীয়া হয়ে এক সময় গিয়ে গুরু-দেবের ছবির সামনে বসে পড়লেন, 'দয়া করো, দয়া করো ঠাকুর, দয়া করো এবার!'

বুঝি ঐ নিশ্চল ছবিখানা শুধুই ছবি নয়। কারণ পথও দেখতে পেলেন

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মুক্তির পথ। এই গ্লানি, এই অনুশোচনা থেকে পরিত্রাণ পাবার পথ। আশ্চর্য—এইখানে, তিনি সঙ্গেই রয়েছেন ওঁর—এ জন্মের জন্মান্তরের সকল ভয়ের পরিত্রাতা, কখনও চেয়ে দেখারও সময় হয় নি এ ক'বছরে।...

পথ পেয়ে গেছেন, আর ভয় নেই। পরম আশ্বাসের একটি মধুর স্পর্শ যেন অনুভব করলেন বুকে। না, প্রায়শ্চিত্তের পথ নয়। আসলে ঐ কথাটা ভেবেই বৃথা অন্ধকারে ঘুরে মরছিলেন। পথ পেয়েছেন তিনি নতুন জীবনের; মুক্তির পথ। থাক পড়ে এ জীবন, আর তার সমস্ত গ্লানি ও অনুশোচনা। এ সব পড়ে থাক। এই ঐশ্বর্য আড়ম্বর আর এই মিথ্যার প্রাসাদ। আনন্দের পথে, আশ্বাসের পথে, নবজন্মের পথে তাঁর যাত্রা হোক শুরু।

গুরু ও ইষ্টকে আর একবার প্রণাম ক'রে উঠে দোর খুলে সাধন কক্ষের বাইরে এলেন রামদাসানন্দ। একবার মনে হ'ল এ গরদের বহির্বাসখানা ছাড়লে হ'ত—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল এও এক ধরনের মানসিক ভণ্ডামি। কিছুই আর যখন ভাববেন না বলে মনে করেছেন—তখন এই পোশাকের প্রশ্নেই বা প্রয়োজন কি।

উৎসব-ক্লান্ত শিষ্যপরিজনরা সকলেই ঘুমোচ্ছে তখনও। শেষ রাত্রির বাতাস বইছে, প্রত্যূষ আসন্ন, কটা বেজেছে তা আর দেখেন নি, আর কিছুই দেখবার দরকার নেই, কোন হিসেবই আর রাখবেন না। ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক এরা। তিনি নিঃশব্দে একটার পর একটা দোর খুললেন, শেষ পর্যন্ত সদর দরজাটাও খুলে রাস্তায় এসে পড়লেন একেবারে।

এতক্ষণ কোন বাধা পান নি, কিন্তু রাস্তায় এসে পড়তেই শুনলেন পিছনের ডাক, 'বাবা!'

চমকে উঠলেন রামদাসানন্দ। এ গলা তাঁর পরিচিত। বিশেষ পরিচিত। রেখা, চিত্ররেখা মৌলিক।

গুরু গুরু! গুরুদেব রক্ষা করো! এবার আর কোন কারণে গুরুর ঐ পা দুটিকে মন থেকে সরতে দেবেন না তিনি।

তবু তিনি দাঁড়ালেন। দাঁড়াতে হ'ল।

'কী বলছ মা?'

এই প্রথম কি ওকে মাতৃ-সম্বোধন করলেন তিনি? রেখাও কি এর আগে কোনদিন পিতৃসম্বোধন করেছে তাঁকে? কে জানে। কিন্তু ওসব কথা থাক। অতীতের কেন কথা ভাববেন না, কোন তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত কোন কথাই ভাববেন না তিনি আর।

'বাবা, আমার অপরাধের শেষ নেই। আমাকে আর একটিবার পায়ে স্থান দিন—প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিন। আর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন।'

রেখা সেই পথের ওপরেই তাঁর পা দুটি ধরে বসে পড়ল।

ব্যস্ত হলেন না রামদাসানন্দ। বিচলিতও হলেন না। শান্ত প্রসন্নকণ্ঠেই বললেন, 'তুমি তো কোন পাপ করো নি মা, পাপীকে প্রায়শ্চিত্তের পথ দেখিয়ে দিয়েছ বরং। সেদিক দিয়ে তুমি আমার নমস্যা। তবে সেটুকুও আমার ভাগ্যে হ'ল না। তুমি মা ওঠো, বাড়ি যাও। অন্তরে সত্য ব্যাকুলতা থাকলে যিনি তোমার সত্যকার গুরু তাঁরই দেখা পাবে, তিনিই তোমাকে সত্যমিথ্যা, পাপপুণ্য, অপরাধ আর প্রায়শ্চিত্ত সব বুঝিয়ে দেবেন, জীবনে যা সত্যকার পথ তাই দেবেন দেখিয়ে। আমিও আজ থেকে পথেই ভাসলুম মা, পথের সন্ধানে বেরোলুম। গুরুদেব কৃপা ক'রে এই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, আজ থেকে এই পথই আমার আশ্রয়, অবলম্বন। এই আমার প্রায়শ্চিত্তেরও পথ, সাধনারও। আশীর্বাদ করো এ পথ যেন একদিন সার্থক হয়, পথের শেষে যিনি আছেন তাঁকে যেন পাই। যাও মা, তুমি বাড়ি যাও।'

আস্তে আস্তে পা দুটো ছাড়িয়ে নিলেন রামদাসানন্দ, তারপর হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় পড়েও গতি কমল না তাঁর। বোধ করি প্রভাতের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগেই তিনি পরিচিতদের থেকে দূরে চলে যেতে চান।

গতিও কমালেন না, পিছন দিকেও তাকালেন না আর।

আর না। আর কোন দিন না তাকাতেও হয় পিছন দিকে।

তাঁর জীবন এখন থেকে শুধু সামনের দিকেই প্রসারিত হয় যেন।

সাধু দর্শন

কদিনে রাঁচি শহর চষে ফেলেছিলাম, দেখবার মতো যা কিছু প্রায় সবই দেখা হয়ে গিয়েছে সুতরাং ঐটুকু খুঁত রেখে গেলেও এমন কিছু ক্ষতি হ'ত না। অর্থাৎ এ নিয়ে মন খুঁতখুঁত করার কথা নয়।

মানে, জোনা ফল্‌স্‌টা দেখা হয় নি। এখন এটার নাম হয়েছে গৌতম ধারা, এবং শেঠ বিরলারা এক মন্দির ও ধর্মশালা বানিয়ে এক শিব মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন—ভগবান তথাগতেরও দু-একটি মূর্তি পথেঘাটে পড়ে আছে। একটা তীর্থের ছাপ দেওয়ার ষড়যন্ত্র আছে বোধ হয়। কিন্তু সাহেবী আমলে ওটা শুধু ছিল 'ফল্‌স্‌'—সোজাসুজি জলপ্রপাত।

যা বলছিলুম, হুড্রু হয়েছে, রাজরোপ্পায় ছিন্নমস্তা দেখা হয়েছে—জোনা না দেখলে কোন ক্ষতি-বোধই করতুম না। কিন্তু দৈবের যোগাযোগ, হঠাৎ কাকাবাবুর বন্ধু স্থানীয় পুলিস সাহেব গাড়িখানা দিতে চাইলেন এবং আমরা যাঁদের বাড়ি অতিথি হয়েছিলাম, সেই রমানাথবাবুর ছেলে নন্দ এসে খবর দিলে, 'শুনছি জোনাতে এক বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ এসেছেন।'

ব্যস্‌। আর যায় কোথায়। মন স্থির ক'রে ফেললাম। মহাপুরুষ দেখবার শখ ছেলেবেলা থেকেই। সে জন্যে হরিদ্বারে ছুটে গেছি ভোলা-গিরিকে দর্শন করব ব'লে, বৃন্দাবন গেছি কেশবানন্দের খোঁজে, পুরীতে পাগল হরনাথ থেকে শুরু ক'রে লোকনাথের ন্যাংটা বাবা—বাদ দিইনি কাউকেই। কী পেয়েছি না পেয়েছি, তা জানি না, তবে দেখবার শখটা আজও যায় নি।

মা আপত্তি তুললেন, 'হ্যাঁরে, আজই যাওয়া—কখন ফিরবি, কখন গোছ-গাছ করবি—'

'গাড়িতে যাচ্ছি, বারোটার মধ্যেই ফিরব। আর যাওয়া তো সেই সন্ধ্যের সময়, দুটো বিছানা, পাঁচটা বাক্স গুছিয়ে নিতে কতক্ষণ লাগবে? সে তুমি ভেবো না মা।'

মেয়েদের বাদ দিয়ে যাওয়া হ'ল। সবসুদ্ধ আমরা জনা পাঁচেক পুরুষ মানুষই রওনা হলুম। বন্ধু ইন্দু সঙ্গে খাবার নিলেন একরাশ। ভাগ্যে মস্ত

এবং ভাইপো রমু আছে, কাকাবাবু তো আছেনই। এঁদের সব কজনেরই রাঁচিতে এসে পর্যন্ত মুহুর্মুহু ক্ষিদে পাচ্ছে।

নতুন দামী গাড়ি এক ঘণ্টার আগেই জোনাতে পৌঁছে গেল। আমিই আগে আগে উৎসাহ সহকারে নেমে গেলাম। কিন্তু কোথায় সাধু আর কোথায় কে! কাকস্য পরিবেদনা। নতুন গরম পড়েছে বলে ভ্রমণার্থীর সংখ্যাও কম—একটা যাত্রী পর্যন্ত কোথাও দেখা গেল না। যারা জঙ্গলে কাঠের সন্ধানে আসে তারাও এখনো কেউ এদিকে দেখা দেয় নি। নির্জন থমথম করছে সমস্ত উপত্যকাটা।

কাকাবাবু খুব ঠাট্টা করলেন, 'কই হে, তোমার সাধু বাবা কই? এ যে সব ফাঁকা!'

'তাইতো দেখছি।'

দমে গেলাম খুবই। নন্দটার দেখছি আগাগোড়াই 'গুল্'-এর ব্যাপার। বাড়ি ফিরে ছোকরাকে এক হাত নিতে হবে—এমন কটু কথা বলব যে ওর গুলন্দাজী বেরিয়ে যাবে—

খুব ছুটোছুটি ক'রে খানিকটা স্নান করা গেল। তারপর পাথরে বসে ইন্দুবাবুর রুটি, মার্মালেড, খেজুর, বিস্কুট এবং ডিমসিদ্ধর সদ্ব্যবহার ক'রে কতকটা যেন মনের ক্ষোভ মিটল।

আহারাদির পর কাকাবাবু পাথরের ওপরই এলিয়ে পড়লেন, ইন্দুও তাই—for a cool and refreshing smoke—এটুকু নাকি চাই। ভাইপো ও ভাগ্নে ততক্ষণে পাথর বেয়ে ওপরে উঠেছে, একমাত্র আমিই বেকার। ধূম-পানের মর্ম বুঝি নে, খাড়া পাথর বেয়ে ওঠবার সাহস নেই। অগত্যা ঘুরতে ঘুরতে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে জলধারা ধরেই এগিয়ে চললাম।

যাঁরা জোনা বা গৌতমধারা গেছেন তাঁরাই জানেন যে জলটা যেখানে পড়ে সেখানে অনেকটা সমান—উপত্যকার মতো, তারপর খানিকটা গিয়েই—ছোট ছোট স্তরে নীচে নেমেছে জলটা। পাঁচ-ছ ফুট ক'রে নীচে পড়েছে আবার খানিকটা ক'রে সমান, এমনি ক'রে ওধারে একটা বড় জঙ্গলের বেড়ে ঘা খেয়ে বেঁকে আবার এমনি ভাবে নামতে নামতে গেছে। অবশ্য এত বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে চার দিকে (Boulder) যে, এই ক্রমিক অধঃ-

পতনটা খুব চট্ ক'রে নজরে পড়ে না।

আমি এই সব পাথরে পা দিয়ে দিয়েই ঘুরেফিরে অন্যমনস্ক ভাবে এগোচ্ছি হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়ল। জলটা এক জায়গায় এসে একটা বিস্তৃত বাঁকা পাথরের গা বেয়ে নিচে পড়ছে। সেখানে জল-রেখা—বোধ হয় আশি নব্বই ফিট চওড়া হবে—অন্তত বর্ষার সময় তাই হয়—কিন্তু পড়ছে একদিকে বোধহয় সাত-আট ফুট নিচে, অপর দিকে মাত্র ফুট-তিনেক। সেই যেদিকে ফুট-তিনেক নীচু সেই দিকেই, পাহাড়ের খাঁজে, জলের ধারায় গা ডুবিয়ে, যেন সম্পূর্ণরূপে পৃথিবী থেকে আত্মগোপন ক'রে বসে আছে প্রায়-উলঙ্গ একটি মানুষ।

অবশ্য মানুষ তাকে বললাম সৌজন্যের খাতিরে। কিম্ভুতকিমাকার জীব বলাই উচিত ছিল। মিশকালো রঙ্, বোধহয় এদিককার আদিবাসীই হবে, একমাথা টোকা চুল, তার কতকগুলো ধুলোয় এবং তৈলহীনতায় জট পাকিয়েছে, কতকগুলি এখনও পাকায় নি। গোঁফ-দাড়ি আছে, খোঁচা খোঁচা—মানে অবসর পেলে মধ্যে মধ্যে কামানো হয়। সামান্য একটি ন্যাকড়া কৌপীনের মতো জড়ানো, দ্বিতীয় কোন আচ্ছাদন নেই। পাথরে ঠেস দিয়ে পাহাড়ের কোণে যতটা সম্ভব গা মিশিয়ে বেশ নিস্পৃহ নিশ্চিন্ত ভাবে বসে আছে, ওর মাথাটা শুধু বাদ, বাকী সর্বাঙ্গ বেয়েই ওপরের জল গড়িয়ে পড়ছে—জল আর তার সঙ্গে শ্যাওলা জড়িয়ে গেছে। কিন্তু সেদিকে তার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই, একটা কি কুটো চিবুতে চিবুতে দূরে আকাশের কোলে যেখানে পাহাড়ের বৃক্ষলতাচ্ছাদিত শ্যামল রেখাটা গিয়ে মিশেছে সেই দিকে চেয়ে আছে।

প্রথমটা ভেবেছিলাম পাগল। এখানকারই কোন আদিবাসী গ্রামের লোক—মাথা খারাপ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কখন এখানে এসে বসেছে বাড়ির লোক হয়ত খবরই পায় নি।

তারপরই একটা সন্দেহ হ'ল—সেই সাধু বাবা নয়ত?

বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ? ··· ··· ··· ? ধ্যুস্!

চলে যাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু একটু একটু ক'রে সন্দেহটাই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। হ'তেও তো পারে। হয়তো এরই নামটা অমনিভাবে

রটেছে—তিলকে তাল করাই এদেশের লোকের স্বভাব।

আরও কয়েকটা পাথর ডিঙিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এইবার লোকটা দিক্‌চক্ররেখা থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলে।

'এই, কেয়া দেখতা হ্যায়?' ব'লে উঠল লোকটা। কিন্তু কণ্ঠস্বরে না উষ্মা, না বিরক্তি, না অনুরাগ—কিছুই প্রকাশ পেল না। লোকটার সমস্ত ভঙ্গীর মতোই কণ্ঠস্বরও নিরাসক্ত, নিস্পৃহ।

কিন্তু ঠিক পাগলের মতোও তো মনে হয় না।

এবার হাত তুলে একটা নমস্কার করলাম, বললাম, 'আপকো দর্শনকে লিয়ে আয়া হ্যায়!'

'দর্শন? তো দেখ্ লেও ফির্।'

তারপরই বোধ হয় মুহূর্ত-খানেক পরই অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল, 'আব্ দর্শন তো হো গিয়া—ভাগো না!'

'বাবা,' হাত জোড় ক'রে বললাম, 'জেরা ঈশ্বরকো বিভূতি—'

অকস্মাৎ হা-হা-হা-হা ক'রে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে হেসে উঠল লোকটা। চমকে উঠলাম সে হাসির শব্দে, সভয়ে—কারণ নির্জন নিস্তব্ধ গিরি উপত্যকায় সে হাসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বিকৃত বীভৎস একটা শব্দের সৃষ্টি করল।

পাগলই বটে। তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

লোকটা এবার কথা কইলে, 'ঈশ্বরকে বিভূতি? তো ই সব কেয়া হ্যায়? আঁখ নেহি হায় তেরা?'

আঙুল দিয়ে চারিদিকের পাহাড় বন প্রান্তর জলপ্রপাত দেখিয়ে দিলে।

আলো-ঝলমল নির্মেঘ নির্মল আকাশের কোলে শ্যামল মেঘের মতো পাহাড়গুলি আঁকা! গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, লতায় লতায় কী অপূর্ব শোভা। কত নাম-না-জানা পাখী ডাকছে মিষ্ট মধুর স্বরে—তার সঙ্গে চেনা ডাকও আসছে কোকিল পাপিয়ার। মুক্তাধারার মতো জল ঝরে পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে—'যেন রঘুপতি হৃদে হীরকের হার'—সেই জল পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে বিচিত্র শব্দ এবং স্রোতের সৃষ্টি ক'রে দূরে কোন সবুজ ঢেউখেলানো শস্যক্ষেত্র এবং অরণ্যের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। লোকটার অঙ্গুলি নির্দেশের

সঙ্গে সঙ্গে নিজের দৃষ্টিও একবার সবগুলোর ওপর ঘুরে এল।

কথাটা ঠিকই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এই অসীম এবং অপূর্ব প্রকাশই যে ঈশ্বরের বিভূতি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ তাঁরই এক বিচিত্র রূপ, কিন্তু ঠিক এ কথা তো আমি বোঝাতে চাই নি। সব গোলমাল ক'রে দিলে লোকটা।

থতমত খেয়ে বললাম, 'নেহি, নেহি, সো বিভূতি নেহি—'

'তব্? তব্ কেয়া?'

'আচ্ছা, উসব ছোড় দিজিয়ে। আপকো যোগ বিভূতি জেরা দেখ্লাইয়ে না—'

'মেরা যোগ বিভূতি? উস্‌মে তুম্‌হারা কেয়া কাম, আউর হামারা কেয়া ফায়দা, বাৎলাও তো!'

'মৈনে শুনা হ্যয় আপ বাক্‌সিদ্ধ যোগী হ্যয়।'

'যো শুনা হ্যয় সো শুনা হ্যয়। হামারা কেয়া? যাও, ভাগো!'

এই ব'লে লোকটা হঠাৎ থু থু ক'রে থুথু দিতে লাগল।

না, বদ্ধ পাগল। নয়তো মহা খলিফা। এই সাধু সাজাটাই হ'ল পাগলামির ভান। আর এইতে অমনি সবাই ভুলে গেছে—

উঠে দাঁড়ালাম। যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েও আবার কি মনে হ'ল, প্রশ্ন করলাম, 'দীক্ষা দেগা বাবা?'

'দীক্‌ষা? দীক্‌ষা কেয়া হোগা? ঈশ্বর খাড়া হ্যয় তুমহারা সামনামে, উন্‌কো দেখো, সাম্‌ঝো—দীক্‌ষা লেনেসে ফয়দা কেয়া? যাও, হট্ যাও, ঝুটে আদ্‌মী, দিক্ মৎ করো—'

থু-থু ক'রে লোকটা থুথু দিতে লাগল আবার।

তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে। কাকাবাবুকে সব কথা বলতে তিনি বললেন, 'তুমিও যেমন! সাধু সাধু ক'রে তুমিই ক্ষেপে উঠলে দেখছি। ...একটা পাগল—মুণ্ডা কি হো—তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ!'

একটা ধোঁকা তবু ছিল মনের মধ্যে, 'লোকটা হিন্দী বললে যে! আদিবাসী হ'লে তো হিন্দী বলবে না।'

'শিখেছে। হিন্দুস্থানীর অভাব আছে এ দেশে?'

কাকাবাবু উড়িয়েই দিলেন কথাটা।

এর কয়েক মাস পরে শুনলাম নরেশবাবুদের সেই অতি বিখ্যাত গুরু এসেছেন কলকাতাতে।

নরেশবাবু এ গুরুর গল্প বহুবার করেছেন। তাঁর নাকি আশ্চর্য সব ক্ষমতা, তিনি নাকি ত্রিকালজ্ঞ। এখনই এঁর তিন লাখের ওপর শিষ্য হয়ে গেছে। দ্বারভাঙার উত্তরে হিমালয়ের কোলে জয়নগরে নাকি আশ্রম করেছেন। বিরাট আশ্রম, নানা দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সঙ্গে চতুষ্পাঠি, বেদ বিদ্যালয় সব স্থাপনা করা হয়েছে। বিরাট ব্যাপার। উনি আজকাল বড়-একটা কলকাতা আসতে চান না। সেখানেই থাকেন। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমেই এবার এখানে এসেছেন।

শুনেই কৌতূহল হ'ল যাবার।

'কোথায় আছেন ভাই?'

নরেশবাবু যা নাম করলেন তাতে তো চক্ষুস্থির। ভবানীপুরের এক প্রচণ্ড বড়লোকের বাড়ি—তিন-পুরুষ সবাই বিলাত-ফেরত এবং ধনী।

'সেখানে কি আমরা ঢুকতে পারব?'

'বিলক্ষণ। অবারিত দ্বার। কত ভক্ত শিষ্য যাচ্ছে প্রত্যহ তার ইয়ত্তা আছে?···কী করা যাবে বলো ভাই, বড়লোক না হ'লে ওঁর ঝক্কিই বা কে সামলাবে বলো? ওঁর সঙ্গেই আসে একশো লোক, যেখানেই যান না কেন। তা ছাড়া কলকাতায়, শুধু কলকাতাই বা কেন, যেখানেই যাবেন অমনি রথ-দোলের ভীড় তো লেগেই আছে। ওঁর ভক্ত কোথায়ই বা কম?'

গেলাম সন্ধ্যাবেলা নরেশবাবুর সঙ্গেই। প্রকাণ্ড বাড়ি, দোতালার ওপর তার সর্ববৃহৎ হলঘরে—গুরুদেব বসে আছেন। পুরু গদীর ওপর গেরুয়া রঙের শাল দিয়ে তাঁর আসন ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সেই আসনে গেরুয়া সিল্কের বহির্বাস পরে বসে আছেন এক দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ব্যক্তি। মাথায় জটা নেই, তার বদলে পিঠ পর্যন্ত এলিয়ে পড়েছে, কাঁচা-পাকা চুল। গোঁফ-দাড়িও আছে, তবে খুব প্রচুর নয়। মোটের ওপর দেখলেই ভক্তি আসে।

ঘরের মেঝেতে ঢালা কার্পেট পাতা, তাতে অসংখ্য ভক্ত বসে আছেন, বোধ হয় ওঁর মুখের বাণী শোনবার জন্য। সকলেই উৎসুক, হাত জোড় ক'রে সশ্রদ্ধ ভাবে চেয়ে বসে আছেন। গুরুদেব জন-দুই অসংখ্য-আংটি এবং দামী শাল-পরা সম্ভ্রান্ত ভক্তের সঙ্গে তখন কথা কইছিলেন, আমি গিয়ে প্রণাম ক'রে বসতে শুধু একবার হাসি-হাসি মুখে চাইলেন কিন্তু তখন আর কথার সুযোগ হ'ল না।

অনেকক্ষণ পরে সেই দুটি ভক্ত বিদায় নিতেই সুযোগ বুঝে নরেশবাবু আমার পরিচয় ক'রে দিলেন, 'ইনি একজন অধ্যাপক, এই বয়সেই বেশ নাম ক'রে ফেলেছেন। এঁর দাদা একজন ডি-এ-জি, এঁর পরের যিনি সম্প্রতি আই-সি-এস হয়ে এসেছেন। বেশ শিক্ষিত এঁরা সকলেই। আপনার নাম শুনে দর্শন করতে এসেছেন।'

'তাই নাকি! বেশ বেশ। তা অতদূরে কেন। এস এস, কাছে এস।'

কাছে গিয়ে আর একদফা প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বড় আনন্দ হ'ল বাবা তোমাকে দেখে, এই বয়সে যে মনে ভগবদ্-জিজ্ঞাসা জেগেছে এ বড় কম কথা নয়। না না, বিনয় ক'রে লাভ নেই। তুমি আমাকে দেখতে এসেছ, আমি কে? আসলে তোমার মনে তৃষ্ণা জেগেছে তাঁর জন্যই—তাই একটা উপলক্ষ্য ধরবার চেষ্টা করছ, যাতে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারো। এই তো!...তা বাবা সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বুড়ো বয়সে মন্ত্র-তন্ত্র নিয়ে পরলোকের একটা পাকা বন্দোবস্ত করতে ঝুঁকে পড়ি এই দিকে কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, বুড়োবয়সের জিনিস এ নয়। যৌবনের উদ্যম উৎসাহ বীর্য চাই, নইলে এ পথেও সুবিধা হয় না। ঈশ্বরকে পাবার সাধনা দুর্বলের জন্য নয়, আসক্ত বদ্ধ জীবের জন্যও নয়। তোমরা ইচ্ছা করলে সব কিছু ত্যাগ করতে পারো এক মুহূর্তে, সব রকম দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে পারো অনায়াসে —বুড়োরা পারে?'

অভিভূত হয়ে শুনছিলাম। বাস্তবিক, মহাপুরুষ বলতে হয় তো এঁরাই। কত কি নতুন কথা শোনালেন, কত কি নতুন ধরনের চিন্তা। জিনিসটা নিয়ে সত্যিই ভেবেছেন। অনেক রাত্রে যখন নরেশবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম

তখন গুরুদেব নিজে হাতে কিছু প্রসাদ দিলেন, উৎকৃষ্ট সন্দেশ কয়েকটি। আবার যেতে বললেন। আমার সঙ্গে কথা কয়ে নাকি তাঁরও তৃপ্তি হয়েছে।

আসবার সময়ে পাশের ঘরে দেখলাম তাঁর শয্যা প্রস্তুত হয়েছে। গেরুয়া রঙের বিছানা, লেপের ওয়াড় নেটের মশারী, সব গেরুয়া রঙের—বৈরাগ্যের রঙ সর্বত্র।

বাড়ি ফিরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই কথাই মনে হতে লাগল, এত দিনে একটা সাধু দেখলাম বটে!

ঘুমোবার আগে স্থির করলাম পরের দিনই আবার যাবো। যে কদিন থাকেন ওঁর দুর্লভ সঙ্গসুখ ছাড়া হবে না।

নিরুত্তর

পথেঘাটে দুর্ঘটনা ঘটাটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। নিত্যই ঘটছে। নিত্যই বহু লোক মরছে—স্ত্রী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে। কিন্তু সেদিন পালপাড়ার মোড়ে যে ব্যাপারটা ঘটে গেল—সেটা একটু বিচিত্র বৈ-কি!

দিনে-দুপুরে—পথে তেমন ভীড়ও ছিল না তখন—হঠাৎ মালবোঝাই ভারি লরীখানা বেঁকে ফুটপাথের ওপর উঠে গিয়ে একটা বাড়ির গায়ে ধাক্কা মারল। গাড়ির বিশেষ কিছু হ'ল না, মালপত্র যেমন ছিল তেমনি রইল—লোকসানের ভেতর কর্পোরেশনের একটা ল্যাম্প-পোস্ট একটু বেঁকে গেল, আর গেলেন ১৩।১।এফ নম্বর বাড়ির শ্রীবিলাসবাবু। হাসপাতালে নিয়ে যেতেও তর সইল না, য়্যাম্বুলেন্স এসে পৌছবার আগেই তিনি ইহজীবনের মতো চোখ বুজলেন।

ইঞ্জিন খারাপ ছিল? কই না, পুলিস উপযুক্ত লোক দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করিয়েছে; কোথাও কোন গোলমাল ধরা পড়ে নি।

ড্রাইভার মদ খেয়েছিল? তাও তো নয়। কারণ, যে উন্মত্ত জনতা চারি দিক থেকে হঠাৎ গজিয়ে উঠে তাকে ধরে সহজভাবে শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গী ক'রে দিতে চেয়েছিল, তারাও ও অপবাদ কেউ দিতে পারে নি। সবাই স্বীকার করেছে, আর যাই হোক, মদের গন্ধ কেউ পায় নি তার মুখে। সে লোকটি নিজেও বার বার কসম খেয়ে বলেছে যে, সেদিন সে তখনও পর্যন্ত দারু ছোঁয়

নি। তাছাড়া কাজ-কাম সেরে রাতেই তারা এক-আধটু ফুর্তি করে—তাও কোন কোন দিন। সেটা তখনও ফুর্তি করার সময় নয়।

তবে?

এ তবের উত্তর ড্রাইভার রামলগনও ভাল ক'রে দিতে পারে নি। সে বার-বার ঐ একই কথা বলেছে—'কী ক'রে যে কি হল বাবুসাব্, তা বলতে পারব না। আমি বেশ সুস্থই ছিলাম, পথে কেউ ছিলও না তেমন যে তাকে বাঁচাতে যাবো, যেভাবে স্টিয়ারিং ঘোরাবার কথা সেভাবেই ঘুরিয়েছি—কী করে যে হঠাৎ অমনভাবে গাড়ি বেঁকে ফুটপাথে উঠে গেল তা আমি বলতে পারব না। যেন মনে হ'ল বাবুসাব্, কে টেনে নিয়ে গাড়িখানাকে আছাড় মারলে দেওয়ালে!'

সুতরাং কোন মীমাংসাই হ'ল না এ রহস্যের। সরকারী তদন্ত হ'ল, খবরের কাগজে লেখালেখি হ'ল, য়্যাসেমব্লীতে প্রশ্ন উঠল, বিরোধীদলের নেতারা গরম গরম বক্তৃতা করলেন, বে সরকারী তদন্ত দাবী করা হ'ল—মুলতুবী প্রস্তাব উঠল—তারপর আবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শুধু শ্রীবিলাসবাবুর ক্ষুদ্র সংসারে এই সত্যটা বহুকাল ধরে ঘুরে-ফিরে নানা কাজে নানা ভাবে নিত্য-স্মরণীয় হ'য়ে রইল যে,—শ্রীবিলাসবাবু নেই এবং তাঁর সঙ্কল্পিত ইন্‌সিওরেন্সের প্রথম প্রিমিয়ামটাও দিয়ে যেতে পারেন নি। এক কথায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের অকূলে ভাসিয়ে চলে গেছেন।

কিন্তু এই ঘটনায় দুর্ঘটনার কারণ ছাড়াও আর একটি রহস্য অমীমাংসিত রয়ে গেল। সে কথাটা—যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন নিয়মিত, তাঁদের চোখে পড়েছে নিশ্চয়ই—হয়ত অতটা লক্ষ্য করেন নি। ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন শ্রীবিলাসবাবু তাঁর বাড়ি থেকে এক বোঝা বই নিয়ে কোথায় বেরোচ্ছিলেন। বইগুলি একটা ছেঁড়া-গামছায় পুঁটুলি বাঁধা ছিল, তবে সেটা কিছু রহস্য নয়—রহস্য যা তা হচ্ছে এই—বইগুলি সবই পরলোক তথা জন্মান্তর সম্পর্কিত। 'পরলোকের কথা' 'মৃত্যুর পরপারে' 'জন্মান্তর রহস্য' 'আঁধারের পারে'—এমনি সব নানা নামের এবং নানা আকারের। বইগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় এক,—মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কি নেই। ঐ বইগুলি অমন পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে শ্রীবিলাসবাবু কোথায় যাচ্ছিলেন? আর সেদিন অফিস খোলা, ছুটির

বারও নয়—অফিসে না গিয়ে তিনি বাড়িতেই বা করছিলেন কি?

এ-সব প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল চিরকালের মতো। এ-সব নিয়ে অবশ্য জনসাধারণ বা জননেতারা—কেউ মাথা ঘামান নি। শুধু বিশেষ দু-একজন একটু কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন মাত্র।

আসল রহস্যটারও কোন মীমাংসা হ'ল না।

কেন এ ঘটনা ঘটল? শ্রীবিলাসবাবু কেন মারা গেলেন?

এ রহস্যের কিছু সদুত্তর বোধ হয় দিতে পারতেন—একজন লোক। তিনি হলেন শ্রীবিলাসের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং চিরদিনের তর্ক-সহচর—হরিকেশববাবু। মজার কথা এই, তদন্তের সময় তাঁকে কোনপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা কারও মাথাতে যায় নি।

হরিকেশব কলেজ-জীবনে শ্রীবিলাসের সহপাঠী ছিলেন। তারপর প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায়—সহকর্মীও হতে পেরেছিলেন। সুতরাং গত দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে তাঁরা দিন-রাতের অনেকখানি সময়ই একসঙ্গে কাটিয়েছেন (ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে নাকি শ্রীবিলাস মারা গেছেন) আর এই সময়েরও বেশীর ভাগ তাঁদের কেটেছে তর্ক করে। শ্রীবিলাস আর হরিকেশব দুজনেই তর্ক করতে ভালবাসতেন এবং সে তর্ককে আর যা-ই হোক অবসর-বিনোদনের খেয়াল মনে করার কারণ নেই। কারণ যদিচ তর্কটা তাঁদের প্রাত্যহিক এবং প্রায় প্রতি-মুহূর্তিক ছিল, তবু তাঁরা বেশ আন্তরিকভাবেই তর্ক করতেন। তর্ক করতে করতে প্রায়ই দুজনের চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠত, দুই কশের প্রান্তে থুথু জমত, কপালের ও গলার শিরাগুলো উঠত ফুলে। তবু তাঁরা তর্ক থামাতেন না। সকাল থেকে চ'লে অফিস যাওয়ার সময়ে সেটা মুলতুবী থাকত—আবার অফিস থেকে ফেরার পর শুরু হয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত গড়াত। উভয়েরই সংসার এবং নিত্যকার জীবনের বাকী কাজগুলো কিভাবে চলত, সেটা পরিচিত সকলকার কাছেই বিস্ময় এবং আলোচনার বস্তু হয়ে ছিল।

প্রথম যৌবনে তর্কের বিষয়বস্তুটা অবশ্যই রাজনীতি ছিল। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ক্রমান্বয়ে সাহিত্য, দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব ঘুরে পরলোকতত্ত্বে এসে পৌচেছিল। গত দু বছর ধরে ওঁরা বলতে গেলে আর কিছুই আলোচনা

করেন নি—অথবা আর কোন কথা নিয়ে তর্ক করেন নি।

দেহত্যাগেই কি সব শেষ?

না মরবার পরেও কোন জীবনের অস্তিত্ব আছে?

হরিকেশব বলতেন, 'ফুঃ!…জীবনটা কি? সমুদ্রে ঢেউ ওঠে আবার সমুদ্রে মিলিয়ে যায়—সাগরকে লহরী সমানা।…পঞ্চভূতের সমুদ্রে আমরা বুদ্‌বুদ মাত্র—হঠাৎ উঠেছি হঠাৎই মিলিয়ে যাবো। পরলোক আবার কি? এই বিশ্বে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নক্ষত্র আছে, এই পৃথিবীর মতো কত কোটি গ্রহ তাদের কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে। সেই সব গ্রহে এমনি কত জীব আছে—তাদের জন্যে যদি মরবার পরেও আবার একটা বাসার ব্যবস্থা করতে হয়, তাহ'লে তো ভগবান নাচার!'

শ্রীবিলাস উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। ইদানীং তিনি ইংরেজী, বাংলা বিস্তর বই কিনেছিলেন পরলোক সম্বন্ধে। সে-সব বইয়ে দেহাতীত জীবনের নানা চমকপ্রদ বিবরণ এবং প্রমাণ আছে—বই খুলে খুলে সেই সব অংশ পড়ে শোনাতেন ভদ্রলোক আর প্রশ্ন করতেন—'এসব কি মিথ্যে তাহ'লে? এত-গুলো লোক মিছে কথা কইছে?'

হরিকেশব বলতেন. 'অত শত আমি বুঝি না। নিজে চোখে না দেখলে—নিদেনপক্ষে অনুভব না করলে আমি বিশ্বাস করব না। একটি হেল্‌দি হোলসাম প্রত্যক্ষ ভূত বার কর—বহুৎ আচ্ছা, আমি বিশ্বাস করতে রাজী আছি। শুধু বাত-এ ভুলছি না!'

কোনদিনই এসব আলোচনার কোন মীমাংসা হ'ত না।

অবশেষে একদিন শ্রীবিলাস বলে বসলেন, 'তাঁর একটি পরিচিত ভদ্রলোক ভাল প্ল্যানচেট নামান—তাঁর বাড়ি যাওয়া যাক।'

হরিকেশবও রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, 'চলো, তোমার বুজরুকি ভেঙে দিয়ে আসি।'

দিনক্ষণ দেখে সন্ধ্যার সময় একদিন গেলেন দুজন। সে ভদ্রলোক একটা খালি ঘরে ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে মৃদু নীল আলো জ্বেলে প্ল্যানচেটের টেবিল পেতে বসলেন। ভদ্রলোক হরিকেশববাবুকে বললেন, 'মৃত কোন আত্মীয়কে চিন্তা করুন আপনি। তিনিই আসবেন।'

হরিকেশব শ্রীবিলাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার বাবার কথাই ভাবি। তুমিও তো তাঁকে দেখেছিলে বহুবার। তুমিও ভাবো। তা হ'লেই ব্যাপারটা সহজ হবে।'

তিনজনে স্থির হয়ে বসলেন। একটু পরেই টেবিলে প্রাণলক্ষণ দেখা দিল। সে ভদ্রলোক ফিস-ফিস ক'রে বললেন, 'এসেছেন, এসেছেন আপনার বাবা। প্রশ্ন করুন।'

হরিকেশবও একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন বৈকি। দু-একটা প্রশ্ন করলেন। কাগজের ওপর তার যথাযথ উত্তরও ফুটে উঠল।

যথা—হরিকেশবের স্ত্রীর নাম, বোনের নাম, ছেলেদের নাম।

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন, শ্রীবিলাসেরই হাতটা সম্পূর্ণ প্ল্যানচেটের ওপর আছে। নড়ছে হয়ত আপনিই, কিন্তু তবু—!

তিনি ফস ক'রে বলে বসলেন, 'আমার প্রপিতামহের নামটা লিখুন তো বাবা?'

তিন-চারটি নাম লেখা হ'ল। কোনটাই মিলল না।

হরিকেশব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বোগাস্! অল্ বোগাস্! আমি ও বেশ বুঝে নিয়েছি। ও তোমাদের এক রকমের সেলফ্-হিপ্নটিজম্।'

স্বপ্ন ভেঙে গেল। শ্রীবিলাস যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। গৃহস্বামী বিরক্ত হয়ে উঠে আলো জ্বেলে চায়ের ফরমাস করলেন।

অর্থাৎ আবারও তুমুল তর্ক বেধে ওঠবার ভূমিকা রচিত হ'ল।

শ্রীবিলাস বললেন, 'তোমার বাবার যে তাঁর ঠাকুর্দার নাম জানা ছিল তার প্রমাণ কি?'

'বাবা আমাকে ছেলেবেলাতে দশ পুরুষের নাম মুখস্থ করাতেন। সেকেলে লোক, ঠাকুর্দার নাম ভুলে যাবেন সেটা সম্ভব নয়। বিশেষ পরলোকে গিয়ে তো সর্বজ্ঞ হবার কথা!...এই তো তোমরাই বলেছ যে, মাননীয় ভূতেরা এসে কত কি সব অজানা খবর দিয়ে গেছেন!'

যাঁর বাড়ি তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'তাঁর সান্নিধ্য পেয়েও আপনি সন্দেহ করছেন, এতেই তিনি বোধ হয় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। ইরিটেটেড হ'লে কন্‌ফিউশ্যান্ আসাই স্বাভাবিক।'

'আজ্ঞে সে তো দেহীদের পক্ষে। বিদেহীরাও যদি সামান্য বিরক্তিতে বাপ-ঠাকুর্দার নাম ভুলে বসেন, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, তাঁদের অবস্থা আমাদের চেয়েও খারাপ।···চলো হে শ্রীবিলাস, ওঠো।'

শ্রীবিলাস কথা কইলেন না। এমন কি যখন চা-টা এল তখনও কতকটা অন্যমনস্কভাবেই চা খেলেন বসে বসে—যদিচ তাঁর চা-প্রীতি অসাধারণ—শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফেরার পথেও হরিকেশববাবুর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইলেন না। সেটা তাঁর পরাজয়ের লজ্জা মনে ক'রে হরিকেশব মনে মনে খুব হেসে নিলেন।

এর পর থেকেই শ্রীবিলাসবাবুর কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। জীবনের যেটা ছিল প্রধান অবলম্বন—তর্ক, সেটাতেও যেন আর রুচি রইল না তেমন। দিন-রাতই গুম্ খেয়ে বসে থাকেন, কেউ কথা কইলে সংক্ষেপে 'হাঁ' 'না' উত্তর দেন। কোন প্রলোভনেই আর তর্কে নামতে চান না—এ-বিষয়ে হরিকেশবের সহস্র কলাকৌশল ব্যর্থ হয়।

তবে তিনি কি করেন?

অফিসের সময়টুকু ছাড়া, বাকী সমস্ত সময়টাই পুঁথিতে ডুবে থাকেন। হরিকেশববাবু নিয়মিত আসেন কিন্তু তাঁর দিকে একটা বই কি কোন সাময়িক পত্র এগিয়ে দিয়েই শ্রীবিলাসবাবু আবার বালিশের ওপর উপুড় হয়ে পড়েন; সামনে বই খোলাই আছে—তাইতেই ডুবে যান মুহূর্তের মধ্যে।

আসলে শ্রীবিলাসবাবুর আত্মাভিমানে প্রচণ্ড একটা ঘা লেগেছে। এতকালের কোন পরাজয় তাঁকে কোনদিন এত বিচলিত করে নি—সেদিনের ঐ ক্ষুদ্র ঘটনাটি যতটা করেছে। এটা যেন তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয় এবং অপমান। তাহ'লে তিনি এতদিন পড়াশুনো ক'রে যা বুঝেছেন তা কি সবই ভুল? তিনি কি এতটুকু লেখাপড়া শেখেন নি—তাঁর কি এতটুকু সহজবুদ্ধি নেই যে, তিনি এর ফাঁকিটা ধরতে পারেন?

না। তাঁর কোথাও কোন ভুল হয় নি। হরিকেশবটাই নির্বোধ। হামবাগ। কিন্তু সেটাও যে প্রমাণ-সাপেক্ষ। হরিকেশবকে প্রমাণ ক'রে দিতে হবে যে, সে নির্বোধ এবং হামবাগ। তাকে দিয়ে স্বীকার করাতে হবে যে, পরলোক আছে—আত্মা আছে—এই দেহটা ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সবকিছু ফুরিয়ে যায় না।

অথচ সেটার উপায় কি ?

প্রাণপণে সব বইগুলো পড়েন আবার। নিজের বিশ্বাসে না কোথাও ফাঁক থাকে! যতই পড়েন ততই মনে হয় যে, না—তাঁর কোথাও বোঝবার কোন ভুল হয় নি। ঐ হরিকেশবটাই—

পড়েন—এবং তাঁর জানা যতগুলো উপায় আছে পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার, সবগুলোই প্রয়োগ করেন। তারপর পরিচিত অপরিচিত যে-কোন আত্মারই নাগাল পান না কেন—কাকুতি-মিনতি করেন, 'যেমন ক'রেই হোক ঐ হরিকেশবটাকে বুঝিয়ে দিন, আপনাদের অস্তিত্ব যেন কোনমতেই ও আর অস্বীকার করতে না পারে। এমন শিক্ষা দিন যাতে এই হামবাগিজ্‌ম্‌-এর জন্যে রীতিমতো অনুতাপ হয় ওর—আর কখনও ওর এত আস্পদ্দা না হয়—'

কিন্তু কোন আত্মাই যে এ অনুরোধে কর্ণপাত করেন বলে মনে হয় না। দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে যায়। হরিকেশবের সবিদ্রূপ দৃষ্টি ওঁকে প্রতিনিয়তই বেঁধে; তাঁর প্রসন্ন হাসিকেও ওঁর করুণা ব'লে, তাচ্ছিল্য ব'লে বোধ হয়।

অবশেষে শ্রীবিলাস যেন আর স্থির থাকতে পারলেন না। বন্ধুর বাড়ি প্ল্যানচেটে নিজের বাবার আত্মাকে নামিয়ে (অন্তত শ্রীবিলাসের বিশ্বাস সেই স্বর্গত আত্মা পুত্রের আবদারে নিরানব্বুইয়ের পাঁচের তিন নম্বর দীনদয়াল বসু মজুমদার স্ট্রীটের আলোবাতাসহীন কক্ষে সত্যিই এসেছিলেন সেদিন) চরমপত্র বা আলটিমেটাম দিয়ে দিলেন যে, আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে যদি হরিকেশবটা রীতিমতো জবাব না পায়, তার ধৃষ্টতার, তার ঔদ্ধত্যের ও তার নির্বুদ্ধিতার—তাহ'লে তিনিও আর পরলোকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না। তিনিও ধরে নেবেন যে, এতদিন ধরে তিনি আত্মপ্রবঞ্চনাই করেছিলেন—আসলে পরলোক, ভূত, আত্মা কিছুই নেই !···

এর পরও তিনটি দিন নির্বিবাদে কেটে গেল। হরিকেশবের মুখের সকৌতুক ও সহজ হাসি এতটুকুও ম্লান হ'ল না। উল্লেখযোগ্য এমন কোন ঘটনাই ঘটল না যে, এ বিষয়ে টেনেটুনেও কিছু প্রমাণ করা যায়। এতবড় একটা 'চ্যালেঞ্জ' যে তাঁকে উপলক্ষ ক'রে দেওয়া হয়েছে, তা হরিকেশব সন্দেহ মাত্র করলেন না।

এধারে এই তিনটি দিন এবং তিনটি রাত্রি শ্রীবিলাসের যেভাবে কাটল তা অবর্ণনীয়। আশা ও আশঙ্কা—বিশ্বাস ও সংশয়ের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত দোলা খেয়েছে তাঁর মন। আশাটা শুধু নিজের পরাজয়েরই নয়—তা বললে শ্রীবিলাসের বন্ধুপ্রীতির ওপর একটু অবিচারই করা হবে—হরিকেশবের সম্বন্ধেও কিছু ভয় ছিল বৈকি। যদি ওর কোন বিপদাপদ ঘটে। আত্মারা যে কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন তার তো ঠিক নেই। নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে বন্ধুর কোন অনিষ্টের কারণ হবেন না তো।

কিন্তু আশা বা আশঙ্কা কোনটাই সফল হ'ল না। অবশেষে তৃতীয় রাত্রিটি বলতে গেলে কণ্টক শয্যায় জেগে কাটিয়ে ভোরবেলাই হরিকেশবের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন এবং ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে শ্রীবিলাস বললেন, 'ভাই কেশব, তোমার কাছে একটা মাপ চাইবার আছে আমার। আফ্‌টার অল্‌ তুমিই ঠিক বুঝেছিলে, আমিই বেকুব মূর্খ—হামবাগ!'

হরিকেশব তো অবাক। আগের দুটো দিন মেয়ের অসুখে ব্যস্ত ছিলেন বলে শ্রীবিলাসের বাড়ি যেতে পারেন নি—আজ ওর দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। তিনদিনে মানুষের এমনি চেহারা হয়? চোখের কোণে কালি, চোয়ালগুলো বসে গেছে, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। এ কী কাণ্ড!

সব শুনে তিনি ব্যাকুলভাবে শ্রীবিলাসের হাত দুটো ধরে বললেন, 'সত্যি বলছি ভাই, তুমি এমন সিরিয়াসলি কথাটাকে নিয়েছ জানলে ভদ্রলোক আত্মা তো দূরের কথা, ভূত-পেত্নী, শাঁকচুন্নি সব মেনে নিশ্চিন্ত হতাম! ইস্‌—কী ক'রে ফেলেছ দ্যাখো তো চেহারাখানা!'

'ভয় নেই। আজই শেষ। আজই ওসব পাট চুকিয়ে দেবো। আজ সন্ধ্যায় অফিসের ফেরত নিজে হাতে ঐ সব বোগাস বইগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো।' ম্লান হাসলেন শ্রীবিলাসবাবু।

হরিকেশব হেসে বললেন, 'আচ্ছা পাগল বটে। বরং আমাকে দিও এবার আমিই না হয় পাগল বনব।'

'না না। ওসব আর কারুরই পড়ে দরকার নেই।' শ্রীবিলাস উঠে দাঁড়ান।

'বসো বসো। চা খাও। এরি মধ্যে কি!'

হরিকেশব জোর করে টেনে বসান তাঁকে।

নিজে মুখে সন্ধ্যায় যাবেন বললেও শ্রীবিলাস সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের মূলে ঘা লেগেছে। সেই সঙ্গে আত্মসম্মানেও। জীবনে এতবড় পরাজয় কখনও ঘটে নি তাঁর। সমস্ত তার্কিক সত্ত্বা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ভাগ্যের এই আঘাতের বিরুদ্ধে।

স্নান ক'রে খেতে বসেই মনে মনে স্থির করলেন আজ আর অফিস যাবেন না। দুপুরে যখন পথে-ঘাটে কোন লোক থাকবে না,—তখনি তিনি চুপিচুপি ও পাপ চুকিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

কিন্তু এ সঙ্কল্পের কথাটা কাউকেই বলেন নি। স্ত্রীকেও না। অফিসের নাম ক'রে বেরিয়ে সারা দুপুরটা লালদীঘিতে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম? না, ঘুম ছিল না তাঁর চোখে। ঘাসের ওপর বসে এক মনে ভেবেছেন, আর কেমন একটা রুদ্ধ আক্রোশে ছটফট করেছেন।

তারপর বেলা একটা নাগাদ ফিরে এসেছিলেন আবার। তখন কেউ ছিল না। ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে, স্ত্রী ঘুমুচ্ছেন বাচ্ছা মেয়েটাকে নিয়ে। ঝি এসে দোর খুলে দিয়েছিল, কিন্তু তারও চোখে ঘুমের ঘোর—অসময়ে আসার কারণটা সেও জিজ্ঞাসা করে নি।

বাইরের ঘরে ঢুকে আলমারী খুলে সব বইগুলো বার ক'রে নিয়ে পুঁটুলি বেঁধেছিলেন শ্রীবিলাসবাবু। তারপর কাউকে না জাগিয়ে নিঃশব্দে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন।...

তার পরের কথা আর তিনি জানেন না।

মৃত্যুর পরে যদি সত্যিই কোন জীবন থাকে তো সেখানে গিয়ে হয়ত জানতে পেরেছেন—কি ক'রে কেমনভাবে লরীটা বেঁকে এসে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দেওয়ালে আছড়ে পিষে ফেলেছিল!

হরিকেশববাবুকে করোনারে ডাকা হয় নি। পুলিস তাঁকে কোন প্রশ্ন করে নি। এই পরের ব্যাপারটার মধ্যেই তিনি আসেন নি।

কিন্তু তাঁর মুখের সেই সকৌতুক হাসি ও প্রসন্ন দৃষ্টি—যেটা দূর ক'রে দেবার জন্য, মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে দেবার জন্য এত আকুতি ছিল শ্রীবিলাসের—শ্রীবিলাস জীবিত থাকলে দেখে সুখী হতেন যে, সে হাসি এবং

দৃষ্টি—সংবাদটা পাবার পর থেকে একেবারেই চলে গিয়েছিল তাঁর। কর্মে রুচি, তর্কে উৎসাহ এবং রাত্রের নিদ্রা কিছুই তাঁর ছিল না।

তবে কি, তবে কি শ্রীবিলাস মরেই জিতে গেলেন ?

তবে কি তাঁর চ্যালেঞ্জই জয়ী হ'ল শেষ পর্যন্ত ? শ্রীবিলাসের কথাই কি ঠিক ?

কিন্তু শ্রীবিলাস মারা গেলেন কেন ? হরিকেশব তো মরতে পারতেন। অবশ্য তাতে হরিকেশব তাঁর পরাজয়টা উপলব্ধি করবার সুযোগ পেতেন না—এটাও ঠিক।

কিন্তু তিনদিন তো পেরিয়ে গিয়েছিল। আল্‌টিমেটামের তিনদিন।

আসলে এটা হয়ত কাকতালীয়বৎ। ইংরাজীতে যাকে বলে কোইন-সিডেন্স—আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র···

শ্রীবিলাসের স্ত্রীর কাছ থেকে বিক্রী ক'রে দেবার নাম ক'রে বইগুলো নিয়ে এসে নিজেই দাম বুঝিয়ে দিলেন হরিকেশব। বলতে গেলে পুরো দামই দিলেন। শ্রীবিলাসের স্ত্রী অত হিসেব রাখতেন না, তিনি আশাতিরিক্ত দাম পেয়ে খুবই কৃতজ্ঞ হলেন।

তারপর হরিকেশবও সেই বইগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। দিন রাতের সমস্ত অবশিষ্ট অবসর কাটতে লাগল তাঁর বুকে বালিশ দিয়ে ঐ সব বই পড়ে।

তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন। ঐ সর্বনেশে সাংঘাতিক বই-গুলোকে পুড়িয়ে ফেলবেন তিনি—এমন ভয়ও দেখান। ঐ বইগুলো হাতে ক'রে বেরিয়েই তো অতবড় সর্বনাশটা হল। আবার কি নিজেরও একটা সর্বনাশ না বাধিয়ে ছাড়বেন না হরিকেশববাবু।

প্রায় হাতে পায়ে ধরে অনুনয় ক'রে স্ত্রীকে নিরস্ত করেন। কয়েকটা দিন, আর কয়েকটা দিন সময় চেয়ে নেন—

নির্জন জায়গায় অন্ধকারে স্থির হয়ে বসে মনে মনে ভাববার চেষ্টা করেন পরলোকগত বন্ধুকে। অস্ফুট কণ্ঠে অনুরোধ জানান, 'যদি সত্যিই তোমার আত্মা থাকে শ্রীবিলাস, আমাকে দেখা দাও। অন্ততঃ জানিয়ে দাও যে তুমি আছ। একটা কোন প্রমাণ দাও। দোহাই তোমার।'

কিন্তু দিন সপ্তাহ মাস চলে যায়। কোন প্রমাণই কোথাও থেকে আসে না। শুধু হৃষিকেশববাবু দিন রাত বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, প্রত্যয় ও সংশয়ের মধ্যে দোলা খেতে থাকেন। কিছুই জানা যায় না, মন স্থির করতে পারেন এমন কোন ঘটনা ঘটে না।

শুধু হৃষিকেশব দিন দিন শীর্ণ হতে থাকেন। তাঁর সারা জীবনটা বিষাক্ত হয়ে যায়।

অকস্মাৎ

প্রকাণ্ড উঠান মধ্যে, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া সারবন্দী ঘর, কতকটা ব্যারাকের মতো। ঘরের সম্মুখে হাতচারেক চওড়া বারান্দা, তাহারই খানিকটা করিয়া ঘেরা, ভাড়াটাদের রান্নার জন্য। ঘরের জানালাগুলি বড়, হাওয়া বাতাস যত দূর সম্ভব আসিতে পারে। ঘরের মধ্যে অসংখ্য তাক-কুলুঙ্গি আছে এবং সর্বাপেক্ষা বড় কথা, ভাড়া কম। এই সব লোভনীয় সুবিধার জন্যই বাড়ির তেরো ঘর ভাড়াটে নাকি নড়িতে চায় না, বাড়ি সব সময়ই ভর্তি থাকে!

বাড়ির ভাড়াটেগুলিও মন্দ নয়। একটু যা গোলমাল যদু ভট্টাচার্যের বিধবাকে লইয়া, তাঁহার ভীষণ শুচিবায়ুর জন্য; তিনি কলে গেলে আর নড়িতে চান না। কিন্তু সময়-অসময়ে বাকী বারো ঘরের ভাড়াটাদের ঐ একটি মাত্র মানুষের কাছে টাকার জন্য হাত পাতিতে হয় বলিয়া সকলকেই সে অসুবিধাটা মানিয়া লইতে হয়। কেবল মানিকবাবুই মাঝে মাঝে গোলমাল করেন, তাঁহার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, জলের খরচটা তাঁহারই বেশী কিন্তু কল তিনি প্রায়ই পান না। মাঝে মাঝে ক্ষেপিয়া গিয়া ঘরের মধ্য হইতে বলেন, 'ভাড়া আমরা সকলে সমান দিচ্ছি, অথচ একজনের জন্যে সকলের অসুবিধে সহ্য করব কেন? ওঁর যতটুকু ন্যায্য পাওনা, ততটুকুর বেশী জল ওঁকে কি জন্যে দেব?'

ভট্চায গিন্নীও সমান তালে জবাব দেন, 'আ মর্—আমায় ন্যায্য পাওনা দেখাতে এসেছে! ঘোষালদের এই ব্যারাকে কত ভাড়াটে এল, কত ভাড়াটে গেল কিন্তু অমুক ভট্চাযের পরিবার ঠিক আছে। আজ ওর চোখ-রাঙানির

ভয়ে কল ছেড়ে দিতে হবে নাকি? না পোষায় দু'হাত অন্তরে যা-না!'

কিন্তু বিবাদটা বেশী দূর যায় না, কারণ মানিকবাবুর মনে পড়ে ছেলে-মেয়েদের অসুখের সময় ভট্‌চায গিন্নী ছাড়া উপায় থাকে না।

এহেন ব্যারাকে একদিন একখানি ঘর খালি হইল। প্রভাস রক্ষিত আর তাহার স্ত্রী যে কোণের ঘরটিতে থাকিত একদিন দেখা গেল তাহারই বাহিরের দিকের জানালায় 'টু-লেট' টাঙানো রহিয়াছে। প্রভাস রেলে কাজ করিত, সহসা রঙ্গপুরে বদলি হওয়াতেই এই বিপত্তি।

ঘটনাটি লইয়া জল্পনা-কল্পনার সীমা রহিল না, নূতন ভাড়াটে কেমন হইবে তাহারই আলোচনায় অন্য ভাড়াটেরা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বেশীদিন তাহাদের দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে হইল না, ঘর খালি হইবার তৃতীয় দিনের দিন সকালেই একটা রিকশায় একটা বিছানা আর একটা ভাঙা সুটকেস চাপাইয়া যতীন আসিয়া হাজির হইল। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, বয়স বোধ করি সাতাশ-আটাশের বেশী হইবে না। কিন্তু মুখে, বহুকালের রাত্রি-জাগরণ কিংবা অন্য কোন অত্যাচারের ফলে, যেন এই বয়সেই বার্ধক্যের ছায়া পড়িয়াছে।

সে তারিণী ঘোষালের সহিত ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কহিল, 'বাঃ, এ বেশ ঘর! এতেই আমার দিব্যি চলে যাবে। তা ভাড়া কত?'

তারিণী ঘোষাল রিকশার মালপত্রের কথাটা ভাবিতেছিলেন, একটু অন্য-মনস্কভাবেই কহিলেন, 'ছ'টাকা।'

যতীন প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল, 'ছ'টাকা! বলেন কি? চার টাকা। টিনের চাল গরম কালে তেতে আগুন হবে, তাতে কখনও ছ'টাকা দেওয়া যায়!'

তারিণী অপ্রসন্ন মুখে কহিল, 'না মশাই, পারব না, আমরা দর করি না।'

সে বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় তার ডান কনুইটা ধরিয়া এক টান মারিয়া যতীন ঘরের দিকে ফিরাইয়া লইল, 'আহা-হা, দাদা, অত তাড়াতাড়ি চটেন কেন!'

তাহার পর পকেট হইতে একটা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তারিণীর হাতের মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, 'এই নিন, হ'ল তো? মিছিমিছি ঝগড়া ক'রে ভাড়াটে খোয়াচ্ছিলেন আর কি!'

বিস্মিত ঘোষাল কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না, তাহার পর ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'এসব আপনি কি বলছেন? ছ'টাকাই রেট আমাদের, তার কম নিতে পারব না।'

যতীন অদ্ভুত একটা হাত-মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিল, 'কেন মশাই, ব্রাহ্মণকে সকাল বেলা নিরাশ করবেন! ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-সন্তান এসে পড়েছি, তাড়িয়ে দেওয়াটা কি ভাল হবে? কি হবে একটি টাকাতে আপনাদের? নিন নিন, রসিদ লিখে দিন—'

তারিণী কহিল, 'ঘর কখন দখল করবেন তাহ'লে?'

যতীন কহিল, 'বিলক্ষণ, করব কি, করেছি! ঐ তো মাল আমার রিকশাতে।'

তারিণী আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তার মানে? মেয়েছেলেরা কই?'

যতীন কহিল, 'নেই। বেশ আছি দাদা, একলা মানুষ, ওসব ঝঞ্চাটে কি যেতে আছে?'

তারিণী নোটটা বাড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'আপনার টাকা ফিরিয়ে নিন। আপনাকে ভাড়া দিতে পারব না।'

যতীন বিস্মিত হইয়া কহিল, 'তার মানে?'

তারিণী মুখখানা বোদা করিয়া কহিল, 'আমার সমস্ত গেরস্ত ভাড়াটে, তার মধ্যে আপনি একলা পুরুষ, কি করে আপনাকে ভাড়া দিই?

ইতিমধ্যে যতীন একটা সিগারেট ধরাইয়াছিল, সেটা ঘরের মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'ওঃ এই কথা? আচ্ছা, সে জন্যে কিছু ভাববেন না, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি!

বলিয়াই সে ঘোষালের উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তাহাকে এক রকম ঠেলিয়া উঠানে নামিয়া আসিল, তাহার পরই চীৎকার শুরু করিয়া দিল, 'কৈ গো, আমার মায়েরা সব কোথায়?'

ঠিক সেই সময় ভট্টাচার্য-গৃহিণী কলে আসিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্রই যতীন ঢিপ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, 'এই যে আমার যশোদা মা, মা চিনতে পারছ না আমাকে?'

ভট্টাচার্য-গৃহিণী অবাক হইয়া বলিলেন, 'না তো বাবা, কে তুমি?'

যতীন অকস্মাৎ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, 'আমি যে তোমার নীলমণি ছেলে। সে জন্মে ফেলে চলে গিয়েছিলুম, তাই এ জন্মে আমিও পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, তোমার দেখা পাই নি, এতকাল পরে খুঁজে পেলুম।'

কে জানে কেন, অকস্মাৎ ভট্টাচার্য-গৃহিণীর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। কহিলেন, 'তা তুমি কোথায় থাক বাবা?'

যতীন হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'আজ থেকে এইখানেই থাকব মা, ঐ ঘরটা ভাড়া নিলুম।...বাড়িওয়ালা আবার বলে কি জান মা, বলে তোমার সঙ্গে মেয়েছেলে নেই, তোমায় ঘর ভাড়া দেব না। আমি বললুম, নাই বা থাকল মেয়েছেলে, আমার মা-ই তো রয়েছে এই বাড়িতে, মায়ে পোয়ে থাকব, কে কি বলবে আমাদের?'

জাহ্নবী দেবী হাত পা নাড়িয়া কহিলেন, 'ও তারিণীর অমনি ভীমরতিই ধরে মধ্যে মধ্যে! ও মড়া এখনও মানুষ চিনলে না? এমন সোনার চাঁদ ছেলে, এ যদি ভাড়া থাকে তো তোমার ভাগ্যি। তা কি জাত বাবা তুমি?'

যতীন ফস করিয়া পাঞ্জাবির নিচে হইতে পৈতাটা বাহির করিয়া কহিল, 'বামুন মা, আমার নাম যতীন মুখুজ্জে।'

আরও খুশী হইয়া জাহ্নবী কহিলেন, 'আহা বেশ, বেশ, একঘর ব্রাহ্মণ তবু বাড়ল, ভালই হ'ল। ভেবে মরছিলুম তাই, যে প্রভাসরা এতদিনের লোক, বেশ পোটসোট হয়ে গিয়েছিল, আবার কে আসবে, কি রকম লোক, বনবে কিনা কে জানে। কি করো বাবা তুমি?'

যতীন কহিল, 'ছাপাখানায় কাজ করি মা। সারা রাত চাকরি করি, সারা দিন ঘুমুই, কোন ঝঞ্ঝাট নেই—'

সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং রিক্শা হইতে মালপত্র তুলিয়া আনিয়া ভাড়ার জন্য রিক্শাওলার সহিত বকাবকি শুরু করিয়া দিল।

বিহ্বল তারিণী তখন উঠানে নামিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'তুমি তো ফস ক'রে ওকে আশ্রয় দিলে মাসী কিন্তু ওর ধরনধারণ আমার ভাল লাগছে না। শেষকালে কি স্বদেশী হ্যাঙ্গামে জড়িয়ে পড়ব!...চেনা নেই, শুনো নেই —আর একেবারে মালপত্র নিয়েই বা আসে কেন?'

জাহ্নবী হাত পায়ের বিচিত্র ভঙ্গী সহ ফিস ফিস করিয়া কহিলেন, 'যে যেমন লোকই হোক তারিণী, জান্থ বামনীর কাছে পার পাওয়া শক্ত! তিনটি দিনে ওর নাড়ী-নক্ষত্তর সব জেনে নেব, ও পালাবে কোথায়! তেমন বুঝি তো পুলিসে খবর দিলেই হবে।'

বিরস মুখে তারিণী কহিল, 'তাই যা হয় করো মাসী!'

অর্থাৎ যতীন থাকিয়া গেল। সে প্রত্যহ রাত্রি নটা নাগাদ বাহির হইয়া যায় এবং ভোর পাঁচটা নাগাদ বাড়ি ফেরে। আসিয়াই স্নান সারিয়া লয়, স্টোভ জ্বালিয়া চা তৈরী করে, তারপর দোরে খিল দিয়া বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমায়। দশটার সময় উঠিয়া পাশের গলির বিশ্বম্ভর ঠাকুরের হোটেলে ভাত খাইতে যায়, আবার তিনটা পর্যন্ত ঘুম।

তাহার পরই শুরু হয় তাহার জটলা। ইতিমধ্যেই বাড়িসুদ্ধ ভাড়াটের সহিত সে বেশ জমাইয়া লইয়াছে। জাহ্নবীর সহিত সে বৃন্দাবনের, মথুরার, কুরুক্ষেত্রের গল্প করে, মুকুন্দবাবুর সহিত অফিসের সুখ-দুঃখের গল্প হয়, ললিত-বাবুর সহিত শেয়ার কেনা-বেচার কথা আলোচনা হয়। মহেশ থিয়েটারে কাজ করে—সুতরাং তাহার সহিত চলে ফিসফিস করিয়া মেয়েদের গল্প। ছেলে-মেয়েদের সহিতও তাহার খুব ভাব, পকেট সর্বদাই লজেঞ্চুসে বোঝাই থাকে বলিয়া সকলেই তাহার অনুরক্ত। সুতরাং তারিণীর সংশয় একরকম চাপা পড়িয়া গেছে, যতীনের পরিচয় বা ইতিহাস লইয়া কেহ মাথা ঘামায় না।

তাহা ছাড়া সান্ত্বনা দিতে তাহার তুলনা নাই। মুকুন্দবাবুর মেয়ের বিবাহ হয় না, তাঁহাকে সে বলে, 'ভয় নেই দাদা, সামনের আষাঢ়েই যদি আপনার মেয়ের বিয়ে না হয় তো কি বলেছি! দেখে নেবেন আমার কথা!'

ললিতবাবুকে বলে, 'সাউথ কারাণপুরা' এখন খুব কম যাচ্ছে বটে কিন্তু চড়বেই হবে ওকে! ঠিক সময়টিতে আমি খবর দেব—শ'তিনেক শেয়ারে ন'শো টাকা গুণে নেবেন এক হপ্তার মধ্যে!'

মানিকবাবুকে বলে, 'এবারের রেঞ্জার্সটা আর কিনবেন না, ভাইসরয় কাপে আপনার নাম উঠবে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি!'

সন্ধ্যাবেলায় জাহ্নবীর ঘরের সামনের রকে আলতো বসিয়া সান্ত্বনা দেয়,

'কি হবে মা আপনার তীর্থ করে? শুধু শুধু পয়সা খরচ বই তো নয়! এখানে থেকে এতগুলো লোকের উপকার করছেন এতে কি পুণ্যি কম হচ্ছে?'

ঘাড় নাড়িয়া জাহ্নবী বলেন, 'তাইতো! বল্ বাবা!...পোড়ারমুখো মান্‌কে আবার বলে, টাকা ধার দিয়ে সুদ নেন ওতে আবার পুণ্যি কি? পরকালে গিয়ে নাকি আমার পেট থেকে ছুরি কাঁচি বেরোবে।'

যতীন ভ্যাঙাইয়া বলে, 'ছুরি কাঁচি বেরোবে! সে বেরোবে ঐ মান্‌কের পেট থেকে।...সুদ নিয়েই কটা লোক ধার দেয় একবার গ্যাখ্ না! বলে আমাদের অফিসে টাকায় দু-আনা সুদে টাকা ধার দেয় দারোয়ানগুলো, তাই বাবুরা তাদের কত হাতে-পায়ে ধরে।'

জাহ্নবীর চোখ দুইটি বড় বড় হইয়া উঠে, 'টাকায় দু-আনা সুদ? বলিস কি বাবা!'

'তাই পায় না!' যতীন জবাব দেয়।

দুই-তিন দিন পরে জাহ্নবী যতীনকে ডাকিয়া বলেন, 'হ্যাঁ বাবা, তা ঐ যে সব চড়া সুদে টাকা ধার নেয়, ওতে টাকা মারা যায় না তো?'

যতীন বলে, 'দেখে শুনে দিতে হয়! যাকে তাকে দিলেই কি হ'ল? আপনি যদি টাকা খাটাতে চান তো বিশ্বাসী লোক দেখে দিতে পারি, মাসটি কাবার হ'লেই আসল আর সুদ পৌঁছে দিয়ে যাবে।'

জাহ্নবী চুপ করিয়া থাকেন, দো-টানায় পড়িয়া জবাব দিতে পারেন না। কিন্তু দিন-তিনেক পরে যতীন যখন আসিয়া পাঁচটি টাকা চায়, তখন ধীরে ধীরে বাহির করিয়া দেন। যতীন বলিয়া যায়, 'কিচ্ছু ভাবনা নেই মা, এই তো সাত দিন পরেই মাস কাবার—পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা আমি নিজে আদায় করে দেব।...ছ' পয়সার বেশী কিছুতেই দিতে চাইলে না—'

সেবারে যতীন ঠিক নির্দিষ্টদিনে টাকা ও সুদ পৌঁছাইয়া দিল। তারপর আবার তিন টাকা, দু টাকা করিয়া তিন-চারজনকে টাকা ধার দিল, সে সুদও জাহ্নবী যথাসময়ে পাইলেন। ফলে জাহ্নবীর লোভ বাড়িয়া উঠিল, তিনি যতীনকে বলিলেন, 'আর আমি এ বাড়ির কাউকে টাকা ধার দিচ্ছি না বাবা, দু-পয়সা করে সুদ দেবে, তার আবার কত লম্বা-চওড়া কথা! এবার যা দেব সব তোর হাত দিয়ে—'

গঙ্গা স্নান করিতে গেলে জাহ্নবীর আজকাল আর যতীনের জন্য চন্দ্রপুলি কিনিয়া আনিতে ভুল হয় না। যতীন চন্দ্রপুলি ভালবাসে।...

মুকুন্দবাবু একদিন সন্ধ্যাবেলায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া আসিয়া যতীনের হাত ধরিলেন, বলিলেন, 'যা বলেছিলে ঠিক-ঠিক তো ফলল ভাই, কিন্তু এখন শেষ-রক্ষে করি কি ক'রে।'

যতীন ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'কি ব্যাপার কি? হয়েছে কি আপনার?'

মুকুন্দবাবু বলিলেন, 'পাত্র তো পাওয়া গেছে, মনের মতো পাত্র—ছুটো পাস, সরকারী অফিসে কাজ করে, দেখতেও কার্তিকটি! কিন্তু হাজার টাকার কম কিছুতে রাজী হচ্ছে না। মেয়ে তারা পছন্দ করেছে, গণ-পণও মিলে গেছে, এ অবস্থায় ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু হাতে যে একটি পয়সাও নেই ভাই! তোমার বৌদির যা গয়না আছে, সব বেচলেও মেরে-কেটে ছু'শো টাকা পাওয়া যেতে পারে, আর বড় জোর এদিক-ওদিক থেকে শ-ছুই টাকা যোগাড় হবে। কিন্তু তার পর? ঘর-খরচা আছে, দান সামিগ্‌গির আছে—'

মুকুন্দবাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। যতীন বিব্রত হইয়া বলিল, 'তাইতো! কি করবেন তাহলে?'

মুকুন্দবাবু তাহার হাত ছুইটি ধরিয়া পুনশ্চ কহিলেন, এ-যাত্রা যেমন করেই হোক বাঁচিয়ে দে ভাই, তুই ইচ্ছে করলে সব ঠিক ক'রে দিতে পারিস। আমাদের বাঁচা—'

যতীন কহিল, 'কি মুশকিল, আমি কি করব দাদা? আমার যে কিছুই নেই। সব ঝেড়েঝুড়ে বোধ হয় দশটা টাকাও আমার কাছে হবে না।'

মুকুন্দবাবু কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'তা জানি না। কিন্তু এ ছেলে যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে সপরিবারে আত্মহত্যে করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। একুশ বছরের মেয়ে হ'ল, আর কি আশায় বুক বাঁধব?'

তাঁহার চোখের জলে যতীন বিচলিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, 'আচ্ছা আপনি বিয়ের সব ঠিক করুন গে দাদা, আমি দেখছি কি করতে পারি!'

পরদিন হইতেই মহা উৎসাহে মুকুন্দবাবু বিবাহের উদ্যোগ করিতে

লাগিলেন। মোড়ের বড় বাড়িটা তখনও খালি ছিল, বাড়িওয়ালার হাতেপায়ে ধরিয়া দুই দিনের জন্য সেটা পাওয়া গেল। এ-বাড়ির বাকী লোকেরাও সকলে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।—'যাক্ মুকুন্দ বাঁচল, মেয়ে যেন গাছের মতো হয়ে উঠেছিল ; পার হবে যে এ ভরসা ছিল না।'

বিবাহের আগের দিন সকালে মুকুন্দবাবু ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, 'ভাই যতীন, টাকাটার তাহলে কি ব্যবস্থা হবে ভাই ?'

যতীন চা খাইতেছিল। সে বিস্মিত হইয়া কহিল, 'টাকা ? কিসের টাকা ?'

মুকুন্দবাবুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ধপাস্ করিয়া মেঝেতেই বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, 'কি সর্বনাশ যতীন, আমার যে বাজার-হাট পর্যন্ত করা তৈরী! এখন আমি কি জবাব দেব তাদের ? ধার দেনা যেখানে যা করবার সব হয়ে গেছে। চারশো টাকা আরও তাদের না দিলে বিয়ে কিছুতে হবে না—'

যতীন কহিল, 'ওঃ—হ্যাঁ, সেই আপনার বিয়ের টাকা! ওঃ, সে হবেখন। কাল পাবেন এখন টাকা। আমিই দেব।'

মুকুন্দবাবু যথারীতি সাধুবাদ দিয়া উঠিলেন ; কিন্তু তখনও যে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না, তাঁহার মুখ দেখিয়াই তাহা বোঝা গেল। যতীন হাসিয়া কহিল, 'ভয় নেই দাদা, মনে আমার কেমন মাঝে মাঝে কথা হারিয়ে যায়, কিন্তু যখন ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন তখন আর ভাবনা নেই। কাল সন্ধ্যের আগে যেমন করে হোক পৌঁছে দেব—'

মুকুন্দবাবু কহিলেন, 'তাই দে ভাই, নইলে আর প্রাণে বাঁচবো না। টাকা আমি যেমন ক'রে হোক শোধ দেব, না খেয়েও দেব, তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই—'

যতীন কহিল, 'না, তার জন্যে ভাবি না, তবে এ ঘরটা—। আচ্ছা সে যা-হোক হবে, আপনি যান।'

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা যতীন চুপিচুপি জাহ্নবীকে ডাকিয়া বলিল, 'একটা মোটা দাঁও আছে মা, দিতে পারবেন অত টাকা ?'

জাহ্নবীর চক্ষু লোলুপ হইয়া উঠিল, 'কিসের দাঁও বাবা যতীন ?'

যতীন জবাব দিল, 'আমাদের ছাপাখানায় যে সাহেব ম্যানেজার আছে সে নিলামে একটা মোটর গাড়ি কিনেছে; তার টাকাটা কালকের মধ্যে না দিলেই নয়। সে অফিস থেকেই টাকা ধার নেবে কিন্তু তিন চার দিনের আগে তো আর আফিসে টাকা পাওয়া যাবে না, সেইজন্যেই বড় ঠেকেছে। আমায় বলে, মুখুজ্জে, এক হপ্তার জন্যে আমায় চারশ টাকা এনে দাও, আমি পঞ্চাশ টাকা সুদ দেব।'

জাহ্নবী লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কহিলেন, 'টাকাটার কোন ভয় নেই তো?'

'কিছু না, সে আমি জামিন রইলুম।'

জাহ্নবী কহিলেন, 'কিন্তু অত কমে হবে না, চারশো টাকা নিয়ে যদি পাঁচশো টাকা ফেরত দিতে পারে তো আমায় বলিস—'

চিন্তিতমুখে যতীন কহিল, 'অত কি দিতে রাজী হবে?· ·আচ্ছা দেখি এক-বার জিজ্ঞাসা ক'রে।'

পরের দিন ভোরবেলা ফিরিয়াই জাহ্নবীকে কহিল, 'কথা কয়েছি মা, সাহেবের সঙ্গে। ঐ পঁচাত্তর টাকাতে রফা ক'রে এলুম। ব্যাটা বলে কি জান মা, বলে এই টাকাই কি সোজা? এ-রকম সুদ পেলে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে মহাজনী ধরতে রাজী আছি।'

হাসিয়া জাহ্নবী বলিলেন, 'ব্যাটা সাহেবের আর কত বুদ্ধি হবে!'

তিনি বারবার সন্তর্পণে নোট চারিখানি গণিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখিস বাবা, একরাশ টাকা—'

বার-বারই অভয় দিয়া যতীন টাকাগুলি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সকলেই বিবাহ-উৎসবে মত্ত রহিল। জাহ্নবী দেবীও সারা রাত বাসরে কাটাইলেন। শুধু দেখা পাওয়া গেল না যতীনের। তাহার অফিসের কাজ রাত্রে, সকলেই জানিত বলিয়া কেহ তত বিস্মিত হইল না। কিন্তু ভোরবেলা বাড়ি ফিরিয়া জাহ্নবীই ব্যাপারটা প্রথম লক্ষ্য করিলেন। যতীনের খোলা দ্বারপথে একবার-মাত্র উঁকি মারিয়াই আছড়াইয়া পড়িলেন, 'ওমা, কি সর্বনাশ হ'ল গো!'

লোকজন ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জাহ্নবী একেবারে মড়া-কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাহারই মধ্যে

বারবার চেঁচাইতে লাগিলেন, 'ওরে তোরা কেউ পুলিসে খবর দে না রে—'

ব্যাপারটা আর কিছুই না, যতীনের ঘর খালি, তাহার সেই অদ্বিতীয় স্যুটকেশ বা বিছানা কিছুরই চিহ্ন নাই।

যেমন অকস্মাৎ সে আসিয়াছিল তেমনই আকস্মিকভাবে চলিয়া গেল।··· খালি তারিণী বারবার বলিতে লাগিল, 'আমি তখনই বলেছিলুম—'

একান্নবর্তী

হালুয়াটার ভাগ নিয়েই মনোমালিন্যের সূত্রপাত। ভাগ্নী খেঁদি বড়বৌকে ডেকে বলেছিল, 'বড় মামীমা, তাহলে হালুয়াটা কী রকম ভাগ করব?'

'তার মানে?' সত্যিই অতটা বুঝতে পারে নি বড়বৌ।

'না—মানে অন্য দিন তো সব সমান সমান দাও তোমরা—আজ বাপু তিন ঘর থেকে তিন জিনিস বেরিয়েছে, মেজমামী দিয়েছে ঘি, তুমি দিয়েছ সুজি, ছোট মামী চিনি। তা সমান ভাগ করব? কিন্তু দামের কথা যদি ধরো, ঘিয়েরই দাম সবচেয়ে বেশি, মেজ মামীর তাহলে একটু বেশি পাওনা হয়। ও বাপু আমি বুঝতে পারছি না! তার চেয়ে তোমরা এসে ভাগ-যোগ ক'রে নাও—'

কথার মধ্যে ইচ্ছাকৃত খোঁচা ছিল বই কি! যতটা সরলভাবে খেঁদি বলতে চাইছে ততটা সরল সত্যিই ও নয়—বিশেষত এখন সে সবটা জেনে-শুনেই অপদস্থ করতে চাইছে। পাড়ার নতুন বড় বাড়িতে ঘোষালরা এসেছেন মাত্র ন'দিন—সেই ঘোষাল-গিন্নী আজই সবে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রের বিস্ময় ও কৌতূহল লক্ষ্য ক'রে বড়বৌয়ের আরও বেশি মাথা গরম হয়ে গেল। সে কাছে এসে ঠাস ক'রে খেঁদির গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার আস্পদা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, না? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!'

অতবড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা নিশ্চয়ই ঠিক হয় নি। তা ছাড়া ওর গায়ের রং ঠিক গৌর না হলেও, পাঁচ আঙুলের দাগ না বোঝবার মত কালোও নয়। কিশোরী মেয়ের নরম গালে পাঁচটি আঙুলের দাগ নীল হয়ে ফুটে উঠল।

খেঁদি কাঁদল না। জলভরা চোখে একবার সকলের দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। ফলে কিন্তু লজ্জার কারণটা আরও বেড়েই গেল। ঘোষাল-গিন্নী হাঁ হাঁ ক'রে উঠলেন, 'ও কি করেন, ও কি করেন! ছিঃ! বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে—ওদের গায়ে কি হাত তুলতে আছে!'

তার ওপর রসান দিলেন মাসিমা, দালানের ও-প্রান্ত থেকে কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠ তাঁর বেজে উঠল, 'ওর অপরাধ কি গা বড় বৌমা! কী মিছে কথাটা ও বলেছে? তোমাদের সংসারের যা হালচাল তাই না হয় পষ্ট ক'রে বলেছে! তাই বলে অত মাথা গরম করা কি তোমার ঠিক?'

'আপনি চুপ করুন, মাসিমা। যা বোঝেন না—'

'চুপ ক'রেই তো আছি বৌমা। কবে আর কি বলছি বলো। তবে যদি মনে ক'রে থাকো যে,কিছু বুঝি না, সেটা তোমার ভুল। সবই বুঝি মা—নিহাৎ উপায় নেই বলেই পড়ে থাকি। আমরা দুটি প্রাণী হয়েছি তোমাদের সকলেরই চক্ষুশূল। কিন্তু তাও বলি বাছা—আমরা আছি তাই কিছু টের পাচ্ছো না, নইলে তিন হাঁড়ি তিন ঠাঁই হ'তে আর দেরি থাকত না। আর তাহ'লে তিনজনকেই তিনটি দিনরাতের ঝি আর ঠাকুর রাখতে হত, তা বলে দিচ্ছি।'

খেঁদিকে শাসন করা সোজা কিন্তু বয়স্কা মাসিমাকে থামাবার কোন উপায় নেই। যা ঢাকতে চাইছিল তাই-ই যেন কদর্য কর্কশ রূপ নিয়ে বেশি ক'রে ফুটে উঠল। রাগে দুঃখে বড় বৌয়ের চোখে জল এসে গেল।

এই অবস্থায় বাঁচালে মেজবৌ, সে ছুটে এসে এক রকম ঠেলেই বড় জাকে ওপরে উঠিয়ে দিলে, 'দিদিমণি, ছোট খোকাটা যে সেই থেকে কেঁদে কেঁদে গেল! আপনি যান শীগ্‌গির—আমি ওদের খাবার ভাগ ক'রে দিচ্ছি।'

তারপর ঘোষাল-গিন্নির দিকে চেয়ে মধুক্ষরা কণ্ঠে বললে, 'আপনি ভাই ওখানটায় বসে পড়েছেন? চলুন ওপরে যাই—ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে দিতে কথা কইব। প্রকাণ্ড বাড়ি করেছেন, এইবার একটা ভোজটোজ দিন। নইলে আপনারা আমাদের পাড়ায় এসেছেন বুঝব কেমন ক'রে?' ইত্যাদি—

ব্যাপারটা হ'ল এই। বাঁড়ুয্যেরা তিন ভাই-ই একান্নবর্তী। অর্থাৎ তিনটি পরিবারের রান্নাটা হয় একটা হাঁড়িতে, এক জায়গায়। তার সুবিধা ঢের,

কারণ এক বিধবা মাসি এবং অনাথা ভাগ্নীকে যখন পুষতেই হয় তখন রান্নার ব্যাপারটা একত্র থাকায় ঐ দুটি প্রাণীর ওপর দিয়ে রাঁধুনী রাখার খরচাটা চলে যায় অনায়াসে। খাওয়া-পরা ছাড়া তাদের মোটা মাইনে দিতে হ'ত—এদের তা দিতে হয় না।

অবশ্য বৌরাও রান্নাঘরে আসে। সকালে একটু বেলায় উঠে ছেলেমেয়েদের দেখে শুনে খাইয়ে নিজেরা কাপড়চোপড় কেচে এসে যখন রান্নাঘরে ঢোকে তখন বাড়ির তিন কর্তাই আপিস বেরিয়ে যায়। মানে সাড়ে নটারও পর। তখন রান্নার কাজ অল্পই বাকি থাকে। জলখাবারও ইতিমধ্যে খেঁদি তৈরি ক'রে রাখে। ওরা তিন বৌ এলে চা তৈরি হয়—সকলে মিলে জলখাবার খেয়ে উঠতে উঠতে দশটা, সাড়ে দশটা। তখন মেজ বৌ বলে, 'মাসিমা, কুটনো কিছু বাকি আছে কি ?' আর ছোটবৌ বলে হয়ত, 'মাসিমা, আপনি যান আহ্নিকটা সেরে আসুন গে—আমি দেখছি।' তখন মাসি গিয়ে স্নান ক'রে আহ্নিক পূজো সেরে এসে একটু কিছু মুখে দিয়ে জল খান, তারপর খেঁদি উনুনটা নিকিয়ে হেঁসেল ধুয়ে দিলে নিজের নিরামিষ রাঁধতে বসেন। বিকেলেও খেঁদি আগে এসে দুধ, ছেলেমেয়েদের জলখাবারের ব্যবস্থা, গিন্নীদের চা খাবার ক'রে এক-আধটা তরকারি চাপিয়ে দিলে বৌয়েরা একে একে দেখা দেয়। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে মাসি এসে আটা মেখে রুটি বেলে দিতে বসেন, খেঁদি সেঁকতে থাকে—তখন বৌয়েরা ওপরে উঠে যায় আবার। ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো আছে, ঘুম পাড়ানো আছে—নেই কি ?

তবু এক হাঁড়ি—এটাই কি কম।

কিন্তু বিপদ হচ্ছে, খরচের কেন্দ্রটা এক নয়। বোধ হয় কোন ভাই-ই কোন ভাইকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না—এটাই তার কারণ। বড় ভাই দেয় ট্যাক্স-খাজনা, ঝি-চাকরের মাইনে, ইলেকট্রিক, কয়লা, ঘুঁটে, মশলা, ডাল ইত্যাদি ; মেজ ভাই দেয় দৈনিক বাজার, এবং ছোট ভাই দেয় রেশন ও তেল। তেলের খরচ তো কম নয়—মাসে ষোল সের। এর মধ্যে প্রত্যেক ভাইয়েরই বিশ্বাস সে অপর দুই ভাইয়ের চেয়ে বেশি খরচ করছে। অবশ্য এই মোটা খরচগুলো বাদে বাকি সব খরচাই যে-যার নিজে বহন করে। চিনিটা রেশনের অঙ্গ কিন্তু চিনি নিয়ে প্রায়ই বিবাদ বাধত বলে (অর্থাৎ বড়র ছেলেমেয়ে বেশি

সে-ই বেশি চিনি খরচ করে এই সংশয়) চিনি প্রত্যেকেই নিজে নিয়ে নেয়, নিজেদের ঘরে রাখে। ছেলেমেয়েদের খাবার, দুধ, ধোপা সব স্বতন্ত্র। মাসি আর খেঁদির ধোপার খরচ বহন করে ছোটবৌ—মাসির একাদশীর একপো দুধ তিন বৌ নিজেদের থেকে একটু ক'রে দেয়। এ ছাড়া ঘি-ও যে যার নিজের ঘরের। সে জন্য ডাল-তরকারীতে ঘি পড়ে না কোন দিন। কোন বৌ যদি বিশেষ কোন রান্না রাঁধতে বসে তাহ'লে সে বাহবা নেবার জন্যে নিজের ঘর থেকে বার করে ঐ বস্তুটি।

তা হোক—এই ভাবেই একান্নবর্তী পরিবারের গৌরব তো বজায় রেখে চলেছে এরা!

বিপদে পড়ে সবচেয়ে খেঁদিই। জলখাবারের পরোটা হয় একত্রে, অথচ সংসারের কোন ঘি নেই। খেঁদিকে প্রতি ঘর থেকে চামচ মেপে মেপে ঘি নিয়ে আসতে হয়। হালুয়া হ'লে সব ঘর থেকেই সমানভাগে সুজি চিনি ঘি বেরোয়। তিন বাবু কি তিন বৌ একসঙ্গে খেতে বসলে তিনটে মাখনের কৌটা নিয়ে আসতে হয়, আবার চিহ্ন ক'রে রাখতে হয় কোন্ ঘরের কোন্টা। রাত্রে দই পাততে হ'লে তিন বৌকে দেখিয়ে দুধ নিতে হয় মেপে। নইলে সামান্য একটা কথা থেকে অনেক কথা এবং বাঁকা কথার সৃষ্টি হয়।

সেই দুঃখ আর ক্ষোভটাই যদি খেঁদির মুখ থেকে আজ বিদ্রূপের আকারে বেরিয়ে থাকে তো তাকে দোষ দেওয়া যায় কি?

রাত্রে তিন ভাই-ই বাড়ি এসে শুনল কথাটা।

বড় বৌ বললে, 'এ অপমান আমার বরদাস্ত হয় না বলে দিলুম! যা হয় একটা বিহিত করো!'

'কী বিহিত করব? আইবুড়ো ভাগ্নীকে তাড়িয়ে দেব? বড়জোর একটু বকে দিতে পারি। কিন্তু তুমি তো তার আগেই শাস্তি দিয়ে বসে আছ। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে লাভ কি?'

'তা কেন—কিন্তু এই কেলেঙ্কারী, ঘোষাল-গিন্নির সামনে—ছি ছি!'

'কেলেঙ্কারীর কারণটা দূর করলেই পারো। তোমরা ঝগড়াঝাঁটি করেই তো ব্যাপারটাকে এই দাঁড় করিয়েছ—ভাগযোগ, কত কি!'

'আমরা করেছি!' বড় বৌ রাগ করে, 'মেয়েছেলে থাকলে অমন একটু তর্ক-বিতর্ক হয়ই। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে সব করালেই পারো। একসঙ্গে হিসেব রেখে এক গেরস্তর বাজার-হাট করা, সেটাও তো করলে পারো—কই, তাও তো হয় না।'

'তাতে ঝগড়ার বীজটা যাবে কি? সেই তো মাপ-জোক নিয়ে ঝগড়া বাধাবে!'

'বেশ গো বেশ! আমিই দিনরাত ঝগড়া করছি!···দাও না আমাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে। মনের সুখে থাকো না ভাই-ভাজদের নিয়ে!'

বৃথা জেনে বড় ভাই প্রফুল্ল আর কথা কইলে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মাত্র।

মেজ বৌ তার স্বামী সন্তোষকে ঠিক ঐ কথাটাই তখন বলছিল, 'সামলে নিলুম বটে আমিই—কিন্তু লজ্জায় যেন মাথা কাটা গেল! এর একটা যা হয় বিহিত করো বাপু!'

'কী বিহিত করব বলো! আসল মূল যেটা সেটা তো দূর করতে পারবে না। ঠিকমতো বিহিত করতে গেলে তিনটি হাঁড়ি আলাদা করতে হয়।'

'তাই না হয় করো—কী আর কম খরচা হচ্ছে আমাদের?'

'অনেক কম খরচা হচ্ছে। যা আছে তা তো থাকবেই, তাছাড়া মনে করো ঝি-চাকর, টেক্স-খাজনা, ইলেকট্রিক-ঘুঁটে-কয়লা—সমস্তই প্রত্যেককে খরচের ভাগ বইতে হবে। আর এই তো জায়গা, তিনটে পৃথক সংসার ধরাবই বা কোথায়? তিনটে ভাঁড়ার, তিনটে রান্না শুধু নয়—কয়লা-ঘুঁটে রাখবারও তিনটে জায়গা—'

'বেশ তো, এরই মধ্যে যাতে মানায় তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা তো করতে পারো!'

'হ্যাঁ—ঐটেই বাকি আছে। তোমরা ঝগড়া পাকাবে আর আমরা ব্যবস্থা করব। বাইরে থেকে টাকা রোজগার করব—চাকরি আছে, টিউশ্যনী আছে—আবার দাঁড়িয়ে থেকে সংসার করব!'

'বেশ বেশ। আমরাই খালি ঝগড়া বাধাই আর তোমরা সাধুপুরুষ!'

পাশের ঘরে ছোট ভাই আনন্দও এই কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করছিল,

'তাহ'লে সোজাসুজি পৃথক হ'তে হয়। তা নইলে এ সমস্যার আর সমাধান হবে না কোন দিনই।'

'তাই হও না বাপু—কী আর বাকী আছে?'

'ঢের আছে গো, ঢের আছে। যা খরচ করছি এর তিনগুণ খরচেও থৈ পাবো না। তার পর, রান্না করতে পারবে?…এই চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে?'

'সে হয়ে যাবে একরকম ক'রে। মাসিমাকে আমাদের সংসারে নিয়ে নেবো।'

'হ্যাঁ—সেইটাই তোমার সুবিধা কিনা। অপর ভাইরা মাসিমাকে ছাড়বে?'

'কেন ছাড়বে না? ওঁকে তো একজন না একজনকে নিতেই হবে।'

'ওঁকে নেওয়া যে সুবিধা, তা যেমন তুমিও জানো তেমনি ওরাও জানে। ঝিঁদিকে নিলে বিয়ে দেবার প্রশ্ন, ঠাকুর রাখলে মাইনে আছে—চুরি আছে। …না গো ঠাকরুণ, অত সোজা নয়। বরং পারো তো নিজেরাই মানিয়ে নাও।'

কিন্তু সেটা যে সম্ভব নয়—অর্থাৎ তিনটে মেয়েছেলের একত্র মানিয়ে চলা—তা আনন্দও জানত। তাই রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সে-ই বাকি দুজনকে বাইরের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

'শুনেছ তো সব দাদা?'

'শুনেছি বই কি।'

'এর কি একটা ব্যবস্থা করা যায় না?'

'কী ব্যবস্থা করতে চাও?' সন্তোষ প্রশ্ন করে।

আনন্দ একটু মাথাটা চুলকে বললে, 'আমরা সবাই যদি সমান একটা টাকা ডোনেট করি—একটা সাধারণ ফাণ্ড ক'রে—ধরো দাদার কাছেই রইল—সব খরচ উনিই করবেন, হিসেবটা রইলো। যা কম পড়বে আবার আমরা সমান ভাগে দেবো।'

প্রফুল্ল বললে, 'সে কথা তো আগেও উঠেছিল। কিন্তু তাতে যে সমস্যা ঢের। আমার সাতটা ছেলেমেয়ে, তোমার চারটে, সনুর তিনটে। আইনত খরচা আমার বেশি হওয়া উচিত। অথচ সেটার হিসেব বা কি ক'রে হবে?'

'তা ছাড়া—' সন্তোষ বললে, 'তাতে স্বাধীনতা সকল দিক দিয়েই ক্ষুণ্ণ

হবে। আমি হয়ত অনেকটা রেহাই পাবো, কিন্তু তেমনি এখন এক-একদিন হাতে পয়সা থাকলে আমি পাঁচ-ছ টাকারও বাজার করি—ছেলে-মেয়েগুলো এটা-ওটা খেতে পায়, তখন তো আমার হাত থাকবে বাঁধা। যদি বা বেশি বাজার করি, তোমরা ভাববে এত নবাবীর কি দরকার ছিল?'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আনন্দ বললে, 'রেহাই পাবে মানে? তুমি কি ভাবছ তুমি বেশি খরচা করো আমাদের চেয়ে—আমাদের কত ক'রে পড়ে তা জানো?'

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি থামিয়ে দেয়, 'আঃ! ও সব এখন থাক। এই সব সমস্যার জন্যই তো একান্নবর্তী পরিবার থাকে না। অথচ ছাখো—একান্নবর্তী পরিবারে সুবিধাই বেশি, নয় কি? আলাদা হওয়া মানে সম্পূর্ণ নতুন এস্টাব্লিসমেণ্ট্। সবই তো চাই—দরকার নেই কি!...তাছাড়া কাজের লোক ছাড়াও তো সংসার চলে না। শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির লোক এনে সংসার ভরাতে হয়। পাড়ার মনো সান্যালকে ছাখো না—মেজদা একটু বেশি খরচ করে বলে রাগ ক'রে আলাদা হলো—তারপর? ওখানে বাড়ি ভাড়া দিত পুরনো আমল থেকে চল্লিশ—এখানে দুখানা ঘর পঁয়ষট্টি। ঝি রাতদিনের, আরও তো সবই আছে পুরো—সংসারের। তার ওপর একটি ক'রে শালীকে এনে রাখতেই হয়, কখনও কখনও তার ওপর শালা এবং শাশুড়ী।—না, না, ও কোন কাজের কথাই নয়!'

বেশ বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে কথাগুলো ব'লে চুপ করে প্রফুল্ল। তিন ভাই-ই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তিনজনেই ভাবছে একটা 'মেড্ইজি' ব্যবস্থা—

শেষে আনন্দই বললে, 'আচ্ছা, জলখাবারটা পুল সিস্টেম করলেই তো হয়। ঘি যখন কেনা হবে একেবারে দেড় সের কেনা হবে, আমরা প্রত্যেকে আধসের করে দেব। ময়দা আটা তো রেশনে থাকেই, সুজি না হয় ঐ ভাবেই কিনে দেব সবাই মিলে।'

সন্তোষ বললে, 'চিনি?...যেদিন হালুয়া হবে?'

আনন্দ বললে, 'পরোটা চিঁড়ে ভাজা এই সবই তো বেশি হয়। বেশ তো, হালুয়া যেদিন—এক এক দিন এক এক জনের ঘর থেকে পুরো চিনি নিলে হবে!'

সন্তোষ বললে, 'এ ব্যবস্থা মন্দ নয়।'

একটা উদার মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রফুল্ল বললে, 'কিন্তু ভাই আমার ছেলেমেয়ে তো বেশি। সেটাও হিসেবে ধরা উচিত—'

উদারতার সে তরঙ্গ বোধ করি বাকি দুজনের মনেও এসে ধাক্কা জাগিয়েছিল, আনন্দ তাড়াতাড়ি বললে, 'রেখে দাও ওসব কথা। তুচ্ছ ঐ সব হিসেবের মানে হয় না।'

সন্তোষ বললে, 'তোমার ছেলেমেয়েরা কি আমাদের কেউ নয়? সবাই বাড়ির ছেলেমেয়ে, ব্যস্!'

সেই ব্যবস্থাই বাহাল হ'ল।

দিন পাঁচেক পরে কিন্তু সন্তোষ বাজার থেকে ডিম নিয়ে এল আলাদা ক'রে, 'ওগো হ্যাখো আমাকে তোমাদের ও পরোটা-মরোটা দিও না। আমি আজ একটা মাম্‌লেট খাবো।'

সেদিন মেজ বৌ কিছু বললে না। কিন্তু পরের দিনও ডিম খেতে চাইলে মেজবৌ চাপা তর্জনের সঙ্গে বললে, 'বেশ তো তোমার বুদ্ধি! ও ধারে তোমার ঘিয়েতে গোছা গোছা পরোটা হচ্ছে—আর তুমি আবার আলাদা ডিম খরচ করো রোজ রোজ!'

সন্তোষ একটু অপ্রতিভভাবে বললে, 'রোজ রোজ আর কই! তাছাড়া শরীরটা কদিন ধরেই একটু দুর্বল লাগছে কিনা, তাই!'

'বেশ তো, পরোটাও খাও, ডিমও খাও।'

'আবার তো একটু পরেই ভাত খাবার সময় হবে—'

'তা হোক!…'

আনন্দর শরীর খারাপ—সে সেদিন জলখাবার খেলে না। কিন্তু পরের দিনও পেট খারাপের দোহাই দিতে ছোট বৌ বলে উঠল, 'আহা, আহ্লাদ! একতাল ক'রে হালুয়া হচ্ছে—তুমি খাবে না! তোমার ভাগটা কি বেঁচে যাবে বলতে পারো? পাঁচ ভূতে তো খাবে! আজ তুমি খাও।'

'পেটটা খারাপ যে!'

'তা হোক। না হয় একটু জোয়ানের জল খেয়ে নেবে খাবার পর।'

এমনি ক'রে কয়েকদিন চলতেই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। আবারও একদিন

দেখা গেল ঘি এসে যে-যার ঘরে উঠেছে। আবার একদিন থেঁদিকে মেজ বৌ-এর ঘরে এসে প্রশ্ন করতে হয়, 'মেজ মামী, তোমাদের কি জলখাবার হবে বলো? বড় মামী তো হালুয়ার হুকুম করলে।'

'তবে তাই করো। সুজি চিনি ঘি মাপ করে নিয়ে যাও। একেবারে এক পাকে হয়ে যাক। পঞ্চাশ রকম আর কতক্ষণ ধরে করবে?'···মেজবৌ সহানুভূতির স্বরেই বলে।

— অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত —